মধ্যশিক্ষাপর্ষদের নবপ্রবর্তিত সমাজবিজ্ঞার পাঠ্যসূচী অনুসারে
নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত
(Vide Notification No, SYL/1/62, dated 30th March, 1962)

দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী
এম.এ. (ইতিহাস), বি.টি., এম.এ. এডুকেশান (লণ্ডন)
এ.বি.পি.এস্. (লণ্ডন)
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ; বিশ্বভারতী
বিশ্বালয়ের শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিশ্বালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ও
শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, এম.এড.
ইতিহাসের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দণ্ডন, ইথিওপিয়া
ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক, ম্যাকউইলিয়ম উচ্চ বুনিয়াদী বিশ্বালয়,
আলিপুর দুয়ার

সংশোধিত সংস্করণ

ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড
২৯৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৬৪

মুখবন্ধ

পশ্চিম বংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দশম-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস এবং ভূগোল এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে সামাজিক জ্ঞান (Social Studies) আবশ্যিক পাঠ্যরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। একাদশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে অবশ্য এ সুযোগ পূর্ব হইতেই ছিল। দশম-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি যে সাগ্রহে এই সুযোগ গ্রহণ করিবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

ইতিহাস এবং ভূগোল এই দুইটি বিষয়ই অনেক ছাত্রছাত্রীর নিকট নীরস এবং দুরূহ। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে একটি বিষয় পাঠের অনুমতিকে সুযোগই বলিতে হয়। ইতিহাস এবং ভূগোলের (বিশেষ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যে ধরনের পাঠ্যসূচী) দুরূহ তাত্ত্বিক জ্ঞানের স্থলে দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়িত 'সামাজিক জ্ঞান' (Social Studies)এর ব্যবহারিক জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা তাহাদের নিকট সহজতরও মনে হইবে। তাই, বিদ্যালয়ে সামাজিক জ্ঞান পাঠের প্রবর্তন করিলে, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তো সহজ হইবেই, অধিকন্তু তাহারা দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক বাস্তবজ্ঞানও সংগ্রহ করিতে পারিবে—শিক্ষালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে। সামাজিক জ্ঞানের বিষয়বস্তু এমনই যে, শুধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কেন, দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভেচ্ছু যে কোনো ব্যক্তি এই বিষয় পাঠে উপকৃত হইবেন।

নূতন বিষয় বলিয়া, এই বিষয়ে পাঠদান করা কঠিন হইবে বলিয়া শিক্ষক মহাশয়দের মনে করার কোনো কারণ নাই। এই পুস্তকে যে সকল বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা অতি সহজ ও সুললিত ভাষায় ছাত্রদের জন্য পরিবেষিত হইয়াছে। 'Exercises'গুলি ছাত্রদের

দ্বারা করাইয়া, পরিবেষিত জ্ঞান সংহত করিতে পারিলেই, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে।

বস্তুতপক্ষে, পুস্তকখানি অনেকটা Self-study Readerএর মতো করা হইয়াছে। ছাত্ররা যাহাতে নিজেরা পুস্তকখানি পড়িয়া বুঝিতে পারে তাহার জন্য প্রচুর দৃষ্টান্ত, মানচিত্র, ছবি ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে।

কিভাবে Scrap-book রক্ষা করিতে হয়, কিভাবে Project পরিচালনা করিতে হয়, এইসব বিষয়েও পুস্তকে বাস্তব নির্দেশ দেওয়া আছে। ঐসব নির্দেশ অনুসরণ করিয়া ছাত্ররা অনেকটা শিক্ষক-নিরপেক্ষভাবেও কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। পুস্তকের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের (Objective Tests) উত্তর সংগ্রহ করাও এক ধরনের হাতে-কলমে কাজ এবং ইহা পাঠ-শিক্ষায় সাহায্য করে। প্রত্যেক পাঠের শেষে কিছুসংখ্যক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে; এইগুলি অনুশীলন করিলে ছাত্ররা যথেষ্ট লাভবান হইবে।

আর একটি কথা, Scrap-book এবং Projects সম্বন্ধে যেসব কাজের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সব কিছুই যে করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হইবে এবং অন্তত একটি Project গ্রহণ করিতে হইবে। ছাত্রদের ইচ্ছা, বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কাজ গ্রহণ করিলেই চলিবে।

সংক্ষেপে, শিক্ষক মহাশয়ের মোটামুটি পরিচালনা থাকিলেই ছাত্ররা এই বিষয়ের পাঠে সাফল্যলাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃত শিক্ষা এবং সহজে পরীক্ষা পাশের মধ্যে যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, এই পুস্তকের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ তাহা প্রমাণ করিবে বলিয়া ভরসা করি।

১লা অক্টোবর, ১৯৬২ গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পত্র

ভূমিকা

আমাদের দেশ ও আমরা

আমাদের দেশ—ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। সিন্ধু-গংগা-যমুনা-লৌহিত্য বিধৌত, সাগরপর্বতধৃত এই সুবিশাল দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের জীবন সার্থক। 'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে' যুগ যুগ ধরিয়া আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপীয়দের অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিচিত্র জন কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা এই দেশে আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং একে একে ধীরে ধীরে কিভাবে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারায় বিলীন হইয়া ইহাকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে। জ্ঞানে গুণে গরিমায় অর্থসম্পদে কর্মক্ষমতায় একদিন এই দেশ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। আজিও যখন পৃথিবী যুদ্ধভয়পীড়িত তখন 'মহামিলনের গান' এই দেশেই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে; 'শান্তির ললিতবাণী'র আশায় বিভিন্ন জাতি এই দেশের দিকেই তাকাইয়া আছে।

ভৌগোলিক পটভূমি—মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ দিকে পূর্ব গোলার্ধের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ভারতবর্ষ অবস্থিত। ইহার উত্তরে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের অপর পারে আফ্রিকা, আর দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগরের অপর পারে ওসেনিয়া। ফলে, ভারতবর্ষের সহিত এই তিন মহাদেশেরই যোগাযোগ বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

অবস্থান

উত্তরে ও দক্ষিণে বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা আমাদের এই দেশ সীমিত। ইহার উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়, আর দক্ষিণে বংগোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরবসাগর। পূর্ব-পশ্চিমেও যে স্বাভাবিক পার্বত্য সীমারেখা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষকে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছে, সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাহা খর্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমানে পূর্ব দিকে পূর্ব পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশ, আর পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের সীমা নির্দেশ করিতেছে। বস্তুত, আজিকার রাষ্ট্রীয় সীমা যাহাই হউক, তিনদিকে সুউচ্চ

সীমা

পৃথিবী
সমুদ্র পথ
বিমান পথ
অ্যাঙ্কোরেজ
এডমন্টন
ভ্যাঙ্কুবর
সানফ্রান্সিস্কো
শিকাগো
নিউ ইয়র্ক
মেক্সিকো
হনলুলু
টাহিটি
ইকোয়েডর
লিমা
বেসিফে
রিও ডি জেনিরো
মন্টিভিডিও
বুয়েনস এয়ার্স
ভালপারাইসো
ওয়েলিংটন
লেনিনগ্রাড
মস্কো
লণ্ডন
প্যারিস
বার্লিন
লিসবন
মাদ্রিদ
রোম
আলেকজান্দ্রিয়া
কায়রো
ডাকার
কেপটাউন
ডারবান
জোহানেসবার্গ
খার্টুম
এডেন
করাচী
বোম্বাই
দিল্লী
কলিকাতা
কলম্বো
রেঙ্গুন
হংকং
ম্যানিলা
সিঙ্গাপুর
ডারউইন
পিকিং
সাংহাই
টোকিও
ইয়াকুটস্ক
ব্রিসবেন
সিডনী
মেলবোর্ন
পার্থ
তাসখন্দ
নভোসিবির্স্ক
ভ্লাডিভস্টক
অকল্যাণ্ড
হোবার্ট
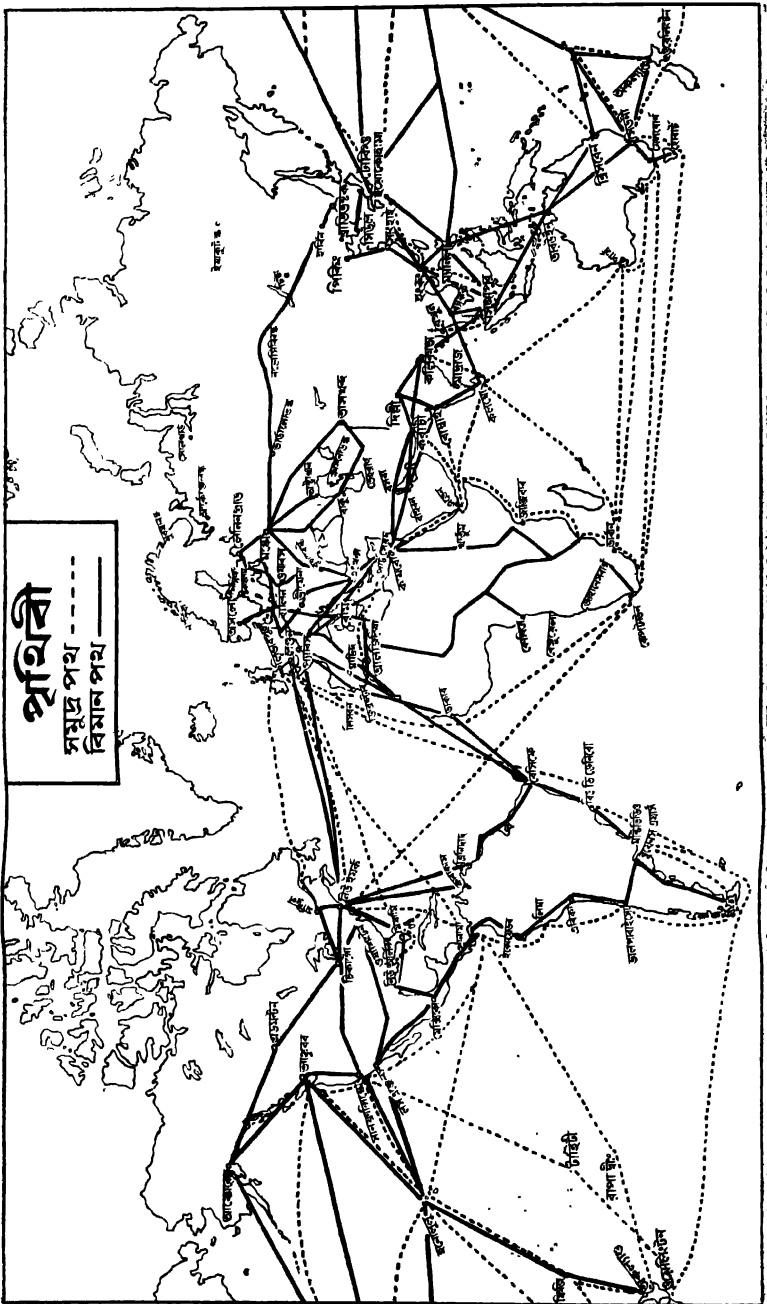
পর্বত আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র—এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূখণ্ডই প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ভারতবাসীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি। ইহাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত হইবার সুযোগ দিয়াছে।

আকৃতি
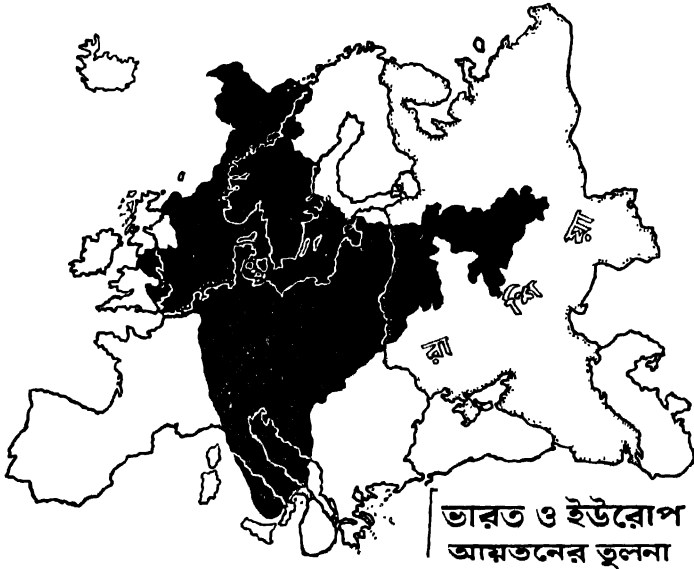
ভারতের আকৃতি দেখিতে অনেকটা ত্রিভুজের মতো। তবে ইহার উত্তর-দক্ষিণে বা পূর্ব-পশ্চিমে দুই দিকেই দীর্ঘতম দূরত্ব প্রায় সমান (প্রায় ৩২১৮ কিলোমিটার)। এই কারণেই বোধ হয় এদেশীয় তথা বিদেশীয় পণ্ডিতরা প্রাচীনকালে এই দেশকে ত্রিভুজের দ্বারাই বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়তন

আমাদের এই দেশের আয়তন প্রায় ৩০,৫৩,৫৯৭ বর্গ কিলোমিটার। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এবং চীন সাধারণতন্ত্রের পরেই ইহার স্থান। পৃথিবীর মধ্যে আয়তনে ইহার স্থান অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে অষ্টম। পাকিস্তান অপেক্ষা আমাদের দেশ প্রায় সাড়ে তিন গুণ এবং বৃটিশ

দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা বারো গুণ বড়ো। বস্তুত, রাশিয়াকে বাদ দিলে গোটা ইউরোপ মহাদেশটাই আমাদের এই দেশের সমান।

ভূ-প্রকৃতি—নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই সুবিশাল দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশও বৈচিত্র্যময়। এদেশের বিভিন্ন অংশের ভূ-প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান, সেই অনুযায়ী এই দেশকে চারিটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(১) উত্তরের ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল, (২) উত্তর ভারতের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চল, (৩) মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, এবং (৪) উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চল।

উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল

ভারতবর্ষের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি ও পর্বতগ্রন্থি পামির। 'তথা হইতে একটু দক্ষিণ-পূর্বে বাঁকিয়া বরাবর পূর্বদিকে হিমালয়ের তিনটি পর্বতশ্রেণী প্রায় পরস্পরের সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। উচ্চতার দিক হইতে সর্বদক্ষিণের অব-হিমালয় পর্বতশ্রেণী নিম্নতম এবং সর্বউত্তরের প্রধান হিমালয় শ্রেণী উচ্চতম। এই শ্রেণীতেই হিমালয়ের সুউচ্চ শৃংগসমূহ—নাংগা পর্বত, নন্দাদেবী, কামেট, কাঞ্চনজংঘা, মাকালু, ধবলগিরি, এভারেষ্ট প্রভৃতি অবস্থিত। হিমালয়ের পূর্ব সীমা হইতে ক্রমশ দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে পাটকই, নাগা, বরাইল ও লুসাই পর্বত। আর আসামের মধ্য দিয়া গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পাহাড় পূর্বদিকে গিয়া বরাইল পর্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে।

উত্তরের এই পর্বতমালার অবস্থান ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু এই পার্বত্য অঞ্চলে বাধা পায় বলিয়াই যেমন এই দেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়, তেমনি শীতকালে উত্তরের শীতল বায়ুও এই পর্বতমালায় বাধা পায় বলিয়াই এই দেশে অধিক শীত হইতে পারে না। এই পর্বতমালার বরফ-গলা জল ও বৃষ্টির জলের ধারাই এই দেশের বহু নদনদীর উৎস। আর এই নদনদীই সৃষ্টি করিয়াছে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ পলিগঠিত সমভূমি, সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে সেখানকার কৃষি ও শিল্পের উন্নতির, নৌপথে যাতায়াতের সুবিধার। সাম্প্রতিককালে এই সকল নদীর পার্বত্য অংশে জল-বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের সুবিধা হইয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের প্রচুর বনজ

সম্পদ এই দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এই পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গমতাই এই দেশকে স্থলপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে অনেক সময় রক্ষা করিয়াছে। অবশ্য একই কারণে স্থলপথে এদেশের বহির্বাণিজ্যও কোনোদিনই বেশী হইতে পারে নাই।

উত্তর ভারতের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চল ও তাহার প্রভাব

ভারতবর্ষের মধ্যভাগ জুড়িয়া রহিয়াছে বিস্তীর্ণ পলিময় সমভূমি। ইহার পশ্চিম প্রান্তে আরাবল্লী পর্বত আর তাহার পশ্চিমে থর মরুভূমি। এই অঞ্চলের ভূমি পলিগঠিত বলিয়া উর্বর এবং প্রতি বৎসরই বৃষ্টি ও বন্যার ফলে এখানে নূতন পলি সঞ্চিত হয়। ফলে, এই অঞ্চল চাষের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। নদীগুলি এখানে শান্ত বলিয়া যেমন নাব্য তেমনি জল-সেচনের জন্যও উপযোগী। এই বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল স্থলপথ, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণের পক্ষেও সুবিধাজনক। সেইজন্যই এখানে বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য নগরাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। একই কারণে লোক-বসতিও এই অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী।

মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও তাহার প্রভাব

সমভূমি অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণেই মধ্য ভারত ও সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে এক বিরাট মালভূমি। মধ্য ভারত মালভূমি পশ্চিমে মালব, মধ্যাংশে বুন্দেলখন্দ এবং পূর্বে ছোট নাগপুরের মালভূমি নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের মালভূমির সহিত ইহা বিন্ধ্য পর্বতমালাদ্বারা বিচ্ছিন্ন। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিমদিকে বিস্তৃত সহ্যাদ্রি বা পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালা আর পূর্বদিকে বিস্তৃত মলয়াদ্রি বা পূর্বঘাট পর্বতমালা দক্ষিণে মহীশূরের দক্ষিণপ্রান্তে নীলগিরিতে মিলিত হইয়াছে। সেখান হইতে আন্নামালাই, পাল্‌নি ও কার্ডামম পর্বত আরও দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চল প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূভাগের অন্তর্গত এবং আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাদ্বারা গঠিত বলিয়া এই অঞ্চলেই এদেশের প্রায় সমুদয় খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। আবার ইহার উত্তর-পশ্চিমের যে অংশ প্রধানত লাভা দ্বারা গঠিত সেই অঞ্চল বিশেষ উর্বর বলিয়া সেখানে চাষাবাদের সুবিধাও রহিয়াছে। এখানকার নদীগুলি খরস্রোতা বলিয়া

যদিও নাব্য নয়, কিন্তু জল-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনেব জন্য বিশেষ উপযোগী। এখানকার পার্বত্য অংশও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু এখানকার বেশীর ভাগ অঞ্চলেই চাষাবাদের সুবিধা কম বলিয়া এখানে লোকবসতি উত্তরের সমভূমি অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম ; ফলে, নগরাদিও কম।
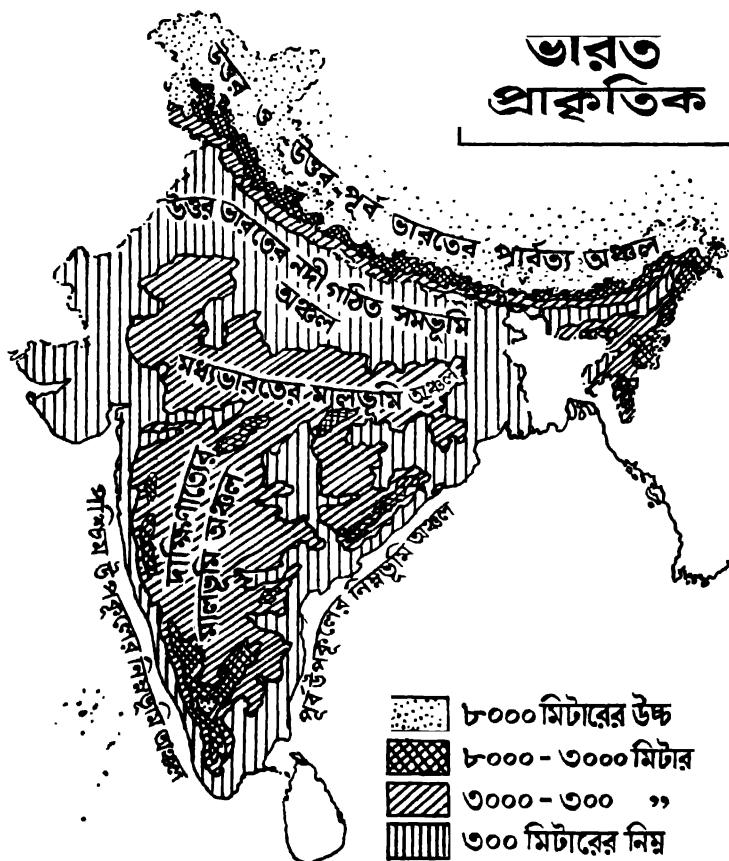
উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চল ও তাহার প্রভাব

উপকূলের সমভূমি অঞ্চল পূর্বদিকে বেশ প্রশস্ত হইলেও (প্রায় ১৬১ কিলোমিটার চওড়া), পশ্চিমে সংকীর্ণ (প্রায় ৪৮-৬৪ কিলোমিটার মাত্র)। প্রধানত উর্বর পলির দ্বারা গঠিত বলিয়া এই অঞ্চল কৃষিকার্যের অত্যন্ত

উপযোগী। মৎস্য ব্যবসায়ের জন্যও এই অঞ্চল সুবিধাজনক; বিশেষতঃ পূর্ব উপকূলে প্রচুর শংখ ও মুক্তা পাওয়া যায়। উত্তরের সমভূমির পরেই এখানে জীবিকা অর্জনের সুবিধা বেশী বলিয়া এখানে লোকবসতিও বেশ ঘন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছে এদেশের অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী। উত্তর ভারতের প্রধান নদী গংগা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু। গংগার অসংখ্য উপনদী ও শাখানদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যমুনা, শোণ, গোমতী, সরযু, গণ্ডক, কুশী, মহানন্দা, ভাগীরথী প্রভৃতি। ইহার শেষ গতিতে পদ্মা নামে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবাহিত। লোহিত, সুবর্ণশ্রী,

নদ-নদী

তোর্সা, তিস্তা প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। সিন্ধুর ডান দিকের উপনদীগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত। ইহার বামতীরের উপনদীর মধ্যে বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু প্রধান। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি উত্তর ভারতের নদীগুলির তুলনায় ক্ষুদ্র এবং সারা বৎসর ইহাদের উপত্যকাতে জলও থাকে না। ইহাদের মধ্যে প্রধান নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, পেন্নার, পেরিয়ার প্রভৃতি।

এই নদীগুলিই এদেশের প্রাণ। ইহারাই উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া উত্তরের সমভূমি ও উপকূলের সমভূমি অঞ্চলকে গড়িয়াছে। ইহারাই এদেশের আশীর্বাদ। ইহাদেরই তীরে তীরে ভারতীয় সভ্যতার জয়যাত্রা, মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম-নগরের উদ্ভব, শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম-কর্মের বিকাশ। এদেশের শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উত্তর ভারতের নদীগুলি এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি উচ্চগতিসম্পন্ন হওয়ায় সাম্প্রতিক কালে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎসে পরিণত হইয়াছে।

জলবায়ু

আমাদের এই সুবিশাল দেশের জলবায়ুও বৈচিত্র্যময়। মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষ উষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত। তবে উত্তর ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশেই (পাঞ্জাব ও রাজস্থানে) গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর। অন্যত্র গ্রীষ্মের বায়ু উষ্ণ জলীয়। আবার সমুদ্র-সান্নিধ্যের ফলে দক্ষিণ ভারতে শীত-গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য খুবই কম, কিন্তু উত্তর ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে এই পার্থক্য খুব বেশী।

বৃষ্টিপাত

এদেশের ঋতু পরিবর্তনের সংগে বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বায়ুপ্রবাহেরও দিক পরিবর্তন ঘটে। তাই এই বায়ু প্রবাহের নাম মৌসুমীবায়ু। শীতকালে উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে উচ্চচাপ থাকে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণে চাপ কমিয়া যায়। ফলে, বায়ু সাধারণতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। আবার গ্রীষ্মকালে ভারতের উত্তর অঞ্চলে নিম্নচাপ থাকে এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে বায়ুর চাপ থাকে বেশী। ফলে বায়ু তখন দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হয়।

এই বায়ুপ্রবাহের বৈচিত্র্যই এই দেশের বারিপাত নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগর হইতে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ পশ্চিম ভারতের উপকূলে পৌঁছিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পাইবার সংগে সংগে সেখানে বৃষ্টি শুরু হয়। ক্রমে এই বায়ুপ্রবাহ আরও উত্তরে অগ্রসর হইলে সেখানে বৃষ্টি শুরু হয়। একই সময়ে বঙ্গোপসাগর হইতে আগত বায়ুপ্রবাহের ফলে পূর্ব ভারতের দেশগুলিতে বৃষ্টিপাত হয়। এই বায়ু যখন
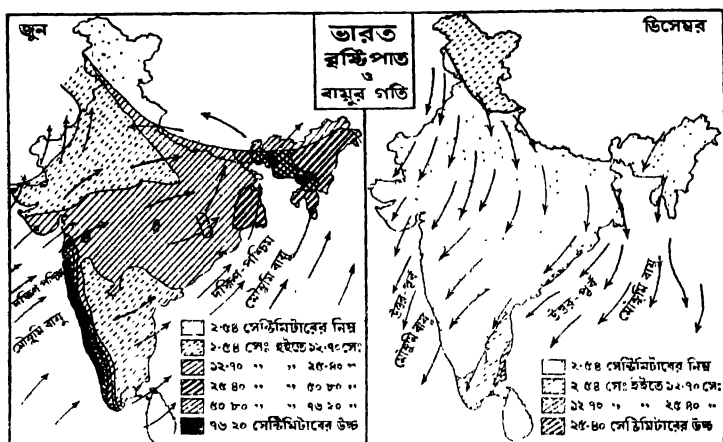
সেখান হইতে ঘুরিয়া ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়, তখন স্বভাবতই পশ্চিমদিকে বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যায়। শীতকালে যে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা স্থলভাগ হইতে আগত বলিয়া তখন এদেশে বৃষ্টি হয় না। তবে ঐ বায়ু যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন যে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় তাহার ফলে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়।

এই জলবায়ুর প্রভাবেই এই দেশের বিভিন্ন অংশে উদ্ভিদের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে এবং পশ্চিমঘাটের পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী সেখানে গর্জন, শিশু, আবলুস, রবার প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের বন। এখানে চিতাবাঘ, বন্য হাতী, গণ্ডার,

বনজ সম্পদ

ভাল্লুক প্রভৃতি পশুর বাস। ইহাদের চামড়া ও হাতীর দাঁত বিশেষ মূল্যবান। হিমালয়ের পাদদেশে কতক অংশে এবং পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের যেসকল স্থানে বৃষ্টিপাত মাঝারি রকমের

সেখানে সেগুন, শাল, অর্জুন, খয়ের, শিমুল প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। এই সকল বনে হরিণ, বাঘ, শূকর প্রভৃতি পশু বাস করে। ইহাদের চামড়া, শিং, চর্বি প্রভৃতি মূল্যবান। হিমালয়ের নিম্ন অংশে পাইন, দেবদারু প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছের বন। এখানে চামরী গাই, কস্তুরী মৃগ, হরিণ, বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতির বাস। উপকূল অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী,

কেয়া, তাল, সুপারী, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছ। এছাড়া মধ্য প্রদেশ হইতে পশ্চিমে বোম্বাই পর্যন্ত এবং পাঞ্জাবের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে
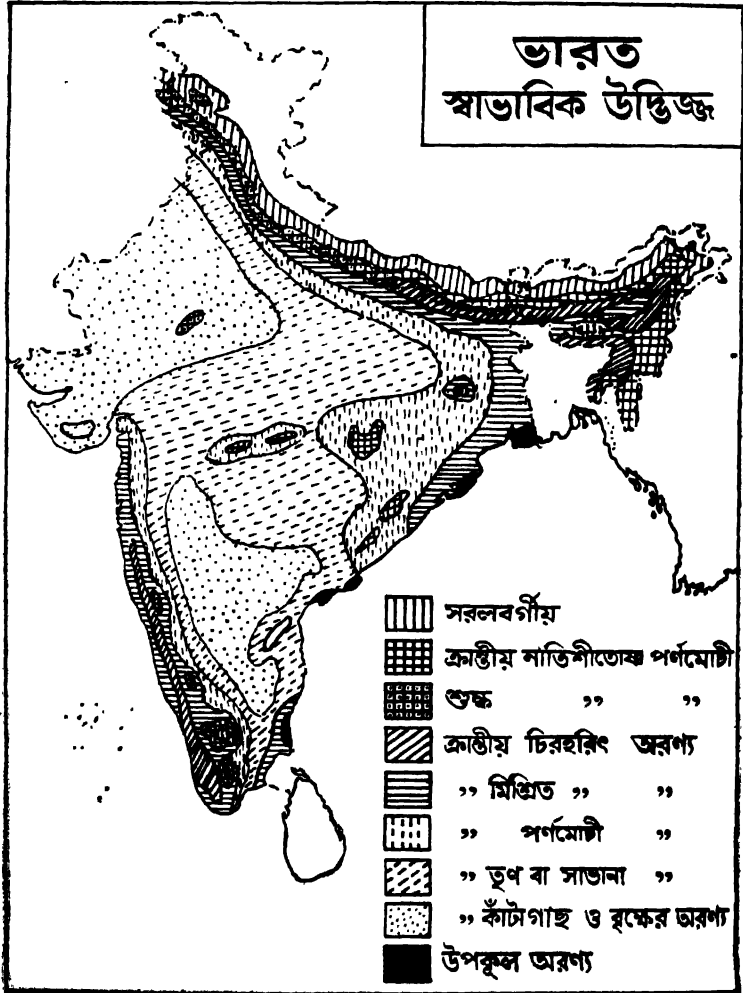
মহীশূর পর্যন্ত যেখানে বৃষ্টি স্বল্প সেখানে শুধু তৃণ ও গুল্ম জন্মে। সেখানে শুধুমাত্র খরগোস ও বন্য ছাগের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাজস্থান ও আশপাশের শুষ্ক অঞ্চলে সামান্য তৃণ এবং কাঁটাগাছ মাত্র জন্মে।

আমরা ও পৃথিবী

বিশেষ করিয়া ভৌগোলিক অবস্থানের নিমিত্ত এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। এই কার্যে স্থল এবং জল উভয় পথই ব্যবহৃত হইত।

সাম্প্রতিককালে সুয়েজ খাল কাটার পর, ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। জাহাজ চলাচল পথের উন্নতির সংগে সংগে নূতন মহাদেশ আমেরিকার সহিতও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকটি প্রধান বিমানপোত কোম্পানীর বিমানসমূহ নিয়মিতভাবে এদেশের উপর দিয়া যাতায়াত করে বলিয়া ইহাদের মারফত ভারতের পক্ষে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত ও তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ হইয়াছে।

অধুনা আফ্রিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে তাহাদের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সমগ্র বিশ্বে আমাদের মর্যাদাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সহিত আমাদের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধও গড়িয়া উঠিতেছে। সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমগ্র বিশ্বের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলা স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিও বটে।

রাজনৈতিক পটভূমি

প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজের অধীনে থাকিবার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আমাদের এই দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তবে সেই দিনই এদেশের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের মুসলমান প্রধান অংশ লইয়া নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রও গঠিত হইয়াছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে এই দেশ এক স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে (Sovereign Democratic Republic) পরিণত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠন

দেশ বিভাগের সময় ভারতবর্ষে এগারোটি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ, পাঁচটি চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ এবং ছয়শ'র বেশী দেশীয় রাজ্য ছিল। পরবর্তীকালে ঐসব রাজ্যগুলি ধীরে ধীরে নিকটবর্তী গভর্ণর-শাসিত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, বা কতকগুলি

পরস্পর মিলিত হইয়া রাজপ্রমুখ-শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই দেশে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবী ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এই দাবী মানিয়া রাজ্যসমূহের পুনর্গঠনের ব্যাপারে মতামত দিবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করেন। এবং এই কমিশনের মতামতের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য রাজ্যসংখ্যা হয় বিশটি। ইহাদের মধ্যে চৌদ্দটি—উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, বিহার, অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ, পশ্চিম বংগ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, রাজস্থান, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, কেরালা, আসাম এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য। আর বাকী ছয়টি—দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা-আমীন দ্বীপপুঞ্জ—কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল। ইহার পরেও আসামের উত্তর-পূর্ব অংশকে এবং নাগা পাহাড অঞ্চলকে লইয়া পৃথক উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল এবং নাগাপাহাড-টুয়েনসাংগ অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। অল্পদিন হইল, গুজরাটী ও মারাঠীদের নিজ নিজ ভাষাভাষী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের সুযোগ দিবার নিমিত্ত বোম্বাইকেও গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামে দুইটি রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৯৬২ সালে নাগা পাহাড়-তুয়েনসাংগ অঞ্চলকে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

এই রাজ্যগুলি যে সব প্রায় একই আয়তনের তাহা নহে। রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যসমূহের মধ্যে মধ্য প্রদেশ বৃহত্তম (প্রায় ৪,৪৩,৪৫২ বর্গ কিলো-মিটার) আর সর্বনিম্নের দুইটি স্থান যথাক্রমে পশ্চিম বংগ (প্রায় ৮৭,৬১৭ বর্গ কিলোমিটার) ও কেরালার (প্রায় ৩৮,৮৫৫ বর্গ কিলোমিটার)। কিন্তু লোকসংখ্যার দিক হইতে উত্তর প্রদেশ প্রথম (৭৩,৭৪৬,৪০১) আর শেষ দুইটি রাজ্য যথাক্রমে আসাম (১১,৮৭২,৭৭২) এবং জম্মু-কাশ্মীর (৩,৫৬০,৯৭৬)। আবার প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি যদি ধরা যায়, তাহা হইলে প্রথম স্থান অধিকার করে কেরালা (১,১২৭) এবং তাহার পরই পশ্চিম বংগ (১,০৩২); জম্মু-কাশ্মীরের লোকবসতি সবচেয়ে কম আর রাজস্থানের লোকবসতি (১৫৩) কাশ্মীর হইতে শুধু বেশী।

আরও পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটাইতে পারে নাই, যে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সমস্যা মিটাইয়াও জাতীয় চেতনায় আমাদের উদ্বোধিত করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছে, ভেদবুদ্ধি জাতীয়তাবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্প্রীতি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন রাজ্যসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগস্থাপনের উদ্দেশ্যে এদেশকে নিম্নলিখিত পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে—
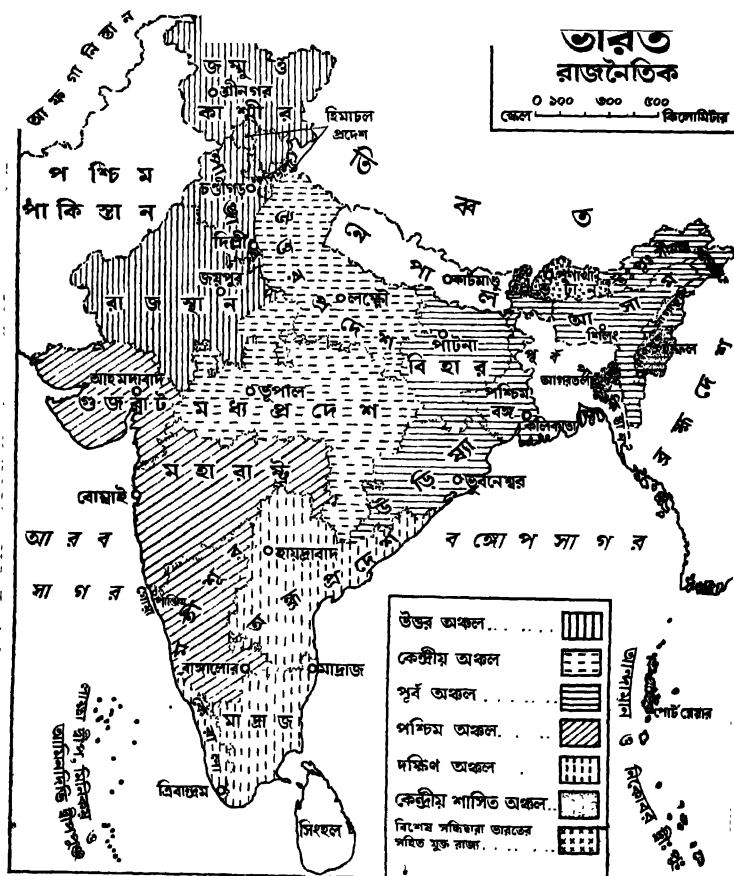
উত্তর অঞ্চল—জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ ও দিল্লী।

কেন্দ্রীয় অঞ্চল—উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ।

পূর্ব অঞ্চল—বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বংগ, আসাম, ত্রিপুরা, নাগাভূমি এবং মণিপুর।

পশ্চিম অঞ্চল—গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং মহীশূর।

দক্ষিণ অঞ্চল—অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং কেরালা।

আগেই বলা হইয়াছে আমাদের শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় শাসনের বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যাধীন—এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির—যথা, দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ, ডাক ও তার, যোগাযোগ প্রভৃতি—শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। আর রাজ্যাধীন বিষয়গুলির—যথা, আইন ও শৃঙ্খলা, বিচার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও জলসেচ, মৎস্য ও বনসম্পদ, আবগারী বিভাগ প্রভৃতি—দায়িত্ব রহিয়াছে রাজ্য সরকারের হাতে। এছাড়া কতগুলি বিষয়কে যুগ্ম বিষয় বলা হয়—যথা, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন ও বিচারপ্রণালী, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, উইল, চুক্তি, খবরের কাগজ-বই-ছাপাখানা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধ, কারখানা, শ্রমিক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি—এইগুলির সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারকেই দেওয়া আছে। তবে, সাধারণতঃ এই সব বিষয় সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন রাজ্য-আইনের উপর বলবৎ থাকিবে। তবে রাজ্যসরকারের আইন যদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় তাহা হইলে সেই আইনই কেন্দ্রীয় আইনের উপর বলবৎ হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

কি কেন্দ্রে কি রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার একজন রাষ্ট্রপতি, একটি মন্ত্রিপরিষদ, ও দুই সভা বিশিষ্ট আইন পরিষদ লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি প্রধান কর্মকর্তা হইলেও তিনি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই শাসন করেন। রাজ্যগুলির শাসনের জন্য একজন রাজ্যপাল, একটি মন্ত্রিসভা ও আইনসভা আছে। কি কেন্দ্রে কি রাজ্যগুলিতে যদিও মন্ত্রিসভাই আসল ক্ষমতার অধিকারী, তাহারা সবসময়ই আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক

বহু শহীদের ত্যাগে ও জীবনদানে আমরা আজ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের বলে আজ আমরা কতকগুলি মৌলিক অধিকারের অধিকারী। আইনের চোখে ভারতের নাগরিকমাত্রই সমান—আমাদের প্রত্যেকেরই যোগ্যতা থাকিলে সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার রহিয়াছে। আমাদের সকলেরই স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার, সভাসমিতি গঠনের অধিকার, দেশের অভ্যন্তরে অবাধ ভ্রমণের ও বাস করিবার অধিকার রহিয়াছে। সকলেই ইচ্ছামত যে কোনো ধর্ম গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারি, যে কোনো ধর্মানুষ্ঠান পালন করিতে পারি। যে কোনো সম্প্রদায়—যত সংখ্যালঘুই হোক না কেন—নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে ও তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে। রাষ্ট্র এইসব প্রয়াসকে ন্যায্য অর্থসাহায্য পর্যন্ত করে। বেআইনীভাবে কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায় না। আমরা সকলেই যাহাতে যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার এবং জীবিকার্জনের সুযোগ এবং প্রয়োজনমত চিকিৎসার সুযোগ পাই সে চেষ্টা রাষ্ট্র করিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা নব-জীবনের প্রভাতে উপনীত হইয়াছি।

আমাদের অধিকার

আমাদের এই সব অধিকার এবং দাসত্ববিমুচিত নবজন্মকে সার্থক করিতে হইলে আমাদেরও দায়িত্ব বহন করিতে হইবে প্রচুর পরিমাণে।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের উপর কতকগুলি গুরু দায়িত্বও আসিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা যদি আমরা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই, যদি আমাদের দেশকে এবং নিজেদের জীবনকে আরও সুন্দরতর সমৃদ্ধতর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাই, তবে এই দায়িত্বগুলি আমাদের পালন করিতে হইবে।

আমাদের দায়িত্ব

আজ জাতীয় সংহতি আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। এখনও আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস এবং সম্প্রীতি স্থাপিত হয় নাই। এখনও আমরা সমগ্র দেশের স্বার্থের চেয়ে আঞ্চলিক এবং ধর্মদলগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। অস্পৃশ্যতা এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে

আমাদের কর্তব্য নিজেদের এবং অপরের মন হইতে এসব ভাব এবং ধারণা দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে, নানা কারণে, আমাদের কর্মজীবনে দুর্নীতি এবং আলস্য প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের কর্তব্য নিজেদের এবং অপরের কর্মজীবন হইতে এসব দূর করা।

অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ইত্যাদিতে এখনও আমাদের জীবন পূর্ণ। একা সরকারের চেষ্টায় এসব দূর হইবে এরূপ ভরসা করা অন্যায়। গ্রামে বা শহরে যেখানেই আমাদের বাড়ী হউক না কেন, আমাদের কর্তব্য সেখানকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি সমস্যা দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। পৌর প্রতিষ্ঠান, বা যেসব জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, পঞ্চায়েৎ রহিয়াছে বা যেসব জাতীয় এক্সটেন্সন্ সার্ভিস (N. E. S.) ব্লক প্রভৃতির উদ্বোধন হইয়াছে, আমাদের কর্তব্য সেই সব প্রতিষ্ঠানের কার্যে সবরকমে সাহায্য করা। কোন না কোনরূপে সমাজসেবা আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

অধুনা আমাদের মধ্যে উচ্ছৃংখলতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। উচ্ছৃংখল দেশ মেরুদণ্ডহীন মানুষের মত। সরকারের নিয়ম-কানুন এবং আমরা যে সব প্রতিষ্ঠানের সভ্য (বিদ্যালয়, ক্লাব ইত্যাদি) তাহাদের নিয়ম-কানুন অনুগত সৈনিকের মতো আমাদের মানিয়া চলিতে হইবে। অবাঞ্ছিত নিয়ম-কানুন দূর করার জন্য আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত নিয়ম-কানুনগুলি চালু আছে, ততদিন পর্যন্ত তাহা ভংগ করিয়া উচ্ছৃংখলতা প্রকাশ করিতে পারি না।

EXERCISE

A. Answer the following questions :—

(1) Describe the (a) shape, (b) area and (e) geographical location of India with reference to the world.

(2) Describe India's relationship with the world in the past and the present.

(3) Describe the physical characteristics of the four geographical regions of India and discuss their significance to the country.

(4) Describe the climate of India.

(5) Describe the different monsoon winds which blow over India, indicating the times and areas in which they cause rainfall.

(c) Describe our privileges and responsibilities as citizens of free India.

B. Answer the following questions :—

1. A few names are given below. Write 1, 2, 3 and 4 under the names to indicate whether they form the Northern, Southern, Eastern or Western boundaries of India.

Also write (within brackets) "N" under the names which fall under Natural boundaries and "U" under those which fall under Unnatural boundaries.

Put a cross (×) under those names which do not fall on any of the boundaries (North, South, East and West).

Names: Vindhya Mountains, East Pakistan, Thailand, the Ganges, the Indian Ocean and the Arabian Sea, the Himalayas, Bay of Bengal, Atlantic Ocean, Burma, West Pakistan, Afghanistan, the Eastern Ghats, the Western Ghats.

2. Find on the left below a few phrases indicating the characteristics of the four physical regions of India. Write 1, 2, 3 and 4 under the phrases which indicate the characteristics of the Mountain regions of the North and the North-east, the river valleys of the North, the Deccan plateau and the Lower Sea coasts respectively. If a phrase indicates characteristics of more than one region, you should write more than one number under it. Put a cross (×) under the phrases which do not indicate the characteristics of any of the regions.

On the right below are certain other phrases which indicate the reasons for having the characteristics. To indicate the relation of a characteristic with a reason, write the number

written on the left of the characteristic, under the reason with which you consider it to be connected. If one cause is connected with more than one characteristic, you may write more than one number under it.

Put a cross (×) under the phrases which are not connected with any characteristic.

Left : characteristics

1. Sufficient rainfall
2. Sources of rich minerals
3. Suitable for river navigation
4. Plenty fertile agricultural land
5. Small rivers
6. Suitable for fish trade
7. Rivers not navigable
8. Sources for hydroelectric power
9. Plenty of water for irrigation purposes
10. Not too cold
11. Full of desert lands
12. Convenient for building roads and railways
13. Rich in forest resources
14. Most of the places extremely cold
15. Population not dense
16. Very hardy people
17. Resisted invaders trying to enter through land routes
18. Dense population

Right : reasons for having the characteristics

(a) Very bright sun
(b) Plateau made of stone
(c) Long river valleys made of mud carried by the river
(d) The South-west monsoon strikes the high mountains
(e) Long sea-coast
(f) Large rivers travelling long distance and not with much current
(g) Rivers coming down from mountains with strong currents
(h) The North wind in the winter strikes against the mountains
(i) High mountain regions difficult to climb
(j) Vast plains
(k) Abounding in mountain ranges
(l) Limited fertile land
(m) Rivers with very strong currents
(n) Facilities of agricultural and industrial development

3. Below are given a list of forest products and animals of the following regions of India : (A) Foot of the Himalayas, Assam, and western side of Western Ghats ; (B) Certain parts of the foot of the Himalayas, West Bengal, Assam, Bihar, Orissa and certain parts of the Deccan ; (C) Lower regions of the Himalayas ; (D) Madhya Pradesh to Bombay and Punjab to Mysore, places where rains are scarce.

Under every product or animal put the letters at the left of the region to which it belongs. If a resource belongs to more than one region, you may put more than one letter under it.

Forest products	*Animals*
1. Sabui grass	1. Elephants
2. Plam tree	2. "Chamari" cow
3. Cocoanut tree	3. Bear
4. Pine tree	4. Rabbits
5. Segun tree	5. "Kasturi" deer
6. Cane	6. Rabbits
7. Rubber	7. Jungle goats

C. The following are for your scrap-book :—

1. On lithographed outline maps of India draw the following (use separate outline for each) and place them in your scrap-book.

(a) Physical and political boundaries of India, showing its divisions into states and the five political regions.

(b) Physical regions.

(c) River system.

(d) Climatic divisions, courses of wind and distribution of rainfall.

(e) Sea and air routes connecting India with other parts of the world.

2. (a) Collect some pictures illustrating at least one of the characteristics of each of the physical regions of India,

(b) Collect at least one statement of any great man about the role of India in the modern world.

(c) Collect at least one patriotic song about India and one about Bengal.

3. On a page draw ten vertical lines so as to divide it into eleven columns. Give the headings for these columns as follows :

(a) Name of the river.
(b) Where does it rise ?
(c) What is its length ?
(d) Where does it empty itself ?
(e) Has it an estuary or a delta ?
(f) What are its chief tributaries ?
(g) Names of big towns on its banks.
(h) Is there any dam across it ?
(i) What are the chief canals leading from it ?
(j) How far is it navigable ?
(k) Name of chief waterfall, if any.

Now in column 1 put down serially the names of the following rivers and then complete the other columns :— Ganga, Indus, Brahmaputra, Narmada, Tapti, Godavari, Krishna, Kaveri, Pennar and Peryar.

4. On a page draw seven vertical lines so as to divide it into eight columns. Give the headings for these columns as follows :

(a) Season
(b) Month
(c) Temperature (You will get the daily temperature record from the newspapers. The mean of the daily maximum and minimum temperature will give you the average daily temperature. Keep a record of the same, and the monthly temperature will be the average of the daily temperatures).
(d) Rainfall (This also can be found in the newspapers ; the monthly rainfall will be the sum of the daily rainfall.)
(e) Direction of wind (You can find this out with the help of the wind vane which you can easily construct.)
(f) Natural appearance : rivers, fields, forests, etc.
(g) Appearance of sky : clear, hazy, cloudy, etc.

(h) Vegetables available.

Fill up the chart from your personal experience.

D. Undertake the following project :—

Our India—An Exhibition. The class may be divided into about 8 groups for this work. Each group should prepare one map of India (as indicated in the text) for the exhibition.

E. With plasticine, clay or plaster make a relief map of India :—

(a) Show the following mountains by raising the surface to a height above the sea-level as indicated by their sides :

1. The Inner Himalayas (2½″)
2. The Middle Himalayas (2″)
3. The Outer Himalayas (1″)

(b) With flags, having the names written on them, mark the following peaks : Nanga Parvat, Nandadevi, Kamet, Kanchanjungha, Makalu, Dhabalgiri, Everest.

(c) Show the following ranges by raising the height ½″ above the sea-level :

1. The Western Ghats
2. The Eastern Ghats
3. The Nilgiri Hills
4. The Annamalai Hills
5. The Palni Hills
6. The Cardamam Hills
7. The Vindhya Range
8. The Aravalli Range
9. The Satpura Range

(d) Finally, show the following plateaus by raising the surface ½″ above the sea-level :

1. The Malwa Plateau
2. The Bundelkhand Plateau
3. The Chota Nagpur Plateau
4. The Deccan Plateau

জীবনের চাহিদা

আমাদের খাদ্য, আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ,
আমাদের ঘরবাড়ী, আমাদের অন্যান্য চাহিদা

আমাদের খাদ্য

জীবনে যে কতরকম চাহিদা আছে তাহার ঠিকঠিকানা নাই। ঐ চাহিদাগুলি নিবৃত্তির চেষ্টায় আমরা সারা জীবন ঘুরিয়া মরিতেছি। উহাদের নিবৃত্তিতেই আমাদের জীবনের শান্তি, সুখ—সব কিছু। অপর দিকে জীবনের ন্যূনতম চাহিদা না মিটিলে কাহারও পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব নহে। আজ স্বাধীন ভারতে যাহাতে সকলের ন্যূনতম জীবন-চাহিদা নিবৃত্তি হয় তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

জীবন ও তাহার চাহিদা

জীবনে আমরা যতসব জিনিস চাই তাহাদের মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যায়—খাদ্য, পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী ও অন্যান্য। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্য আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

শরীর হইতে রোজ যাহা খরচ হইয়া যাইতেছে তাহা নিত্য পূরণ করিয়া লইবার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। জীবনকে যদি আগুনের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে খাদ্যকে বলা যায় তাহার ইন্ধন। আগুনকে জ্বালাইয়া রাখিতে যেমন ক্রমাগত ইন্ধনের যোগান প্রয়োজন, তেমনি আমাদের জীবনাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিবার জন্যও খাদ্য ইন্ধনের প্রয়োজন। জীবনের স্ফুলিংগ আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষে, প্রত্যেকটি রক্তকণিকায় বিরাজমান। ঐসব কোষ প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, ঐসব রক্তকণিকা প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। সাধারণভাবে বলা হয়, বারো বৎসর পর শরীরে পূর্বের একটি রক্তকণিকাও পুরাতন থাকে না—প্রতি বারো বৎসরে হয় আমাদের নবজন্ম। তাই এই কোষগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, নূতন রক্তকণিকা সৃষ্টির জন্যই বাহির হইতে খাদ্যের সরবরাহ করিতে হয়।

খাদ্যের প্রয়োজন

আবার, শরীরকে যদি যন্ত্রের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বলা যায় যন্ত্র যেমন কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি ইন্ধন ছাড়া চলিতে পারে না, শরীরও

তেমনি উপযুক্ত ইন্ধন ছাড়া চলিতে পারে না। যন্ত্র বরং ইন্ধনের অভাবে কিছুদিন ফেলিয়া রাখা যায়, কিন্তু শরীরকে কখনই ঐরূপ বেকার ফেলিয়া রাখা যায় না। প্রতিমুহূর্তে সে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এমন কি যখন আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকি, বাহির হইতে মনে হইতে পারে শরীর-যন্ত্র কাজ বন্ধ করিয়া আছে, কিন্তু তখনও উহার অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ডের কাজ চলিতে থাকে, রক্ত চলাচল হইতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে। বস্তুতঃ, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মানুষের হৃৎপিণ্ড একবার মাত্র সংকুচিত হইতে যে শক্তি খরচ করে তাহাতে দুই পাউণ্ডের জিনিস এক ফুট উঁচুতে তোলা যায়। ঘুমের সময় যদি আমাদের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭০ বার ধুকধুক করে, তাহা হইলে বলা যায় ঘুমের সময়ও উহা প্রতি মিনিটে ১৪০ ফুট-পাউণ্ড (প্রায় ১৯০.৩ জুলস্) শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে। শরীর যন্ত্রকে চালু রাখিতে হইলে খাদ্যের ইন্ধন যোগাইতেই হইবে।

খাদ্য কাহাকে বলিব?

সুতরাং, দেখা যাইতেছে মোটামুটি তিনটি কারণে শরীরকে খাদ্য যোগানো প্রয়োজন—(১) উহার কর্মশক্তির ইন্ধন যোগানোর জন্য, (২) উহার উত্তাপ বজায় রাখার জন্য, এবং (৩) শরীরে বিভিন্ন কোষ প্রভৃতির নিত্যক্ষতি পূরণের জন্য। অতএব, খাদ্য বলিতে আমরা তাহাকেই বুঝিব যাহা আমাদের কর্মশক্তি দেয়, যাহা আমাদের শরীরে তাপের সৃষ্টি করে, এবং যাহা শরীরের বিভিন্ন কোষ প্রভৃতিকে নিত্য নূতন গড়িয়া তুলিতে পারে। এছাড়া অন্য কিছু, তাহা যত মুখরোচকই হউক না কেন, খাদ্য আখ্যার যোগ্য নহে। বস্তুতঃ, রসনার তৃপ্তি করা খাদ্যের একটি আনুষংগিক ক্রিয়া মাত্র। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষ খাদ্যকে সুস্বাদু করার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। খাদ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল ইহাই নহে।

খাদ্যের ইতিকথা

পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা বনে-জংগলে ঘুরিয়া বেড়াইত। সেই সময় কাঁচা মাংসই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। এই মাংস তাহারা সংগ্রহ করিত বন্য পশু শিকার করিয়া। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাহারা ক্রমে আবিষ্কার করিল কোনো কোনো পশুকে বশ মানাইয়া পোষা যায়। ফলে, মাংসের প্রয়োজনে তাহাদের আর শিকারে যাইবার প্রয়োজন রহিল না। গরু,

ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু শুধু যে তাহাদের মাংসেরই যোগান দিল তাহা নহে, তাহাদের দুধও মানুষ আহার্য হিসাবে গ্রহণ করিল। মানুষ তাহার পশ্বাদির জন্য তৃণভূমি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা শুধুমাত্র শিকারী রহিল না, পশুপালকেও পরিণত হইল। ইতিমধ্যে আগুনের আবিষ্কার তাহাদের খাদ্যজগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করিল। তাহারা আবিষ্কার করিল অপক্ক মাংসের চাইতে আগুনে পোড়া মাংস অনেক সুস্বাদু।

আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধুই মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত না। ফল, মূল, বীজ, পাতা যাহা কিছু হাতের কাছে পাইত তাহাও তাহারা আহার করিত। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা আবিষ্কার করিল যে মাটিতে এইসব বীজ বুনিলে নূতন করিয়া গাছ হয়। তাহারা সভ্যতার অগ্রগতির তৃতীয় স্তরে পৌঁছিল—শিকারী এবং পশুপালক ছাড়াও তাহারা এখন হইল
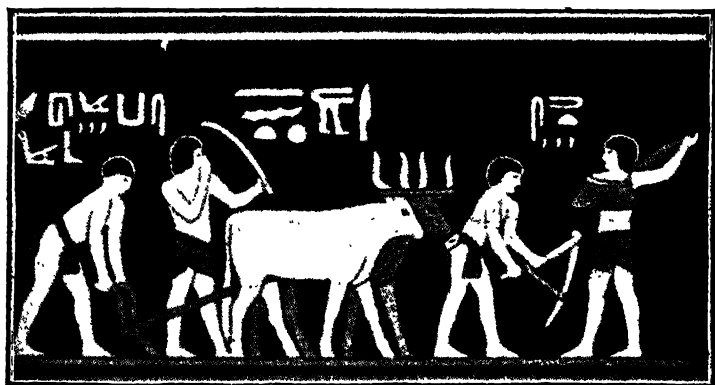
প্রাচীন মিশরে কৃষিকার্যের পদ্ধতি

কৃষিজীবী। খুব সম্ভবতঃ নীল নদের তীরে মিশরের, সিন্ধুনদের তীরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাংশের এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়ার উষ্ণ উর্বর জমিতেই এই কৃষিকার্যের সূত্রপাত হয়। খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেকার মিশরের বিভিন্ন মন্দির-চিত্রে এই চাষ-কার্যের ছবি পাওয়া গিয়াছে। সমকালীন ভারতবর্ষে হরপ্পায়

গম ভাংগার পাথরের জাঁতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সময়ই খুব সম্ভবতঃ জলের সহিত আটা মিশাইয়া চাকৃতি করিয়া আগুনে গরম রুটি তৈরীর কৌশল মানুষ আবিষ্কার করিয়াছিল। ধানের চাষ বা চালজাত খাদ্যের প্রচলন হয় আরও পরে।
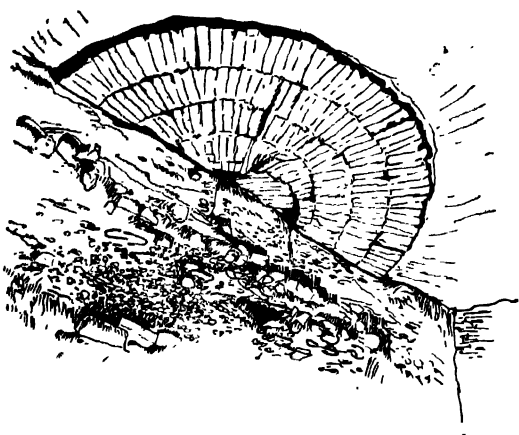
হরপ্পায় আবিষ্কৃত গম ভাংগাব জাঁতা

তাহার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। মানুষ নানাপ্রকার রন্ধন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে। তৈলবীজ আবিষ্কারের ফলে তেলের ব্যবহার শিখিয়াছে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন মসলা আবিষ্কার করিয়াছে; রন্ধনকার্যে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছে; খাদ্যকে সুস্বাদু করিয়াছে। আজ বিভিন্ন দেশে কতো না বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সমারোহ, তাহাদের খাদ্যাভ্যাসে কতো না বৈচিত্র্য!

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক এই যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, এমন কি আমাদের দেশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব। যে দেশে যে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই দেশের লোক সাধারণতঃ সেই খাদ্যেই অভ্যস্থ হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে ধান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা বাংগালীরা প্রধান খাদ্য

খাদ্যাভ্যাসে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

হিসাবে ধানজাত চালকে গ্রহণ করিয়াছি। শুধু বাংলা দেশই বা বলি কেন। পৃথিবীর যেসব অংশে মৌসুমী জলবায়ু বর্তমান, অর্থাৎ একই সংগে প্রচুর বারিপাত ও খরতাপ পাওয়া যায়, সেই সব জায়গাতেই এই জাতীয় জলবায়ুর কল্যাণে ধানচাষ বেশী হয়। ফলে সেই সব অঞ্চলেরই অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ধান হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি। আবার, ভারতের পশ্চিমাংশে বা

মৌসুমী অঞ্চল
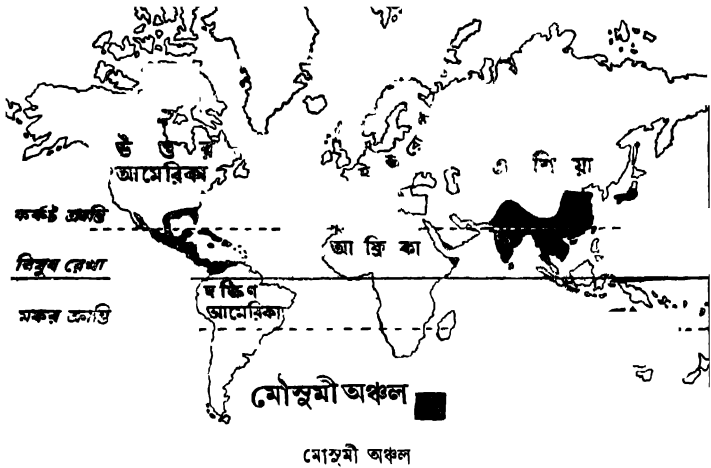
য়ুরোপে যেখানে ধান প্রায় জন্মায়ই না, অথচ গমের চাষ হয়, সেখানকার লোকেরা গমজাত খাদ্য খাইতেই ভালবাসে। আবহাওয়ার পার্থক্যের জন্যও দেশে দেশে খাদ্যের পার্থক্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শীতের দেশের লোক সাধারণতঃ আমিষ ও উগ্র পানীয়ের ভক্ত। গরমদেশে এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য শরীর প্রচুর পরিমাণে গ্রহণে অসমর্থ বলিয়াই ইহার প্রচলন কম।

সাংস্কৃতিক প্রভাবও খাদ্যাভ্যাস গঠনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন, আমাদের বাংগালীদের মাছ খাওয়া। একদিন এই নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইত। নানাধরনের মৎস্য-রন্ধনপ্রণালী বাংগালী আবিষ্কার করিয়াছিল। ফলে, উৎসবাদিতে ও ধর্মাচরণে মাছের ব্যবহার আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অংগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন মাছ দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। তবু বাংগালী এই

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করিতে পারিতেছে না। অথচ, ভারতেরই অন্যান্য অঞ্চলের লোক হয়তো মাছের গন্ধই সহ্য করিতে পারে না। আবার খাদ্য-দ্রব্যের স্বাদও আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রিত করে। যাহা খাইতে সুস্বাদু তাহাই আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে চাই। খাদ্যকে সুস্বাদু করার জন্য আমরা পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করি না। কিন্তু ইহার উপরও ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অনস্বীকার্য। একের কাছে যাহা সুস্বাদু অপরের কাছে তাহা বিস্বাদ। ভারতের মধ্যেই এক অঞ্চলের লোকের যাহা প্রিয়তম খাদ্য, অপর অঞ্চলের লোক তাহার কণামাত্রও হয়ত খাইতে পারে না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস

আমরা জানি, নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর লোক লইয়া আমাদের ভারতবর্ষের জনসমষ্টি গঠিত। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, জলবায়ু ইত্যাদিও বিভিন্ন। তাই আমাদের দেশের সর্বত্র খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যসংক্রান্ত রুচিও এক নহে।

মোটামুটিভাবে খাদ্যদ্রব্যের ভিত্তিতে ভারতবাসীদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়—একদল, যাহাদের চাল বা চালজাত দ্রব্যাদিই প্রধান খাদ্য, অন্যরা, গমজাত দ্রব্যাদি যাহাদের প্রধান খাদ্য। আগেই বলা হইয়াছে, বাংলা দেশ, আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। ফলে, এখানকার প্রচুর বৃষ্টিপাত ও খরতাপের প্রভাবে ধানের চাষ হয় খুব বেশী। সেই কারণেই এইসব রাজ্যের অধিবাসীরা প্রধানতঃ চালজাত ভাতকেই তাহাদের প্রধান খাদ্য করিয়া লইয়াছে। শুধু ভাতই নয়। চাল হইতে নানাপ্রণালীতে অপরাপর জিনিসের মিশ্রণে নানাপ্রকার খাদ্যও তাহারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের চালে-দুধে তৈরী পায়েস, চালগুঁড়ার তৈরী নানাপ্রকার পিষ্টক, চাল-ভাজা মুড়ি, ধান-ভাজা খই, দোসা প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে, অর্থাৎ পাঞ্জাব, দিল্লী, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের লোকেরা প্রধানতঃ গমজাত দ্রব্যাদিকেই তাহাদের প্রধান খাদ্য করিয়া লইয়াছে। স্বল্প

বৃষ্টি ও প্রচুর উত্তাপের ফলেই এইসব অঞ্চলে গমের চাষ প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। গমজাত আটার তৈরী রুটি যদিও ইহারা প্রধানতঃ আহার করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদের রুটি তৈরীর প্রণালী সর্বত্রই এক নহে। যথা, কোথাও বা শুধু আটার রুটিই খাওয়া হইয়া থাকে, আবার কোথাও বা আটার সহিত বিভিন্ন শাক-সবজি মিশানো হইয়া থাকে। কোথাও বা হাতে করিয়াই পুরু করিয়া চাপাটি তৈরী হয়, আবার কোথাও বা বেলুন-চাকতির সাহায্যে পাতলা করিয়া রুটি বেলা হয় যাহা আগুনে দিলেই ফুলিয়া ওঠে। ইহা ছাড়া গমের দ্বারা নানাপ্রকার পিষ্টক ও খাবারও বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরী করা হয়।

মধ্য ভারতীয় ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে অবশ্য ধান বা গম কোনোটাই বিশেষ জন্মে না। সেখানে মালভূমির নিকৃষ্ট জমিতে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিতে জলসেচ ভিন্নই প্রচুর পরিমাণে জোয়ার ও বাজরা জন্মায়। এই অঞ্চলের স্বল্পবিত্ত অধিবাসীরা তাই জোয়ার ও বাজরাজাত রুটিকেই প্রধান খাদ্য করিয়া লইয়াছে। একই কারণে, মালয়ালীদের প্রধান খাদ্য হইতেছে টাপিয়োকা (Tapioca)।

আবার, ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলের লোক আমিষভোজী, কোনো কোনো অঞ্চলের লোক নিরামিষভোজী। প্রধানতঃ, সাংস্কৃতিক প্রভাবেই এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের আদিমতম সভ্যতার লীলাভূমি সিন্ধু উপত্যকায় যেসব নিদর্শন মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় তাহারা আমিষ খাইতে অভ্যস্থ ছিল। পরবর্তীকালে এদেশে আগত আর্যরাও যে আমিষ আহার করিত বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু বৈদিক-উত্তর যুগে খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবেই জীবহত্যা বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলেই আমিষ ভক্ষণও বন্ধ হইয়া যায়। মৌর্যসম্রাট অশোকের শিলালিপিতে আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করার উল্লেখ আছে। হিন্দুযুগের শেষে মুসলমানদের আগমনের ফলে তাহাদের প্রভাবে আমিষ আহার পুনরায় প্রচলিত হয়। ইংরেজ আগমনের পরে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রসারের ফলেও আমিষাশীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পাঞ্জাব, বাংলা, উড়িষ্যা ও আসাম ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রায় সব জায়গাতেই নিরামিষাশীর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু অহিন্দুরা, এবং হিন্দুদের

মধ্যেও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রায় সর্বত্রই আমিষভোজী। মাংস ও ডিম সকল আমিষভোজীরই প্রিয়। উপকূল অঞ্চলে এবং নদীমাতৃক বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় মাছ অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। শুকনো মাছ খাওয়ার প্রচলন অবশ্য উপকূল অঞ্চলেই বেশী।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই কোনো-না-কোনো রকমের ডালের চাষ হয়। তাই ডালও ভারতবাসীর একটি প্রধান খাদ্য। তবে ডালজাত খাদ্যও সর্বত্র এক প্রকারের নহে। আমরা বাংলাদেশে যেভাবে ডাল খাইয়া থাকি, অন্যত্র সেইভাবে ডাল খাওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোথাও বা ডালের তৈরী পাকৌড়া বিশেষ প্রিয় খাদ্য (যেমন দিল্লী, পাঞ্জাব অঞ্চলে), আবার কোথাও বা ডাল গুঁড়া করিয়া তাহা হইতে তৈরী বেসন দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যই বেশী উপভোগ্য (যেমন, গুজরাট অঞ্চলের কাড়ি)। ডালজাত বোঁদে, মিহিদানা, লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত।

পানীয়ের ব্যাপারেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পার্থক্য রহিয়াছে। পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রধান পানীয় দুগ্ধ। এছাড়া দুগ্ধজাত দধির দ্বারা তৈরী লস্যিও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যগুলির গ্রীষ্মকালের প্রধান পানীয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য অংশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। এই চা উত্তর ভারতের, বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চলের, বিশেষ প্রিয় পানীয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে কফির চাষ বেশী হয় বলিয়া দক্ষিণ ভারতে কফিই বেশী প্রিয় পানীয়। শীতপ্রধান দেশগুলির মত ভারতবর্ষে মদ্যপান বহুল প্রচলিত নহে। তবে যুরোপীয় সভ্যতার প্রসারের ফলে বিশেষ করিয়া বড়ো বড়ো শহরগুলিতে মদ্যপানের প্রচলন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, নিম্নজাতীয় ও উপজাতীয়দের মধ্যেও মদ্যপান বহুল পরিমাণে প্রচলিত। তবে সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই মদ্যপান আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা রন্ধনপ্রক্রিয়া মোটামুটি ছয় প্রকার—

রন্ধনপ্রণালী

১। সিদ্ধ করা (Boiling); ২। মৃদু উত্তাপে করা বা দমে সিদ্ধ করা (Stewing); ৩। ভাপে সিদ্ধ করা (Steaming); ৪। ঝলসানো (Roasting);

৫। শুকনো তাপে সিদ্ধ করা (Baking) ; ৬। ভাজা (Frying)। বাংলা দেশের খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালীতে সিদ্ধ করার এবং ভাজার প্রচলন খুব বেশী। ভাত আমরা সিদ্ধ করিয়া খাই। অন্যান্য জিনিস ভাজিয়া তাহার সংগে মশলা এবং জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লই। কোনো কোনো জিনিস হলুদ এবং নুন মিশাইয়া শুধু ভাজিয়া লই। সিদ্ধ এবং ভাজা, এই উভয় প্রণালীতেই, বস্তুর খাদ্যপ্রাণ প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। ফলে, আমরা যাহা খাই তাহাতে শরীরের পুষ্টি তেমন সাধন করে না। বিশেষ করিয়া ভাজার কাজে প্রচুর পরিমাণে তেল ব্যবহার করিতে হয়। তেল হজম-শক্তি হ্রাস করিয়া থাকে। কতকটা আমাদের রন্ধনপ্রথার জন্যই বদহজম এবং অম্বল বাংগালীর প্রায় জাতীয় রোগে পরিণত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষের সর্বত্রই খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালীতে বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। জাতিগতভাবে আমরা ভোজনবিলাসী জাতি। খাদ্য শুধু যে আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন তাহাই নহে, খাদ্য পরিবেষণের মাধ্যমেই আমাদের দেশে স্নেহ-মমতা ভালোবাসার আদানপ্রদান হইয়া থাকে, সামাজিক বন্ধন দৃঢ়ীকরণের কাজ চলিয়া থাকে। তাই খাদ্যকে যথাসম্ভব সুস্বাদু করিয়া পরিবেষণ করাই আমাদের দেশের রীতি। দীর্ঘদিন ধরিয়া আমাদের উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের কোনো পেশা না থাকায় তাহারা তাহাদের সময়ের অধিকাংশই খাদ্যপ্রস্তুতে ব্যয় করিতেন। আমাদের খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালীর বাহুল্যের জন্য তাহাদের দান অল্প নহে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রন্ধনপ্রণালী

প্রধানতঃ আমাদের রন্ধনপ্রণালীতে ভাজা জিনিসের স্থানই বেশী। শুধু সিদ্ধ করিয়া বা আগুনে সেঁকিয়া কোনো জিনিস খাওয়া অপেক্ষা ভাজা বা মশলা সহযোগে ঝোল করিয়া খাওয়াই আমরা বেশী পছন্দ করি। এই উদ্দেশ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে তেল এবং কোনো কোনো অঞ্চলে ঘি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপকূল অঞ্চলে এবং দক্ষিণ অঞ্চলে প্রধানতঃ নারিকেল তেল ব্যবহৃত হয়। আবার বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতে সরিষার তেলের ব্যবহারই বেশী। দক্ষিণে কোথাও কোথাও বাদাম এবং তিলের তেলও ব্যবহৃত হয়। উত্তরের অন্যান্য অংশে তেলের ব্যবহার থাকিলেও ঘি-র প্রচলনই বেশী।

সাম্প্রতিক কালে ঘি দুর্মূল্য হওয়ার ফলে সর্বত্রই বনস্পতি ঘি-র বিশেষ প্রচলন হইয়াছে।

তেল বা ঘি ছাড়াও রান্না সুস্বাদু করার জন্য আমরা মসলার ব্যবহার করিয়া থাকি। তবে ভারতের সর্বত্রই মসলার ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও, যে যে অঞ্চলে মুসলমান প্রভাব বেশী, সেই সব জায়গাতেই রন্ধনকার্যে মসলার ব্যবহারও বেশী। পূর্বাঞ্চলে এবং দক্ষিণে শুকনা লংকা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ দক্ষিণ ভারতে শুধু তেঁতুলের সহিত লংকা বাটা বা লংকার গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে মিশাইয়া পাতলা ঝোলের মতো যে রসম্ তৈরী হয় তাহা সেখানকার অতি প্রিয় খাদ্য।

দুধ যে শুধু পানীয় দ্রব্য হিসাবেই খাওয়া হইয়া থাকে তাহা নহে। এদেশের সর্বত্রই দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাদ্যও গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই সব খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মাখন, ঘি, দই, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পনিরের তরকারীও বিশেষ প্রিয়।

খাদ্যের উপাদান

উপরে আমাদের যে সব খাদ্যদ্রব্যাদির আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মোটামুটি ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা চলে—যথা, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, স্নেহ জাতীয় খাদ্য, লবণাদি পার্থিব খাদ্য, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য ও মসলা প্রভৃতি আনুষংগিক খাদ্য। ইহা ছাড়াও জলীয় পানীয়ও আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য এই সব প্রকার খাদ্যই প্রয়োজন।

আমাদের অধিকাংশ নিরামিষ খাদ্যই কার্বোহাইড্রেট পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত—যথা, চিনি, আলু, গম, ভুট্টা, মিষ্টি আলু, টাপিয়োকা প্রভৃতি। ইহার এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ ইহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নির্দিষ্ট মাত্রায় আছে। এই কার্বোহাইড্রেটই আমাদের শরীরকে

কার্বোহাইড্রেট

ক্রিয়াশীল রাখার পক্ষে প্রকৃত দাহ্যস্বরূপ ইন্ধন। এই জাতীয় খাদ্যমাত্রই প্রথমে হজম হইয়া সহজদাহ্য গ্লুকোজ নামক পদার্থে পরিণত হয়। পরে ঐ গ্লুকোজ শরীরের প্রত্যেক কোষে কোষে ও রক্তের মধ্যে গিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত দগ্ধ হইয়া উত্তাপ ও শক্তির সৃষ্টি করে।

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বলিতে বুঝায় নাইট্রোজেনযুক্ত আমিষ পদার্থ। এই জাতীয় খাদ্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাংস, ডিম, মাছ, দুধ, ছানা, পনির ইত্যাদি। এছাড়া ছোলা, মটরশুঁটি, বরবটি, বাদাম, পেস্তা এবং নানাপ্রকার ডালের মধ্যেও প্রোটিন আছে, কিন্তু এইগুলিকে অর্ধ-প্রোটিন বলা হইয়া থাকে। প্রোটিন আমাদের শরীর রক্ষার জন্য অবশ্যপ্রযোজনীয় খাদ্য। তাহার কারণ, আমাদের
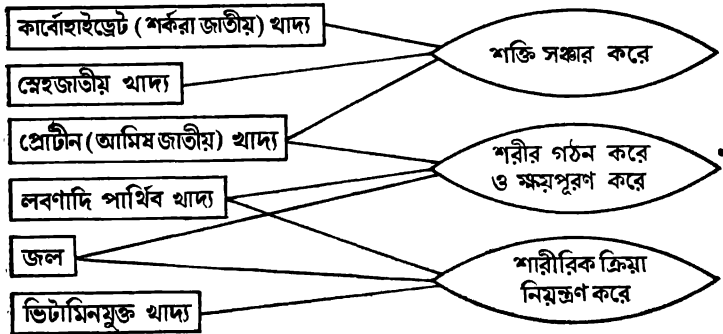
প্রোটিন

শরীরের কোষসমূহ প্রোটিন দিয়াই গঠিত, এবং তাহাদের দৈনন্দিন ক্ষয়-ক্ষতি শুধুমাত্র প্রোটিন খাদ্য দিয়াই পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু শরীরের প্রোটিন একজাতের, আর খাদ্যের প্রোটিন বিভিন্ন জাতের। তাই প্রথমে খাদ্য-প্রোটিন পেটে গিয়া অ্যামিনো এসিড নামক রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়, এবং তাহার পর উহাই শরীরের নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকারের প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। আমিষ খাদ্যে এই অ্যামিনো এসিডযুক্ত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে বলিয়াই প্রোটিন খাদ্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ। তবে যাহারা নিরামিষাশী তাহারা ছানা, দুধ, দই, মটর ডাল প্রভৃতি খাইয়াও প্রোটিনের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন। এই প্রসংগে আরও একটি কথা বলা যায়। চাল বা গমেও প্রোটিন স্বল্পপরিমাণে আছে। তবে গমে যদিও চালের অপেক্ষা প্রোটিনের ভাগ বেশী, কিন্তু চালের প্রোটিনে আবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিডের ভাগ আবার গম অপেক্ষা অধিক। সেই কারণেই আমাদের চালের সহিত সমপরিমাণে গম খাওয়া শরীরের দিক হইতেই প্রয়োজনীয়।

যাবতীয় উদ্ভিজ্জ তেল (সরিষার তেল, নারিকেল তেল প্রভৃতি) এবং জান্তব ঘি, চর্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। এই খাদ্যের ক্রিয়াও অনেকটা কার্বোহাইড্রেটেরই মত, তবে ইহার প্রধান গুণ শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করা। সমান পরিমাণ কার্বোহাইড্রেটের চেয়ে স্নেহজাতীয় খাদ্য দ্বিগুণেরও বেশী উত্তাপ সৃষ্টি করিতে পারে। খাদ্যের এই তাপসৃষ্টির শক্তি মাপা যায় এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহার নাম দেওয়া হয় ক্যালোরি। এক হাজার গ্রাম অর্থাৎ প্রায় এক সের ওজনের উত্তাপ ১° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাহাকেই এক ক্যালোরি ধরা হয়। প্রত্যেক খাদ্যেরই এই ক্যালোরিমূল্য আছে ; তবে স্নেহজাতীয় পদার্থেরই ক্যালোরিমূল্য সর্বাধিক। তাই শীতপ্রধান অঞ্চলে ইহার প্রয়োজন অধিক, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে শুধু কার্বোহাইড্রেট দিয়াই শরীরের উত্তাপ রক্ষার কাজ বেশ চলিয়া যায়।

স্নেহজাতীয় খাদ্য

নুন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় খাদ্য। আমাদের শরীরের রসরক্তাদির মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে নুন আছে এবং ঘাম প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাহার যে অপচয় ঘটে নুন দিয়া প্রত্যহই তাহার পরিমাপ বজায় রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি লবণও আমাদের খাদ্যরূপে প্রয়োজন। তবে সেগুলি পৃথকভাবে খাইবার প্রয়োজন হয় না, কারণ শাক-সবজি প্রভৃতি আমাদের নানা খাদ্যের মধ্যেই আমরা স্বাভাবিকরূপে তাহাদের পাইয়া থাকি।

লবণাদি

খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন এমন এক প্রকার উপাদান যাহার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অথচ সকল জাতীয় টাটকা খাদ্যদ্রব্যেই ইহা নানা আকারে নানা মাত্রায় বিদ্যমান এবং ইহার ক্রিয়াও অন্যান্য উপাদানের চেয়ে ভিন্ন। ফল এবং সবুজ রংএর শাক-সবজিতে ইহা প্রচুরভাবে বিদ্যমান। শুধুমাত্র সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য এবং কয়েকটি রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। বর্তমানে আমরা দশ প্রকার ভিটামিনের অস্তিত্বের কথা জানি—ভিটামিন এ, বি (চার প্রকার), সি, ডি, ই, এইচ এবং কে। ইহাদের প্রত্যেকটির অভাবে মানবদেহে বিভিন্ন ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

ভিটামিন

ভিটামিন 'এ'
কড লিভার অয়েল
ঢেঁকিছাঁটা চাউল
পেঁপে
মাখন
BUTTER
দুধ
আলু
ভুট্টা
আঙুর
কমলা লেবু
কলা
বাঁধাকপি
ডিম
আম
মটর শুঁটি
টম্যাটো
অঙ্কুরিত গম
পেঁয়াজ

ভুট্টা
বাঁধাকপি
ভিটামিন 'বি'
পেঁয়াজ
কলা
ঢেঁকিছাঁটা চাউল
ডিম
আলু
মটর শুঁটি
অঙ্কুরিত গম
টম্যাটো

ভিটামিন 'সি'
বাঁধাকপি
দুধ
অঙ্কুরিত গম
মটর শুঁটি
আলু
ভুট্টা
শশা
পেঁপে
আঙুর
টম্যাটো
লেবু
আম
কমলালেবু
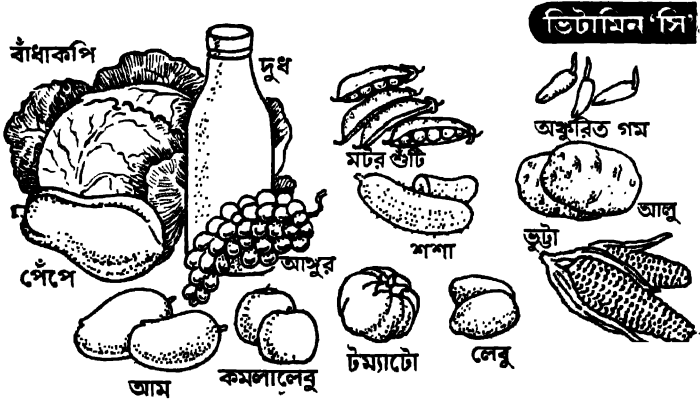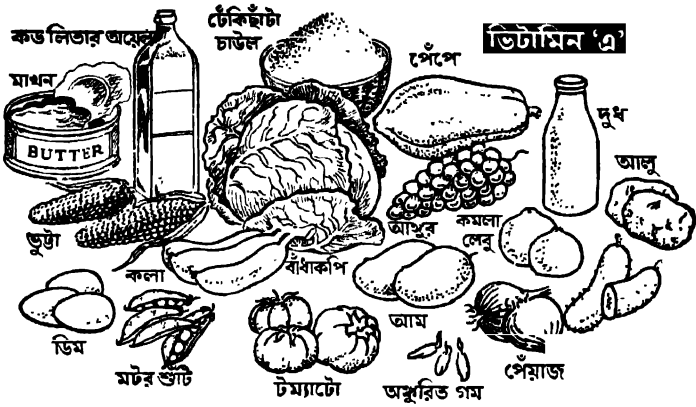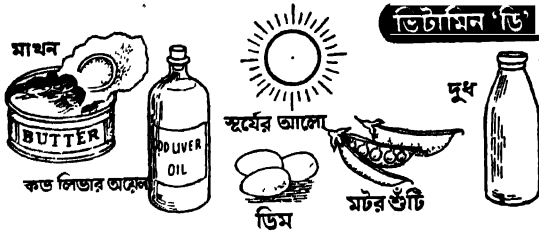
খাদ্যকে মুখরোচক করার জন্য যে সব মসলাদি আনুষংগিক খাদ্য আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, খাদ্যহিসাবে তাহাদের কোনো নিজস্ব মূল্য না থাকিলেও তাহাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। খাদ্য সুস্বাদু না হইলে শরীরের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা খাওয়া যায় না। আবার সুস্বাদু খাদ্য মুখের গ্রন্থিরস নির্গমনে সাহায্য করে বলিয়াই খাদ্য হজম করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। কিন্তু এইগুলির ব্যবহার যত কম হয় ততই ভালো; কারণ অধিক মসলা প্রভৃতির দ্বারা পাকযন্ত্র বিকল হইয়া যাইতে পারে।

আনুষংগিক খাদ্য

জল ঠিক খাদ্য না হইলেও, প্রয়োজন হিসাবে ইহার মূল্য আসল খাদ্য অপেক্ষাও বেশী। শরীরের সর্বত্রই জলের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি কোষ জলের মধ্যে তরল না হইলে কোনো খাদ্যই গ্রহণ করিতে পারে না। রক্তের তরলতাও জলের উপরই নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া দৈনিক ক্লেদ নির্গমনেও জল আমাদের সাহায্য করে।

জল

উপরোক্ত ছয়জাতীয় উপাদানই আমাদের শরীরের পুষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সকল খাদ্যে এই সব উপাদানের সব কয়টি নাও থাকিতে পারে। এইজন্যই মিশ্রখাদ্য খাওয়া প্রয়োজন। সেই খাদ্যসমষ্টিতে এইসব উপাদানের সবকয়টি উপযুক্ত পরিমাণে ও গুণানুসারে থাকে, তাহাকেই বলা যায় **সুসমঞ্জস খাদ্য** (balanced diet)।

সুসমঞ্জস খাদ্য

পরিমাণগতভাবে এইসব উপাদান কতটা হওয়া উচিত, তাহা বলা কঠিন। তবে বিজ্ঞান এই সম্পর্কে গড়পড়তা হিসাবে একটা মাত্রা নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে, খাদ্য আমাদের ইন্ধনস্বরূপ। যে

খাদ্য যতটা উত্তাপ সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার খাদ্যমূল্য বা ক্যালোরিমূল্যও ততটা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আমাদের সাধারণ পরিশ্রমের অবস্থায় দৈনিক ৩০০০ হইতে ৩৫০০ ক্যালোরিমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন। ইহা অবশ্য কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয়—এই তিনজাতীয় খাদ্যের মধ্যেই ভাগ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রায় ৬০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের ও প্রায় ৬০ গ্রাম প্রোটিনের, দুয়েরই উত্তাপ মূল্য ২৩২ ক্যালোরি। কিন্তু স্নেহজাতীয় খাদ্যের উত্তাপমূল্য ইহাদের দ্বিগুণেরও অধিক; প্রায় ৬০ গ্রাম এইজাতীয় খাদ্যের উত্তাপমূল্য ৫২৮ ক্যালোরি। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায়, দৈনিক অন্যূন প্রায় ৪৭০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, প্রায় ১২০ গ্রাম প্রোটিন এবং প্রায় ৯০ গ্রাম স্নেহজাতীয় খাদ্যই আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালোরি উত্তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিতে পারে। এছাড়া শাক-সবজি প্রভৃতি যেসকল খাদ্যে ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতব লবণ আছে, যেসকল খাদ্যে ভিটামিন আছে তাহাও দৈনিক কিছু কিছু খাওয়া প্রয়োজন। তবেই আমাদের খাদ্যতালিকা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে এবং শরীরের যথাযথ পুষ্টি হইবে।

অবশ্যই একটা কথা এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার। উপরিউক্ত সুসমঞ্জস খাদ্যের তালিকায় যেমাত্রার উল্লেখ করা হইয়াছে, স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে তাহার অদল বদল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শীতপ্রধান দেশের লোক শীতের সময় বেশী খাইবে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক গ্রীষ্মের সময় খাইবে কম। বেশী পরিশ্রম যাহারা করিবে তাহাদের খাইতেও হইবে বেশী। আবার বিভিন্ন বয়সের লোকের খাদ্যের মাত্রারও বিভিন্নতা হইবে। ছোটবেলায় বা যৌবনের উদ্ভবের সংগে সংগে খাদ্যের চাহিদা যেমন বেশী হইবে, তেমনি মধ্য বয়স হইতে খাদ্যের মাত্রা আবার কমিতে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদেও এই পরিমাণে পার্থক্য ঘটে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদের খাদ্যের পরিমাণ কম হইলেও, সন্তানসম্ভবা হইলে বা স্তন্যদানের সময়ে উহাদের খাদ্যের মাত্রা অবশ্যই বাড়িয়া যায়।

উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। কি করিয়া খাদ্য নির্বাচন করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি নীতির আলোচনা এখন করা হইতেছে।

খাদ্য নির্বাচনের কয়েকটি নীতি

ব্যক্তিবিশেষকে নিজের আয় অনুসারে খাদ্য নির্বাচন করিতে হয়। অধিক মূল্যের খাদ্য খাইলেই যে তাহা পুষ্টিকর হয় এমন নহে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই গরীব। কাজেই আমরা যাহা খাইতে পাই তাহা হইতে খাদ্যপ্রাণের যাহাতে অপচয় না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভাতের ফেন, আলু, পটল প্রভৃতি তরকারীর খোসা, ছানার জল ইত্যাদি সাধারণতঃ আমরা ফেলিয়া দিয়া থাকি, অথচ উহাদের মধ্যেই প্রোটিন, ভিটামিন, লবণ ও শ্বেতসার প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ভাতের ফেনের সংগে সামান্য লবণ এবং গুড় মিশাইয়া এবং ছানার জলের সংগে সামান্য চিনি মিশাইয়া পুষ্টিকর পানীয় প্রস্তুত হইতে পারে। আবার তরকারীর খোসাগুলি সিদ্ধ করিয়া উহাতে সামান্য লবণ এবং মসলা যোগ করিয়া সূপ প্রস্তুত করা চলে। সংক্ষেপে, রন্ধন-প্রণালীর সংস্কার করিয়া, কি করিয়া খাদ্যের অপচয় দূর করা চলে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের মতো দরিদ্র দেশের লোকদের বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনানুসারেও খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১০।১১ বৎসরের একটি বৃদ্ধিশীল শিশুর খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন না থাকিলে তাহার দেহের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হইবে, অথচ ৭০ বৎসরের একজন বৃদ্ধের খাদ্যে প্রোটিনের অংশ কমাইয়া না আনিলে তাহার হজমের গোলমাল হইতে বাধ্য। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খাদ্য নির্বাচন কালে ব্যক্তিবিশেষের রুচির দিকেও কিছুটা দৃষ্টি দিতে হয়। অনেকেব অনেক খাদ্য অজ্ঞাত কারণে সহ্য হয় না। তাহাকে সে খাদ্য না খাইতে দেওয়াই উচিত।

খাদ্য নির্বাচনের সময় দেশের আবহাওয়ার কথাও বিবেচনা করিতে হয়। গরম ও ঠাণ্ডা দেশের লোকের খাদ্যের প্রয়োজন এক নহে। অনেকের ধারণা শীতপ্রধান দেশে অধিক খাদ্য খাইতে হয়, কিন্তু এই ধারণা ভুল। শীতপ্রধান এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাদ্যের পরিমাণের প্রয়োজন সমানই থাকে, কিন্তু খাদ্যের প্রকারভেদ করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গরম দেশে অথবা গ্রীষ্মকালে অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্যগ্রহণ উচিত নহে।

খাদ্য নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, সুষম খাদ্য নির্বাচন করা। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য আমাদের গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে শরীরের ক্ষয়পূরণের জন্য প্রোটিন, শ্বেতসার, ভিটামিন প্রভৃতি যতরকম বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর প্রয়োজন তাহা আমাদের খাদ্যে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যদি একজন বাংগালীর দৈনিক খাদ্য-তালিকা তৈরীর চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, স্বল্পমূল্যেও একটি সুন্দর সুসমঞ্জস খাদ্যতালিকা প্রস্তুত হইতে পারে। অবশ্য সেইজন্য প্রয়োজন হইবে খাদ্যসমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা এবং আমূল খাদ্যসংস্কারে যত্নবান হওয়া। মুখরোচক বা পুরুষানুক্রমে যাহা এতদিন খাওয়া হইয়াছে তাহাই খাইলে চলিবে না। প্রয়োজন হইবে শরীরের জন্য যাহা প্রয়োজন এবং আমাদের আর্থিক ক্ষমতায় যাহা কুলায় এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান।

বাংগালীর দৈনিক খাদ্যতালিকা : একটি প্রস্তাব

নীচে সাধারণ পরিশ্রম করে এইরূপ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত বাংগালীর খাদ্য তালিকা দেওয়া গেল। অধিক অর্থব্যয় না করিয়াও অধিকাংশ লোকই চেষ্টা করিলে এইরূপ খাদ্য অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিবে ; এবং নিয়মিত আহার করিলে ইহাতেই তাহার স্বাস্থ্য উত্তমরূপে বজায় থাকিবে।

চাল—১৭৫ গ্রাম
ডাল—১১৫ গ্রাম
গম—১৭৫ গ্রাম
তরকারী—৩৫০ গ্রাম
তেল বা ঘি—১৫ গ্রাম
মুড়ি, চিড়া অথবা ছাতু—১১৫ গ্রাম
গুড়—৬০ গ্রাম

ইহার পরেও যদি আর্থিক সংগতিতে সম্ভব হয়, তাহা হইলে ১১৫ গ্রাম মাছ (শুকনো মাছও চলিতে পারে) অথবা ১১৫ গ্রাম মাংস অথবা একটি ডিম এবং ২৩৫ গ্রাম দুধ খাইতে পারিলে খুবই ভালো হয়। কারণ এই সব জৈব খাদ্যে যেরূপ সম্পূর্ণ প্রোটিন থাকে, ডাল প্রভৃতিতে প্রোটিন যথেষ্ট থাকিলেও তাহাতে সেইরূপ সম্পূর্ণ প্রোটিন থাকে না।

স্থূলকায় লোকের খাদ্যব্যবস্থা

আমাদের মধ্যে অনেক স্থূলকায় লোক দেখা যায়। কৈশোর হইতেই অনেক ছেলেমেয়ে স্থূল হইতে আরম্ভ করে। অত্যধিক মোটা হওয়া বা খুব বেশী ওজন বৃদ্ধি হওয়া স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ। কৈশোর বা যৌবন উদ্গমে মোটা হইয়া পড়িলে, উহা ছেলে-মেয়েদের নানারূপ মানসিক অশান্তিরও কারণ হয়। বিভিন্ন কারণে মানুষ মোটা হয়। মোটা হওয়া এক ধরনের রোগ। এই রোগ দমন করিবার জন্য যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, তেমনই ব্যায়াম ও খাদ্যনিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন। প্রত্যেক লোককে নিজের বয়স ও কর্মের প্রকৃতি হিসাবে খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। আমরা যদি নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাপমূল্যের (ক্যালোরি) খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকি, এবং সংগে সংগে পরিশ্রমের মাত্রা না বাড়াই অর্থাৎ অতিরিক্ত কাজের দ্বারা গৃহীত অতিরিক্ত ক্যালোরি ব্যয় না করি, তাহা হইলে মেদ জমিতে জমিতে আমরা মোটা হইয়া পড়িব—তাহাতে সন্দেহ নাই। দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গৃহীত ক্যালোরির কিছুটা গ্লাইকোজেন (glycogen) রূপে জমা হয়; অবশিষ্ট অংশ শ্বেতসার, স্নেহ বা প্রোটিন দেহে চর্বির আকারে জমা হয়। গৃহীত ক্যালোরির পরিমাণ অপেক্ষা কর্মের দ্বারা ক্যালোরির ব্যয় অধিক হইলে, প্রথমে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনে টান পড়ে। উহা শেষ হইয়া গেলেই দেহ সঞ্চিত মেদরাশি টানিয়া লইয়া তাহার প্রয়োজন নিবৃত্ত করে।

কাজেই কেহ অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িলে তাহার প্রথম কর্তব্য ক্যালোরিগ্রহণ নিয়ন্ত্রিত করা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কমাইয়া দিলেই উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। যেসব খাদ্যে অধিক ক্যালোরি আছে সেসব খাদ্যগ্রহণ সম্বন্ধে সকলকে সাবধান হইতে হইবে। কেহ যদি দৈনিক খাদ্য হইতে ৬০০ থেকে ৭০০ ক্যালোরি কমাইতে পারে তবে সপ্তাহে তাহার এক পাউণ্ড ওজন কমিবার সম্ভাবনা আছে। মনে রাখিতে হইবে, মাখন, ননী, চিনি, দুধ, মেদযুক্ত মাছ বা মাংস এইসব খাদ্যের ক্যালোরিমূল্য খুব বেশী। এই সব খাদ্য কমাইলে, তাহার পরিবর্তে ফল, সবজি, স্বল্পমেদযুক্ত মাছ ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক মোটা লোক মেদ কমাইবার জন্য এত স্বল্পাহারী হইয়া পড়েন যে, প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ধাতব লবণ, ভিটামিন প্রভৃতিও তাহাদের খাদ্যে কম পড়িয়া যায়। ফলে তাহারা অন্য নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। দৃষ্টান্ত হিসাবে নীচে একটি খাদ্যতালিকা দেওয়া গেল। এই ধরনের খাদ্য দৈনিক গ্রহণ করিলে মোটা লোকের মেদ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা—

কমলালেবু, বাতাবিলেবু, ডিম (দৈনিক একটি, না ভাজিয়া), অল্প ভাত বা আটা, স্বল্প মেদযুক্ত মাছ, চা।

শীর্ণকায় লোকের খাদ্যব্যবস্থা

বেশী মোটা হওয়া যেমন রোগ, অতিরিক্ত শীর্ণ হইয়া পড়াও তেমনি রোগ। ক্ষয়রোগ প্রভৃতি প্রাণ হানিকর রোগও অতিরিক্ত শীর্ণতার ফলে হইতে পারে। স্বাভাবিক অপেক্ষা ওজন কম হইলে বুঝিতে হইবে শরীর যতখানি সুস্থ থাকা উচিত, ততখানি সুস্থ নহে। কৈশোরে বা প্রথম যৌবনাবস্থায় ছেলেমেয়েদের ওজন কম হইলে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। বয়সের অনুপাতে যাহাদের ওজন কম তাহারা অল্পতেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, একটুতেই মেজাজ খারাপ করে। অনেক কারণেই মানুষের ওজন কমিতে পারে ; তাহাদের মধ্যে খাদ্য অন্যতম। শরীরের প্রয়োজন অনুপাতে খাদ্য গ্রহণ না করিলে, ক্যালোরিমূল্য যথাযথ না হইলে, মানুষের ওজন কমিতে থাকে।

ওজন বাড়াইতে হইলে, খাদ্যের ক্যালোরিমূল্য বাড়াইতে হইবে। অর্থাৎ একজন লোক কর্মের মাধ্যমে যে পরিমাণ ক্যালোরিশক্তি ব্যয় করিবে, তাহার চেয়ে অধিক পরিমাণ ক্যালোরি তাহাকে খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে একজন কর্মঠ সুস্থ মানুষ, দৈনিক ২৫০০ ক্যালোরির শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে। ওজন বাড়াইতে হইলে, তাহাকে দৈনিক অন্ততঃ ৩০০০ হইতে ৪০০০ পরিমাণ ক্যালোরির খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যেসব খাদ্যের ক্যালোরিমূল্য বেশী তাহাদের মধ্যে স্নেহজাতীয় দ্রব্য সর্বাগ্রে। দুধ, মাখন, ননী, পনির, আইসক্রীম, মেদযুক্ত মাংস (ভেড়ার মাংস) প্রভৃতি খাদ্যের ক্যালোরিমূল্য অধিক। দৈনিক একটি করিয়া কাঁচা ডিম খাওয়াও ভাল।

অন্যান্য দেশের খাদ্যব্যবস্থা

আগেই বলা হইয়াছে, ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো দেশের জলবায়ু বা প্রাকৃতিক পরিবেশ যে খাদ্যশস্য চাষের অনুকূল, প্রধানতঃ সেই শস্যই সেই দেশের প্রধান খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। আবার যে অঞ্চলে পশুপালনের বা মৎস্য চাষের সুযোগসুবিধা বেশী, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সেই অঞ্চলের মানুষের খাদ্যতালিকায় যথাক্রমে মাংস ও পশুজাত খাদ্যের বা মৎস্যের পরিমাণ বেশী হইয়া থাকে। আবার শীতপ্রধান দেশে আমিষ ও স্নেহপদার্থ যতটা হজম হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ততটা হয় না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে আমিষজাতীয় খাদ্যদ্রব্যের আধিক্য ঘটে। কয়েকটি দেশের খাদ্য তালিকার আলোচনা করিলেই কথাটি পরিষ্কার হইবে।

ভারতবর্ষের পশ্চিমে এবং এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত আরব দেশ। এই স্থান উষ্ণ মরু অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রচুর উত্তাপ হয় (প্রায় ১০০° ফাঃ), আবার শীতকালের তাপ প্রায় তাহার অর্ধেকেরও কম। এই অঞ্চলে দিন ও রাত্রির তাপের পার্থক্যও খুব বেশী। ফলে, এখানকার শিলাসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বালুকাতে পরিণত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে কতক বায়ু

আরব দেশ
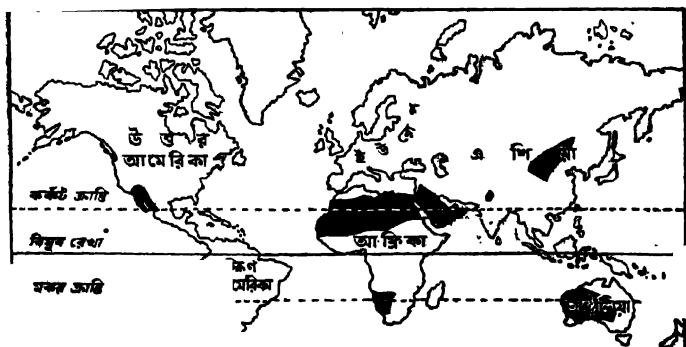
উত্তরে প্রবাহিত হইয়া এখানে আংশিকভাবে নামিয়া আসে। ফলে, এখানে বায়ুর উচ্চচাপ ঘটে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপে এখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হইলেও তখন সেদিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে বলিয়া তাহাতে অত্যন্ত সামান্যই জলীয় বাষ্প থাকে। ফলে, এই অঞ্চলে বৃষ্টি প্রায় হয়ই না।

এইরূপ জলবায়ুর ফলে এখানে গাছপালা প্রায় জন্মিতেই পারে না। কেবল যেখানে বালির নীচে জল পাওয়া যায় সেইসব অঞ্চলে যে সব মরূদ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে খেজুর ও অন্যান্য কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় বৃক্ষ জন্মে। অবশ্য জলসেচের সাহায্যে মরূদ্যানগুলিতে কিছু কিছু ধান, ভুট্টা প্রভৃতিরও চাষ হয়। এখানকার প্রধান জীব উট। মরুভূমিতে জলহীন অঞ্চলে চলিবার জন্য শরীরে বিশেষ জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা প্রকৃতি ইহাদের দিয়াছে।

এইরূপ জলবায়ু অঞ্চলে নিশ্চয়ই আমরা প্রধান খাদ্য হিসাবে আমাদের ভারতবর্ষের মত ভাত-রুটি শাক-সবজি আশা করিতে পারি না। বস্তুতঃ স্বাভাবিকভাবেই আরব দেশের বেশীর ভাগ লোকেরই প্রধান খাদ্য তাই খেঁজুর। অবশ্য ভাত এবং রুটিও স্বল্প পরিমাণে যে পাওয়া না যায় তাহা নহে। উটের মাংস এবং দুধও আরববাসীর বিশেষ প্রিয় খাদ্য। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবশ্য মাছও খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

বড়ো বড়ো উৎসবানুষ্ঠানে রুটি, কেক, ফলমূল, খেজুর ও দুধ প্রভৃতির সহিত মাংস ও ভাত একযোগে পরিবেষণ করা হয়।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে গ্রীষ্মকালে মোটামুটি উত্তাপ পাওয়া গেলেও সেখানে তখন যে আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা শুষ্ক বলিয়া বৃষ্টি হয় না। শীতকালে উত্তাপ অনেক কমিয়া যায়, কিন্তু উজ্জ্বল সূর্যকিরণ পাওয়া যায় বলিয়া তত শীতবোধ হয় না। এই সময় এই অঞ্চলের উপর দিয়া যে প্রত্যায়ন বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার ফলে এই সকল স্থানে যথেষ্ট বৃষ্টিও হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল

এইজাতীয় জলবায়ুর জন্য এখানে সাধারণতঃ চিরহরিৎ গাছ জন্মে। তাহাদের মধ্যে চেষ্টনাট, সিডার, মালবেরি (তুঁত গাছ) প্রভৃতি প্রধান। পৃথিবীর মধ্যে এই অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা বেশী কমলালেবু ও আংগুর জন্মায়।

তাছাড়া এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাদাম, পিচ, আপেল, জলপাই প্রভৃতি ফল এবং গমও উৎপন্ন হয়। কিন্তু তৃণভূমি কম বলিয়া এখানে অল্পই পশুপালন হয় ; এবং তাহাও প্রধানতঃ কৃষিকার্যের সহায়তার জন্য।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল
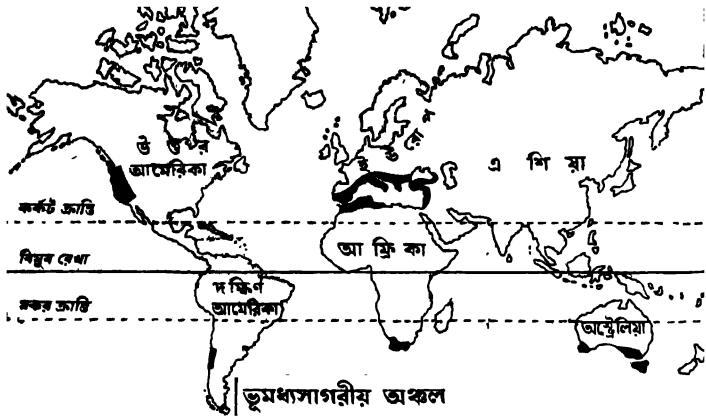
এই অঞ্চলের অন্তর্গত কয়েকটি দেশের খাদ্যতালিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব প্রচুর। স্পেনে জলখাবার হিসাবে যে খাদ্যটি সবচাইতে বেশী প্রিয় তাহার নাম বানিউলস্ (bunuelos)। ইহা কেকজাতীয় খাদ্য, এবং ডিম ও ময়দা একত্রে মিশাইয়া তেলে ভাজিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। বস্তুতঃ, স্পেনে মাখন বা ঘি দুর্লভ বলিয়াই অত্যন্ত মহার্ঘ, এবং সেইজন্যই রন্ধনকার্যে বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ রান্নার কাজে জলপাইর তেল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অঞ্চলে রসুনও প্রচুর জন্মায় বলিয়া রান্নার কাজে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উৎসবানুষ্ঠানে ছাগশিশু আস্ত রোষ্ট করিয়া খাওয়ার রেওয়াজ থাকিলেও স্পেনীয়রা অল্পই মাংস খাইয়া থাকে। তাহাদের প্রধান খাদ্যই হইতেছে জলপাই, কমলালেবু, আঙ্গুর, পিচ, এপ্রিকট প্রভৃতি ফল।

ফরাসী দেশের প্রধান খাদ্য গমজাত দ্রব্য, তরিতরকারী এবং নানাজাতীয় ফল। বিভিন্নজাতীয় খাদ্যপ্রস্তুতের ব্যাপারে ফরাসীদের নাম সুবিখ্যাত। কিন্তু তাহাদের খাদ্যতালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় যদি মদের

উল্লেখ না করা হয়। মদ ফরাসীদের বিশেষ প্রিয় পানীয়। খৃষ্টের জন্মেরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে যখন গ্রীকরা প্রথম মার্সেলিস বন্দরে আগমন করে, তখন তাহারাই ফরাসীদেশে,আংগুরের চাষ প্রবর্তন করে। এখন আংগুর ফরাসীদেশের অন্যতম প্রধান কৃষিসম্পদ। এই কারণেই এখানে আংগুর-জাত মদের চাহিদা এবং প্রচলন এত বেশী। পর্তুগালেও এই জন্যই মদের প্রচলন খুব বেশী।

সিসিলি এবং ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপেও আমিষাশীর সংখ্যাই বেশী। তবে তাহাদের খাদ্যতালিকায় মাংসের পরিমাণ খুবই কম। গবাদি পশু প্রধানতঃ চাষের কাজেই ব্যবহৃত হয়, এবং কাজের অযোগ্য হইলেই শুধু কসাইখানায় প্রেরিত হয়। মাখন বা ঘি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে বলিয়া খুবই কম ব্যবহৃত হয়। ইহাদের প্রধান খাদ্য "কালো রুটি", বীন, পেঁয়াজ, স্বল্প পরিমাণ মদ এবং ছাগদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত একজাতীয় শক্ত চীজ। ফল উৎপাদন প্রচুর হইলেও সাধারণতঃ তা কমই ব্যবহৃত হয়; বেশীর ভাগই রপ্তানীর জন্য সযত্নে সংরক্ষিত হয়।

এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জাপান দ্বীপপুঞ্জ মোটামুটিভাবে মাঞ্চুরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে গ্রীষ্মকালে মোটামুটি উত্তাপ পাওয়া যায়।

জাপানে

তবে সামুদ্রিক প্রভাবে সবসময়ই আবহাওয়ায় সাম্যভাব দেখা যায়। গ্রীষ্মকালেই এদেশের দক্ষিণ অংশের উপর দিয়া মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত হয়, এবং তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ উত্তর ও পশ্চিম দিকে বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যায়। শীতকালে এদেশের উত্তর অংশের তাপ হিমাংকের নীচে নামিয়া যায়। ফলে, এখানে উত্তর-পশ্চিম বায়ুর প্রভাবে ঐ সময় বৃষ্টি হইলেও বহু সময়ই তুষারপাত ঘটে।

এইরূপ জলবায়ুর প্রভাবেই এই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের দেশের মতোই ধানের চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। দেশের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে অধিক শীতের জন্য ধান চাষ সম্ভব হয় না। সেখানে গম, যব, ডাল প্রভৃতির চাষ হয়। এদেশের দক্ষিণ অংশে পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু গায়ে যথেষ্ট পরিমাণে চা-ও উৎপন্ন হয়।

জাপান দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া উষ্ণ কুরোসীয় স্রোত এবং শীতল বেরিং

স্রোত প্রবাহিত হয়। এই দুই স্রোতের প্রভাবে এবং উপকূলে সমুদ্রের অগভীরতার ফলে এই দেশের পূর্বদিকে পৃথিবীর একটি প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে পৃথিবীর প্রায় সিকিভাগ মাছ ধরা পড়ে।

নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই জাপানবাসীদেরও প্রধান খাদ্য আমাদের মতই ভাত, সবজি এবং মাছ। মাছের অভাব অবশ্য তাহাদের কখনই হয় না। কিন্তু একর প্রতি ধান প্রচুর উৎপন্ন হইলেও (প্রতি একর জমিতে জাপানের মতো এত অধিক ধান একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোথাও হয় না) তাহাতে জাপানবাসীদের মোট চাহিদা মেটে না। ফলে, বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য জাপানকে বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া জাপানীরা মাংস কমই খাইয়া থাকে। চা ইহাদের প্রিয় পানীয়।

ল্যাপল্যাণ্ড

সর্বশেষে ল্যাপল্যাণ্ডের খাদ্যের কথা বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। য়ুরোপের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই দেশ মোটামুটিভাবে তুন্দ্রা অঞ্চলের অন্তর্গত। সেখানে গ্রীষ্মকাল অল্পদিন মাত্র থাকে এবং তখন মাঝারি রকমের উত্তাপ পাওয়া যায়। সেখানে বৎসরের অবশিষ্ট সময় তীব্র শীত পড়ে এবং মাঝে মাঝে ভীষণ তুষারঝড় প্রবাহিত হয়। ঐ সময় ঐ অঞ্চলে অনেক দিন সূর্যকে দেখাই যায় না।
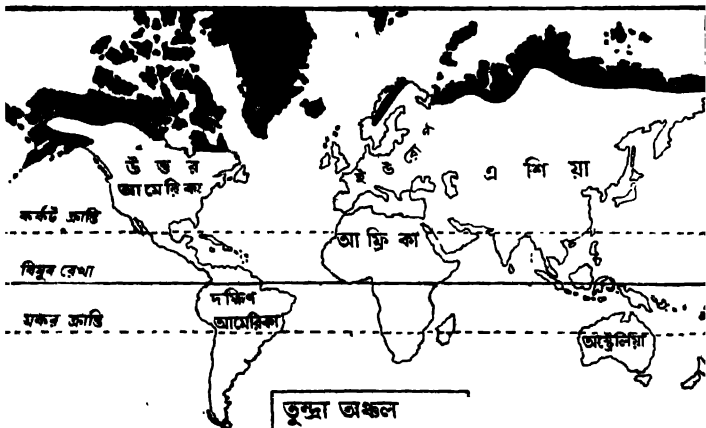
এইরূপ শীতল জলবায়ুর ফলে ঐ অঞ্চলে সামান্য গুল্ম ও শৈবাল প্রভৃতি ছাড়া প্রায় অন্য কিছুই জন্মিতে পারে না। পশুপাখীর মধ্যে দীর্ঘ লোমযুক্ত বল্গা হরিণ, শ্লেজ কুকুর, মেরু ভল্লুক, মেরু খরগোস প্রভৃতির দেখা পাওয়া যায়।

ল্যাপল্যাণ্ডবাসীদের খাদ্যতালিকাতেও এই জলবায়ুর প্রভাব লক্ষণীয়। ইহারা প্রধানতঃ আমিষাশী। বল্গা হরিণ ও মেরু খরগোসের মাংস প্রভৃতি এবং কিয়ৎ পরিমাণে মাছই ইহাদের প্রধান খাদ্য।

কি শিখিলাম?

খাদ্যবিষয়ে এই আলোচনা হইতে আমরা কি শিখিলাম? প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হয় যে, খাদ্যগ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে শরীরকে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখা। খাদ্য যতই সুস্বাদু হউক না কেন, তাহাতে শরীর রক্ষার উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে না থাকিলে, উহা গ্রহণ করার অর্থ থাকে না। তারপরে, ইহা যদি শরীরের ক্ষতি করে তবে খুব সুস্বাদু খাদ্যও বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

খাদ্য লইয়া কাহাকেও ব্যঙ্গ করা নিজের মূর্খতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। মানুষে মানুষে খাদ্য সম্বন্ধে রুচি ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। আমার প্রিয় খাদ্য সকলের প্রিয় হইবে, বা আমার অপ্রিয় খাদ্য অপরেরও অপ্রিয় হইবে ইহা ভাবাও অন্যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের খাদ্যের বিভিন্নতা লইয়া অনেক সময় যে পরস্পর পরস্পরকে ব্যংগ করার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা আমাদের জাতীয় সংহতির (National integration) ক্ষতি করিতেছে। খাদ্যের বিভিন্নতার জন্য কেহ কাহাকেও হীন ভাবা উচিত নহে।

ভৌগোলিক এবং সামাজিক কারণ খাদ্যরুচি সৃষ্টি করে। প্রয়োজন-বোধে খাদ্যের রুচি পরিবর্তন করা কিছু কঠিন নহে। নানা কারণে বাংগালীর খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বর্তমান খাদ্য শরীরের স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা রক্ষায় সহায়ক নহে। আমাদের খাদ্যের অপরিহার্য অংগ—ভাত, তৈল, মাছ ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া এইসব খাদ্যের পরিবর্তে বিকল্প খাদ্যের কথা আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Discuss why food is essential to us.

2. Describe the four stages of man's progress along the road to civilisation, indicating the relation of food with each.

3. Discuss, with illustrations, how geographical factors influence our food habits.

4. Discuss, with illustrations, how cultural factors influence our food habits.

5. Describe what are the different compositions of our food, giving examples of each.

6. Explain, with examples, what you understand by the following—(a) Carbohydrate, (b) Protein, (c) Fat, (d) Salts, (e) Vitamins.

7. Name the foods which are best for producing energy. Discuss why we have to take energy-producing food.

8. Explain what is meant by balanced diet and why we should balance our diet.

B. 1. Give reasons, in not more than 30 words, for the following :—

(a) People of West Bengal, Madras and Orissa take rice as their main food while people of the Punjab, Delhi and Uttar Pradesh take wheat as their main food.

(b) Malayalese take Tapioca, while poor people of the Deccan plateau take "Bajra".

(c) People of certain parts of India are vegetarian, while those of certain other parts are non-vegetarian.

(d) Fish is the national food of West Bengal.

(e) People of eastern India drink tea, while those of southern India drink coffee.

(f) Indians use spice in their food.

(g) Sufficient quantity of water needs to be taken every day.

(h) Bengalees should take some amount of wheat with rice.

(i) We should not laugh at others for their food habits.

(j) Water is not a food, but the body needs it.

2. Write, in not more than 50 words, on each of the following :—

(a) Food habits of the people in the Punjab ; (b) in Madhya Pradesh ; (c) in West Bengal ; (d) in Kerala ; (e) use of "dal" in different parts of India as food ; (f) vegetarian habits in India.

3. State, in terms of kilograms, the amount of Carbohydrate, Protein and Fat one should take normally in his daily diet.

4. State the different items of food, with exact quantity, which a Bengalee may take daily to have a balanced diet. The food should be within the reach of a Bengali family with average income.

5. State, in not more than 40 words, what lessons you have learnt from the chapter.

C. 1. The following are the names of foods or things used in cooking in different States in India. In an outline map of India, with boundaries of States demarcated, put the number in the bracket on the left of each item to the place, whose people usually take them. If required, you may put the same number in more than one place and more than one number in the same place.

Names

(1) Pakaura (2) Dosa (3) Dried fish (4) Meat and eggs (5) Besan (6) Bonde (7) Fish (8) Rice (9) Wheat (10) Tapioca (11) Dal (liquid form) (12) Mustard oil (13) Coconut oil (14) Ghee (15) Tea (16) Coffee.

2. Below are given the names of certain foods. Write 1, 2, 3 or 4 below them, as they contain Carbohydrate, Protein, Fat or Vitamin respectively.

Names

Rice, Fish, Potatoes, Wheat, Eggs, Mustard oil, Ghee, Green Vegetables, Meat, Milk, Curd, Fruits, *Dal*, Groundnut.

3. Fill in the following blanks :—

(a) Normally we need to take daily about—calori-value—.

(b) This calori-value has to be distributed among—, —, and—types of food.

(c) From calculations we know that the calori-value of 60 grams Carbohydrate is equal to—. The calori-values of Carbohydrate and Protein are the—. But the calori-value of 60 grams Fat is more than—.

4. On an outline map of the world, with Desert region, Mediterranean region, Tundra region and Monsoon region demarcated, put the number in the bracket on the left of each phrase or word (given below), in the region to which it is related.

Phrase or word

(1) Too hot summer and cold winter ; (2) Plenty of rice cultivation ; (3) Grows plenty of fruits ; (4) Very short summer ; (5) Plenty of rains, both in summer and winter ; (6) Neither too hot nor too cold ; (7) Not much rain during the summer ; (8) Rain is rare ; (9) Grows dates ; (10) Grows vines ; (11) Takes camel's meat ; (12) Grows oranges ; (13) Uses olive oil in cooking ; (14) Mostly takes meat and fish.

D. For the scrap-book :—

(1) Find out as many kinds of grain or corn as you can and enter their names in your scrap-book ; underline which are grown in West Bengal.

(2) Find out one or two pictures of people of other parts of India and the world taking their food. Fix them in the scrap-book and write brief notes on each.

(3) Write a note on the process of preparing a dish which you like.

(4) Draw columns like those given below in your scrap-book and fill them in in regard to Monsoon region, Mediterranean region, Desert region and Tundra region.

Name of the region	**Climate**	**Food habits**

E. The following Projects may be undertaken :—

(1) Preparing a wall-newspaper on Foods of India with maps, pictures (collected), etc.

(2) Letter-writing for collecting information for the wall-newspaper (may be an independent project as well) :—

(i) Write letters to schools in the Punjab, Kerala, Madhya Pradesh and Assam requesting them to write to you about their food, giving details of one or two of their national dishes.

(ii) Find out the food habits of a neighbour who comes from a different State or who is much below you in economic status.

(iii) Edit the information collected (if possible with pictures).

(3) Have class discussions on the following topics based on individual writings by the pupils on them previously :—

(i) National integration and our food prejudices.

(ii) How to reform the food habits of West Bengal ?

(4) Collecting information about the food habits of the people of different parts of West Bengal, by writing letters to schools in different districts and collecting information from neighbours coming from East Bengal (for the wall-newspaper).

আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ

খাদ্যের পরেই আমাদের আরেকটি অন্যতম চাহিদা পোশাক-পরিচ্ছদ। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে একটি কাহিনী আছে। ভগবান আদিম মানব-মানবী আদম ও ঈভকে সৃষ্টির পর স্বর্গোদ্যানে রাখিয়া দেন। তাহারা সেখানকার যে কোনো জায়গায় যাইতে পারিত, যে কোনো গাছের ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত। শুধু মাত্র একটি গাছের—যাহাকে বলা হইয়াছে জ্ঞানবৃক্ষ—তাহার ফল ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু শেষপর্যন্ত একদিন শয়তানের প্রলোভনে আদম ও ঈভ সেই গাছের ফলও খাইয়া ফেলিল। তাহার পর ভগবান যখন স্বর্গোদ্যানে আসিলেন তিনি তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। বহু ডাকাডাকির পর তাহারা ঝোঁপের আড়াল হইতে সাড়া দিল। জানাইল, উলংগ বলিয়া তাহারা বাহিরে আসিতে পারিতেছে না।

সভ্যতা ও পোশাক-পরিচ্ছদ

এই কাহিনী হয়তো কাল্পনিক। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি গভীর ঐতিহাসিক সত্যের ইংগিত নিহিত আছে। মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতেই পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। সভ্যতার পথে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের কাহিনীর সহিত বস্ত্রের ইতিহাসও তাই অংগাংগীভাবে জড়িত।

আদিম মানুষ উলংগ হইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা অচিরেই বস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করিল। নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদেই তাহারা হাতের কাছে যাহা পাইল তাহার দ্বারাই শরীরকে আবৃত করিতে শিখিল। এই সময় গাছের বাকল, পশুর চামড়া, ঘাস-পাতা প্রভৃতিই ছিল তাহাদের পরিধেয়। শুধু আত্মরক্ষাই নহে। আদিম মানুষের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসও বোধহয় তাহাদের বস্ত্র পরিধানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সমাজ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, খুব সম্ভবতঃ কোন পশু শিকারের পর ঐ পশুর চামড়া পরিধান করিয়াই তাহারা তাহাদের শিকার-উৎসব পালন করিত। ঐসময় তাহারা বিভিন্ন আধিভৌতিক কাল্পনিক শক্তির কাছে শিকারে সাফল্যের কামনা জানাইত,

বস্ত্রের ইতিকথা

অথবা যে পশুর চামড়া তাহারা পরিধান করিত, তাহারা সেই পশুর মতোই শক্তি ও ধূর্ততা অর্জন করিবে বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তখনও

চর্মপরিহিত পুরুষ এবং বৃক্ষপত্র-পরিহিত স্ত্রীলোক

তাহারা ঐ চামড়া হইতে বস্ত্র তৈরী করিতে জানিত না। শুধুমাত্র উহা বা গাছের বাকল গায়ে বা কোমরে জড়াইয়া রাখিয়াই তাহারা তাহাদের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইত। ধীরে ধীরে প্রস্তর যুগের শেষ দিকে তাহারা চামড়া কাটিয়া টুকরা করিয়া এবং হাড়ের বা মাছের কাঁটার সাহায্যে জীবজন্তুর নাড়িভুড়ি দিয়া বস্ত্র সেলাই করিতে শিখিল।

বস্ত্র হিসাবে ফেল্টের ব্যবহার—সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষ যখন পশুপালক হইয়া ওঠে, তখন তাহারা বস্ত্র হিসাবে ফেল্ট (Felt)-এর ব্যবহার শুরু করে। ভেড়া জাতীয় পশুর লোমকে জলে ভিজাইয়া, পচাইয়া পরে চাপ দিয়া শুকাইয়া ফেল্ট তৈরী করা হয়। তবু খুব সম্ভবত এই ফেল্ট সেলাই করিয়া বস্ত্র তৈরী করিতে তাহারা তখনও জানিত না। গাছের বাকল বা পশুর চামড়ার মতো ইহাকেও কাটিয়া টুকরা করিয়া লইয়া তাহারা বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইত।

সুতার তৈরী বস্ত্রের ব্যবহার—ইতিমধ্যে মানুষ তাহার যাযাবর পশুপালক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাষবাস করিতে শিখিয়াছে।

চাষাবাদের প্রয়োজনেই তাহাদের এক জায়গায় স্থিতি ঘটিল। ফলে, তাহারা এখন পোশাকের দিকে আরও একটু নজর দিতে পারিল। শুধু

আত্মরক্ষার প্রয়োজন বা আধিভৌতিক বিশ্বাস ছাড়াও অলংকরণের জন্যও তখন তাহারা বস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করিতে শুরু করিল। তাছাড়া, প্রচুর পরিমাণে পশুর চামড়াও হয়তো পাওয়া যাইত না। সুতরাং চামড়া ছাড়াও বস্ত্রের জন্য অন্যকিছুর প্রয়োজন তাহারা অনুভব করিল। আর এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ তুলার ব্যবহার শিখিল। প্রাচীন মিশরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে তুলার চাষ শুরু হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

প্রাচীন চীনে রেশমের (silk) চাষও সমসাময়িক ঘটনা। তাছাড়া, আরও দুইটি যুগান্তকারী আবিষ্কার—(১) কি করিয়া সুতা তৈরী করিতে হয়, এবং (২) কি করিয়া সেই সুতা দিয়া কাপড় তৈরী করা যায়—তাহাও তাহারা এই সময়ই করিল।

সুতা ও বস্ত্র তৈরী করার কৌশলের আবিষ্কার

নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ দিকেই মানুষ সুতা তৈরী করিবার কায়দা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। বস্তুত, তাম্র-প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকে মিশরে ও ভারতবর্ষে যে উন্নত ধরনের বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সময় হইতে শুরু করিয়া শ' দুই বছর আগে পর্যন্তও যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করিয়াছে। মোটামুটি সুতা তৈরীর বা বস্ত্র তৈরীর কায়দা ছিল সর্বত্র প্রায় একই। ঐ সুতা বা বস্ত্র হাতেই তৈরী হইত।

প্রথমে পশম বা ভেড়ার লোম (wool) অথবা তুলা অথবা গাছের বাকলের সূক্ষ্ম তন্তু তাহারা একটি ভারী জিনিসের সহিত বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত এবং পরে উহাকে পাক দিয়া শক্ত লম্বা সুতায় পরিণত করিত (spinning)। আজিও তকলী দিয়া আমাদের দেশে যে সুতা কাটার প্রথা চালু আছে তাহা ঐ আদিম প্রথারই নব্য সংস্করণ। সুতা তৈরীর পর উহা হয় ছুঁচের সাহায্যে বোনা হইত (knitting) বা হাতে-চালানো তাঁতের সাহায্যে বোনা হইত (weaving)। শুধু সাধারণ-

প্রাচীন মিশরে বয়নপদ্ধতি
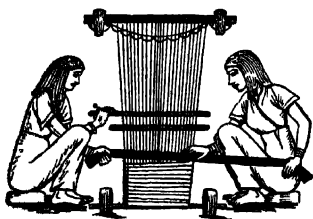
ভাবেই বোনা হয়, প্রাচীন পারসীক ও ভারতীয়েরা বোনার কৌশলে কাপড়ে নানারূপ সুন্দর সুন্দর নক্সা তোলার কাজও আয়ত্ত করিয়াছিল। প্রথম দিকে অবশ্য কাপড় তৈরীর পর উহা গায়ে বা কোমরে জড়াইয়াই মানুষ পরিধান করিত। পরে, মিশরীয়রা কাপড়ের টুকরা এক ভাঁজ করিয়া উহাতে গলার জন্য খানিকটা গোল করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া ফতুয়া জাতীয় জামা তৈরী করিতে শুরু করিল। কখনও বা এই জাতীয় জামার

হরপ্পার জামা-পরিহিত পুরুষ মূর্তি
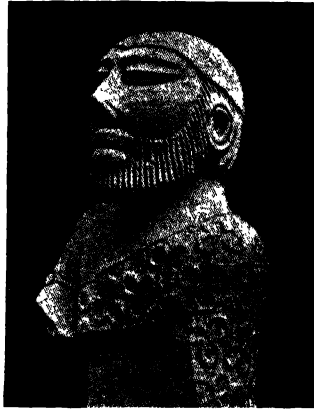
দুইধারে সেলাই করা হইত, আবার কখনও বা শুধুই একটি চাদর দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। প্রাচীন পারসীকরাই প্রথম গায়ের মাপে জামা কাটিয়া জামা সেলাইর কৌশল আবিষ্কার করে।

বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব

বস্ত্রশিল্প জগতে হাতের পরিবর্তে যন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় টাকুর (spindle) সাহায্যে সুতাকাটার পরিবর্তে চরকায় (spinning wheel) সুতাকাটার প্রথা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু বস্ত্রশিল্পে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আজিকার সভ্যতার অংগ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে তাহা আসে আরও প্রায় দুইশত বৎসর পরে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত ল্যাংকাশায়ারের অধিবাসী জেমস হারগ্রীভ্স্ (Hargreaves) ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত Spinning-Jenny আবিষ্কার করেন। অবশ্য ইহাও হাতে চালাইতে হইত; কিন্তু ইহাতে একটির বদলে একসঙ্গে ১৬টি সুতা কাটা যাইত। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড আর্করাইট

(Richard Arkwright) যে Spinning-Frame আবিষ্কার করেন তাহাতে আর হাত দিয়া তুলার যোগান দিতে হইত না। আরও দশ
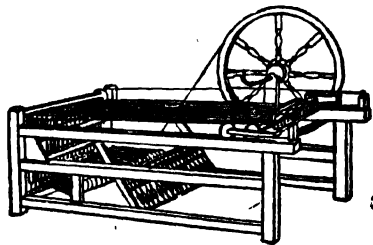
স্পিনিং জেনী

বৎসর পরে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল ক্রম্পটন (Samuel Crompton) তাঁহার Spinning Mule-এ জেনী ও ফ্রেমের সমন্বয় ঘটাইয়া সহজে ও তাড়াতাড়িতে সূক্ষ্ম সুতা কাটার ব্যবস্থা করেন।
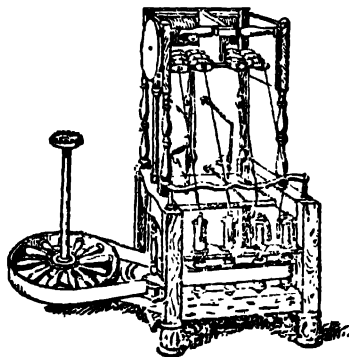
আর্করাইটের স্পিনিং ফ্রেম

ইতিমধ্যে হাতে ছুঁচ দিয়া বোনার ব্যবস্থারও অবসান ঘটান ইংলণ্ডের নটিংহামসায়ারের উইলিয়ম লী (William Lee)। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি Knitting Machine আবিষ্কার করেন। তাঁহার এই আবিষ্কারের মূল কারণটি কিন্তু বড় মজার। তাঁহার স্ত্রী হাতে সেলাইর পিছনেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন বলিয়া তিনি তাঁহার সংগ বিশেষ পাইতেন না। এই জন্য তিনি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। আর তাঁহার সেই বিক্ষোভেরই ফল Knitting Machine।

এদিকে হারগ্রীভ্‌স্‌ প্রভৃতির আবিষ্কারের ফলে প্রচুর পরিমাণে সুতা পাওয়া যাওয়ায় কাপড় বোনার কাজকেও দ্রুততর করার প্রয়োজনীয়তা
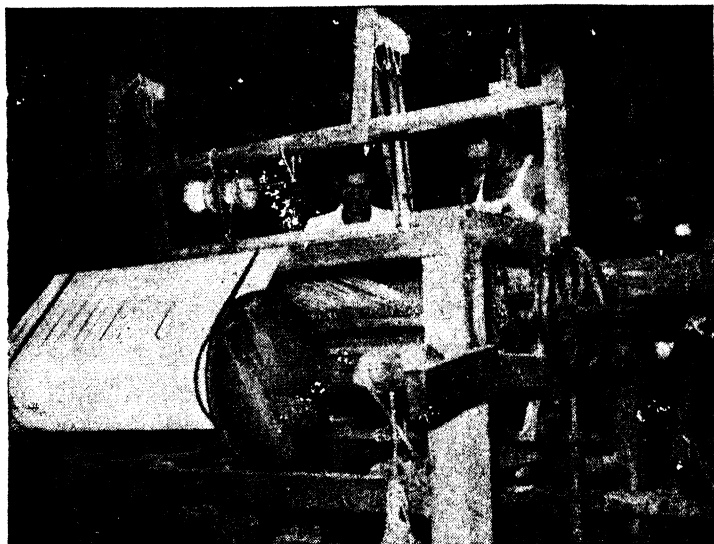
বর্তমান যুগের কলচালিত তাঁত

দেখা দিল। ইহারই তাগিদে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এডমণ্ড কার্টরাইট (Cartwright) নামে একজন ইংরেজ ধর্মযাজক আবিষ্কার করিলেন বাষ্পচালিত তাঁত (power-loom)। ইহার ফলে সহজে প্রচুর কাপড় উৎপাদন সম্ভবপর হইল। ১৮৫১ সালে আইজাক মেরিট সিংগারের (Isaac Merritt Singer) আবিষ্কৃত সেলাইয়ের কল পোশাক তৈরীর কাজকেও সহজ করিয়া দিল।

বস্ত্রের উপাদান

আজিকার পৃথিবীতে এমন কোনো সভ্য জাতি নাই যাহারা বস্ত্র ব্যবহার করে না। যে সব আদিম জাতি আজিও সভ্যতার সংস্পর্শে পুরাপুরি আসে নাই তাহারাও প্রায় সবাই কোনো-না-কোনো রকমের বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু, আগেই বলা হইয়াছে, এই সকল বস্ত্র সবই একই উপাদান দ্বারা তৈরী নয়।

চামড়া—আদিম মানুষ চামড়ার পোশাক পরিধান করিত। আজিও এস্কিমো প্রভৃতি জাতিরা চামড়ার পোশাক পরিধান করিয়া থাকে। তবে, তাহারা চামড়া নরম করিবার বা পরিষ্কার করিবার কায়দা জানিত না। এস্কিমো মেয়েরা এখনও চিবাইয়া চামড়াকে নরম করিয়া নেয়। বর্তমানকালে অবশ্য রাসায়নিক পদ্ধতিতে চামড়াকে পরিষ্কার ও নরম করিয়া তাহার দ্বারা তৈরী বস্ত্র পরিধানের রেওয়াজ শীতপ্রধান সভ্য দেশগুলিতেও চালু হইয়াছে।

উদ্ভিদ-জাত দ্রব্য—বস্ত্রের উপাদান হিসাবে উদ্ভিদ-জাত দ্রব্যের মধ্যে আদিমতম হইতেছে তিসিগাছের (flax) ডাঁটা। উহার লম্বা লম্বা আঁশ হইতে প্রস্তুত লিনেনের প্রচলন সুপ্রাচীন মিশরে প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। ঐ সময়েই ভারতে ও মিশরে তুলার চাষ এবং তুলা হইতে তৈরী সুতার বস্ত্রও প্রচলিত ছিল। আজিও বস্ত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে তুলা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়।

পশম—জৈব পদার্থের মধ্যে চামড়া ছাড়া বস্ত্রের আরেকটি অন্যতম উপাদান পশম (wool)। ভেড়াজাতীয় পশুর লোম হইতে এই পশম তৈরী করা হয়। প্রাচীন য়ুরোপের অধিবাসীরা একান্তই এই পশম দ্বারা তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করিত। দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারই প্রথম ভারতবর্ষ হইতে সুতার তৈরী নানারূপ সুন্দর সুন্দর নক্সা-আঁকা বস্ত্র য়ুরোপে লইয়া যান। তাহার পর অবশ্য আরব বণিকদের কল্যাণে য়ুরোপে সুতীবস্ত্রের প্রচলন হয়।

রেশম—বস্ত্রের আরেকটি জৈব উপাদান রেশম (silk)। প্রাচীন চীনদেশে গুটিপোকার চাষের প্রচলন ছিল। এই গুটিপোকারা তুঁত গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং কীট অবস্থায় নিজেদের চারিধারে সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া ঘিরিয়া রাখে। ঐ তন্তু হইতেই রেশম তৈরী হইত। বহুদিন পর্যন্ত চীনদেশীয়রা রেশম তৈরীর কায়দা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই, যদিও রেশমের তৈরী কাপড়ের সেই সময়ই অন্যান্য দেশে বহুল চাহিদা ছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে লেখা ভারতীয় গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও চীনপট্ট বা রেশমের উল্লেখ আছে। পরে দুইজন সন্ন্যাসী বাঁশের চোঙের মধ্যে করিয়া কয়েকটি গুটিপোকা লুকাইয়া চীন হইতে লইয়া আসিলে

প্রাচীন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে রেশমের চাষ শুরু হয়, এবং পরে ঐ স্থান হইতেই ইহা পশ্চিমে য়ুরোপ ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে।

গাছের পাতা, বাকল ইত্যাদি—আদিম মানুষ চামড়া ছাড়াও গাছের বাকল, পাতা, ঘাস প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের পরিধেয় জিনিস তৈরী করিত। আজিও কোনো কোনো আদিম জাতি ঐরূপ পোশাক পরিধান করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের "হুলা" ঘাগরা একান্তই টি (ti) গাছের পাতা দ্বারা তৈরী হয়। আমরা এইজাতীয় পাতা বা বাকলের পোশাক দেখিয়া অবশ্য হাসিতে পারি। কিন্তু বস্ত্রের উপাদান হিসাবে আধুনিক কালে সুতা, রেশম, পশম প্রভৃতি ছাড়াও রেয়ন, নাইলন প্রভৃতি যে সব মনুষ্য-সংযোজিত দ্রব্যাদি (synthetic products) ব্যবহার করা হইয়া থাকে সেগুলিও কাঠ, বাকল প্রভৃতি হইতেই তৈরী।

নকল রেশম—উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেন যে রেশমের উপাদান আসলে তুঁত গাছের পাতায় সেলুলোজ (cellulose) নামে যে রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান তাহাই। গুটিপোকারা ঐ পাতা খায় বলিয়া উহাদের পেটে এই সেলুলোজ এক জেলিজাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং উহাই উহাদের মুখের দুইটি সূক্ষ্ম ছেঁদা দিয়া রেশম সুতারূপে বাহির হইয়া আসে। অড্‌মার্স (Audemars) নামক একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক তুঁত পাতার ঐ সেলুলোজকে পৃথক করিয়া লইয়া রেশম তৈরী করিতে সক্ষম হন। তিনি উহার নাম দেন নকল রেশম (artificial silk)। পরবর্তীকালে দেখা যায়, তুলার বীজ হইতে তুলা বাহির করিয়া লইলে যে অকেজো অংশ পড়িয়া থাকে তাহা হইতে এবং স্প্রাস (spruce) গাছের কাঠ হইতেও সেলুলোজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হিলেয়ার দ্য শারদোনে (Hilaire de Chardonnet) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঠ ও তুলাবীজের অকেজো অংশ হইতে নকল রেশম তৈরী করেন। পরবর্তীকালে এই নকল রেশমেরই নামকরণ হইয়াছে রেয়ন (Rayon)।

নাইলন—সাম্প্রতিককালে কয়লা, জল, বাতাস, পেট্রোলিয়াম ও স্বাভাবিক বায়ু (natural gas) হইতে হেক্সামিথাইলিন-ডায়ামিন (Hexamethylene-diamine) ও এডিপিক এসিড (Adipic acid) নামক দুইটি

রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়া ওয়ালেস কেরোথার্স (Wallace Carothers) উহাদের মিশ্রণে বস্ত্রের আরেকটি অন্যতম কৃত্রিম উপাদান নাইলন (Nylon) তৈরী করিয়াছেন (১৯৩৮ খৃঃ)। বস্ত্রের উপাদান হিসাবে ইহা অত্যন্ত শক্ত ও স্থিতিস্থাপক বলিয়া সকল দেশেই ইহার বহুল প্রচলন হইয়াছে।

অন্যান্য কৃত্রিম উপাদান—বস্ত্রের অন্যান্য কৃত্রিম উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে এসিটেট (Acetate), ওরলোন (Orlon), ডেক্রন (Dacron), টেরিলিন (Terylene) প্রভৃতি। বস্তুত, আধুনিক যুগে ক্রমশই প্রাকৃতিক উপাদানের চাইতে এইসব কৃত্রিম উপাদানের তৈরী বস্ত্রের জন্যই মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বস্ত্রাভ্যাসে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

আগেই বলা হইয়াছে, বস্ত্রের জন্য আমাদের যে চাহিদা তাহার মূল কারণ বস্ত্র আমাদের প্রধানত দুইটি প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। প্রথমত, বস্ত্র শীতাতপের হাত হইতে আমাদের রক্ষা করে। আর দ্বিতীয়ত, বস্ত্র দ্বারা মানুষ তাহার লজ্জা নিবারণ করে। ইহা ছাড়াও মানুষ বস্ত্র দ্বারা তাহার অলংকরণের প্রবৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধ চরিতার্থ করে। বস্ত্রের ব্যবহারে যথাক্রমে প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

শীতপ্রধান দেশের লোকের বস্ত্র

স্বভাবতই, শীতপ্রধান দেশের লোক বস্ত্র তৈরীর জন্য যে উপাদান ব্যবহার করিবে বা যে জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক তাহা করিবে না। শীতপ্রধান দেশে অত্যধিক শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই বস্ত্রের প্রয়োজন। তাই সেখানে প্রধানত লোমশ চামড়ার এবং পশমের আঁটসাঁট বস্ত্রের চাহিদাই বেশী। বস্ত্রের উপাদান হিসাবে যদি তাহারা একান্তই সুতির ব্যবহার করে তাহা হইলেও ঠাস বুননি মোটা কাপড়ই তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কৃত্রিম বস্ত্রের ব্যবহারও একইকারণে শীতপ্রধান দেশে এত বেশী প্রচলিত হইয়াছে। শুধু উপাদানই নহে ; বস্ত্রের রং-এর উপরও প্রাকৃতিক

প্রভাব লক্ষণীয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে কালো বা ঘন রং-এর বস্ত্রের সমাদর বেশী ; কারণ ঐ কালো রং বা অন্য কোনো ঘন রং সূর্যের রশ্মিকে বেশী গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া ঐ রংএর কাপড় শরীরকে গরম রাখিতে পারে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পোশাক স্বভাবতই শীতপ্রধান দেশের লোকের পোশাক অপেক্ষা ভিন্ন।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের লোকের বস্ত্র

বস্তুত, নিরক্ষীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের বস্ত্রের কথা যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায়, তাহারা এক টুকরা বাকল বা গাছের পাতার তৈরী কাপড় দিয়াই তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। বর্তমান-কালে অবশ্য তাহারা সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বাকল বা পাতার পরিবর্তে পাতলা এক টুকরা কাপড়ই তাহাদের পরিধেয়। কোমরের চারিধারে উহা জড়াইয়াই তাহাদের বস্ত্রের প্রয়োজন মেটে। সুতীবস্ত্র বা লিনেনই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের বস্ত্রের প্রধান উপাদান। কারণ, গরমে যে ঘাম হয় তাহা এইজাতীয় কাপড় সহজেই শুষিয়া নেয় এবং ঠাস বুনুনি না হওয়ায় তাহাদের মধ্যেকার সূক্ষ্ম ছেঁদাগুলির মধ্য দিয়া বায়ু চলাচলের সুযোগও থাকে। এই অঞ্চলের বস্ত্রাদির রং প্রধানত শাদা, কারণ ঐ রং-টিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় বলিয়া বস্ত্র পরিধানকারী কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা বোধ করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিধেয় বস্ত্রাদি শীত-প্রধান অঞ্চলের ন্যায় স্বভাবতই আঁটসাঁট নহে। আবার মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত ঢিলা সুতীবস্ত্রের জামা পরিধান করিয়া থাকে। কারণ ঐরূপ ঢিলা জামা দিনের বেলায় যেমন তাহাদের প্রখর সূর্যরশ্মির উত্তাপের হাত হইতে রক্ষা করে, তেমনি আবার রাত্রির অত্যধিক ঠাণ্ডার হাত হইতেও আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে।

আমাদের ভারতবর্ষের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোকেরা একই কারণে শীত-গ্রীষ্মে বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক প্রভাবের ন্যায় মানুষের বস্ত্রাভ্যাসে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। এক দেশের সামাজিক পরিবেশে যে পোশাক বরণীয়, অন্য দেশে তাহা হয়তো অচল। যেমন, ব্রহ্মদেশের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র লুংগি ;

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব

উহার ঔজ্জ্বল্য ও ব্যবহারের তারতম্যে সেখানকার লোকদের সামাজিক সত্তার পরিচয়। কিন্তু আমরা বাংগালীরা যদি বা সেই লুংগি বাড়িতে পরি, বাহিরে সেই লুংগি পরিধান করিয়া কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়া আমাদের কল্পনারও বাইরে। আবার, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই যদিও পুরুষেরা এবং মেয়েরা বিভিন্ন রকমের পোশাক ব্যবহার করিয়া থাকে, এস্কিমোদের মধ্যে পুরুষের ও মেয়েদের পোশাকের প্রায় কোনো পার্থক্যই নাই। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা স্কার্ট পরে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের পরিধেয় পাজামা, আর ভারতবর্ষে শাড়ী। আরব দেশে মেয়েরা মুখের সামনে বোরখা দ্বারা ঢাকিয়া রাখে; কিন্তু উত্তর আফ্রিকার টুয়ারেগদের (Tuaregs) মধ্যে পুরুষদেরই মুখ ঢাকিয়া রাখা রীতি।

বহুদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও বস্ত্রাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাজার বছর আগে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা যে পেলিয়াম (pallium) নামক পোশাক পরিত, রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা আজিও অনুরূপ পোশাক পরিয়া থাকেন।

একটি আদিম জাতির উদাহরণ দিলে বস্ত্রাভ্যাসে এই সাংস্কৃতিক প্রভাব কতোটা কাজ করে, তাহা আরও স্পষ্ট হইবে। বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) বিভিন্ন অধিবাসীদের রীতিনীতি বিশেষভাবে অনুশীলনের জন্য জাহাজে করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত টেরা-ডেল-ফুগো-তে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন সেখানকার অত্যধিক শীতের মধ্যেও সেখানকার অধিবাসীদের পরণে কোনো বস্ত্র নাই। তাহারা সম্পূর্ণ উলংগ। ডারউইন তাহাদের কিছু রংগিন বস্ত্র দান করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলেন যে তাহারা ঐসব বস্ত্র পরিধান না করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং ঐসব টুকরা তাহাদের মাথায় জড়াইয়া লইয়াছে। বস্তুত, ঐ জায়গায় ঐ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কাপড় পরিবার কোনো রীতিই নাই, কিন্তু অলংকরণের জন্য মাথায় খণ্ডবস্ত্র জড়ানোর রীতি রহিয়াছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রভাবের কথা উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অবশ্য

জৈবিক প্রয়োজনের জন্যই পোশাকের ব্যবহার। পোশাক কি রকম হইবে তাহাও অবশ্য প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবেই স্থিরীকৃত হয়। তাহা হইলেও মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য-বোধ সেই পোশাকের অলংকরণের কাজটুকু করিয়া লয়। তাহা না হইলে একই দেশে একই সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে হয়তো আমরা সব সময়ই একই পোশাকের প্রচলন দেখিতাম। কিন্তু তাহা হয় না। মানুষের রুচির পরিবর্তনে নিত্য নূতন ষ্টাইলের উদ্ভবে পোশাকেরও বিবর্তন ঘটে। মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাদের এই সৌন্দর্যবোধই তাহাদের পোশাককেও পাল্টাইয়া চলিয়াছে ; নিত্য নূতন পোশাকের রীতির উদ্ভব ঘটিতেছে। শুধু সভ্য মানুষের কথাই বা বলি কেন। আদিম মানুষও তাহাদের সহজাত সংস্কারের বশেই পোশাকের দ্বারা তাহাদের জৈবিক প্রয়োজন মিটাইবার পরই তাহাকে সুন্দরতর করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। এইজন্যই দেখা যায়, পাখীর রংগিন পালক প্রভৃতি খুঁজিয়া তাহারা তাহাদের পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যেখানে বস্ত্রাভাব সেখানে গায়ে-হাতে-পায়ে রংগিন উল্‌কি আঁকিয়া তাহারা তাহাদের সৌন্দর্যস্পৃহা চরিতার্থ করে। জুতা, টুপী, দস্তানা, অলংকার প্রভৃতি যেসব আনুষংগিক পোশাক আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাদের কোনো কোনোটা শীতাতপ হইতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলেও, তাহাদের বৈচিত্র্য আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রভাবের সাক্ষ্যই বহন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরাই শাড়ী পরিলেও, পরার ভংগীর বিভিন্নতার ভিতর দিয়াই তাহাদের সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ পায়। একই কারণে তাহারা শাড়ীকে বিভিন্ন রঙেও রঞ্জিত করে।

সৌন্দর্যবোধ ও পোশাক

পরনের কাপড়কে সুন্দরতর করার জন্য তাহার উপর নানা ধরনের কারুকার্য করা হয়। যেসব স্থলে কাপড়কে কাটিয়া সেলাই করিয়া পরা হয়, সেসব স্থলে তো নিত্য নূতন কাটার এবং সেলাই করার ভংগী বাহির হইতেছে। পোশাকে সৌন্দর্যবোধের ব্যাপারে মেয়েরাই অগ্রণী। দেহের রং, পরিধেয় পোশাকগুলির পরস্পরের রং এমন কি আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরিচ্ছদের রং নির্বাচন করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন।

সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার নিমিত্তই মানুষ নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্তমানে পুরুষদের মধ্যে অলংকার ব্যবহারের রীতি কমিয়া আসিলেও, তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দেহসজ্জাকেও পরিচ্ছদের অংগ হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়।

এ বিষয়ে মনে রাখিতে হইবে, দেহসজ্জায় অধিক কৃত্রিমতা এবং পরিচ্ছদে বাহুল্য উচ্চ রুচিবোধের পরিচয় নয়। সহজ সরলতার মধ্যেই প্রকৃত সৌন্দর্যের বিকাশ। পোশাকের ভিতর দিয়া আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইলে তাহা উচ্চ রুচিবোধের পরিচায়ক।

পোশাক-পরিচ্ছদে পাদুকার স্থান

পোশাক-পরিচ্ছদে পাদুকার স্থান সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা এখানে প্রাসংগিক। পৃথিবীর সকল দেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই কোনো-না-কোনো ধরনের পাদুকার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আমাদের গরম দেশ; শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাদুকা ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। কিন্তু রোগ-বীজাণু এবং আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাদুকার প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতে কাষ্ঠ পাদুকার যে বহুল ব্যবহার ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। নানা সুবিধার জন্য বর্তমানে চর্ম পাদুকাই পৃথিবীর সকল দেশে বিশেষভাবে চালু হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষও ইহার ব্যতিক্রম নহে। চামড়া ছাড়া কাপড়ের জুতারও ব্যবহার আছে। বিশেষ করিয়া বর্ষাকালের জন্য রবারের জুতার প্রচলন বর্তমানে হইয়াছে। বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য কাঠের পাদুকার ব্যবহারও আমাদের দেশে এখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই।

জুতা পরিচ্ছদেরই অংগ। সুতরাং জুতা নির্বাচনের সময় তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(১) জুতা ব্যবহার যেন স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করে; (২) ইহা যেন দৈহিক আরামপ্রদ হয় এবং (৩) ইহার ব্যবহার যেন আমাদের গঠনসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। পায়ের মাপ ও গঠন অনুযায়ী জুতা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। অন্তত এরূপ জুতা ব্যবহার করা উচিত যাহাতে পায়ে কোনো যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি না হয়। জুতা পরিধান করিয়া যদি আরাম ও

স্বাচ্ছন্দ্যই নষ্ট হইল, তাহা হইলে উহা পরিধান করিয়া লাভ কি! জুতা পরিধান করিবার সময় দৃষ্টি রাখা দরকার যাহাতে পা কোনোদিকে চাপিয়া না যায় বা আংগুল কুঁচকাইয়া না থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জুতার দোষেই পায়ে কড়া, ফোস্কা ইত্যাদি দেখা দেয়, আংগুল বিশ্রী ভাবে বাঁকিয়া যায় এবং নখের দুই দিকে চাপ পড়িতে পড়িতে উহা ক্রমশ ঘষিয়া বসিয়া যায়। বয়স্কদের যেমন তেমন, শিশুদের জুতা নির্বাচনে বিশেষ সাবধান থাকিতে হয়। জুতার দোষে উহারা যদি যথাযথভাবে দাঁড়াইতে বা চলিতে না পারে তবে অবাঞ্ছিত দাঁড়ানো বা চলার ভংগী তাহাদের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতে পারে। জুতা পায়ে দিবার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত উহা পায়ের উপরভাগে, নিম্নদেশে ও গোড়ালির চারিদিকে যথাযথ-ভাবে বসিল কি না। আমাদের গরম দেশে যে সবসময় পায়ের উপরিভাগ ঢাকিয়া জুতা পরিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। পা যাহাতে বেশী গরম হইয়া না পড়ে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সবসময়ে রবারের জুতা ব্যবহার করাও স্বাস্থ্যসম্মত নহে। বর্তমানে আমাদের দেশে আধুনিক মহিলাদের মধ্যে উঁচু হীলের জুতা ব্যবহারের রেওয়াজ দেখা দিয়াছে। উঁচু হীলের জুতা পরার ফলে পায়ের প্রতিপদক্ষেপ হ্রস্ব হইয়া আসে এবং চলার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। তারপর চলার সময় অনবরত ঝাঁকুনির ফলে পায়ের ও গোড়ালির সংযোজক তন্তুগুলির উপর খুব বেশী চাপ পড়ে।

পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি

উপরের আলোচনা হইতে ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে রীতিমত বিবেচনা করিয়া পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করিতে হয়। আমাদের দেশে কাহারও কাহারও ধারণা যে পোশাক-পরিচ্ছদের উপর এতখানি দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন কি—নিতান্ত লজ্জা নিবারণ হইলেই হইল। কিন্তু এই দৃষ্টিভংগী ঠিক নহে। লজ্জানিবারণ ছাড়াও, 'দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা, সৌন্দর্যবৃদ্ধি, সামাজিকতা প্রভৃতি নানারূপ উদ্দেশ্য যে পোশাক পরিধানের আছে তাহা তোমরা দেখিয়াছ। তাই নিতান্ত খেয়াল খুশীমত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত নহে।

পোশাক পরিধানের সময় প্রথমেই স্বাস্থ্যরক্ষার কথা মনে রাখিতে হইবে। দেহের তাপ-সৃষ্টি এবং তাপমোচনের মধ্যে সমতা সাধন করিয়া শারীরিক সুস্থতা রক্ষা করা যে পোশাক পরিধানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ইহা সর্বদা মনে রাখিবে। অধিকসংখ্যক এবং বেশী আঁটসাঁট জামা-কাপড় পরিলে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ কষ্টকর হইয়া গলরন্ধ্র-গ্রন্থি (adenoids) বৃদ্ধি পাওয়া আশ্চর্য নয়। আঁটসাঁট কাপড জামা এবং জুতা পরিধান করিলে দেহের রক্ত-সঞ্চালনেও বাধা জন্মাইতে পারে। কোনো কোনো মেয়েরা কর্‌সেট্ পরিয়া থাকেন। দীর্ঘদিন কর্‌সেট্ আঁট করিয়া পরিলে, ফুস্‌ফুসের নীচের অংশ ক্রমশ সরু হইয়া আসে এবং কখনও কখনও যকৃতও স্থানচ্যুত হয়। আবার, ছেলেরা শক্ত আঁট কলার দীর্ঘদিন ব্যবহার করিলে ঘাড়ের দুই পাশের রক্তবাহী ধমনীগুলি চাপিয়া যায়। আমাদের দেশে কিছুটা ঢিলা এবং হালকা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করাই ভালো। সংক্ষেপে, ঋতু বুঝিয়া, আবহাওয়ার অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যে কার্যে লিপ্ত থাকা হয় তাহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এবং স্বাস্থ্যের কথা মনে রাখিয়া পোশাক নির্বাচন করিতে হয়।

পোশাকের পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ এবং আরও নানাপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে। কাজেই যেসব জামাকাপড় সহজে ধৌত করা যায়, সেই সব জামাকাপড়ই সাধারণত ব্যবহার করা ভালো। আমাদের বাংলাদেশে অত্যধিক ঘাম হইয়া থাকে। ফলে, জামা-কাপড নিয়মমত ধৌত না করিলে অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। বাইরের পোশাক যেমন তেমন হউক, আমরা অনেকে অন্তর্বাসের পরিচ্ছন্নতার কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। ইহারা লোকচক্ষে না পড়িলেও ইহাদের অপরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর।

দৈহিক সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধনের কথা মনে রাখিয়াও পোশাক নির্বাচন করিতে হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। পরিচ্ছদ নির্বাচন কালে দীর্ঘাংগ কিংবা খর্বাকৃতি, ক্ষীণাংগ কিংবা স্থূলকায় একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। দেহের ক্রটিগুলি ঢাকিবার নিমিত্ত পরিচ্ছদের সাহায্য গ্রহণ

করা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পরিচ্ছদ নির্বাচনের দ্বারা মোটা লোককেও কিছুটা ক্ষীণকায় এবং ক্ষীণকায় লোককেও কিছুটা মোটা দেখানো যাইতে পারে। আরেকটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে শালীনতা সৌন্দর্যের অংগ। শালীনতা রক্ষা করিয়া পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বেশভূষা

আমাদের এই বিরাট দেশ মোটামুটিভাবে উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত হইলেও ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কথা আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাছাড়া, এই দেশের অধিবাসী হিসাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারক-বাহক বিভিন্ন জন যে তাহাদের স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহাও তোমরা জান। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের ন্যায় পোশাকেও বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মতোই প্রাচীন ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসীরা চামড়া বা গাছপালার পোশাক পরিয়াই শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিত। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেই তাহারা যে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আর্যরা অবশ্য বল্কল এবং সুতীবস্ত্র উভয়ই পরিধান করিত। কিন্তু সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি তখনও ছিল না। সেলাই করা বস্ত্রের প্রচলন হয় আরও পরে উত্তর-পশ্চিমের বহিরাগত জাতিগুলির সহিত সংযোগের ফলে। পুরুষদের অধোবাস প্রাচীন বাংগালী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে ছিল একান্তই ধুতি; উত্তরাঞ্চলে ধুতির সহিত পরবর্তীকালে ঢিলা বা চুড়িদার পাজামারও প্রচলন হয়। মেয়েদের অধোবাস ছিল শাড়ী; পরবর্তীকালে অবশ্য ঘাগরারও প্রচলন হয়। মেয়েদের ঊর্ধ্বাংগ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থাকিত অনাবৃত। তবে উত্তর-পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবে কেহ কেহ যে কাঁচুলী বা ওড়নার সাহায্যে ঊর্ধ্বাংশ ঢাকিয়া রাখিত সমসাময়িক চিত্রে ও ভাস্কর্যে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। অবশ্য সাধারণ নিম্নবিত্ত ঘরের নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।

প্রাচীন ভারতের পোশাক

সংগতিপন্ন পুরুষরাও উত্তরবাস হিসাবে উত্তরীয় ব্যবহার করিত। আরও পরে, মুসলমানদের আগমনের ফলেই, প্রধানত আমাদের বস্ত্রবাহুল্য বৃদ্ধি পায়, এবং প্রায় দুইশত বৎসর আগে য়ুরোপীয়দের আগমনের ফলে আমাদের পোশাকে পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসীরা—কি পুরুষ কি নারী—অলংকার ব্যবহার করিতে খুবই ভালোবাসিত। উভয়ের কাছেই কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাংগুরী, অংগুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ূর, মেখলা প্রভৃতি ছিল খুবই প্রিয়। বিবাহিত নারীরা বিশেষভাবে ব্যবহার করিত শংখবলয়। পোশাকের উপাদান হিসাবে কার্পাসজাত বস্ত্রই ছিল প্রধান। তবে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতকেও যে এই দেশে রেশমের বস্ত্র চালু ছিল, সমকালীন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে "চীনপট্টের" উল্লেখই তাহার প্রমাণ। এছাড়া ঐ গ্রন্থ হইতেই জানা যায় পূর্বাঞ্চলে পত্রোর্ণ বস্ত্র (পত্র হইতে জাত বস্ত্র = এণ্ডি ?) এবং বাংলাদেশের কার্পাসজাত দুকূল বস্ত্র খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। প্রসংগত বলা যাইতে পারে, বাংলাদেশের এই দুকূল বা খুবই সূক্ষ্ম বস্ত্র বহুদিন পর্যন্ত পাওয়া যাইত। আরব বণিক সুলেমান (৯ম শতক), ভিনিসীয় মার্কোপোলো (১৩ শতক), পরিব্রাজক মা হুয়ান (১৫ শতক) প্রভৃতি সবাই ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ঢাকার মসলীন ইহারই উত্তরসূরী। কিন্তু ইংরেজদের অত্যাচারে এই শিল্প ধ্বংস হইয়া যায়।

বর্তমানকালে এই দেশের বিভিন্ন অংশের বহু বিচিত্র বেশভূষা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে বলা যায়, গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ার সহিত খাপ খাওয়াইয়াই প্রায় সমস্ত ভারতীয় পোশাকই ঢিলা ধরনের এবং পাতলা কাপড়ের তৈরী। রংগিন ও অলংকৃত বস্ত্রাদি মেয়েরা ব্যবহার করিলেও ছেলেদের পোশাক প্রায় সর্বত্রই শাদা। উত্তর ভারতে, বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চলে ও দক্ষিণে, পুরুষদের অধোবাস হিসাবে ধুতিই প্রধান পরিধেয়। তবে উত্তর ভারতে যেমন কাছা-কোঁচা দিয়া ধুতি পরা হয় দক্ষিণে তাহা হয় না। সেখানে ধুতিকে লুংগির মতো করিয়া পরিধান করা হইয়া থাকে। মধ্যভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারত মুসলমান ও অন্যান্য বহিরাগত জাতির সংস্পর্শে বেশী আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সেখানে পায়জামা—ঢোলা এবং

বর্তমান ভারতের পোশাক-পরিচ্ছদ

চুড়িদার উভয়ই—বেশী প্রচলিত। হয়তো বা সেখানকার জলবায়ুতে শীতাধিক্যও সেখানকার লোকদের চাপা পায়জামা পরিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পুরুষদের উত্তরবাস হিসাবে ফতুয়া ও পাঞ্জাবীর ব্যবহার সুপ্রচলিত। দক্ষিণে, হয়তো বা গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যই, এখনও শুধু উত্তরীয়ের ব্যবহার প্রচলিত। ইহা ছাড়া, য়ুরোপীয় পোশাকও সর্বত্রই প্রচলিত। মুসলিম সংস্কৃতির অনুকৃতিতে গলাবন্ধ শেরওয়ানীর প্রচলনও পশ্চিম ও উত্তরে খুবই বেশী। মেয়েদের অধোবাস প্রধানত শাড়ী। কিন্তু পুরুষদের মতো তাহাদের শাড়ী পরিবার পদ্ধতিও সর্বত্র এক নহে। আমাদের বাংগালী মেয়েরা যেমন কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়া অধোবাস রচনা করিয়া আঁচলটিকে কোমরের ডান দিক হইতে তির্যকভাবে বক্ষের উপর দিয়া বা কাঁধের পিছনে ফেলিয়া কাপড়
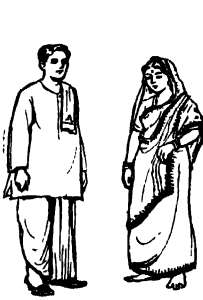
পরিয়া থাকে, অন্যত্র তাহা নহে। পশ্চিমে মেয়েরা কোমরের বাঁ দিক হইতে তির্যকভাবে পিছন দিক দিয়াই ডান কাঁধের উপর দিয়া শাড়ীর আঁচলকে

সামনে আনিয়া উহার দ্বারা উত্তরবাস রচনা করে। আবার, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে মেয়েরা শাড়ীর মধ্যভাগ কোমরে জড়াইয়া এক প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্দিকে পুরুষদের মত কাছা দিয়া এবং অপর প্রান্ত দিয়া উত্তরবাস রচনা করিয়া কাপড় পরিয়া থাকে। গুজরাট অঞ্চলে মেয়েরা ঘাগরা এবং আসাম অঞ্চলে মেয়েরা সায়া জাতীয় মেখলা অধোবাস হিসাবে ব্যবহার করে; উত্তরবাস হিসাবে অতীতের অনুকরণে তাহারা ওড়নার ব্যবহার করে। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মেয়েদের মধ্যে শাড়ীর প্রচলন থাকিলেও তাহারা প্রধানতঃ চুড়িদার পাজামাই অধোবাস হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার সহিত লম্বা হাতওয়ালা হাতকাটা জামা এবং ওড়না বা দোপাট্টা তাহারা পরিধান করে। গ্রামাঞ্চলে বা নিম্নবিত্ত পরিবারে মেয়েরা যদিও প্রায় সর্বত্রই এক বস্ত্র পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করে, তবুও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারের ফলে ব্লাউজ, সায়া, সেমিজ প্রভৃতিরও যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে। বড়ো বড়ো শহরগুলিতে যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত সেখানে বিত্তবান ঘরের মেয়েদের মধ্যে স্কার্ট ও ফ্রক, স্ল্যাকস্, ট্রাউজার ও সার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধরনের পোশাকের প্রচলনও দেখা যায়। তবে তাহা খুবই সীমিত। যুদ্ধোত্তরকালে মেয়েরাও বেশী বাহিরের কাজে যোগ দেওয়ার ফলেই বোধহয় এই জাতীয় আঁটসাঁট পোশাকের চাহিদা বাড়িয়াছে।

বস্ত্রের উপাদান জলবায়ু অনুযায়ী দেশের এক এক জায়গায় এক এক রকম। দক্ষিণাঞ্চলে কার্পাস বস্ত্রেরই একচেটিয়া প্রাধান্য। পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমে কার্পাস বস্ত্রই বেশী পরা হইলেও শীতকালে মধ্যবিত্ত ও বিত্তবানরা পশমের পোশাকও ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্বাঞ্চলে এণ্ডি বা মুগা জাতীয় বস্ত্র এখনও খুব ভালো উৎপন্ন হয় বলিয়াই ঐ স্থানে শীতকালে এণ্ডির পোশাকও পরা হয়। মধ্য ভারত, এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শীতকালে শীতের আধিক্য হেতু পশম বস্ত্রের চাহিদা খুব বেশী। ইহা ছাড়া ভারতের সর্বত্রই বিত্তবানদের মধ্যে রেশম বস্ত্রেরও যথেষ্ট প্রচলন রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া উৎসবানুষ্ঠানে রেশম বস্ত্র পরিধান মেয়েদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। সাম্প্রতিককালে নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন প্রভৃতি কৃত্রিমবস্ত্রও বেশী টেঁকসই বলিয়া এবং সহজেই ধোয়া যায় বলিয়া যথেষ্ট সমাদৃত হইতেছে।

আনুষংগিক পোশাক হিসাবে অলংকার বর্তমান কালে ভারতীয় পুরুষরা আর বিশেষ পরে না। তবে ভারতের প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের কাছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার এখনও খুবই প্রিয়। দক্ষিণভারতের মেয়েরা অবশ্য ফুলের অলংকারও খুব ভালোবাসে। য়ুরোপীয়দের মত মস্তকাবরণ ভারতীয় পরিচ্ছদের অংগরূপে সর্বত্র অপরিহার্য নয়। দক্ষিণে বা পূর্ব অঞ্চলে মস্তকাবরণ বলিয়া সাধারণত কিছু নাই। কিন্তু পাঞ্জাবী শিখেরা ধর্মাচরণের অংগ হিসাবেই পাগড়ী মাথায় দিয়া থাকে। মুসলমানরা ফেজ বা অলংকৃত চ্যাপ্টা টুপী মাথায় দেয়। পার্শীরা মাথায় দেয় কোণাকৃতি অলংকৃত টুপী। এ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্রই সাধারণ মানুষ পাতা দিয়া মস্তক আচ্ছাদন তৈরী করিয়া সূর্যের খরতাপ হইতে আত্মরক্ষা করে। মেয়েদেরও মস্তকাবরণ বলিয়া কিছু নাই। তাহারা শাড়ীর আঁচল বা ওড়না দিয়াই সেই কাজ চালাইয়া লয়। তাছাড়া, নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই তাহাদের শিরোভূষণ। তাহাদের কাহারও লম্বমান কেশ ঘাড়ের উপর খোঁপা করিয়া বাঁধা থাকে, কাহারও বা মাথার পিছন দিকে থাকে এলানো, আবার কাহারও বা মাথার উপরে থাকে প্যাঁচানো ঝুঁটি। সাম্প্রতিককালে বাহিরের প্রয়োজনে ও পাশ্চাত্য প্রভাবে ভারতীয় মেয়েরাও কেহ কেহ চুল "বব্" করিয়া ছোটো করিয়া থাকে।

জাতীয় পোশাক

বিদেশে এই বহুবিচিত্র বেশভূষা লইয়া এক জাতি হিসাবে আমাদের পরিচয় তুলিয়া ধরার অসুবিধা হয়। সেই কারণেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের জাতীয় পোশাকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর সেই প্রয়োজনেরই তাগিদে কালো শেরওয়ানী এবং শাদা পাজামা বা ট্রাউজার আমাদের জাতীয় পোশাক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে পোশাক-পরিচ্ছদের সংস্কার

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের প্রভাবের ফলে পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এই সময় পরিচ্ছদের প্রয়োজন কি এবং কি ধরনের পরিচ্ছদ পরিধান করিলে তাহাকে আদর্শ পরিচ্ছদ বলা যাইতে পারে, এই আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা, শ্লীলতা রক্ষাই

পোশাক-পরিচ্ছদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। কিন্তু, আমরা দেখিয়াছি যে, অনেক আদিবাসী পোশাককে শ্লীলতা রক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার না করিয়া, দেহ অলংকরণের কাজে ব্যবহার করে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ডারউইন সাহেব একদল আদিবাসীকে কাপড় দিলে, তাহারা উহা দ্বারা লজ্জা নিবারণ না করিয়া, উহাকে পাগড়ির মতো ব্যবহার করে। কিন্তু সে যাহা হউক, সভ্য সমাজে শ্লীলতা রক্ষা করা নিশ্চয়ই পরিচ্ছদ পরিধান করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও পোশাকের প্রয়োজন রহিয়াছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন

ইউরোপীয় পোশাকে ভারতীয়

পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া, শরীরের উত্তাপের যথাযথ সংরক্ষণ ও মোচন সম্ভব নয়। শারীরিক শ্রম এবং দেহযন্ত্রের স্বতঃস্ফুরিত ক্রিয়াকলাপের ফলে, শ্বেতসার ও স্নেহ-পদার্থের সাহায্যে সব সময়ই দেহাভ্যন্তরে তাপের সৃষ্টি হইতেছে। অপর দিকে একই কারণে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, ঘর্মবিন্দুতে এবং মলমূত্রে দৈহিক তাপ বাহির হইয়া যাইতেছে। ঋতু, আবহাওয়া এবং শ্রমের তারতম্য অনুসারে মানুষের দেহের তাপরক্ষণ বা মোচন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আবহাওয়ার প্রভাবে শীতকালে আমরা কৃত্রিম উপায়ে দেহের তাপ সংরক্ষণের চেষ্টা করিতে বাধ্য হই এবং গ্রীষ্মকালে একই কারণে তাপমোচনের চেষ্টা করি। পোশাক-পরিচ্ছদ দেহের তাপ রক্ষা করা বা মোচন করার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু তথাপি উহা দেহকে উভয়বিধ কর্ম-সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। দেহের চামড়া এবং পরিচ্ছদের মধ্যে একটি বায়ুস্তর থাকে। দেহ হইতে বহির্গত উত্তাপ ঐ মধ্যবর্তী বায়ুস্তরকে উত্তপ্ত করে। পরিচ্ছদ ঐ বায়ুস্তরটিকে দেহের সঙ্গে আটকাইয়া রাখে বলিয়া পরিচ্ছদ পরিধানে দেহ উত্তপ্ত হয়। তোমরা হয়তো জান না যে, শীতকালে রাত্রিবেলা, একখানা ভারী ও পুরু গাত্রাবরণের স্থলে যদি পরপর দুই তিনখানা হালকা গাত্রাবরণ ব্যবহার করা যায়, তবে শীত অপেক্ষাকৃত কম লাগে। ইহার কারণ, উত্তপ্ত বায়ুস্তরের সংখ্যা, গাত্রাবরণের সংখ্যা

অনুযায়ী। তোমরা যখন, একটির উপর আর একটি পোশাক পরিধান কর, তখন একথা স্মরণ রাখিও। শুধু উত্তাপ-সংরক্ষণের জন্য নহে উত্তাপ-মোচনের জন্যও পরিচ্ছদের প্রয়োজন। এমন সব কাপড় আছে (যেমন সুতার কাপড, লিনেন ইত্যাদি) যাহা উত্তাপের সঞ্চালক। এই সব কাপড় উত্তাপমোচনে সাহায্য করে বলিয়া, গ্রীষ্মকালে পরিলে আরাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, পশমের পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের দৈহিক উত্তাপের ক্ষয়ও প্রতিরোধ করে। পশমের মধ্যে একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ আছে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই ইহা জল শোষণ করে। তাই শীতের দিনে পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিলে দেহ হইতে বহির্গত ঘাম উহা শোষণ করিয়া নেয়। দ্রুত দেহের তাপ ক্ষয় হইতে পারে না। অতএব, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, দৈহিক তাপের সৃষ্টি ও তাপমোচন এই দুয়ের মধ্যে সমতা সাধন করিয়া দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করা। বাহিরের ময়লা হইতে আমাদের দেহকে রক্ষা করিয়াও পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করে। তাই বিভিন্ন কর্মের জন্য উপযোগী পরিচ্ছদ আজকাল পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবহৃত হইতেছে। দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাও পোশাক-পরিচ্ছদের অন্যতম কাজ। মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যপ্রিয়।

সৌন্দর্যের উপলব্ধি ও প্রকাশের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাই সভ্যতার বিকাশের সংগে সংগে মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতিও বৃদ্ধি পায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের মন্দ দিক

বর্তমানে পোশাক-পরিচ্ছদের সাহায্যে দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে আমাদের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছে। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে বাড়াবাড়ি করিলে, তাহার একটা মন্দ ফলও আছে। সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের নিমিত্ত, পোশাক-পরিচ্ছদে অতিরিক্ত ব্যয় করার ফলে, অনেককে দৈনন্দিন খাদ্যে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইতেছে। ফলে, স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় হয়তো এমন পরিচ্ছদ পরা হইল যাহা দেহের তাপ সংরক্ষণ ও মোচনে সমতা বিধান না করিয়া উহা ঐ কার্যে কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করিল। অতিরিক্ত কৃত্রিম অংগরাগ ইত্যাদি ব্যবহারের ফলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। পোশাক-পরিচ্ছদ

কর্মোপযোগী না হইলে অনেক সময় উহা কর্মে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

আমাদের বাংগালীদের পোশাক-পরিচ্ছদে সংস্কারের প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রথমত, আমাদের পোশাক এত ঢিলা-ঢালা যে উহা কর্ম উপযোগী নহে। উহার কিছুটা রদবদল করিয়া এবং উহার পরিধান-ভংগীর পরিবর্তন করিয়া উহাকে অধিকতর কর্মোপযোগী করিয়া নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে, কৃত্রিম প্রসাধনদ্রব্যের ব্যবহার আমাদের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থসামর্থ্য কম বলিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে এবং অতিরিক্ত কৃত্রিমতার ফলে দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রকাশও ব্যাহত হইতেছে। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে, মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদে আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী শ্লীলতার অভাব দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণের ফলেই আমাদের মধ্যে এই বিভ্রম দেখা দিয়াছে। পোশাক নির্বাচনের সময় মনে রাখিতে হইবে যে তাহা যত সরল হয় ততই ভালো। পোশাকের ব্যাপারে অনর্থক অধিক ব্যয় করাও উচিত নয়। পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্যের কথা সব সময় স্মরণ রাখিয়া পোশাক নির্বাচন করিতে হয়।

বাংগালীর পোশাক-পরিচ্ছদে সংস্কার

দেশ-বিদেশের পোশাক-পরিচ্ছদ

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারের সংগে সংগে পাশ্চাত্য পোশাক যদিও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তবু মেরু অঞ্চলে, আফ্রিকার অনগ্রসর অঞ্চলে বা আরবের মরু অঞ্চলে এখনও তাহাদের আদিম পোশাক-পরিচ্ছদ বহুল পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। বস্তুত, এই সব পোশাক সম্বন্ধে খোঁজ করিলে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব আমাদের বস্ত্রাভ্যাসকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে।

মেরু অঞ্চলে যে এস্কিমোরা বাস করে তাহাদের কাছে পোশাক তৈরীর জন্য কোনো কার্পাসজাত তুলা বা মেষজাত পশম লভ্য নহে। কারণ ঐরূপ শীতে তুলার চাষ বা মেষপালন কোনোটাই সম্ভব নহে। আর পাওয়া গেলেও সেই তুলা বা পশমজাত বস্ত্রে সেখানকার শীতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। ইহারা প্রধানত

মেরুদেশে

শিকারী। তাই যে পশুর মাংস তাহাদের খাদ্য, সেই পশুর চামড়াকেই তাহারা শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য পোশাক তৈরীর কাজে লাগায়। গ্রীষ্মকালে ইহারা বল্‌গা হরিণের চামড়া দিয়া তৈরী আঁটসাঁট বস্ত্র পরিধান করে; চামড়ার লোমশ দিকটি গায়ের সহিত মিশিয়া থাকে। আমাদের ঐরূপ পোশাক পরিতে হইলে আমরা হয়তো গরমে দম বন্ধ হইয়াই মারা যাইতাম। শীতকালে ঐ পোশাকের উপরেই তাহারা বল্গা হরিণের চামড়ারই তৈরী আর এক প্রস্থ কোট পরে, কিন্তু ইহার লোমশ দিকটি থাকে বাহিরের দিকে। এই বাহিরের কোটটির সহিত একটি মস্তকাবরণও লাগানো থাকে, যাহা টানিয়া দিলে কান ও মাথা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়া যায়। তাহারা সীল মাছের চামড়া দিয়া তৈরী লম্বা লম্বা জুতা পরিয়া থাকে কারণ উহা জলে ভেজে না বা নষ্ট হয় না। জুতার ভিতরে তাহারা পায়ে হরিণের চামড়ার মোজা পরিয়া থাকে। তাছাড়া, তাহারা চামড়ার তৈরী এক বিশেষ ধরনের দস্তানাও পরিয়া থাকে, যাহাতে গোটা হাতটাই ঢাকা পড়ে। প্রতিটি আংগুলের জন্য আলাদা আবরণ থাকে না।

এস্কিমো

ইহাদের পোশাকের ঠিক বিপরীত জাতীয় পোশাক আফ্রিকার কংগো উপত্যকার পিগমীদের। ইহারাও এস্কিমোদের মতই শিকারী জাতি। সুতরাং এস্কিমোদের মত ইহারাও ইচ্ছা করিলে পশুর চামড়ার পোশাক পরিতে পারিত। কিন্তু নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় চামড়ার পোশাক পরা এখানে অসম্ভব। তাই তাহাদের পুরুষেরা কোমরে গাছের বাকল জড়াইয়া এবং মেয়েরা পাতার তৈরী পোশাক পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতিদের সংস্পর্শে আসার পর অবশ্য তাহারা সুতী কাপড়ের ব্যবহার শিখিয়াছে। কিন্তু তাও তাহারা সাধারণত সেলাই করিয়া পোশাক তৈরী করিয়া পরিধান করে না। কোমরের চারিধারে বা বস্ত্রখণ্ড বড় হইলে কাঁধের চারিধারে জড়াইয়া তাহারা তাহাদের পরিচ্ছদ

আফ্রিকায় পিগমী

পরিয়া থাকে। মধ্য আফ্রিকার অন্যান্য অনগ্রসর জাতিরাও সাধারণভাবে বলিতে গেলে অনুরূপভাবেই পোশাক পরিয়া থাকে। আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পুরুষদের কোমরে জড়াইয়া ধুতি পরিবার রীতির সহিত ইহাদের রীতির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

আরবের মরু অঞ্চলেও গরম অত্যধিক। কিন্তু সেখানে আফ্রিকাবাসীদের মতো স্বল্প পরিচ্ছদ পরিয়া আত্মরক্ষা করা চলিবে না। কারণ, শুধু গরমই নহে; তাহার সংগে সংগে প্রচণ্ড ধূলির ঝড় হইতেও আত্মরক্ষার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন। তাছাড়া রাত্রিকালে ঐ অঞ্চলে শীতের আধিক্যও যথেষ্ট। তাই মরুবাসীরা—কি স্ত্রী কি পুরুষ—লিনেনের তৈরী ঢোলা পাজামা এবং লম্বা সার্ট পরিয়া থাকে। ইহার উপর তাহারা পঁরে বড়ো হাতাযুক্ত লম্বা আলখাল্লা। শীতের সময় ঐ হাতার মধ্যে হাত ঢুকাইয়াই দস্তানার কাজ চলিয়া যায়। ঢোলা আলখাল্লা যে শুধু শীতাতপ হইতে তাহাদের রক্ষা করে তাহাই নহে; উন্মুক্ত প্রান্তরে যখন কোনো মরুবাসী কোনো আস্তানার দিকে অগ্রসর হয়, তখন ঐ আলখাল্লা বাতাসে সঞ্চালিত করিয়াই সে জানাইয়া দেয় যে তাহার কোনো খারাপ অভিসন্ধি নাই, তাই তাহার সম্বন্ধে ভীত হইবারও কোনো কারণ নাই। আরবের মেয়েরা মুখ বোরখায় ঢাকিয়া পথ চলে, কিন্তু মরুবাসী বেদুইন মেয়েরা অপরিচিতদের সামনে শুধু তাহাদের গাত্রাবরণ দিয়া মুখের নিম্নাংশ ঢাকিয়া দেয়। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মাথায় একখণ্ড বড়ো কাপড় ভাঁজ করিয়া মস্তকাবরণের কাজ চালায়। উটের লেজের চুল দিয়া তৈরী সুন্দর বেষ্টনী ঐ মস্তকাবরণটিকে মাথার সহিত বাঁধিয়া রাখে। ফলে, উহা বাতাসে উড়িয়া যায় না, বা উহার একাংশ যখন সামনের দিকে টানিয়া প্রখর রৌদ্রের হাত হইতে চোখের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন উহা স্থানচ্যুত হয় না। ইহাদেরও ঢোলা পোশাকের সহিত আমাদের দেশের রাজস্থান ও পাঞ্জাব অঞ্চলের ঢিলা পোশাক তুলনীয়।

মরু অঞ্চলে

আরবীয়

আগেই বলা হইয়াছে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সংগে সংগে পাশ্চাত্য পোশাক পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু য়ুরোপের সর্বত্রও পোশাক একই রূপ নহে। বর্তমানকালে শীতপ্রধান অঞ্চলে লিনেন বা পশমের তৈরী ট্রাউজার, জ্যাকেট ও কোট, সুতীবস্ত্রের সার্ট এবং ফেল্টের টুপিই পুরুষদের প্রধান পরিধেয়। কিন্তু ঐ অঞ্চলেও বিভিন্ন দেশে মেয়েদের পোশাকের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আয়র্ল্যাণ্ডের মেয়েরা প্রধানত নীল চাদর, লাল ‘বডিস’ ও পেটিকোট পরিয়া থাকে এবং মাথায় মস্তকাবরণরূপে একটি রুমাল বাঁধিয়া নেয়। রুমেনিয়া, এস্‌থোনিয়া প্রভৃতি দেশের মেয়েরা কিন্তু মেষের

য়ুরোপে

বৃটিশ সুইস্

স্প্যানিয়ার্ড ফরাসী

চামড়ার পোশাক ও ফেল্টের তৈরী মোটা জুতা পরে। আবার চেকো-শ্লোভাকিয়ার মেয়েদের কাছে লাল টুপি ও চাদর, শাদা লম্বা হাতার জামা এবং নীল পেটিকোটই বেশী প্রিয়। তাহারা রেশম বা সাটিন সাধারণত পরে না, কিন্তু সোনালী সুতা দিয়া তাহাদের পোশাকে অতি সূক্ষ্ম যে কাজ

করিয়া নেয় তাহা অবাক হইয়া দেখিবার মতো। হাংগেরীর মেয়েরা সাধারণত লাল মোজা, ধূসর রংয়ের "এপ্রন" এবং পুরা পেটিকোট পরিয়া থাকে। সময় সময় তাহারা দশবারোটি পেটিকোটও এক সংগে পরিয়া থাকে। য়ুরোপের দক্ষিণাঞ্চলে ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুর দেশগুলিতেও পোশাকের বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়। পর্তুগালের কি পুরুষ কি নারী উভয়েরই পোশাকে রং-এর বাহার লক্ষণীয়। মেয়েরা তাহাদের পোশাকে স্কার্ট, এপ্রন, বডিস এবং মাথার রুমাল সর্বত্রই বিচিত্র রংয়ের সুতা দিয়া কাজ করিয়া নেয়। কিন্তু তাহাদের পোশাক উত্তরাঞ্চলের মতো আঁটসাঁট নয়; কিঞ্চিৎ ঢিলা। ফ্রান্স ও স্পেনের মেয়েদের পোশাকের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য জিনিস তাহাদের মস্তকাবরণরূপে ব্যবহৃত তাহাদেরই হাতে বোনা লেসের অবগুণ্ঠন এবং গায়ে দিবার জন্য হাতে বোনা ও প্রচুর কারুকার্যসমৃদ্ধ শাল (manton)। এছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের মতো স্পেনের মেয়েরাও চুলে ফুলের অলংকার ব্যবহার করিয়া থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের সর্বত্রই রংয়ের ও নক্সার আধিক্য। কি পুরুষ কি মেয়ে, সকলের পোশাকে ইহাই বৈশিষ্ট্য।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. State why men first started wearing clothes.

2. Describe the different materials we use for the production of clothes.

3. Narrate the discoveries which revolutionised cloth production in modern times.

4. Discuss, with examples, how physical environmental factors influence human dress.

5. Discuss, with examples, how human dress is influenced by social and cultural factors.

6. Discuss, with examples, how aesthetic considerations influence human dress habits.

7. Discuss the purposes for which clothings are used including the lines on which we should undertake the reform of our dress.

B. Answer, in not more than 60 words, the following :—

1. Describe Indian national dress.

2. Describe Bengalee national dress.

3. State what you mean by "Felt".

4. Describe how thread was spun and woven before machines for the purpose were discovered.

5. Describe the dress of the people of the Polar region.

6. Describe the dress of the people of the Arabian desert region.

7. Describe the dress of the people of Africa.

C. 1. Below are given certain words or phrases to indicate the dress of the people of different parts of India and those of Europe.

Write in the blank space provided at the right side of every word or phrase the name of the part of India or of Europe to indicate whose people wear it.

Put a cross in the blank space of the dress which does not belong to any part of India or to regions mentioned above. Write within bracket in each case M or F to indicate whether the dress belongs to the Males or Females respectively.

Handkerchief as head-dress......Apron......"Pyjama"...... Wearing "Sari" over the right shoulder....... Manton...... Wearing "Sari" over the left shoulder......Trousers......Wearing "dhuti" like "lungi" ......"Mekhala"......Ghagra......Skirt...... Sherwani ...... Dupatta ......

2. These sentences have been split up. Put their halves together and write them down.

(i) Felting means	(i) cloth on a loom
(ii) Spinning is the process for	(ii) dampening the wool, pressing it and then letting it to form a dense flat mass
(iii) Dyeing means	(iii) twisting and pulling the fibres
(iv) Threads are woven into	(iv) colouring the yarn

3. Rewrite the following and put in the missing words :—

Customs vary from country to country. In most countries men wear different clothes to women. But — men and women dress alike. Women in U. S. A. wear —, while those in the Middle East wear —, and those in India mostly wear —. Arab women draw the veil, but amongst — of North Africa men veil their faces. We can tell from — where a person is from.

4. In India head-dresses vary according to locality and religion. The Muslims wear a turban or a ——, the Sikhs wear a —— and the Parsees wear embroidered caps roughly —— shaped.

D. For your scrap-book :—

1. Draw a table like this in your scrap-book and fill in the columns :—

People	Clothes	Made of	Why
(i) Bengalees			
(ii) Madrasis			
(iii) Punjabis			
(iv) Bedouins			
(v) Eskimos			
(vi) Pigmies			
(vii) Spaniards			
(viii) Britishers			

2. Try to find as many pictures as you can showing the dresses of different countries and paste them in your scrap-book.

E. You may undertake the following Projects :—

(a) A big map of Northern India with pictures placed at appropriate places to indicate the male and female dress in different parts.

(b) The same kind of map for Southern India.

N. B. 4 or 5 pupils may work for one map. There is no harm, if more than one group do the same map separately.

(c) Letter-writing to different parts of India to know of their dress and how they like them.

(d) Seeking the opinion of prominent people about the best dress for the Bengalees (males and females).

(e) A wall-newspaper with pictures and photographs about dress in different parts of India.

আমাদের ঘরবাড়ী

আদিম কাল হইতেই মানুষ যেমন বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনেই খাদ্য-বস্ত্রের চাহিদা অনুভব করিয়াছে, তেমনই একই জৈবিক তাগিদে আশ্রয়ও খুঁজিয়া মরিয়াছে। আশ্রয়—তাহা প্রাকৃতিক গুহাই হউক বা স্ব-কৃত ঘরবাড়ীই হউক—মানুষের অন্যতম প্রয়োজন। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই তাহাকে যুগ যুগ ধরিয়া আশ্রয় খুঁজিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আবার মানুষের সৌন্দর্যবোধ তাহার ঘরবাড়ীকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিতে শিখাইয়াছে।

ঘরবাড়ী মানুষের চাহিদার অন্যতম

•• তোমরা জান, আমাদের আদিমতম পূর্বপুরুষরা ছিল শিকারী। খাদ্যের খোঁজে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় তাহারা সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। তাই স্থায়ী বাসগৃহের প্রয়োজন তাহারা কোনোদিনই অনুভব করে নাই। কিন্তু সেই সুদূর অতীতেও শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা যেমন গাছের বাকল, পশুর চামড়া প্রভৃতি দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিবার কায়দা আবিষ্কার করিয়াছিল, তেমনই অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো পাহাড়-পর্বতের স্বাভাবিক গুহার মধ্যেও আশ্রয় লইতে শিখিয়াছিল। জন্তু-জানোয়ারের হাত হইতে আত্মরক্ষার তাগিদেও তাহাদের এই আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহাদের চলার পথে সর্বত্রই গুহার খোঁজ মিলিত না। তাই, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মানুষ গাছের ডালপালা দিয়া একটি কোণাকৃতি কাঠামো তৈরী করিয়া লইত। তারপর চামড়া বা ঘাস বা পাতা দিয়া উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া আশ্রয় তৈরী করিতে শিখিয়াছিল।

ঘরবাড়ীর ইতিকথা

মৌচাকের মতো বাড়ী

তারপর যাযাবর শিকারী মানুষ কৃষিজীবীতে পরিণত হইল। চাষের প্রয়োজনেই এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বাস করা তাহাদের পক্ষে অনিবার্য হইয়া পড়িল। কৃষিকার্যের ফলে তাহাদের জীবনধারণ করার উপযোগী খাদ্যের যোগান হইত বলিয়া এক জায়গায় স্থায়ী বসতি করায় তাহাদের পক্ষে কোনো অসুবিধা হইল না। এই স্থায়ী বসতির তাগিদেই মানুষ প্রথম

স্থায়ী আশ্রয় তৈরী করিতেও শিখিল। খুব সম্ভবত এই সময়ই মনুষ্য সমাজে পরিবার-প্রথারও উদ্ভব হইয়াছিল। একই পরিবারভুক্ত লোকজনদের একসংগে বসবাস করার জন্যও হয়তো স্থায়ী আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। এই সব আশ্রয় ছিল মোটামুটি গোলাকৃতি। সমাজ-বিজ্ঞানীরা

মৌচাকের মতো বাড়ী চামড়ার ঘর

মনে করেন যে আদিমতম কৃষিজীবী মানুষ নিম্নলিখিত ভাবে তাহার গৃহ নির্মাণ করিত। প্রথম তাহারা গোল করিয়া মাটি খুঁড়িয়া গর্ত করিয়া লইত। তারপর এই কাটা মাটি গর্তের চারিদিকে উঁচু করিয়া দিত। সর্বশেষে ঐ উঁচু মাটির উপর কাঠ বা গাছের ডালপালা দিয়া তাহা চামড়া বা ঘাসপাতা দিয়া ঢাকিয়া গৃহ প্রস্তুত করিত। আজিও এই জাতীয় গোলাকৃতি গৃহের সন্ধান আদিম জাতিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। একই সময় পাথরের বড়ো বড়ো টুকরার সাহায্যেও ঐজাতীয় গোলাকৃতি ঘর তৈরীর কায়দা মানুষ আয়ত্ত করিয়াছিল। ঐসব গৃহে চারিদিক হইতে দেয়াল ক্রমশ উপরের দিকে ভিতরে চাপা হইতে হইতে একেবারে উপরে একত্র হইয়া যাইত। ইহাকেই বলা হয় মৌচাকের মতো বাড়ী ("bee-hive hut")।

চৌকোণা ঘরের উদ্ভব

কিন্তু এইজাতীয় গৃহের সবচাইতে অসুবিধা ছিল, উহাদের খুব বেশী উঁচু করা চলিত না। ফলে, উহার ভিতর সোজা হইয়া চলাচলের সুযোগ ছিল না। মানুষ একটু স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করার পরই এই অসুবিধা দূর করার কাজে ব্রতী হইল।

আর তাহার সেই চেষ্টার ফলেই চৌকোণা ঘরের উদ্ভব হইল। প্রধানত মাটি বা পাথর বা কাঠের মোটা মোটা গুঁড়ির সাহায্যে এইজাতীয় ঘরের চারিদিকের দেয়াল তৈরী হইত। তারপর উপরে কাঠের বর্গা ফেলিয়া আগের মতোই ঘাস-পাতা-খড় প্রভৃতির সাহায্যে ছাদ তৈরী হইত। পরে ঐসব ঘাস-পাতার উপরে মাটি দিয়া ছাদ প্রস্তুত করার প্রথাও প্রচলিত হয়। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষ দিকে এবং ধাতু-প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকে প্রাচীন মিশর, সিন্ধু উপত্যকা ও মেসোপোটেমিয়ায় যেসব সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে উচ্চস্তরের গৃহ নির্মাণের কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত, মানবসভ্যতার এই সব আদিম কেন্দ্রে যেসব উন্নত ধরনের ঘরবাড়ীর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলিকে অনায়াসেই বর্তমান যুগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।
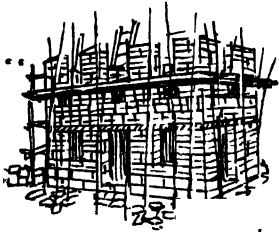
ইট দিয়া ঘরবাড়ী নির্মাণ

প্রাচীন কালের ইটের বাড়ী

এই সময়ই অবশ্য মানুষ শুধু মাটি উঁচু করিয়া বা পাথর জড় করিয়া দেয়াল তৈরীর বদলে মাটি দিয়া ইচ্ছামতো আকৃতির ইট তৈরী করিয়া তাহার দ্বারা
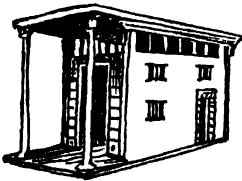
প্রাচীন মিশরের বাড়ী
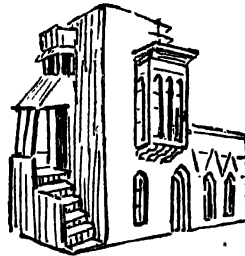
মেসোপোটেমিয়ার বাড়ী

দেয়াল তৈরী করিতেও শিখিয়া ফেলিয়াছিল। গৃহ নির্মাণে এই ইটের ব্যবহারই মানুষকে সুযোগ করিয়া দিয়াছিল ইচ্ছামতো গৃহ তৈরীর। তারপর, যুগ যুগ ধরিয়া দেশে দেশে মানুষ গৃহ নির্মাণ লইয়া কতো না পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চালাইয়াছে, একঘরবিশিষ্ট গৃহের বদলে উদ্ভব হইয়াছে বহুঘরযুক্ত গৃহের। একতলা বাড়ীর জায়গায় দেখা দিয়াছে বহুতলবিশিষ্ট বাড়ী।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই সামাজিক রীতি, নীতি, প্রয়োজন ইত্যাদি মানুষের গৃহনির্মাণ প্রথাকে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিতেছে। মানুষ যখন গুহায় বাস করিত তখনও দুই ধরনের গুহা বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। যাহারা ছোটো পরিবার লইয়া বাস করিত তাহারা ছোটো গুহায় থাকিত এবং যাহারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করিত তাহাদিগকে বড়ো গুহা খুঁজিয়া লইতে হইত। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষ জীবিকার্জনের জন্য নানাধরনের কর্মে লিপ্ত হইতে লাগিল। ফলে, তাহার বাসগৃহ কর্মক্ষেত্রেও পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কামারের কামারশালা, তাঁতীর তাঁতঘর, বাসগৃহের অংশ হিসাবেই গণ্য হইতে লাগিল। প্রাচীন সমাজে বহু বিবাহ প্রচলনের ফলে বাসগৃহ নির্মাণপ্রথার আরও কিছুটা পরিবর্তন হইল। অবস্থাশালী লোকেরা বহু বিবাহ করিতেন এবং প্রত্যেক পত্নী এবং তাহার সন্তানদের জন্য পৃথক পৃথক ছোটো ছোটো গৃহ নির্মাণ করিতেন। ফলে, অবস্থাপন্ন লোকেদের বাড়ী বিরাট আকার ধারণ করিল। গোলাবাড়ী বা কর্মশালা, পশুশালা, বিভিন্ন পত্নীর পৃথক পৃথক আবাস, নানাধরনের কর্মচারীদের বাসগৃহ ইত্যাদি লইয়া এক একটি গৃহ যেন এক একটি ছোটো গ্রামের রূপ লইল। দরিদ্রদের কিন্তু এক গৃহেই নিজেদের সব প্রয়োজন মিটাইতে হইত। এই গৃহেরই অংশবিশেষ হয়তো ধানের গোলা বা পশুর আশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনকালের মানুষের ঘরের সৌন্দর্যবোধও এক বিশেষ ধরনের ছিল। তাহাদের নির্মিত গৃহগুলি বৃত্ত, ত্রিভুজ ইত্যাদি কোনো না কোনো জ্যামিতিকরূপ গ্রহণ করিত।

প্রাচীনকালের ঘরবাড়ী প্রস্তুতের রীতিতে সামাজিক প্রভাব

আমাদের দেশের আদিবাসীদের কাহারও কাহারও গৃহনির্ম্মাণ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, প্রাচীনকালের গৃহনির্মাণ প্রথা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আন্দামানীদের গৃহনির্মাণ প্রথার সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আন্দামানীদের বাস। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া একই ধরনের জীবন যাপন করিতেছে। আন্দামানীদের মধ্যে এখনও কিছুটা

আন্দামানীদের গৃহ

যাযাবর ভাব রহিয়াছে। জীবশিকারের জন্য তাহারা অস্থায়ী বাসস্থান গড়িয়া তোলে। ঐসব বাসস্থানে তাঁবুই তাহাদের আশ্রয় দিয়া থাকে। ঋতু অনুযায়ী যখন যেখানে সুবিধা সেখানেই আন্দামানীরা তাঁবু ফেলিয়া শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। স্থায়ী বসতিকেন্দ্রে আন্দামানীরা গোষ্ঠী হিসাবে বিভক্ত হইয়া বসবাস করিয়া থাকে। এক একটি গোষ্ঠীর কয়েকটি পরিবার মিলিয়া এক একটি গ্রাম গড়িয়া তোলে। গ্রামের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে তাহারা সর্বপ্রথম দেখে পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে কি না। কাঠ এবং গাছের পাতাই তাহাদের গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ। মধ্যে একখণ্ড জমি ছাড়িয়া দিয়া তাহার চারিদিকে বৃত্তাকারে বা উপবৃত্তাকারে প্রত্যেক পরিবারের জন্য তাহারা আলাদা আলাদা গৃহনির্মাণ করে। মধ্যের জমি নৃত্য-ভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক গৃহের মুখ নৃত্যভূমির দিকে থাকে। দুইটি গৃহ বড়ো করিয়া নির্মিত হয়। তাহাদের একটিতে গোষ্ঠীর কুমারেরা বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান পুরুষদের সংগে একত্র বাস করে। অপরটিতে একই ভাবে গোষ্ঠীর কুমারীরা বিধবা এবং নিঃসন্তান স্ত্রীলোকদের সঙ্গে একত্র বাস করে। পত্নীসহ সন্তানবান পুরুষেরাই পরিবার গৃহগুলিতে বাস করে।

গৃহনির্মাণে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব

প্রাকৃতিক প্রভাব

কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এই বাসগৃহ বিভিন্ন আকৃতির রূপ লইয়াছে। আর মানুষের খাদ্যবস্ত্রের মতো এই বিভিন্ন আকৃতিও প্রভাবান্বিত হইয়াছে সমসাময়িক সামাজিক ধ্যানধারণার দ্বারা, ঐ স্থানের প্রাকৃতিক

ঢালু ছাদ সমতল ছাদ অল্প ঢালু ছাদ
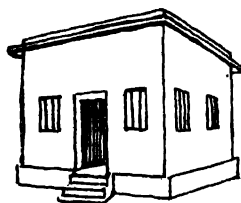
বৈচিত্র্য দ্বারা, বা ঐ স্থানের সহজলভ্য উপাদানের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে বাসগৃহের ছাদের কথা। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্যই দেশে দেশে ছাদ তৈরীর কলাকৌশলে পার্থক্য দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান বৃষ্টিহীন দেশে সমতল ছাদের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত হইলেও, যেসব দেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর সেইসব জায়গায় এইজাতীয় সমতল ছাদ প্রায় অচল। কারণ, সেইসব জায়গায় ছাদ এইরকম হওয়াই প্রয়োজন যাহাতে ছাদে জল না জমিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে পারে। তাই নিরক্ষীয় বা মৌসুমী প্রভৃতি অঞ্চলের অন্তর্গত দেশগুলিতে দেখা যায় ঢালু ছাদের ব্যবহার। আবার, বিভিন্ন জলবায়ুতে ছাদের বিভিন্ন ঢালের প্রয়োজন। উষ্ণতর আবহাওয়ায় বৃষ্টি যেখানে স্বল্প, সেখানে ছাদ খুব ঢালু না হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু শীতলতর দেশে বৃষ্টি যেখানে অত্যন্ত বেশী সেখানে ছাদ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত খাড়া হওয়া প্রয়োজন। আবার, শীতপ্রধান দেশে যেখানে শুধু বৃষ্টিই নহে বরফও প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া থাকে, সেখানে ছাদকে স্বল্প ঢালু করা হইয়া থাকে। কারণ, মানুষ দেখিয়াছে ঐরূপ ছাদে জমাট বরফে গৃহ যেমন উষ্ণতর হয়, তেমনি ছাদ স্বল্প ঢালু থাকায় বরফ-গলা জল সরিয়া যাইতেও অসুবিধা হয় না।

কিন্তু শুধু ছাদই নহে। গৃহনির্মাণের সমস্ত কলাকৌশলই প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। উষ্ণতর দেশে ঘরবাড়ীকে যতটা খোলামেলা রাখা দরকার, শীতপ্রধান দেশে ততটা নহে। সেখানে বরং বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত হইতে গৃহাভ্যন্তরকে রক্ষা করাই বেশী প্রয়োজন। অথচ সেরূপ করিতে গিয়া চারিদিকে দেয়াল তুলিয়া দিলে গৃহাভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় আলোর চাহিদা মেটে না। এইজন্যই দেখা যায়, ঐসব দেশে জানালায় কাঁচের প্রচলন এত বেশী।

আবার পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বাড়ী তৈরীর কাজে ইটের ব্যবহার চালু থাকিলেও যেখানে জংগল বেশী, সেখানকার মানুষ স্বভাবতই কাঠের বাড়ীতে আজিও বাস করিয়া থাকে।
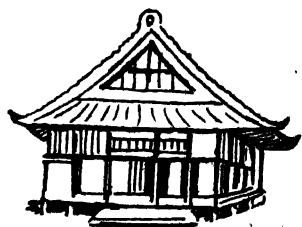
জাপানের কাঠের বাড়ী

কারণ, ইট অপেক্ষা কাঠই সেখানে সুলভ। জাপান প্রভৃতি ভূকম্প-প্রধান দেশগুলিতেও মানুষ প্রধানত কাঠের তৈরী বাড়ীতেই বেশী বাস করিয়া থাকে। সেখানে কাঠের বাড়ীতে বাস করার কারণ ভূমিকম্পে ঐজাতীয় বাড়ীর বেশী ক্ষতি করিতে পারে না বা করিলেও তাহার পুনর্গঠনের বিশেষ অসুবিধা হয় না।
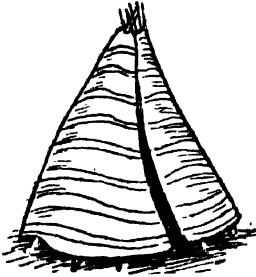
মরু অঞ্চলের তাঁবু

আবার মরু অঞ্চলে যেখানে বালির ঝড় ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটাইতেছে সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থায়ী বসবাস সম্ভবপর নহে। ফলে, সেখানে গৃহ হিসাবে তাঁবুর প্রচলনই বেশী।

প্রাকৃতিক প্রভাবের ন্যায় গৃহনির্মাণে সামাজিক প্রভাবও অনস্বীকার্য। আর এই প্রভাব নানাভাবে কাজ করিয়া চলে। উত্তরকালের গৃহনির্মাণ-রীতির উপর পুরাকালের গৃহনির্মাণরীতি সব সময়ই তাহার স্বাক্ষর রাখে। তবে কোনো কোনো সময় এই প্রভাব যতটা সুস্পষ্ট চোখে পড়ে, অন্য ক্ষেত্রে হয়তো ততটা প্রকট হয় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন বাংলায় বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নক্সার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচাড়ির বেড়ায় ঘেরা খড়ের ধনুকাকৃতি চাল দিয়া ছাওয়া ঘর তৈরী হইত। মধ্য-

সামাজিক প্রভাব

বাংলার কুটির

বাংলো-বাড়ী

যুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যে তাহার অনুকরণের প্রয়াস সুস্পষ্ট। ইংরেজদের এদেশে আসার পর অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে একই রীতি বাংলো-বাড়ী

নামে ইংগ-ভারতীয় সমাজেও সমাদৃত হইয়াছে। পার্থক্য যাহা হইয়াছে তাহা শুধু উপাদানের, সমৃদ্ধি ও অলংকরণের। আবার, সমাজে লোকসংখ্যা, তাহাদের অর্থনৈতিক পটভূমি, নগর ও গ্রামীণ সমাজের পার্থক্য প্রভৃতিও গৃহনির্মাণশৈলীকে প্রভাবান্বিত করে। সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে তাহাদের আশ্রয়ের প্রয়োজনেই ঘরবাড়ীর চাহিদাও বাড়ে। গ্রামাঞ্চলে নূতন গৃহ তৈরীর জন্য জায়গা হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু শহরাঞ্চলে সেইরূপ স্থান মেলে না। অথচ জীবিকার্জনের সুবিধা প্রভৃতি কারণে গ্রাম অপেক্ষা শহরাঞ্চলেই লোকের ভীড় হয় বেশী। ফলে, ঐ স্বল্প জায়গাতেই বেশী লোকের স্থান সংকুলান কি করিয়া করা সম্ভব, স্থপতিকে তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। বস্তুত, তাহাদের এই প্রয়াস হইতেই আধুনিক স্থাপত্যকলার গগনচুম্বী গৃহনির্মাণের কলাকৌশলের উদ্ভব। আগেই বলা হইয়াছে, গৃহনির্মাণের উপাদান বহুলাংশে স্থিরীকৃত হয় উহাদের সহজলভ্যতা দ্বারা। কিন্তু এই সহজলভ্যতা শুধুই প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও ইহার নিয়ন্ত্রক। তাই দেখা যায়, শহরাঞ্চলেও গগনচুম্বী কংক্রীট বা ইটের বাড়ীর অদূরেই মাটির বা বাঁশের চাঁচাড়ির বেড়ায় ঘেরা টিন বা টালির ছাদে ছাওয়া ছোটো ছোটো ঘরের সারি অপ্রচুর নহে। মানুষের সহজাত সৌন্দর্যবোধও তাহার গৃহনির্মাণ প্রথার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাই সর্বদেশে, সর্বকালে, ধনী-দরিদ্র সকলের বাড়ীতেই নানারূপ অলংকরণ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। নিতান্ত যাহা প্রয়োজন তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। গৃহনির্মাণের ভিতর দিয়াও সে নানাভাবে তাহার সৃজনীশক্তি এবং সৌন্দর্যবোধকে সার্থক করিতে চেষ্টা করে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, কাঠের বা কাঁচের দরজা-জানলার উপর এবং দেওয়ালের গায়ে অনেক সময় নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করা বা খোদাই করা থাকে। নিতান্ত কুটিরের দেওয়ালেও ছবি অংকিত দেখা যায়।

সৌন্দর্যবোধ ও গৃহনির্মাণ প্রথা

আবার বাড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য অনেক সময় সংলগ্ন জমিতে উদ্যান ইত্যাদি রচনা করা হয়। দরজা, জানলা এবং গৃহের আকৃতির নানারকম রূপ দিয়াও মানুষ তাহার সৌন্দর্য-প্রীতিকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করে।

উপরিউক্ত গৃহ অলংকরণ রীতির উপরও সামাজিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ইউরোপে এই অলংকরণের প্রথা একরূপ, আমাদের দেশে তাহা অন্যরূপ। এমন কি প্রাচীন ভারতে মুসলমান যুগে এবং বর্তমান ভারতের মধ্যে গৃহ-অলংকরণ পদ্ধতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো প্রাচীন ভারতের আদিবাসীরাও যে কোথাও কোথাও গুহায় বাস করিত তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ঘরবাড়ী

তবে এই উষ্ণ জলীয় বৃষ্টিস্নাত পলিমাটির দেশে সর্বত্র গুহা পাওয়া যাইত না। তাই, সেই আদিম যুগেই মানুষ খড়, কাঠ প্রভৃতি দিয়াও ঘর বাঁধিত—এই অনুমান অসংগত হইবে না। বস্তুত, ভারতবর্ষের গুহাস্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন যে কারুকার্য লোমশ ঋষি গুহার সম্মুখভাগে খচিত আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় ঘরেরই অনুকরণে খোদিত।

আগেই বলা হইয়াছে খৃষ্টজন্মের প্রায় চারহাজার বছর আগে ভারতবাসী তাহাদের ঘরবাড়ী তৈরীর উপাদান হিসাবে ইটের ব্যবহারও শিখিয়াছিল। তবে, তাহার নিদর্শন শুধু সেই যুগের সিন্ধু উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ীর নিদর্শনের সন্ধান আবার বহুদিন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তবে, প্রধানত পাথরের তৈরী মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য, মন্দির বা চৈত্য প্রভৃতির সংলগ্ন বিহার বা শিক্ষাকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষও যে পাওয়া না গিয়াছে তাহা নহে। ইহার কারণ, খুব সম্ভবত ঐ সব মন্দির, বিহার, চৈত্য প্রভৃতি পাথরের তৈরী হইলেও সাধারণ মানুষ কাঠ-বাঁশ-খড় ইত্যাদি দ্বারাই তাহাদের গৃহ নির্মাণ করাইত। ইটের ব্যবহার পুনর্প্রচলিত হয় অনেক পরে, গুপ্ত যুগে। অবশ্য, উচ্চবিত্ত মানুষের পাথরের ব্যবহারের সামর্থ্য যে ছিল না তাহা নহে। তবে সাধারণভাবে যুক্তিটা বোধ হয় ছিল এই যে, আমাদের পঞ্চভূতে গড়া এই নশ্বর দেহের জন্য স্থায়ী গৃহের কি-ই বা প্রয়োজন। সে প্রয়োজন যদি কাহারও থাকে তাহা দেবতাদের। কারণ, তাহাদের বিনাশ নাই। আর তাই, চিরস্থায়ী বাসগৃহের প্রয়োজন তো তাহাদেরই।

মুসলমানদের আগমনের ফলে আমাদের চিন্তাধারায়ও পরিবর্তন দেখা

দিল। জায়গীরদার প্রথার প্রচলনের ফলে যে মুসলমান জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হইল তাহারা এবং তাহাদের দেখাদেখি হিন্দু সমৃদ্ধিশালী রাজা বা জমিদাররাও তাহাদের বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের অংগ হিসাবেই ইটের তৈরী বিরাট বিরাট প্রাসাদ তৈরী করানো শুরু করেন।

মুসলমানদের আমলে ঘরবাড়ী

এই সব গৃহের সব চাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল ইহাদের মেঝে এবং অনেক সময় দেয়ালগুলি হইত নানা-প্রকার রংগিন মার্বেল বা কাঁচ দ্বারা কারুকার্যখচিত। এইরূপ মোজাইক (mosaic) করার রীতি ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে মুসলমানদের একটি বড়ো দান।
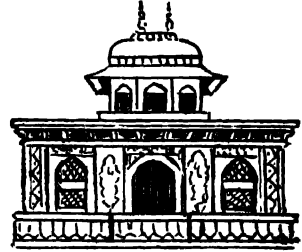
মুসলমান আমলের বাড়ী

ইংরেজদের ভারত আগমন ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে আর একটি অধ্যায়ের সূচনা করিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্রীষ্টোফার রেন (Christopher Wren) এবং ইনিগো জোনস (Inigo Jones) প্রমুখ স্থপতিরা ইংল্যাণ্ডে স্থাপত্যকলায় ক্ল্যাসিক রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের অনুকরণে বড়ো বড়ো স্তম্ভ, হলঘর, খিলান প্রভৃতির ব্যবহারে এই সময় ইংল্যাণ্ডে বিরাট বিরাট গৃহ গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ইহারও পরিবর্তন শুরু হইয়া গিয়াছিল। বড়ো বড়ো হলঘরের পরিবর্তে গৃহে খাওয়া, শোওয়া, পড়া প্রভৃতির জন্য আলাদা আলাদা ঘরের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এই যুগের স্থপতিরা গৃহ-নির্মাণে এইরূপ ব্যবস্থা করা শুরু করেন। বড়ো হলঘরটি শুধুই এইসব ঘরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে এবং দ্বিতলে উঠিবার প্রশস্ত সিঁড়ির পাদপীঠ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইংরেজরা
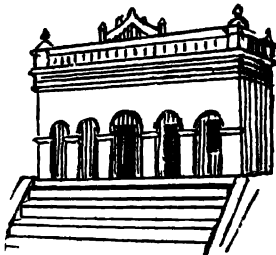
ইংরেজদের আমলে ঘরবাড়ী

ইংরেজ আমলের ঘরবাড়ী

এদেশে আসিয়া এই দুই রীতির গৃহেরই প্রচলন করিলেন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি যেসব শহর ইংরেজদের আগমনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই সব জায়গায় এই দুই রীতিরই গৃহের প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে। এইসব গৃহনির্মাণে ইট এবং পাথর দুইয়েরই ব্যবহার হইত। আমাদের দেশে জানলায় কাঁচের ব্যবহারও এই সময় হইতেই।

কিন্তু, উচ্চবিত্তদের গৃহনির্মাণে মুসলমানদের আগমন হইতেই এই পরিবর্তন শুরু হইলেও সাধারণ ভারতবাসীর গৃহনির্মাণ প্রাচীন পন্থার অনুকরণেই আজ পর্যন্তও চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলের মানুষ আজিও সর্বত্র খড়-বাঁশ-কাঠ-মাটি প্রভৃতি ভংগুর জিনিসের সাহায্যেই প্রধানত তাহাদের আশ্রয় তৈরী করে। অবশ্য বিভিন্ন অংশে তাহাদের আকৃতি হয়তো

বর্তমান ভারতের ঘরবাড়ী—গ্রামাঞ্চল
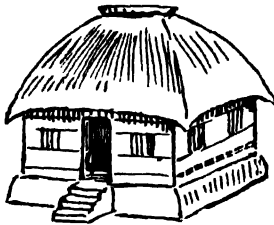
গ্রামাঞ্চলে বাংগালীর বাড়ী

বিভিন্ন রকমের হয়। আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের পশ্চিম বংগের কুড়ে ঘরগুলি তৈরী হয় বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নক্সার ভিত্তিতে, মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচাড়ির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া। সাধারণত একচালা বা দোচালা হইলেও চৌচালা বা আটচালা ঘরও দেখা যায়। ইহাদের চালগুলি বিন্যস্ত হয় ক্রমহ্রস্বায়মান ধনুকাকৃতি রেখায়। এবং সেগুলি এই দেশের সুপ্রচুর বৃষ্টির হাত হইতে দেয়ালকে রক্ষার জন্য স্বভাবতই বাহির দিকে বাড়ানো থাকে। আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও একই ধারায় ঘর তৈরী হইয়া থাকে। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে, যেখানে বৃষ্টি খুব বেশী পরিমাণে হয় না, সেখানে কাদামাটির দেয়াল দিয়া ঘেরা টালির ছাদযুক্ত ঘরেরই প্রচলন বেশী। যেহেতু এইসব অঞ্চলে গ্রীষ্মে উত্তাপ বেশী আবার শীতে শৈত্য বেশী, তাই এইসব দেয়াল

পুরু করিয়া তৈরী করা হইয়া থাকে এবং তাহাতে জানলা থাকে খুবই কম। দক্ষিণাঞ্চলের ঘরগুলি অনেকটা পূর্বাঞ্চলের মতই তৈরী করা হয়। তবে সেখানে তালগাছ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মায় বলিয়া ছাদের জন্য তাল-পাতার ছাউনী বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে অবশ্য কাঠ সহজলভ্য বলিয়া সেখানে কাঠের বাড়ীই বেশী তৈরী হয়। জন্তু-জানোয়ারদেব হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য এইসব বাড়ী সাধারণত মাচার মতো করিয়া মাটি হইতে অনেকটা উঁচুতে তৈরী করা হইয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে সর্বত্রই অবশ্য ছাদের জন্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে
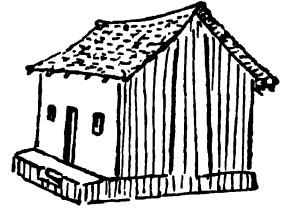
টালিব ছাদযুক্ত ঘর

দক্ষিণ ভারতে তাল-পাতাব ছাউনীর ঘর
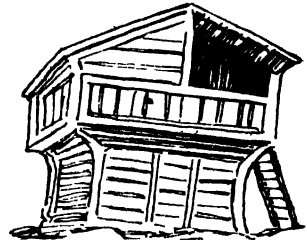
কাঠের বাড়ী

দেয়ালের জন্যও টিনের ব্যবহারও চালু হইয়াছে। বাঁশ প্রভৃতির চাইতে টিন যদিও বেশী স্থায়ী, তবুও টিনের ঘরে এত অধিক গরম হয় যে তাহার নীচে বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা ভিতরদিকে আচ্ছাদন (ceiling) না দিলে উহাতে বসবাস করা শক্ত হইয়া পড়ে। গ্রামাঞ্চলে বিত্তবানরা ইটের তৈরী গৃহ-নির্মাণও করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা সীমিত।

শহরের সংগে তুলনায় গ্রামাঞ্চলের বাড়ীগুলি বহুঘরবিশিষ্ট। সেখানে সাধারণত এক বা দুই ঘরবিশিষ্ট বাড়ীতে স্থান সংকুলান হয় না। যৌথ পরিবারভুক্ত আত্মীয়-পরিজনদের জন্য বহু ঘরের প্রয়োজন হয়। তারপর যাঁহারা বিত্তবান তাঁহারা পূজা-পার্বণের জন্য এবং অতিথি-অভ্যাগতদের

জন্যও আলাদা আলাদা ঘরের প্রয়োজন অনুভব করেন। ইহা ছাড়া গৃহপালিত পশুদের আশ্রয়ের জন্য এবং শস্যাদি রাখার জন্য আলাদা ঘর তৈরী হইয়া থাকে। অবশ্য সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীরা কোনো মতে একটি চালা তুলিয়াই বসবাস করিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যাই বেশী। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহারা ঐ চালা-ঘরেই গৃহপালিত পশুদের আশ্রয় দিতে এবং শস্যের ভাণ্ডার রাখিতে বাধ্য হয়।

গ্রামাঞ্চল

শহরাঞ্চলের গৃহনির্মাণ-সমস্যা এবং তাহা সমাধানের প্রণালী উভয়ই ভিন্ন। শহরাঞ্চলের লোকেরা অধিকতর বিত্তবান, তাই ইটই এখানে গৃহ-নির্মাণের প্রধান উপাদান। গৃহনির্মাণে স্থানের অভাব শহরাঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা। জীবিকার বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে অধুনা শহরাঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমির দর এবং বাড়ীর চাহিদা দুইই খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

শহরাঞ্চল

শহরাঞ্চলের লোকেরা তাই গ্রামের মতো বিভিন্ন ঘরবিশিষ্ট বাড়ীর কথা কল্পনাও করিতে পারে না। অবশ্য শহরে সাধারণত যৌথ পরিবার না থাকায় এবং শস্যভাণ্ডার, গৃহপালিত পশুর জন্য ঘর ইত্যাদির প্রয়োজন না হওয়ায় ঐরূপ বাড়ীর প্রয়োজনও হয় না। শহরের বেশীর ভাগ লোকই থাকে ভাড়া বাড়ীতে।

কিন্তু লোকসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরাঞ্চলে বহুঘরবিশিষ্ট বাড়ী তো দূরের কথা, একঘরবিশিষ্ট "ফ্ল্যাটও" জোগাড় করা সবসময় সম্ভব হয় না। বাড়ীর ভাড়া অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর ভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা আইন করিয়াও তাহা দরিদ্রের ক্ষমতার মধ্যে রাখা যাইতেছে না। তাই, সাম্প্রতিককালে দেখা যাইতেছে, অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য বহু বাড়ীর মালিকই সাধ্যে কুলাইলে তাহাদের পুরানো বাড়ী ভাংগিয়া ফেলিয়া সেখানে বহুতলবিশিষ্ট ও বহুফ্ল্যাটযুক্ত বাড়ী তৈরী করাইতেছে। এইজাতীয় গৃহনির্মাণ অবশ্য নির্মাণশৈলীরও বিবর্তন ঘটাইতেছে। দেখা গিয়াছে, ইট দিয়া এইরূপ বাড়ী মজবুতভাবে গড়া সুবিধাজনক হয় না। ফলে, গৃহনির্মাণে পাশ্চাত্য দেশের মতো আমাদের শহরগুলিতেও ইস্পাত ও কংক্রীটের (reinforced concrete) ব্যবহার

সুপ্রচলিত হইয়াছে। এখন আর আগেকার মতো তলদেশ হইতে একটির পর একটি ইট গাঁথিয়া বাড়ী তৈরী করা হয় না। তাহার পরিবর্তে, প্রথমেই পূর্বে স্থিরীকৃত নক্সা অনুযায়ী গোটা বাড়ীর ভারবহনের উপযোগী ইস্পাতের কাঠামো তৈরী করা হয়। পরে ঐ কাঠামোর পূর্বনির্ধারিত জায়গায় জায়গায় কংক্রীটের সাহায্যে দেয়াল, ছাদ, মেঝে প্রভৃতি তৈরী করা হয়। এইজাতীয় গৃহ যদি নীচে দাঁড়াইয়া দেখ, তবে মনে হইবে যেন আকাশ ছুঁইয়া আছে। তাই এইরূপ গৃহকে অনেক সময় বলা হইয়া থাকে স্কাই-স্ক্র্যাপার (sky-scraper)।

আগেই বলা হইয়াছে, শহরাঞ্চলে শিল্পপ্রসারের সংগে সংগে শ্রমিক-কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি সেখানকার লোকবসতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমাদের দেশের খণ্ডিত অংশ হইতে উদ্বাস্তুদের আগমনও এই লোকসংখ্যা বহুল পরিমাণে বাড়াইয়াছে। কিন্তু এই সব শ্রমিকরা বা

আধুনিক বাড়ী ও ইহার পাশে বস্তী

উদ্বাস্তুরা বেশীর ভাগই অত্যন্ত গরীব। যাহারা রোজগার করে তাহারাও অত্যন্ত স্বল্প বেতন পাইয়া থাকে। ফলে, বেশী ভাড়া দিয়া আশ্রয় সংগ্রহ তাহাদের কাছে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। তাই তাহাদের অনেকেই বস্তী-গুলিতে (slums) আশ্রয় লইয়া থাকে। শিল্পপ্রসারের সংগে সংগে এই বস্তীগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। শিল্পপতিরা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শিল্প হইতে অনেক অর্থ উপার্জন করেন বটে, কিন্তু শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা যে শিল্পের স্বার্থেই প্রয়োজন সেই বোধ তাহাদের নাই। রুচিবোধেরও তাহাদের মধ্যে অভাব। তাই তাহারা

বস্তী-সমস্যা

আরও অর্থলাভের আশায় ইট, টালি প্রভৃতি অত্যন্ত সাধারণ উপাদান দিয়া অত্যন্ত নীচু, প্রায় অন্ধকার যেসব সারি সারি একতলা ঘর তৈরী করিয়া শ্রমিকদের ভাড়া দিয়া থাকেন, তাহাদের সমষ্টিকেই বস্তী আখ্যা দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলে অনেক কারখানার মালিকরা নিজেদের শ্রমিকদের জন্যও কোনোরূপ থাকার ব্যবস্থা করেন না। আবার, অফিস, দোকান ইত্যাদিতে অনেক অল্প বেতনের লোক কাজ করেন যাহাদের অল্প ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ফলে, শিল্পপতিরা ছাড়াও অনেক বিত্তবান লোক শহরে বস্তী তৈরী করিয়া দরিদ্রদের অসহায়তার সুযোগ লইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। এইসব বস্তীতে বেশীর ভাগ পরিবারই আলো-বাতাসহীন এক একটি ঘরমাত্র লইয়া কোনোমতে মাথা গুঁজিয়া বসবাস করেন। এক পরিবার হইতে অপর পরিবারের গোপনতা রক্ষা করিবার উপায় নাই। একঘরেই সকলে ছেলেমেয়ে লইয়া ঘুমান,—এক ঘরেই রান্নাবান্না, এক ঘরেই সব কিছু। এইসব বস্তীতে জলের বা পায়খানার সুব্যবস্থা নাই। বস্তীগুলিতে ঢুকিলেই হয়তো দেখা যাইবে রাস্তার উপর ছেলেমেয়েরা পায়খানা করিতেছে, রাস্তার কল হইতে জল তুলিবার জন্য হয়তো তুমুল ঝগড়া চলিতেছে। এইজাতীয় পরিবেশে কি মন, কি শরীর কোনোটারই স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় থাকে না। যে-কোনো সভ্যদেশের পক্ষেই এইজাতীয় বস্তী কলংকস্বরূপ। কলিকাতা শহরে নাকি প্রতি চারজন অধিবাসীর মধ্যে একজন বস্তীতে থাকে।

আজিকার দিনে আমাদের সভ্যতা হইতে বস্তীর কলংক দূর করিবার নিমিত্ত নানাধরনের চেষ্টা চলিতেছে। প্রথমত বিভিন্ন শ্রমিক-কল্যাণ সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আন্দোলন এবং সরকারের সহানুভূতির ফলে বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণ আইন চালু হইয়াছে। ফলে, কলকারখানার মালিকগণ শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আস্তানা প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। আশা করা যাইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে কারখানা-অঞ্চলে বস্তী-সমস্যার সমাধান হইবে।

শহরাঞ্চলে এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত Improvement Trust গঠিত হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক বড়ো বড়ো শহরেই এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। তাহারা সরকারী অর্থানুকূল্যে বস্তী ভাংগিয়া সেখানে ছোটো ছোটো ফ্ল্যাটে

বিভক্ত বহু বড়ো বাড়ী তৈরী করিয়া স্বল্প ভাড়ায় বস্তীবাসীদের ঐ সব ফ্ল্যাটে বসবাসের সুযোগ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের কলিকাতা শহরেও এইরূপ অনেক বস্তী ভাংগিয়া নূতন ফ্ল্যাট-বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

আমাদের সরকার এই কার্যে বিশেষ অগ্রণী। আমাদের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একাধিকবার অত্যন্ত আবেগের সহিত বস্তীর কলংক দূর করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য বস্তীদূরীকরণ কার্য আমাদের দেশে আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। আমাদের শাসনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি জোর করিয়া অধিকার করা যায় না। কাজেই বস্তীর মালিকদের জায়গা জোর করিয়া অধিকার করিয়া সরকার সেখানে দরিদ্র লোকেদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না। বস্তীর মালিকরা মুনাফার লোভে সরকারের বস্তীদূরীকরণ ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার বাধা দিতেছেন। এদিকে বড়ো বড়ো শহরে একান্ত স্থানাভাব। শত শত দরিদ্র লোকের জন্য বসতিনির্মাণের স্থান কোনো বড়ো শহরেই নাই। জায়গা যদি বা অল্পস্বল্প পাওয়া যায়, তাহার দাম এত বেশী যে, তাহাতে জায়গা কিনিয়া দরিদ্রের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করা চলে না। এই কার্যে নিয়োগ করিবার মতো অর্থেরও সরকারের অভাব। চারিদিকেই আমাদের নানারকমের গঠনমূলক কার্য চলিতেছে। ঐগুলিকে বঞ্চিত করিয়া দরিদ্রদের গৃহনির্মাণ কার্যে অর্থব্যয় করিলে তাহাও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। তবু, প্রতি পাঁচশালা পরিকল্পনায়ই সরকার এই খাতে বেশ ভালো অর্থ মঞ্জুর করিতেছেন। কিন্তু আর এক মুস্কিল দেখা দিয়াছে। জায়গার অতিরিক্ত দামের জন্য নূতন প্রস্তুত বাড়ীগুলির ভাড়া এরূপ হইতেছে যে দরিদ্রেরা সেই ভাড়া দিতে পারিতেছে না। অনেকস্থলে দেখা যাইতেছে বাড়ীগুলি হয়তো আংশিক খালিই পড়িয়া আছে, অথবা কোনো দরিদ্রের নামে কোনো বিত্তশালী লোক তাহা ভোগ করিতেছেন। যাহাকে বসবাসের জন্য বাড়ী দেওয়া হইয়াছে সে হয়তো কোনো বিত্তশালী লোকের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহাকে ঐ বাড়ীতে বসবাসের অধিকার দিয়া নিজে পুনরায় গিয়া বস্তীতে আশ্রয় লইয়াছে।

বস্তী-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদের আরও দৃঢ়সংকল্প হইতে হইবে এবং সামগ্রিকভাবে বৃহৎ শহরের বাস-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। "জরুরী অবস্থায়" সরকার যে-কোনো লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন। শহরের বাসগৃহের সমস্যা জরুরী পর্যায়ে উঠিয়াছে মনে করিলে, সরকার যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্যক্তিগত জমি বা গৃহ অধিকার করিতে পারেন। মনে হয়, এইভাবে সমগ্র সমস্যার কিছুটা সুরাহা হইতে পারে। তারপর, পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে সরকার যদি গৃহনির্মাণের জন্য পৃথক ঋণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং গৃহের মালিকদের (শহরের) উপর কর বসান, তাহা হইলে দরিদ্রদের জন্য গৃহনির্মাণের অর্থের অভাব হয়তো হইবে না।

পশ্চিম বংগে গৃহনির্মাণ-সমস্যা

পশ্চিম বংগের গৃহনির্মাণ-সমস্যার কথা আমরা একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে পারি। এই সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—গ্রামাঞ্চলের এবং শহরাঞ্চলের গৃহনির্মাণ-সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত অর্থাভাব, জ্ঞানাভাব এবং কুসংস্কার আদর্শ গৃহনির্মাণের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

গৃহ আমাদের শীত এবং উত্তাপের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট নহে। উহা যে স্বাস্থ্যসম্মত হওয়াও প্রয়োজন এ ধারণা আমাদের গ্রামাঞ্চলের খুব কম লোকেরই আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও অনেকে টিনের চাল এবং টিনের বেড়া দিয়া গৃহনির্মাণ করিয়া থাকেন। এইরূপ গৃহে বাস করার ফলে যে স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে একথা কেহ একবারও চিন্তা করেন না। আলো-বাতাসের প্রবেশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দরজা-জানলা খুব কম বাড়ীতেই থাকে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা, গৃহনির্মাণের সময় মল-মূত্রত্যাগের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার উপর আমাদের গ্রামের অল্প সংখ্যক লোকই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া থাকেন। ফলে, মল-মূত্রের গন্ধ সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়া দূষিত করিয়া ফেলে। অনেক বাড়ীতে আবার রান্নাঘর এবং শোবার ঘরের দূরত্ব যথেষ্ট নহে। ফলে, রান্নাঘরের ধোঁয়া শোবার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে অস্বাস্থ্যকর

করিয়া তুলিতেছে সে জ্ঞান আমাদের নাই। আমাদের গ্রামাঞ্চলের বাড়ী-গুলিতে পানীয়জলের উপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকে না। পুকুর হইতেই পশ্চিম বংগে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা সাধারণত পানীয় জল সংগ্র করিয়া থাকেন। কিন্তু পুকুরের জল যে নানাকারণে দূষিত হইয় পান জলের উপযুক্ত থাকে না, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। তারপর, আমাদের মনের উপর গৃহেরও যে প্রভাব আছে, তাহা আমরা কল্পনাও করি না। গৃহের ভিতর এবং বাহির যে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন আছে, ইহা আমাদের অনেকেরই ধারণায় আসে না। প্রাচীনকালে গৃহনির্মাণে এবং গৃহসজ্জায় যে সৌন্দর্য-প্রীতি আমাদের চোখে পড়িত, বর্তমানে তাহা নাই। অর্থাভাব পল্লী-অঞ্চলে গৃহনির্মাণের সর্বাপেক্ষা বড়ো বাধা। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোকই এত দরিদ্র যে খড়-বাঁশের একখানা ঘরও প্রস্তুত করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হয়। কোনোরকমে একখানা ঘর প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহাকে সবরকম কাজেই ব্যবহার করা হয়। এই ঘরের এক অংশে হয়তো ধান রাখা হয়; অপর অংশে হয়তো গৃহপালিত পশুর স্থান। ইহাদেরই মধ্যে গৃহের মালিক কোনো রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকেন। পায়খানা, পানীয় জল ইত্যাদির কথা কল্পনাও করা যায় না।

অস্পৃশ্যতার অভিশাপের জন্য গ্রামের কোনো কোনো শ্রেণীর লোককে গ্রামের বাহিরে বাস করিতে হয়। তাহাদের পানীয় জলের সমস্যা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, কারণ পুকুরগুলি হয়তো গ্রামের ভিতর। ঐসব শ্রেণীর লোকেরা দরিদ্রতর বলিয়া তাহাদের ঘরবাড়ীর অবস্থা আরও শোচনীয় থাকে। সভ্যজগতের মানদণ্ডে তাহারা ঠিক মানুষের মতো বাস করে না।

গ্রামবাসীদের আর্থিক মান উন্নততর না হওয়া পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গৃহ-সমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নাই।

পশ্চিম বংগের শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ-সমস্যা কলিকাতা শহরের জন্য প্রধানত জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। অর্থোপার্জনের সুযোগ কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সকলে জীবিকার্জনের আশায় এই নগরের দিকে ছুটিয়া আসে। ফলে, পশ্চিম বংগে আর কোনো শহর ভালোভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। আসানসোল এবং দুর্গাপুর শিল্প-শহর হিসাবে দুইটি

ব্যতিক্রম মাত্র। যেসব শহর আছে তাহাতে সাধারণত অল্পবিত্ত লোক বাস করেন। উহাদের বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, পায়খানা, পানীয় জল সরবরাহ, নর্দমা প্রভৃতি সব কিছুই আধুনিক শহরের মান অপেক্ষা অনেক নীচে। ঐসব শহরে বাস করিবার স্বাভাবিক আকর্ষণ কাহারও হইতে পারে না।

কলিকাতা শহরের গৃহসমস্যা পৃথক ধরনের। অল্প সময়ের মধ্যে লোক-সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গৃহাভাব অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক, যাহারা কলিকাতায় জীবিকার্জন করেন, তাহাদিগকে গৃহাভাবের জন্য প্রতিদিন বাহির হইতে ট্রেনে-বাসে আসিতে হইতেছে। লোকের অধিক চাপের জন্য কলিকাতার পরিবহন-ব্যবস্থা নগরের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। পানীয়জলের সরবরাহও প্রয়োজনানুপাতে খুবই কম। অধিকাংশ বাড়ীতেই যত লোক থাকা উচিত তাহার চাইতে অনেক বেশী লোক থাকে। বাড়ীগুলি হইতে নিক্ষিপ্ত আবর্জনায় রাস্তা-ঘাট নোংরা হইয়া থাকে। বস্তীর সংখ্যাও কলিকাতায় প্রচুর। সুখের বিষয় পশ্চিম বংগ সরকার কলিকাতার গৃহসমস্যাকে জাতীয় অন্যতম সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার কাছাকাছি পতিত জমি, যথা—সল্টলেক, বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন। পানীয় জলের সরবরাহের উন্নতি করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। কলিকাতার পাশাপাশি নূতন শহর স্থাপন করার পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। কলিকাতার সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গ্যানাইজেসন নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা উন্নয়নকার্যে ভারত-সরকারের সাহায্য পাওয়া যাইবে—এই আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। বিদেশী সাহায্যও পাইবার ভরসা আছে।

গৃহনির্মাণ বা নির্বাচন নীতি

গৃহ আমাদের কাছে একটা আশ্রয়স্থল অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। আমাদের অর্থ-সামর্থ্য যাহাই থাকুক না কেন, গৃহনির্মাণ বা নির্বাচনের সময় (যেমন ভাড়া করা বাড়ী) কয়েকটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, বাসগৃহ এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ইহা

আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়। তোমরা জান যে সূর্যকিরণ আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করিয়া সূর্যের উত্তাপ-রশ্মি রোগবীজাণুগুলিকে ধ্বংস করে। তাই অধিক সূর্যালোকবিশিষ্ট বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর। এইজন্য বাসগৃহের চারিদিকে অতিরিক্ত গাছপালা বা উঁচু উঁচু বাড়ী থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। ঘরের অবস্থান এবং দরজা-জানলা এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ঘরের ভিতরেও প্রচুর পরিমাণে সূর্যরশ্মি ঢুকিতে পারে। এসব বিষয় বিবেচনা না করিয়া অস্বাস্থ্যকর গৃহে বসবাস করিলে স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য।

সূর্যরশ্মির মতো আমাদের স্বাস্থ্যের উপর নির্মল বায়ুর প্রভাবও খুব বেশী। বায়ু হইতেই আমরা অক্সিজেন আহরণ করি যাহা আমাদের কর্মপ্রবণতার যোগান দেয়। প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া অক্সিজেন আমাদের দেহের প্রত্যেকটি কোষে নীত হয় এবং তাহাদিগকে জীবিত রাখে। কিন্তু দূষিত বায়ু আমাদের উপকার না করিয়া অপকার করিতে পারে। বায়ু দূষিত হওয়ার ফলে তাহাতে অক্সিজেনের অংশ যদি কম থাকে বা উহা যদি রোগবীজাণু বহন করে, তাহা হইলে ঐ বায়ুগ্রহণ আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। তাই এমন পরিবেশে গৃহনির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায়। গৃহের দরজা-জানলাও এমন হওয়া প্রয়োজন যে ঘরের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। ঘরে বায়ু প্রবেশ করিলে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর—এই ধারণা ভ্রান্ত। নির্মল বায়ু কোনো অবস্থায়ই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে পারে না।

গৃহ যাহাতে স্যাঁতসেঁতে জমির উপর নির্মিত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আবর্জনাদ্বারা ভরাট জমি, গোরস্থান বা এঁদো পুকুরের কাছাকাছি জায়গায় গৃহ নির্মাণ করা উচিত নয়। কারণ, বৃষ্টি হইলে ঐ ধরনের জমি হইতে অসংখ্য রোগজীবাণু বাহির হয়। নীচু জমিতে গৃহ নির্মাণ করা ঠিক নহে। জমির আর্দ্রতার জন্য রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। বাসস্থানের জমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, ঢালু ও শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন।

শুধু গৃহনির্মাণ করিলেই চলে না, গৃহের পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে বাড়ীতে যথোপযুক্ত নর্দমার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শহরের বাড়ী সম্বন্ধে একথা বেশী প্রযোজ্য। রান্নাঘরের ধোঁয়া

আসিয়া সমগ্র বাড়ীটি যাহাতে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে না পারে সে ব্যবস্থাও থাকা উচিত। বাড়ীর আবর্জনা ফেলিবার জন্য উপযুক্ত স্থান থাকা আবশ্যক। যেপাড়ায় বাড়ী সেই পাড়াটাও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত, না হইলে উহার দূষিত আবহাওয়া বাড়ীকে দূষিত করিবে। এই প্রসংগে বাড়ীতে মলমূত্র পরিত্যাগের জন্যও যে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, একথার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আদর্শ বাড়ী

কি গ্রামে কি শহরে বসবাসের উপযুক্ত আদর্শ বাড়ীর সংখ্যা কিন্তু আজিও অত্যন্ত কম। বাড়ী শুধুই মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নহে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের পরিবার-জীবনের বিকাশ। আবার, সুন্দর পরিবেশ আমাদের স্বাস্থ্যকে যেমন সুস্থ, কর্মক্ষম রাখে তেমনি সুন্দর বাড়ী আমাদের মনের সুস্থতা বজায় রাখিতেও সহায়তা করে; মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশে সাহায্য করে। তাই তোমরা যদি কোনোদিন বাড়ী তৈরী করাও তাহা হইলে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে।

গ্রামাঞ্চলে

আগেই বলিয়াছি, গ্রামাঞ্চলে জায়গা এখনও সুলভ। তাই, যদি বেশী ঘরেরও প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেখানে স্কাই-স্ক্র্যাপার গড়িবার দরকার নাই। তাহাছাড়া, তাহা ব্যয়সাধ্যও বটে। তাহার পরিবর্তে একতলা ঘর তৈরী করা যাইতে পারে। কিন্তু এইসব ঘরে আলো-হাওয়া যাহাতে সবসময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দক্ষিণমুখী সারিবদ্ধ গৃহ তৈরী করিলে এবং প্রচুর জানালা থাকিলে এই জাতীয় ব্যবস্থা সহজেই করা যাইবে। যদি কোনো গৃহপালিত পশু থাকে তাহা হইলে তাহাদের আস্তানা বসতবাড়ী হইতে দূরে তৈরী করাই বাঞ্ছনীয়। বাড়ীর চারিধারে গাছপালা কিছু থাকা প্রয়োজন। কিন্তু গাছপালা বেশী হইয়া গেলে আলো ও হাওয়ার চলাচল দুই-ই বিঘ্নিত হইবে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে জলের সমস্যা একটি বড় সমস্যা। বেশীর ভাগ লোকই পুকুর, নদী প্রভৃতির জল খাইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময়ই এই সব পুকুরের জলে কাপড় কাচা, গৃহপালিত পশুদের স্নানাদি যাবতীয় কাজই করা হইয়া

থাকে। ফলে, তাহাদের জল স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং বাড়ী তৈরীর সংগে সংগে জলের ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজনীয়। উঁচু-ধারওয়ালা গভীর কুপ খনন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তবে অর্থে কুলাইলে নলকূপ বসানোই সবচেয়ে শ্রেয়। রান্নাঘর বসতগৃহ হইতে আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে ধোঁয়া প্রভৃতি বসতবাটিকে নোংরা করিতে পারিবে না। পায়খানাও বসতবাড়ী হইতে যথেষ্ট দূরে তৈরী করা দরকার। সাধারণত, আমাদের গ্রামাঞ্চলে অনেক বাড়ীতেই পায়খানা বলিয়া কিছু নাই। এখানে সেখানে মাঠে-ঘাটে পায়খানা করাই রেওয়াজ। কিন্তু এই অভ্যাস শুধু নিজের বাড়ীকেই নোংরা করে না, সারা গ্রামের স্বাস্থ্যও দূষিত
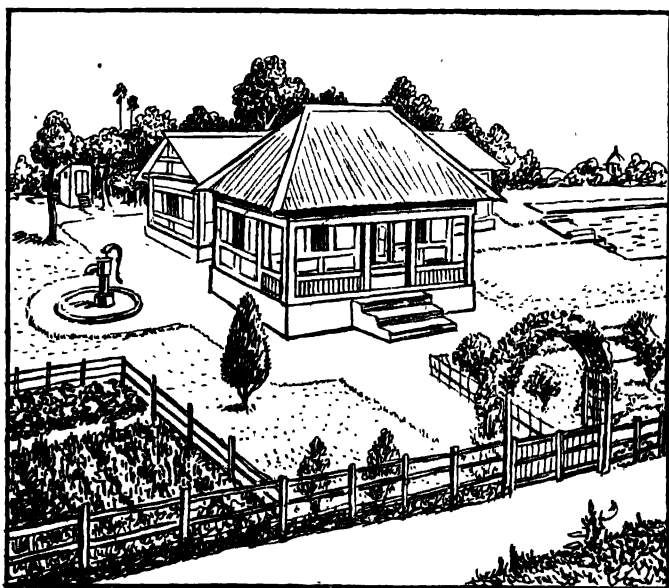
গ্রামাঞ্চলে আদর্শ বাড়ী

করিয়া তোলে। স্বল্প খরচেই গভীর গর্ত খুঁড়িয়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। অবশ্য নলকূপ তৈরীর মতো অর্থে কুলাইলে সেপ্টিক ট্যাংক পায়খানা (Septic Latrines) তৈরী করিলেই সব চাইতে ভালো হয়। এই ব্যবস্থায় পায়খানার নীচে বড়ো বড়ো ট্যাংক তৈরী করা হয় এবং সেখানে সহজ

প্রক্রিয়ায় মলকে নির্দোষ জলে পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়।

শহরাঞ্চলে আদর্শ বাড়ী তৈরীর সমস্যা আরও জটিল। জায়গার স্বল্পতার জন্যই সেখানে দ্বিতল বা বহুতলবিশিষ্ট বাড়ী তৈরী করা অপরিহার্য।

শহরাঞ্চলে

কিন্তু সেখানেও আলো-হাওয়া যাহাতে পাওয়া যায় সেইজন্য বাড়ীর চারিদিকে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এইজাতীয় বাড়ীতে রান্নাঘর, পায়খানা প্রভৃতি বাসগৃহ হইতে দূরে তৈরী করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সেই কারণেই রান্নাঘরের ধোঁয়া যাহাতে সহজেই বাহির হইয়া যাইতে পারে সেইজন্য চুল্লীর উপরে ধোঁয়া বাহির হওয়ার জন্য নল বসানো দরকার। "সেনিটারী" পায়খানা হইলে তাহা হইতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না। যেখানে কলের জলের ব্যবস্থা নাই সেখানে নলকূপ বসানো প্রয়োজন হইবে। বাড়ীর ভিতরের এবং বাহিরের ময়লা নিষ্কাশনের জন্য ভালো নর্দমার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এইসব নর্দমা পাকা এবং ঢাকা দুই-ই হওয়া দরকার।

আমাদের গৃহ-সমস্যা

আমাদের গৃহ-সমস্যা অত্যন্ত জটিল। গ্রামের লোকেরা এত দরিদ্র যে অনেকেই মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁইও গড়িয়া তুলিতে পারে না। যাহারা তাহা পারেও তাহারা কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব প্রভৃতির নিমিত্ত স্বাস্থ্যসম্মত বাড়ী তৈরী করিতে জানে না। ঘরের মধ্যে আলো-বাতাসের অভাব, মানুষে-পশুতে একত্র বাস, রান্না-শোয়ার একঘরে ব্যবস্থা, পানীয় জলের অব্যবস্থা ইত্যাদি তাহাদের বাড়ীকে সুস্থ মানুষের বাসের অযোগ্য করিয়া তোলে।

শহরাঞ্চলে তো নিদারুণ স্থানাভাব। বর্তমানে শহরের লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, লোকেরা কিছুতেই মাথা গুঁজিবার ঠাঁইও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। বাড়ীর মালিকরা চার-পাঁচ গুণ ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। বাস্তুহারাদের আগমনের ফলে, শহর এবং গ্রাম উভয় অঞ্চলেই, সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে।

সরকার শহরাঞ্চলের গৃহ-সমস্যা সমাধানের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিয়াছেন। লোকেরা যাহাতে নিজেরা গৃহনির্মাণ করে তাহার জন্য উৎসাহ দিতেছেন।

উদ্বাস্তুরা যে সব "জবর দখল" পল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন, সরকার তাহা ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। উদ্বাস্তুদেরও দীর্ঘদিন ধরিয়া গৃহ-নির্মাণের জন্য টাকা ধারও দিয়া আসিতেছেন। সরকারী কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের জন্য দুই বৎসরের মাহিনা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। সরকারী কর্মচারী ব্যতীত, স্বল্প উপার্জনকারী ব্যক্তিদেরও (Lower income group people) গৃহনির্মাণের জন্য টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকার নিজেও বহু ফ্ল্যাটযুক্ত বড়ো বড়ো বাড়ী তৈরী করিয়া উদ্বাস্তুদের ও সরকারী কর্মচারীদের স্বল্প ভাড়ায় ঐ সব ফ্ল্যাট ভাড়া দিতেছেন। বস্তী দূরীকরণের নিমিত্ত সরকার যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ তো পূর্বেই করা হইয়াছে। সরকার বিষয়টির উপর এত গুরুত্ব দিতেছেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গৃহসংক্রান্ত একটি দপ্তরের সৃষ্টি হইয়াছে।

গৃহ-সমস্যা সমাধানের

কিন্তু আমাদের গৃহ-সমস্যা এখনও সমাধান হইতে অনেক দেরী। বড়ো বড়ো শহরে ইহার গুরুত্ব বরং দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্যা সমাধানের তিনটি প্রধান অন্তরায়। প্রথমত, দারিদ্র্য। আমাদের দেশের লোক এখনও এত দরিদ্র যে, গৃহ প্রস্তুতের উপাদান আরও অল্পমূল্যের না হইলে, সরকারের নিকট হইতে ধার লইয়াও তাহাদের অনেকের পক্ষেই গৃহনির্মাণ সম্ভব নহে। তাই অল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত প্রয়োজনানুরূপ গৃহনির্মাণ করা যায় কি না, এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। দ্বিতীয়ত, সময়ের অভাব। আমাদের দেশে বর্তমানে এত অধিকসংখ্যক লোক গৃহহীন যে খুব দ্রুতগতিতে গৃহ-নির্মাণ করিতে না পারিলে, এত লোকের গৃহহীনতার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। গৃহের বিভিন্ন অংশ যদি যন্ত্রের সাহায্যে অল্পসময়ে প্রচুর পরিমাণে কারখানায় প্রস্তুত করা যায় এবং যথাস্থানে লইয়া গিয়া অল্প সময়ের মধ্যে গৃহনির্মাণ করা যায়, তবেই গৃহ-সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। রাশিয়া এবং আমেরিকা অনুরূপ প্রথায় গৃহনির্মাণ আরম্ভ করিয়াছে। তৃতীয়ত, শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, অনেক সময় অর্থ থাকিলেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবের জন্য যে ধরনের গৃহ নির্মিত হইতেছে, তাহা স্বাস্থ্যসম্মত নহে।

দেশবিদেশের ঘরবাড়ী

শুধু আমাদের দেশেই নহে। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যদেশেই এই গৃহসমস্যার প্রশ্নটি বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলিতেও শিল্পপ্রসারের ফলে শহরাঞ্চলে লোকসংখ্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, ঐসব দেশে কংক্রীট ও ইস্পাতের তৈরী স্কাই-স্ক্র্যাপারও বহুল প্রচলিত হইয়াছে। এই স্কাই-স্ক্র্যাপারের ব্যাপারে

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে

অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই সবচাইতে অগ্রণী। এইসব স্কাই-স্ক্র্যাপারের বৈশিষ্ট্যই হইল আলংকারিক বাহুল্য বিসর্জন দিয়া প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্যই নির্মিত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমেরিকার স্থাপত্য জগতে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধই ঐসব গৃহকে প্রয়োজন মিটাইয়াও অলংকৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাই সাম্প্রতিককালের মার্কিনী স্থাপত্য-কলায় কংক্রীট ছাড়াও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার হইতেছে। বিভিন্ন ধাতুর টুকরা ও প্রচুর পরিমাণে কাঁচের টুকরার সাহায্যে স্কাই-স্ক্র্যাপারগুলিকে সুন্দরতর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশের গগনচুম্বী বাড়ীগুলিতে এখনও কিন্তু সেই প্রয়াস বিশেষ চোখে পড়ে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শহরাঞ্চলের বাহিরের সাম্প্রতিক ঘরবাড়ীগুলিতে কাঠের ব্যবহারও অনেক বাড়িয়াছে। কাঠ প্রভৃতির সাহায্যেও যে অত্যন্ত সহজে সুন্দর বাড়ী তৈরী করা সম্ভব তাহা আজ সেখানে স্বীকৃত-সত্য। বাড়ীর দেয়াল, ছাদ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ প্লাইউড, এসবেস্‌টস্‌ প্রভৃতি উপাদানে ফ্যাক্টরীতে তৈরী করিয়া সেই সব টুকরা যে জায়গায় বাড়ী তৈরী হইবে সেখানে আনিয়া কাঠের খুঁটি প্রভৃতির সাহায্যে জোড়া দিয়া এই সব ঘর তৈরী করা হইয়া থাকে। ইহাদের বলা হয় Prefabricated house। অল্পসময়ে বাড়ী তৈরী করার ব্যাপারে এইজাতীয় বাড়ী অত্যন্ত সুবিধাজনক। ব্যয়ও ইহাতে অল্প। আমাদের গৃহনির্মাণ-সমস্যার সমাধানে আমেরিকার এই দৃষ্টান্ত আমরা মনে রাখিতে পারি।

য়ুরোপীয় দেশগুলিতে শহরাঞ্চলে যদিও একই ধারায় ঘরবাড়ী তৈরী

হইতেছে, গ্রামাঞ্চলে এখনও তাহাদের নিজস্ব গঠনবৈচিত্র্য বজায় রহিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের ঘরবাড়ী

ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে আজিও কাঠের বাড়ী বহু দেখা যায়। উহাদের ছাদগুলি স্বভাবতই ঢালু। কোথাও বা দেয়ালের নিম্নাংশ ইট দিয়া গাঁথিয়া উপরের অংশটুকু কাঠ বা কাঠের উপর সিমেণ্ট দিয়া প্লাষ্টার করিয়া বাড়ী তৈরী করা হইয়া থাকে। এই জাতীয় বাড়ীর সিঁড়িগুলি সাধারণত কাঠের তৈরী হয়। উহাদের দেয়ালে কাঁচের জানলাও থাকে প্রচুর। শীতপ্রধান জায়গা বলিয়া এখানকার সব বাড়ীতেই ঘর গরম রাখার জন্য চুল্লীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। শহরাঞ্চলে এই জাতীয় চুল্লীর প্রয়োজন নাই, কারণ সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাড়ীগুলি খুব রুচিসম্মত এবং ছিমছাম। প্রত্যেক বাড়ীতেই ফুল এবং শাক-সবজির জন্য এক ফালি করিয়া জমি আছে। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলিতে "কবে"র (Cob) দেয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত ঘর বহুলপরিমাণে দেখা যায়। সাধারণ কাদা-মাটি ও খড় অথবা খড়, মাটি ও চুন মিশাইয়া এই "কব্" তৈরী করা হয়। ইহার প্রধান গুণ, ইহার দ্বারা তৈরী দেয়াল ঘরকে উষ্ণ রাখিতে সহায়তা করে।
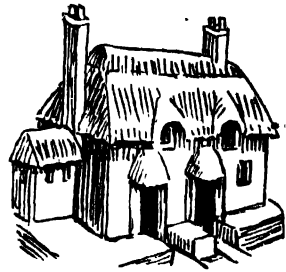
ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলের বাড়ী

ফরাসীদেশের গ্রামাঞ্চলে গৃহের স্থানসংকুলান সমস্যার সমাধানের এক বিচিত্র ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে বিছানাগুলি রেলের "বাংকে"র (bunk) মতো একটির উপর আর একটি স্থাপিত হইয়া থাকে। দিনের বেলায় একটি ঠেলা দরজা দেয়ালের ন্যায় উহাদের ঢাকিয়া রাখে। আয়ার্ল্যাণ্ডে বা স্কটল্যাণ্ডে পাথর প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া সেখানকার গ্রামাঞ্চলের ঘরবাড়ী এখনও পাথরের দ্বারাই বেশী তৈরী করা হয়। উহাদের ছাদগুলি তৈরী হয় সাধারণত খড়ের দ্বারা। জার্মানীতে গ্রামাঞ্চলে অবশ্য লাল টালির ছাদের প্রচলনই বেশী। আগেই বলা হইয়াছে, এখানকার প্রচুর পরিমাণ শীত ও বরফের হাত হইতে ছাদগুলিকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই এইসব ছাদকে অত্যন্ত খাড়া করিয়া

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ঘরবাড়ী

তৈরী করা হইয়া থাকে। দেয়াল ইট বা কংক্রীটের তৈরী হইলেও কাঠামো সাধারণত তৈরী করা হয় কাঠ দিয়াই। একই গৃহের মধ্যেই সাধারণত রান্নাঘর, বসতঘর, পশুদের ঘর (কুকুর ইত্যাদির) প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আবার, উত্তর অঞ্চলের ফিনল্যাণ্ডে, সুইজারল্যাণ্ডে, নরওয়ে বা সুইডেনে ঘরবাড়ী একান্ত কাঠের দ্বারাই তৈরী করা হয়।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বাংকসহ বাড়ী
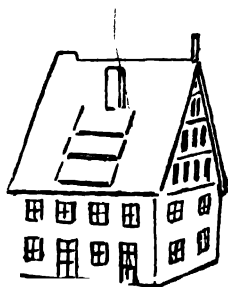
জার্মানীর খাড়া ছাদের বাড়ী

কিন্তু সেখানে প্রতিটি বাড়ীতেই শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইটের বা পাথরের তৈরী চুল্লীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। মোটকথা, পাশ্চাত্যদেশে প্রাকৃতিক চাহিদা, সহজ সৌন্দর্যবোধ এবং ব্যয়-স্বল্পতা গৃহনির্মাণের নীতি প্রভাবিত করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ পৃথিবীর যেসব দেশে আজিও ভালো-ভাবে হয় নাই সেইসব জায়গায় এখনও মানুষ তাহাদের ঘরবাড়ী তৈরীর ব্যাপারে প্রাচীন রীতিরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন একদিকে সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশকে রোধ করিয়াছে, তেমনি সেখানকার খাদ্যবস্ত্রের মতো গৃহনির্মাণ-শৈলীকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

উত্তরে মেরু অঞ্চলের এস্কিমোরা শীতের দিনে বরফের ঘর তৈরী করিয়া বাস করে। এইসব গৃহকে বলা হয় ইগ্‌লু (igloo)। জানলাবিহীন ও ছোটো ঢুকিবার পথযুক্ত ইহাদের অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয় বলিয়া সেখানকার প্রচণ্ড শীতে এইগুলি অত্যন্ত উপযোগী। সেখানকার স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালে যখন ঐ বরফ গলিয়া যায়, তখন এস্কিমোরা দক্ষিণের জলস্রোতে ভাসিয়া আসা কাঠ দ্বারা তৈরী কুঁড়ে

মেরু অঞ্চল

ঘরে বা চামড়ার তৈরী তাঁবুতে (ইহাদের বলা হয় wigwam) বাস করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার পরে তাহারা এখন ক্যানভাসের তাঁবুও ব্যবহার করিয়া থাকে।
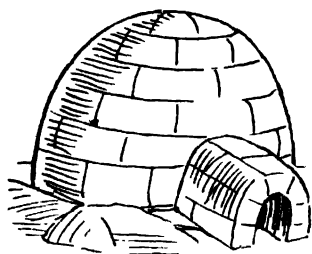
ইগ্‌লু

জুলুদের কুটির

আবার, ঠিক ইহার বিপরীত দেখা যায় আফ্রিকার অভ্যন্তরের উষ্ণ জংগলপ্রধান অঞ্চলের কাফির প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের মধ্যে।

আফ্রিকায়

সেখানে শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ঘরের প্রয়োজন নাই। কিন্তু দিনের প্রখর উত্তাপ ও রাত্রিতে জংগলের জন্তুজানোয়ারের হাত হইতে নিশ্চিন্ত থাকিবার জন্যই তাহাদের ঘরের প্রয়োজন। তাই দেখা যায় তাহারা মাটিতে বড়ো বড়ো গাছের শক্ত ডাল পুঁতিয়া তাহার উপর পুরু করিয়া মাটির প্রলেপ দিয়া তাহাদের ঘর তৈরী করিয়া থাকে। গোবর, মাটি ও ছাই প্রভৃতি শক্ত করিয়া বসাইয়া উহাদের মেঝে তৈরী হয়। ইহারা দেখিতে হয় গোলাকৃতি এবং

কাফিরদের ঘর

তাহাদের দেওয়ালে জানলা বলিয়াও কিছু থাকে না। ইহাদের ছাদ তৈরী হয় বড়ো বড়ো ঘাস দিয়া। ইহারা আমাদের দেশের মাটির দেয়ালযুক্ত খড়ের ঘরের কথা মনে করাইয়া দেয়।

আরবের মরুভূমি অঞ্চলে কিন্তু এইজাতীয় স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ

অসম্ভব। এখানে অধিবাসী বেদুইনরা যাযাবর। নিজেদের খাদ্য এবং তাহাদের ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুদের খাদ্যের খোঁজে তাহারা সবসময়ই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই তাহাদের বাসগৃহ হইল তাঁবু। উটের লোমে তৈরী বস্ত্র বা ভেড়া বা ছাগলের চামড়ায় তৈরী এই সব তাঁবু তাহারা সংগে লইয়াই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যায়। ইহাদের নেতা বা "শেখে"র তাঁবুর সম্মুখে অবশ্য কিছুটা জায়গা গাছের ডাল বা ঝোঁপঝাড় দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

মরু অঞ্চলে

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Give a short account of how early people satisfied their need for shelter.

2. Discuss how environmenta factors influence our house types. Give illustrations.

3. Describe how our housing is conditioned by social factors and aesthetic tastes.

4. Describe what you know of houses in India in Ancient, Muslim and British periods.

5. Narrate briefly what are the chief problems of housing in India. State your ideas as to how they can be solved.

6. State what you understand by an "ideal house". Give, in short, your ideas about the requirements of an ideal house in (i) our villages, (ii) our towns.

7. Briefly describe the house types in (i) Desert lands, (ii) Polar regions, (iii) European countries, (iv) U. S. A. and (v) Central African jungles.

8. State your idea of slums and narrate how they developed. Describe the steps which are being taken to do away with slums.

B. Give short answers, in not more than 60 words, to the following questions :—

1. State why it was necessary for farmers to build permanent dwellings.

2. Describe a bee-hive hut.

3. State whether safety is more important than comfort in building houses. Give reasons for your answer.

4. Describe a Bengalee hut.

5. Describe what is a Septic Latrine.

C 1. Some words and phrases are given below :—

Write (1) against those which relate to houses in villages, and (2) against those which relate to houses in cities. You can put both the numbers against any word which you think relates to both the places.

(a) Slums
(b) Service latrines
(c) Sky-scrapers
(d) Pit latrines
(e) Septic tanks
(f) Huts
(g) Tap water
(h) Improvement Trust

2. Below on the left are given names of three regions in India and on the right some words or phrases. Indicate their relations by writing the numbers of the right hand side words or phrases against the names in the left hand column :—

(1) Southern States	(1) Roofs overhanging the walls
(2) Eastern States	(2) Roofs of palm trees
(3) Northern States	(3) Mud houses
	(4) Walls with bamboo mattings
	(5) Roofs with tiles

D. Collect as many pictures as you can of types of houses different parts of the world. Paste them in your scrap-book.

At the end of the collections, draw a table as indicated below to summarise relevant data about the pictures of the types of houses you have collected.

TABLE

Name of the type of houses	Who lives in it	Where it is	What it is made of	Why it is made like this and any other remarks
Igloo	Eskimo	Polar region	Snow	Snow keeps the inside warm

2. Collect pictures of houses in different parts of India and place them in your scrap-book.

E. You can take up the following projects :—

(1) Every student may prepare a note on the house he lives in and suggest what improvements are required to make it an ideal house.

(2) The survey of a slum (in case of a city) or "mahalla" (in case of a small town or a village) in regard to houses may be undertaken as a Group project and a wall-newspaper may be brought out on what has been seen.

3. There may be a workshop on how we may be able to solve our housing problem—(a) Pupils may be grouped into 4 or 5 and asked to tabulate our problems in regard to houses and then to offer specific suggestions for remedy. (b) In the meantime letters may be written to some of the local leaders to get their solutions to the problem. Their views may be edited. (c) The groups may discuss the suggestions made by each and also those of the leaders in one class session.

4. Build the following (Group project) :—

(1) An ideal village house.
(2) An ideal flat house in a city.
(3) A sky-scraper.

আমাদের অন্যান্য চাহিদা

আদিম মানুষ প্রধানত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের খোঁজেই ঘুরিয়া মরিত। এই তিনটি মূল চাহিদার পূরণেই ছিল তাহাদের জীবনের চরিতার্থতা। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার সামগ্রীও ততই বাড়িতে লাগিল। আজিকার পৃথিবীতে আমাদের চাহিদার অন্ত নাই। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি যেমন একদিকে এইসব চাহিদার পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে নিত্য নূতন ভোগ্যদ্রব্য (consumers' goods) ও সেবার (services) চাহিদার সৃষ্টিও করিয়া চলিয়াছে। অনেক সময় মনে হয়, দিন দিনই যেন আমরা চাহিদার দাস হইয়া পড়িতেছি। অনেক জিনিস আছে যাহা জীবনধারণের জন্য আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই, তবু অভ্যাসের দরুণ বা অন্য ারণে উহা আমাদের অপরিহার্য চাহিদার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চা, সিগারেট ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে সভ্যতা অর্থই যেন নিত্য নূতন চাহিদার সৃষ্টি এবং তাহাদের পূরণের চেষ্টা। এই বহুবিচিত্র চাহিদার সামগ্রিক বর্ণনা সম্ভবপর নহে; তাই নিম্নে শুধু তাহার ইংগিত দেবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ভোগ্যদ্রব্য

তোমরা জান, আদিম মানুষ পশু-পাখী মারিয়া কাঁচা অথবা আগুনে পোড়াইয়া তাহার মাংস অথবা ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত।

বাসন-পত্র

কিন্তু মানুষ যখন রান্না করিবার কায়দা আয়ত্ত করিল, তখন স্বভাবতই রান্না করিবার জন্য পাত্রাদির প্রয়োজন অনুভূত হইল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেই যে নব্য-প্রস্তরযুগের সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাত্রাদি তৈরী হইত তাহার বহুল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সবই ছিল মাটির তৈরী। তারপর ধাতুর আবিষ্কারের ফলে পাত্রাদির নির্মাণ সহজতর হইল। বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পাত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইল। আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই পাত্রাদির চাহিদা

অনস্বীকার্য। ধনীর প্রাসাদ হইতে শুরু করিয়া দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত সর্বত্রই পাত্রাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। তবে দরিদ্রের কুটিরে যেখানে হয়তো শুধুই রান্নার জন্য হাঁড়ি, কড়াই, হাতা, খুন্তির বা খাওয়ার জন্য থালা, গ্লাস বা বাটির সন্ধান পাওয়া যাইবে, সেখানে বিত্তবানদের গৃহে আরও হাজার রকমের পাত্রাদির সন্ধান মিলিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চা-পানের জন্য কেটলী, টিপট, সুগারপট, মিল্কপট, কাপ, প্লেট, চামচ, ছাকনী

প্রভৃতি ; কফি-রসিকদের গৃহে কফিপট, ষ্টেনার, কফি কাপ, প্লেট ইত্যাদি ; অথবা, বিভিন্ন ধরনের রান্নার জন্য বিভিন্ন আকৃতির প্যান, সস-প্যান, ফ্রাইং-প্যান বা বিভিন্ন ধরনের হাতা প্রভৃতি। তেমনি আবার দরিদ্রের গৃহে যেখানে কাঠের বা কয়লার উনুনেই রান্নার কাজ শেষ হইয়া থাকে
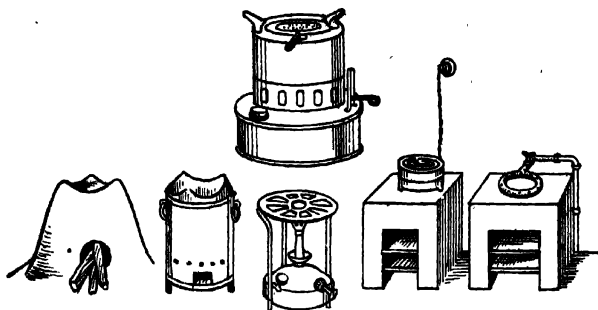
বিভিন্ন রকমের উনুন

সেখানে বিত্তবানদের গৃহে উনুন ছাড়াও নানাপ্রকারের কুকার, ষ্টোভ, হীটার, গ্যাস-ওভেন, কোক-ওভেন প্রভৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে। দরিদ্রের

ঘরে রান্না করা খাদ্য তারের তৈরী ঢাকনা দিয়া বা অন্য কিছু দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। কিন্তু বিত্তবানদের ঘরে মিটসেফ্ বা খাদ্যদ্রব্যাদি ঠাণ্ডা রাখার জন্য রেফ্রিজারেটারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইসব বিভিন্ন প্রকারের পাত্র আবার একই উপাদানে নির্মিত নয়। পোড়া মাটির তৈরী পাত্রাদির
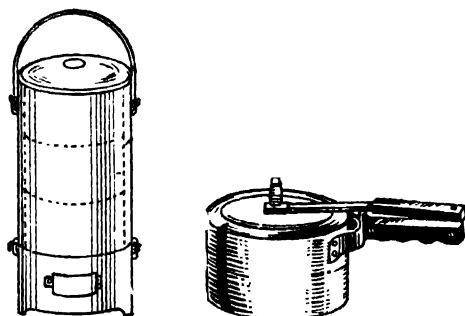
কুকার

কথা আগেই বলা হইয়াছে। ধাতব পাত্রের মধ্যে সুপ্রচলিত হইতেছে লোহা, তামা, কাঁসা, এলুমিনিয়াম, টিন বা কলাই করা পাত্রাদি। পোর্সিলিন, কাঁচ এবং ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীলের পাত্রাদিও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির ফলে এ্যালকাথিনের তৈরী পাত্রাদির চাহিদা খুব বেশী পরিমাণে দেখা দিয়াছে। লোহা, ষ্টেনলেস ষ্টীল, তামা বা কাঁসার পাত্রাদি দুর্মূল্য বলিয়া সাধারণ
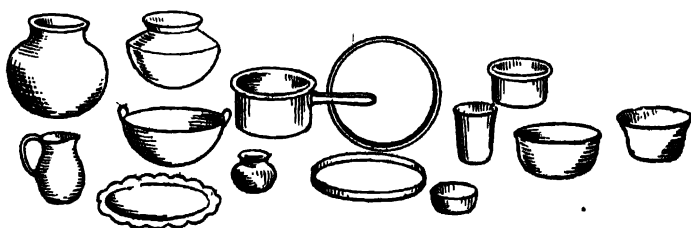
বাসন-পত্র

মানুষ স্বাস্থ্যহানিকর হইলেও টিনের, এলুমিনিয়ামের বা কলাই করা পাত্রাদি বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা কাঁচের বা

পোর্সিলিনের পাত্র ব্যবহার করা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত। অবশ্য সাধারণ গৃহস্থালীতে ইহাদের ব্যবহার সুপ্রচলিত না হওয়ার কারণ এইগুলি ভংগুর। এ্যালকাথিনের পাত্রাদি কিন্তু সেইদিক হইতে বেশী ব্যবহারযোগ্য, কারণ তাহারা কম ভংগুরও বটে, আবার হাল্কাও বটে।

প্রসাধনদ্রব্য

মানুষের দেহকে সজ্জিত করার প্রচেষ্টাও আদিমকাল হইতেই দেখা যায়। প্রাচীনকালে মানুষ দেহে বিভিন্ন উল্কি কাটিয়া এই প্রয়োজন মিটাইত। একদিকে যেমন তাহাদের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, আধিভৌতিক বিশ্বাস এইসব উল্কি-কাটার সহিত জড়িত ছিল, তেমনি আবার তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধও ঐ ব্যাপারে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যে যার বিশ্বাসমতো জন্তু-জানোয়ার, ভূত-প্রেত, ঠাকুর-দেবতা ইত্যাদির ছবি যথাসাধ্য সুন্দরভাবে উল্কি কাটিয়া দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিত। পরবর্তীকালে ঐ সৌন্দর্যবোধের প্রেরণাই তাহাদের বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্য আবিষ্কারেরও প্রেরণা যোগাইয়াছে। জানা যায়, প্রাচীন ভারতে নারীরা কপালে পরিত কাজলের টিপ, সধবারা সীমন্তে দিত সিঁদুরের রেখা, ঠোঁটে ও পায়ে পরিত লাক্ষারস ও অলক্তক, দেহ ও মুখমণ্ডলের ত্বকের শ্রীবৃদ্ধি-উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিত ডাল-বাটা, হরিদ্রা বা নবনী। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দেহ ও মুখমণ্ডলের প্রসাধনে ব্যবহার করিত চন্দনের গুঁড়া ও চন্দনপংক, মৃগনাভি, জাফরাণ প্রভৃতি। কেশের সৌগন্ধের জন্য মেয়েরা তাহাদের চুল শুকাইত ধূপের ধোঁয়ায়। এইসব দ্রব্যাদির অধিকাংশই তাহারা নিজেরাই তৈরী করিয়া লইত। কিন্তু আজিকার দিনে একদিকে যেমন প্রসাধনদ্রব্য পুরুষেরা খুব বেশী ব্যবহার করে না, তেমনি মেয়েদের প্রসাধনদ্রব্যাদির সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; আর সেইগুলির জন্য তাহারা অন্যের মুখাপেক্ষীও বটে। দোকান হইতে সুগন্ধী তেল, সাবান, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক, নেইল পলিশ, আই-ব্রো পেনসিল প্রভৃতি হাজারো রকমের প্রসাধনদ্রব্য কিনিয়া তবে তাহাদের প্রসাধন পর্ব সমাপন করিতে হয়। এই ব্যাপারে, আমরা দেহ-সর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতাকে খুব বেশী অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রসাধনের ভারে দেহের প্রকৃত সৌন্দর্য চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আবার অর্থব্যয়ও হইতেছে প্রচুর। শহরের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারে দেখা যায় যে, অনেক সময় তাহারা

শরীরের পুষ্টির জন্য যথাযথ খাদ্যের ব্যবস্থা না করিয়াও প্রসাধন সামগ্রীর পিছনে অর্থব্যয় করিতেছেন। স্নো, পাউডার, সুগন্ধি তেল ইত্যাদি তো ভাত-ডালের মতোই শহরের মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকায় আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যই দেহের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। অনেক সময় সস্তাদামের প্রসাধনদ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা আমরা স্বাস্থ্যের হানি এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করিতেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মাথায় সস্তা সুগন্ধি তেল ব্যবহার করিয়া আমরা চুলের আয়ু নষ্ট করিয়া থাকি। প্রাচীনকালে যেসব দ্রব্য ব্যবহার করিয়া আমাদের দেশের মেয়েরা দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেন, তাহাদের কোনো কোনোটা ব্যবহারে আমরা অধিক ফল পাইতে পারি।

আসবাবপত্র

মানুষ যেদিন প্রথম ঘর তৈরী করিতে শিখিয়াছিল, সেদিন তাহাই ছিল তাহার কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি। কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শীতাতপ বা বাহিরের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়ই ছিল সেদিন তাহার কাছে বড়ো চাহিদা। তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। মানুষ যেমন তাহার গৃহকে সুন্দর
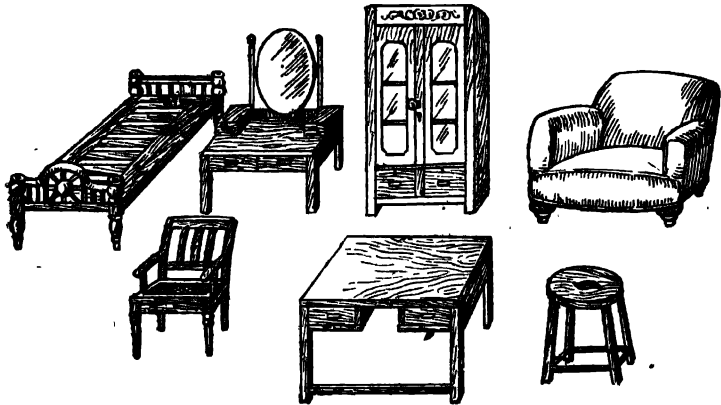
আসবাবপত্র

হইতে সুন্দরতর, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর আকৃতি দিয়াছে, তেমনি গৃহাভ্যন্তরে স্বাচ্ছন্দ্যেরও বিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার সেই প্রয়াসের ফলেই উদ্ভব ঘটিয়াছে বিবিধ আসবাবপত্রের! শোবার জন্য খাটিয়া, চৌকী, খাট, পালংক

প্রভৃতি, বসার জন্য নানারকমের চেয়ার, বেঞ্চ, টুল, সোফা, মোড়া, জলচৌকী প্রভৃতি, জিনিসপত্র রাখার জন্য নানাবিধ সেল্‌ফ্‌, আলমারী, ক্যাবিনেট প্রভৃতি, জামাকাপড় রাখার জন্য আলনা, আলমারী, ব্র্যাকেট, ওয়ার্ডরোব প্রভৃতি, বা লেখাপড়ার জন্য টেবিল, ডেস্ক, সেক্রেটারিয়েট টেবিল প্রভৃতির সহিত তোমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন আমরা এইসব বিভিন্ন আসবাবপত্র ব্যবহার করি, তেমনি আবার গৃহসজ্জায় শোবার ঘর বা বসার ঘর ইত্যাদির বিচার করিয়া বা ঘরের স্থানসংকুলান বিচার করিয়া বা অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়াও আসবাবপত্রের আকৃতি বা রূপ স্থির করা হইয়া থাকে। আবার, বাসনপত্রাদির ন্যায় আসবাবপত্রাদিও নানা উপাদানে তৈরী হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অবশ্য কাঠই প্রধান। অনেক সময় কাঠের সহিত নারিকেল দড়ি বা পুরু ফিতার ব্যবহার করিয়া খাটিয়া বা বেতের ছাউনী দিয়া চেয়ার প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়া থাকে। শুধু বেতের তৈরী মোড়া, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতিও বিশেষ সমাদর পাইয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে টেবিল, চেয়ার, ব্র্যাকেট, আলমারী প্রভৃতি নির্মাণে লোহা বা ষ্টীলও বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। আবার, এইসব ষ্টীলের চেয়ারে ছাউনীর জন্য বেতের বদলে ব্যবহৃত হইতেছে কাপড় বা এ্যালকাথিন ষ্ট্রীপ।
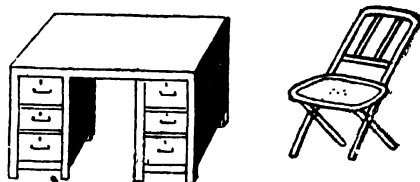
ষ্টীলের আসবাব

প্রাচীন বা মুস্লিম ভারতে আসবাবপত্রের বালাই বিশেষ ছিল না। বিশেষভাবে বৃটিশদের সংস্পর্শে আসিয়াই আসবাবপত্রের দিকে আমাদের এত নজর পড়িয়াছে। বর্তমানে আমাদের আসবাবপত্র অনেকটা বৃটিশদের

অনুকরণেই নির্মিত হইতেছে। পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে শোবার, খাবার এবং বসার ঘরের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে আসবাবপত্রের চিন্তা করা হইতেছে। আমাদের দেশে অবশ্য মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রঘরে এখনও আসবাবপত্রের বালাই খুব বেশী নাই।

শুধু গৃহনির্মাণ করিলেই তাহা বসবাসের যোগ্য হয় না। রাত্রির অন্ধকারে সেখানে আলোর ব্যবস্থা করিতেই হয়। আদিম গুহা-মানব পাথরে পাথর ঘষিয়া যেদিন প্রথম আগুনের আবিষ্কার করিয়াছিল, সভ্যতার সেই প্রথম উন্মেষেই সেই আগুনকে কাজে লাগাইয়া আলো জ্বালিয়া অন্ধকার দূর করিতেও মানুষ শিখিয়াছিল।

আলো

সেইদিন হয়তো যে জন্তুজানোয়ারের মাংস তাহারা খাইত, তাহারই চর্বিকে প্রদীপ জ্বালাইবার কাজেও তাহারা ব্যবহার করিত। তারপর মানুষ
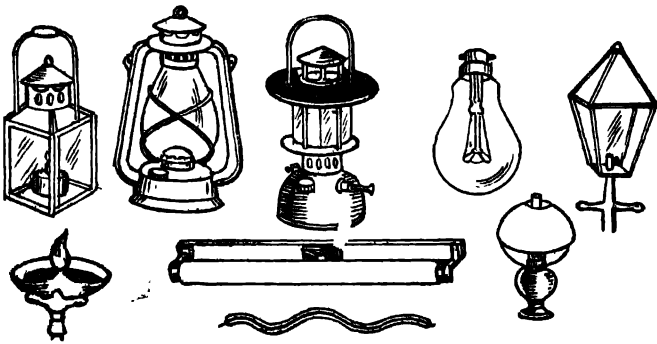
নানাপ্রকারের আলো

বিভিন্ন তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের কায়দা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার দ্বারা প্রদীপ জ্বালাইতে শিখিয়াছে। আরও পরে হাওয়ার হাত হইতে আলোকে বাঁচাইবার জন্য প্রদীপের পাশাপাশি লণ্ঠন্ প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। আলোকে আরও উজ্জ্বল করার নিমিত্ত নানারকমের গ্যাসের বাতি বাহির হয়। বর্তমান যুগে যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব সেখানে মানুষ আর প্রদীপ, লণ্ঠন, গ্যাসবাতি প্রভৃতির উপর অন্ধকার দূর করার জন্য নির্ভর করে না। এইগুলির পরিবর্তে তাহারা বৈদ্যুতিক আলোই ব্যবহার করিয়া থাকে।

গৃহনির্মাণের সংগে সংগে তাই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করাও আজিকার সভ্যদেশগুলিতে এক অন্যতম চাহিদা। শুধু আলোই নহে, গৃহাভ্যন্তরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, হাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যও বৈদ্যুত্যিক শক্তি ও আনুষংগিক যন্ত্রপাতির চাহিদা আজ সর্বত্রই অনিবার্যভাবে দেখা দিয়াছে। অবশ্য অনগ্রসর অঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি গিয়া পৌঁছায় নাই সেখানকার অধিবাসীদের কাছে বা শহরাঞ্চলেও যাহাদের সামর্থ্যে কুলায় না তাহাদের কাছে এই চাহিদা খুব বড়ো নয়। লণ্ঠন প্রভৃতির চাহিদাই তাহাদের কাছে এখনও বড়ো। নানাস্থানে জলে বাঁধ দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ফলে, আমাদের দেশে বর্তমানে অনেক গ্রামেও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি

তাই দেখ এক আলোকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের কত রকমারি জিনিসের প্রয়োজন। এক ইলেকট্রিক বাতির জন্যই প্রচুর সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়।

সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজনে মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, দূরত্বের গণ্ডী ভাংগিয়া পড়িয়াছে। দূর দূর দেশের সহিত যোগাযোগের চাহিদা অনিবার্য-ভাবে দেখা দিয়াছে। আর তাহারই ফলে মানুষ বিভিন্ন যানবাহনের আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথম যুগে মানুষ পায়ে হাঁটিয়া, বা তারও পরে ঘোড়ায় চাপিয়া বা জলপথে ভেলা বা নৌকায় করিয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াত করিত। তারপর আবিষ্কৃত হয় মনুষ্যবাহিত বা পশুচালিত শকট। আরও পরে বাষ্পের ব্যবহার শিখিবার ফলে মানুষ আবিষ্কার করে রেলগাড়ী, ষ্টীমার প্রভৃতি। আরও দ্রুততর যানবাহনের চাহিদার ফলে এবং পেট্রোলের ব্যবহার জানিবার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে উড়োজাহাজ, মোটর প্রভৃতি। শুধু তাহাই নহে। যোগাযোগ রক্ষার কাজকে আরও দ্রুতসম্পন্ন করার চেষ্টায়ই মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি। যদিও সাধারণ মানুষের এইসব জিনিসের মালিকানা অর্জনের উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতা নাই, তবু বিত্তবানদের কাছে ইহাদের চাহিদা যথেষ্ট।

যানবাহন

ইহাদের প্রত্যেকটিকে ঘিরিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের শত শত জিনিসের চাহিদা। ভাবিয়া দেখ, রেলগাড়ী বা জাহাজ তৈরী করিতে কত রকমের কত জিনিসের প্রয়োজন!

কিন্তু মানুষ শুধু খাইয়া পরিয়া দেহগত জীবনধারণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকে না। জীবজগতের সর্বোচ্চ স্তরের প্রাণী হিসাবে তাহার একটা মানসগত জীবনও আছে। এই মানসজীবনের প্রকাশকেই বলা হয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি সকল মানুষের এক নহে। সংস্কৃতির মূলে আছে কায়িক শ্রম হইতে অবসর। ফলে, যুগে যুগে যে জাতি যত বেশী সামাজিক ধনসঞ্চয় করিতে পারিয়াছে, সেই জাতিই তত বেশী সংখ্যক লোককে ধনোৎপাদনগত কায়িক শ্রম হইতে মুক্তি দিয়া অবসরের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। আর সেই সুযোগে তাহারা চিন্তা, অধ্যয়ন, সাহিত্যচর্চা, শিল্পচর্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়া নিজস্ব তথা সমাজগত মানসের ধ্যানধারণা মনন-কল্পনাকে রূপদান করিয়াছে, জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আধুনিককালে যান্ত্রিক সভ্যতা প্রসারের সংগে সংগে কায়িক শ্রমের কাজ যন্ত্রের সাহায্যে যত বেশী হওয়া শুরু হইয়াছে, মানুষের অবকাশও তত বাড়িয়াছে। ফলে, মানস-সংস্কৃতির অনুশীলনেও মানুষ বেশী ব্রতী হইবার সময় পাইতেছে। তবে, কেহ বা এই সংস্কৃতিকে সমসাময়িক সমাজবিন্যাসের প্রয়োজনে সৃষ্টির প্রেরণায় সমৃদ্ধতর করিয়া চলিয়াছে, কেহ বা শুধু তাহাকে উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে। অবশ্য, আধুনিককালেও যে সকল মানুষই সংস্কৃতির অনুশীলনের সমান সুযোগ পাইয়া থাকে সে কথা ভাবিলে ভুল হইবে। এই ব্যাপারেও অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য বহুলাংশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

সংস্কৃতি

সমাজে মানসের এই অভিব্যক্তি দেখা যায় সাহিত্যে, শিল্পকলায়, নৃত্যগীতে, আমোদপ্রমোদে। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই সাংস্কৃতিক চাহিদা আমাদের আরও কতকগুলি ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদার সৃষ্টি করিয়াছে। কাগজপত্র, দোয়াত, কালি, কলম, বই, নানাবিধ খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্রাদি, তুলি, রং প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে প্রধান। অবসর উপভোগের

সাংস্কৃতিক অনুশীলনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

অন্যতম আনুষংগিকরূপে রেডিও, গ্রামোফোন, রেডিওগ্রাম, টেলিভিসন প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

সেবার চাহিদা

বর্তমান সমাজ দিন দিনই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এই সমাজে আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এখানে সার্থক জীবনযাপন করিতে হইলে পুলিশ, বিচারক, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি আরও অনেকের সাহায্য প্রয়োজন। আবার পুলিশ, বিচারক, ডাক্তার প্রভৃতি যদি আমাদিগকে আশানুরূপ সাহায্য দিতে চান, তবে তাহাদের প্রয়োজন হয় নানারূপ যন্ত্রপাতির ও দ্রব্যের। ঐসব প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের সেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা। যদিও এই চাহিদাগুলি আমাদের অন্যান্য চাহিদা হইতে প্রকৃতিতে ভিন্ন, তবু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাদের গুরুত্ব কম নহে।

নিরাপত্তামূলক সেবার চাহিদা

প্রথমই আমাদের শত্রু হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর। এই সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করা এবং যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া সেবা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের অন্যতম প্রধান চাহিদা। তাই, প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত চাহিদা না হইলেও, জাতীয় প্রয়োজনে গোলা, বারুদ, কামান, ট্যাঙ্ক, জংগী বিমান ইত্যাদির চাহিদা আছে। দেশের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী এবং তাহার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রয়োজনও জাতির রহিয়াছে।

স্বাস্থ্যমূলক সেবার চাহিদা

তারপর সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজন হয় ডাক্তারের এবং নানাবিধ ঔষধের। আমাদের দেশে এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন আছে। এই তিনধরনের চিকিৎসার জন্যই উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত যথেষ্টসংখ্যক চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত নির্ভরযোগ্য অসংখ্য রকমের ঔষধের প্রয়োজন। সভ্যতার জটিলতা বৃদ্ধির সংগে সংগে আমাদের জীবনযাত্রা যত জটিল হইতেছে, স্বাস্থ্যরক্ষা ততই কঠিন হইয়া পড়িতেছে এবং চিকিৎসক এবং ঔষধপত্রের উপর আমরা ততই নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছি। বিশেষ করিয়া নগর (city) এবং শহরের

(town) উদ্ভবের জন্য বর্তমানে জনস্বাস্থ্যরক্ষার বিধিবদ্ধ চেষ্টা করাও আমাদের চাহিদার অন্যতম। অনেক লোক খুব কাছাকাছি বাস করার নিমিত্ত এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত থাকার জন্য, নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখা, সংক্রামক রোগের ব্যাপকতা নিরোধ করা, ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করা ইত্যাদি কাজের জন্য জনস্বাস্থ্যবিভাগের বিশেষ প্রয়োজন। এই বিভাগের কর্মীরা যাহাতে যথোপযুক্ত শিক্ষা পান এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি যাহাতে সহজে পাওয়া যায়, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

তারপর, বর্তমানে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ হইয়াছে এবং চিকিৎসা-কার্যের জন্য যেভাবে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হইতেছে তাহাতে অধিকাংশ লোককেই হাসপাতালের চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই আমাদের চাই যথেষ্টসংখ্যক হাসপাতাল এবং এইগুলির জন্য ডাক্তার ব্যতীতও নার্স এবং আরও নানাধরনের কর্মীর।

ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথার উদ্ভবের ফলে তাহার অবশ্যম্ভাবী উত্তরফল মালিকানা লইয়া নানাধরনের বিরোধ আছে। ইহা ছাড়া, মানুষে মানুষে মতের অমিল, নানাধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ফলে ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি প্রভৃতি হইয়া থাকে। পূর্বে এই সব বিরোধ গোষ্ঠীপতি নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন।

আইনমূলক সেবার চাহিদা

কিন্তু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে তাহা আর সম্ভব হয় না। ফলে, বহুবিচিত্র বিচারপ্রথার উদ্ভব হইয়াছে। সংগে সংগে ইহা চালু রাখিবার জন্য বিচারক, আইনজীবি, মুহুরী প্রভৃতি নানারকমের কর্মীর প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা, পুস্তক এবং কিছুটা যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন।

গণতন্ত্রকে চালু রাখিতে হইলে, বিচারশীল গণমত গঠন করা অপরিহার্য। অপরদিকে, আমরা প্রত্যেকে যদি দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হই, তবে দেশের, এমন কি বিদেশেরও কোথায় কি হইতেছে সে সম্বন্ধে নির্ভর-যোগ্য সংবাদ পাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সংবাদপত্রমূলক সেবার চাহিদা

আমাদের এই দুই প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সংবাদপত্রের

চাহিদা। আর সংবাদপত্রকে চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজন দেশে-বিদেশে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার প্রতিষ্ঠা। তারপর, সংবাদপত্রের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের কাগজ, ছাপার যন্ত্রপাতি, রেডিও, টেলিপ্রিণ্টার ইত্যাদি সংবাদ সরবরাহের নানারকমের যন্ত্র এবং অসংখ্য ধরনের কর্মীর।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সেবাসংক্রান্ত চাহিদা

আমাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্তও আমাদিগকে অনেকের সেবা গ্রহণ করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের চুল-দাড়ি কাটিবার জন্য নাপিতের, জামা-কাপড় কাচিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য ধোপার এবং কর্মপ্রয়োজনে যখন আমাদের নিজ আবাসের বাহিরে থাকিতে হয় তখনকার জন্য হোটেল ইত্যাদির প্রয়োজন। আবার যন্ত্রসভ্যতা এত অগ্রসর হইয়াছে যে আমাদের অনেকের বাড়ীতেই কলের জল, ইলেকট্রিক বাতি ইত্যাদি নানারকমের যান্ত্রিক দ্রব্য আছে। ইহাদিগকে চালু রাখাও এক সমস্যা। ইহার জন্য আমাদের নানারূপ কারিগরের প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নলওয়ালা (plumber), ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ইত্যাদি নামের উল্লেখ করা যায়। ইহা ছাড়া, বিত্তবানদের বাড়ীতে পাচক, পরিচারক প্রভৃতির সেবার চাহিদাও রহিয়াছে।

শিক্ষামূলক সেবার চাহিদা

সভ্যতা জটিলতর হওয়ার সংগে সংগে শিক্ষামূলক সেবার চাহিদাও দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্বের মতো পরিবারের ভিতর দিয়া সমাজে বাস করিবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং বৃত্তিগত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নহে। তাই নার্সারি বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় (college) এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধাপে ধাপে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাডা, বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য কতরকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সীমা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক, শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয় ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সেবা ব্যতীত আমাদের জীবন কিছুতেই সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না, সার্থক হইতে পারে না।

আমাদের শিক্ষালাভের চাহিদা মিটাইবার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব্যতীতও

পাঠাগার (Library), যাদুঘর (Museum), বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি আরও অনেক রকমের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Discuss, with proper illustrations, the various consumer goods we need besides food, cloth and shelter.

2. Describe, with illustrations, the various services we are in need of in the present age.

B. Below are given two sets of words. Match them and put the number of the word in the right-hand column against the word with which it matches in the left-hand column.

(a)	1. utensils	1. table
	2. cosmetics	2. glass
	3. furniture	3. bulb
	4. lighting	4. powder
	5. communication	5. violin
	6. recreational equipments	6. aeroplane
(b)	1. Technical service	1. Sanitary inspector
	2. Personal service	2. Cook
	3. Domestic service	3. Teacher
	4. Health service	4. Detective
	5. Legal service	5. Barber
	6. Protective	6. Advocate
	7. Educational service	7. Plumber

C. (1) In your scrap-book make a table like this :—

Names of our needs other than food, cloth or shelter	What purpose they serve	Names of as many goods as you can think of, which satisfy the need, one by one	Drawings or pictures of the goods
1. utensils	required in connection with cooking, eating and drinking	1. glass 2. plate etc.	

(2) In your scrap-book make another table like this :-

Names of the services we require	What purpose the services render	Names of as many establishments as you can think of, engaged in rendering those services	Drawings or pictures of them
Personal services	engaged in taking care of the person or his apparel	1. barbers 2. waiters 4. bootblacks etc.	

D. The following projects may be undertaken :—

1. Every student may visit a consumers' goods shop and make a list of articles available in it under the following heads : (a) Name of the article, (b) Purpose for which used, (c) Price of the article, (d) Place where it is made.

2. Five students may form a group and make a list of consumers' goods (from information gathered) which their houses need to possess. There may be discussions of the list prepared by the groups in the general class.

জীবনের চাহিদা পূরণের উপায়

আমাদের জীবিকা, আমাদের কৃষি, কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্যাদি, আমাদের বনজ দ্রব্যাদি; আমাদের খনিজ দ্রব্যাদি, আমাদের শিল্প, আমাদের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

আমাদের জীবিকা

সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে আমাদের জীবনের চাহিদা বিচিত্র এবং বহুবিধ হইয়া উঠিয়াছে। এই চাহিদা মিটাইতে গিয়াই আমাদের সমাজে বহুবিধ জীবিকার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে অনেক চাহিদা নিবৃত্তির জন্যই আমরা পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে, আমাদের দেশে জীবিকার সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের অনেকেরই বিশেষ বিশেষ ঝোঁক এবং ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে। কেহ হয়তো কৃষিকাজ ভালোবাসে, আবার কেহ বা যন্ত্রপাতির কাজ ভালো পারে; তৃতীয় জন হয়তো চারুশিল্পের প্রতি অনুরাগী। বর্তমানে নানা রকমারী কাজের সৃষ্টি হওয়ায়, প্রত্যেককেই তাহার মনোমতো এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন জীবিকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও এই সংখ্যা ছিল দুই হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ। বিদেশে যান্ত্রিক সভ্যতার আরও উন্নতি হইয়াছে। সেখানে অবশ্য জীবিকার সংখ্যা আরও অনেক বেশী। এইসব জীবিকার কোনটিই হীন নহে। অথচ, ইহাদের অনেকের সম্বন্ধেই আমরা কিছুই জানি না। আমাদের এই অজ্ঞতার ফলে যেসব জীবিকার সন্ধান আমরা রাখি তাহার খোঁজেই বেশী সংখ্যক লোক ভিড় করে। তাহারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অন্যান্য জীবিকাগুলি অনাদৃতই থাকিয়া যায়, এবং সেইসব জীবিকাজাত দ্রব্যের চাহিদাও সবসময় ঠিকমত পূরণ হয় না। তাই নিজেদের স্বার্থে তথা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে এই সব বিভিন্ন জীবিকা সম্বন্ধে আমাদের জানা প্রয়োজন।

জীবিকা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন

অবশ্য তিন হাজার জীবিকার প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই আলাদা আলাদাভাবে জানা সম্ভব নহে। সেই কারণেই আমাদের জাতীয় কর্ম-নিয়োগ সংস্থা (National Employment Service) এইসব বিভিন্ন জীবিকাকে মোটামুটিভাবে জীবিকায় লিপ্ত

জীবিকার শ্রেণীবিন্যাস

কর্মীদের স্বগোত্রীয়তার ভিত্তিতে ১০টি ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। এই বিভাগগুলি হইতেছে—

১। বৃত্তিগত, শিল্পগত বা তৎসংক্রান্ত কর্মী (Professional, Technical and related workers)—যেমন, ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান ইত্যাদি।

২। শাসন-সংক্রান্ত বা পরিচালনা-সংক্রান্ত কর্মী (Administrative, Executive and Managerial works)—যেমন, ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যানেজার, সেক্রেটারী ইত্যাদি।

৩। করণিক বা তৎসংক্রান্ত কর্মী (Clerical and related workers)।

৪। বিক্রয়-সংক্রান্ত কর্মী (Sales workers)—যেমন, এজেন্ট, সেলস্‌ম্যান্ ইত্যাদি।

৫। কৃষক, মৎস্যজীবী, শিকারী, কাঠুরে বা তৎসংক্রান্ত কর্মী (Farmers, Fishermen, Hunters, Loggers and related workers)।

৬। খনি-খনক, প্রস্তর-খনক বা তৎসংক্রান্ত কর্মী (Miners, Quarry-men, and related workers)।

৭। যানবাহন এবং যোগাযোগের কাজে নিযুক্ত কর্মী (Workers in Transport and Communication occupations)—যেমন, গার্ড, ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর ইত্যাদি।

৮। কারুশিল্পী, উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত কর্মী, এবং অন্যত্র অনুল্লিখিত শ্রমিক (Craftsmen, Production Process Workers and Labourers not elsewhere classified)।

৯। সেবা, খেলাধূলা এবং আমোদ-প্রমোদসংক্রান্ত কর্মী (Service, Sports and Recreation workers) এবং নার্স, গায়ক ইত্যাদি।

১০। যেসব কর্মীকে বৃত্তিগতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না (Workers not classifiable by occupation)।

আমাদের চাহিদা হিসাবেও বৃত্তিগুলিকে ভাগ করা যাইতে পারে এবং ঐরূপ ভাগ করিয়া আলোচনা করিলেই তোমাদের বুঝিতে সহজ হইবে।

তোমরা জান, আমাদের প্রধান চাহিদা খাদ্য। কৃষির সাহায্যে প্রধানত

খাদ্যের উৎপাদন হয়। আজিকার দিনে কৃষিকার্য-পদ্ধতি বহু জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে। একদিকে জমিতে কৃত্রিম সারের ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্ভব ঘটিয়াছে; অন্যদিকে বিজ্ঞানের বিস্তৃতির সংগে সংগে জমি চাষ করিবার জন্য ক্রমেই উন্নততর ও অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে। ফলে, আগে যেমন কৃষিজীবি বলিতে আমরা শুধুই চাষীদের বুঝিতাম, তাহার পরিবর্তে এখন চাষীরা ছাড়াও কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া বহু জীবিকা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই জীবিকাগুলির যে কোনোটির জন্য উপযুক্ত হইতে হইলে প্রয়োজন হয় দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। যেমন, কোন্ জমিতে বা কোন্ শস্যে কোন্ সার বেশী কার্যকরী হইবে, কোন্ শস্য কোন্ পোকায় নষ্ট করে এবং সেই পোকা কোন্ রাসায়নিক পদার্থ দিয়া মারা যায়—এই সব বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের চাহিদা আজ কৃষিকার্যের জন্য প্রচুর। ইহাদের এণ্টমলজিষ্ট বলা হয়। আবার কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে ট্র্যাক্টর, মোটর লাংগল, হ্যারো, রোলার প্রভৃতি জমিকর্ষণ যন্ত্র, ড্রিল প্রভৃতি বীজবপন যন্ত্র, হো প্রভৃতি আগাছা তুলিয়া মাটিকে আলগা করিয়া দিবার যন্ত্র, শস্যছেদন যন্ত্র, শস্যের দানাগুলিকে পৃথক ও উপরের আস্তরণ হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য শস্যমর্দন যন্ত্র, আবশ্যক হইলে স্থান ও অবস্থা অনুযায়ী জলসেচের জন্য ওয়াটার এলিভেটার, ড্রেনেজ পাম্প প্রভৃতি জলসেচন যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে ঐ সব যন্ত্রচালনে বিশেষজ্ঞ কর্মীদেরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সব যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রয়োগের খাতিরেই বড়ো বড়ো যৌথ খামার গড়িয়া ওঠার ফলে প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বৈজ্ঞানিক, কৃষিকাজে শিক্ষিত এবং বিশেষজ্ঞ ম্যানেজার, পরিদর্শক, ওভারসীয়ার প্রভৃতি জীবিকার কর্মীদের। সংক্ষেপে, এই কৃষিকার্যকে ঘিরিয়া হাজার রকমের জীবিকার সৃষ্টি হইয়াছে।

কৃষিকার্য ও তৎসংক্রান্ত জীবিকা

বর্তমানে আমরা আমাদের দেশের কৃষিকার্যকে আধুনিক রূপ দিতে বদ্ধপরিকর। তাই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পের উপর গুরুত্ব পড়িলেও পরিকল্পনা কমিশন কৃষিকার্যকেও অবহেলা করেন নাই। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিখাতে বরাদ্দ ৩৫৭ কোটি টাকার স্থলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কৃষি

খাতে বরাদ্দ ৫৬৮ কোটি টাকা কৃষির এই ক্রমবর্ধমান গুরুত্বেরই স্বীকৃতি। তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ অর্থের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া ১৪৭৫ কোটি টাকা করা হইয়াছে। ফলে, আমাদের দেশে কৃষিকার্য সংক্রান্ত সর্বপ্রকার জীবিকার সংখ্যা যে দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সব জীবিকার জন্য যথাযথ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের যে অভাব হইবে ইহাও নিশ্চিত। তোমাদের যাহাদের কৃষিকার্যের দিকে বিশেষ ঝোঁক এবং প্রবণতা আছে তাহারা কৃষিসংক্রান্ত জীবিকা গ্রহণের চিন্তা করিতে পার। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষার এবং গবেষণার জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইতেছে। বাংলা দেশের অনেক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে) কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তারপর চুঁচুড়া, ঝাড়গ্রাম ও কোচবিহারে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠশেষে আরও এক বৎসর কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করা যাইতে পারে। হরিণঘাটার কৃষি-মহাবিদ্যালয়ে তো উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর আরও পাঁচবৎসর কৃষিবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে B. Sc. (Agriculture) তিন বৎসরের জন্য পড়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দিল্লীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, কটকের সেণ্ট্রাল রাইস রিসার্চ স্টেশন, পাটনার সেণ্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, পাঞ্জাবের সেণ্ট্রাল ভেজিটেবল ব্রিডিং স্টেশন উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কৃষিসংক্রান্ত কর্ম সংগ্রহ এবং উচ্চ শিক্ষা উভয়েরই সুযোগ আছে।

কৃষিসংক্রান্ত জীবিকার প্রস্তুতির নিমিত্ত শিক্ষার ব্যবস্থা

কিন্তু শুধু শস্য দিয়াই আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটে না। তাই অন্যবিধ খাদ্যের চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে কৃষিকার্যের পাশাপাশি পশুপালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা মানুষ বহুদিন ধরিয়াই করিয়া আসিতেছে। তবে কৃষিকার্যের মতো পশুপালন ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সাম্প্রতিক কালের। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইউরোপ বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পশুখাদ্য উৎপাদন, পশুপ্রজনন, পশুচিকিৎসা, কুক্কুটাদির ডিম হইতে কৃত্রিম

পশুপালন-সংক্রান্ত জীবিকা

উপায়ে বাচ্চা বাহির করা, পশুমাংস সংরক্ষণ, বা পশুদুগ্ধ হইতে খাদ্যাদি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ প্রভৃতি সর্বকার্যেই যন্ত্রাদির ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপকরূপ ধারণ করিয়াছে। ফলে, সেই সব দেশে ঐ সব বিভিন্ন কাজে বিশেষজ্ঞদের চাহিদা খুবই বেশী। আমাদের দেশ এখনও এসব ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। অথচ, তোমরা জান, প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের চাহিদা আমাদের খুবই বেশী। তাই, জাতীয় স্বার্থেই কৃষিকার্যের ন্যায় পশুপালনের উপরও আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে গবাদি পশুর প্রজনন কেন্দ্র, পশুচিকিৎসালয়, হাঁসমুরগীর পালন ও প্রজনন কেন্দ্র, দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র, মাখন-চীজ প্রভৃতি তৈরীর কেন্দ্র, দুগ্ধ-শুষ্কীকরণ কেন্দ্র, মাংস তাজা রাখার জন্য হিমপ্রকোষ্ঠ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নগণ্য, তবু ইহাদের স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন আমাদের প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূর্বেকার তুলনায় বেশী মিটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে বহু নূতন নূতন জীবিকার উদ্ভব ঘটিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত বিভিন্ন পশুপালন, পশুজাত খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলির জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়াছে পশু-রসায়ন, প্রজনন, পশুর রোগবাহী জীবাণু ধ্বংসকরণ, দুগ্ধশুষ্কীকরণ, দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী ও সংরক্ষণ, পশুজাত খাদ্যদ্রব্য তৈরী ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য অভিজ্ঞ কর্মীর। উন্নততর কৃষিবিদ্যার মত তাই উন্নততর পশুপালন ও খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন দিক শিক্ষাদানের জন্যও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুক্তেশ্বর ও ইজাতনগরের ইণ্ডিয়ান ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বাংগালোর ও কর্ণালে ডেয়ারী রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রধান। আমাদের পশ্চিম বংগে কলিকাতাস্থ বেংগল ভেটেরিনারী কলেজও ইহাদের অন্যতম।

মৎস্যচাষ-সংক্রান্ত জীবিকা

মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও নরওয়ে, ইংল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ যেরূপ অগ্রগামী রহিয়াছে তাহার তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পিছাইয়া আছে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয় তাহা সুপ্রচুর নহে। তাই সাম্প্রতিককালে উন্নততর প্রথায় মৎস্যচাষের চেষ্টা শুরু হইয়াছে। তাছাড়া ট্রলার প্রভৃতি

জেলে-স্টীমার আনিয়া গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবারও ব্যবস্থা ধীরে ধীরে করা হইতেছে। ফলে, একদিকে যেমন মৎস্যের প্রয়োজন কিছুটা মেটানোর আয়োজন হইয়াছে, তেমনি মাছের যকৃৎজাত তৈল প্রভৃতি মৎস্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। ইহার ফলে নূতন নূতন জীবিকারও উদ্ভব হইয়াছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বা উন্নততর মৎস্যচাষের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের (Pisciculturist) প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, মৎস্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্যও ঐ কাজে বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতাস্থ সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন, মাদ্রাজের মণ্ডপম্-স্থিত সেণ্ট্রাল মেরাইন রিসার্চ স্টেশন (ফিশারিজ), বোম্বাইর ডীপ সী ফিশিং রিসার্চ স্টেশন এবং কোচিনস্থ সেণ্ট্রাল ফিশারিজ টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ স্টেশন উল্লেখযোগ্য।

আমাদের অন্যতম চাহিদা খাদ্যের প্রসংগেই জ্বালানী কাঠের কথাও আসিয়া পড়ে। খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য অপরিহার্য এই জ্বালানী কাঠ প্রধানত আমরা পাইয়া থাকি বন হইতে। অবশ্য শুধু জ্বালানী কাঠই নহে, বনজ দ্রব্যাদি হইতে মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু চাহিদা মিটিয়া থাকে। গৃহনির্মাণে, গৃহের নানারূপ আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে, যানবাহনের সম্পূর্ণ বা আংশিক নির্মাণকার্যে, বিভিন্ন খেলার বা বাদ্যযন্ত্রের অংশ তৈরী করিতে, আমাদের কাঠের প্রয়োজন হয়। আবার, বহু শিল্পদ্রব্য সৃষ্টির জন্য অনেক উপাদান বন হইতেই পাওয়া যায়; যথা, কাগজ তৈরীর জন্য কাঠের মণ্ড, কৃত্রিম রেশম বস্ত্র নির্মাণের জন্য কাঠের আঁশ, চামড়া রং করার জন্য হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী গাছের উপাদান, মোম, লাক্ষা প্রভৃতি। বহুদিন পর্যন্ত মানুষ বন হইতে তাহার চাহিদা অনুযায়ী এই সব জিনিস সংগ্রহ করিয়াছে; বসবাসের জন্য অথবা চাষের জন্য বন কাটিয়া ধ্বংস করিয়াছে। নূতন করিয়া বন আবাদের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন পর্যন্ত সে অনুভব করে নাই। অথচ, তাহার ফলে একদিকে যেমন বনজ সম্পদ ক্রমেই কমিয়া যায়, তেমনি দেশের সামগ্রিক ক্ষতিও হইয়া থাকে। কারণ, বন থাকিলে শিকড়ের বন্ধনে মাটি জলে ধুইয়া

বনসংক্রান্ত জীবিকা

যাইতে পারে না, সন্নিহিত নদীতে সহজে জলবৃদ্ধি হইয়া বন্যা হইতে পারে না। আবার, বনের অবস্থিতিই সন্নিহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায় ও ঝড়ের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। এইসব কারণেই বিদেশে গত শতক হইতেই নূতন করিয়া বন আবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। বিভিন্ন শস্যের মতো নূতন নূতন বনেরও চাষ হইতেছে। আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে বন সংরক্ষণের কাজ কিছু পরিমাণে শুরু হইলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই এইদিকে আমাদের বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছে। বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া নূতন নূতন বনের আবাদও শুরু হইয়াছে। ইহার ফলে অরণ্য বিভাগেও নূতন নূতন জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। একদিকে যেমন কনজারভেটার, ফরেষ্টার, এসিষ্ট্যান্ট ফরেষ্টার, রেঞ্জার, ফরেষ্ট অফিসার প্রভৃতি পদের জন্য অরণ্য-বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, তেমনি অরণ্য আবাদের জন্য মৃত্তিকা-বিশেষজ্ঞ, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, রাসায়নিক প্রভৃতিরও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাছাড়া, বৃক্ষাদি হইতে তার্পিন তেল, লাক্ষা প্রভৃতি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাদি চালনে অভিজ্ঞ ডাইজেষ্টার অপারেটার, ডিষ্টিলার, ল্যাক ট্রিটার প্রভৃতি জীবিকারও উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই সব ব্যাপারে অনুশীলন ও সমীক্ষা পরিচালনের জন্য ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, যোধপুর ডেজার্ট এফোরেষ্টেশন রিসার্চ ষ্টেশন, এবং কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ডের অধীনে দেরাদুন, কোটাল, বাসদ, বেল্লারী, উটকামণ্ড, ছাতরা (নেপাল), চণ্ডীগড় ও আগ্রায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

খনিসংক্রান্ত জীবিকা

বনজ সম্পদের মতো অসংখ্য প্রকার খনিজ সম্পদও আমাদের বহু চাহিদা মিটাইয়া থাকে। কি আসবাবপত্রাদি বা রন্ধনের সরঞ্জামাদি সাংসারিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, কি বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রপাতি নির্মাণে, কি গৃহাদি নির্মাণে, কি যুদ্ধের প্রয়োজনে কিংবা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রাদি তৈরী করিতে, কি টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যন্ত্রাদি, রেডিও, মোটর, ডাইনামো প্রভৃতি নির্মাণে সর্বত্র লোহার প্রয়োজন অতুলনীয়। নানাপ্রকার বাসন, জাহাজের আবরণ, বিদ্যুৎবাহী তার প্রভৃতি তৈরীর জন্য প্রয়োজন তামার। গৃহস্থালীর বিভিন্ন দ্রব্যাদি, আকাশযান, নৌকা, জাহাজ, ইলেকট্রিক সংক্রান্ত জিনিসপত্র তৈরীর কাজে হাল্কা অথচ শক্ত

এলুমিনয়ামের ; গ্যাস প্রভৃতি পরিচালনের নল, বন্দুকের গুলি, রং প্রভৃতি তৈরীর জন্য সীসার রং ; এবং ঘরের চাল, পাত্রাদি তৈরীর জন্য টিনের প্রয়োজন। শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম অপরিহার্য। আবার ঐ কয়লা হইতেই আলকাতরা, পীচ, স্যাকারিন প্রভৃতি, এবং পেট্রোলিয়াম হইতে লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যারাফিন বা মোম, এ্যাসফ্যাল্ট বা পীচ প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। বালুজাত সিলিকা কাঁচের প্রধান উপকরণ। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্মাণের ব্যাপারে তাপ-অপরিবাহী অভ্র, তাপসহ চুল্লী নির্মাণের জন্য ক্রোমাইট, গৃহাদির চাল তৈরীর জন্য এ্যাসবেসটস, লবণ প্রভৃতি আরও হাজারো রকমের খনিজ দ্রব্য আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিয়া থাকি। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার সংগে সংগে আমরা নূতন নূতন খনি আবিষ্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। বর্তমানে আমাদের যে সব খনি আছে তাহাদের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যে অনেক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারপর নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া পুরাতন খনিগুলির যাহাতে পূর্ণ ব্যবহার হয় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। খনিকে কেন্দ্র করিয়া উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিয়াছে—দুর্লভ খনিজের পরিবর্তে সুলভ খনিজ দিয়া কাজ চালাইবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হইতেছে। এই সব প্রচেষ্টার ফলে দেখা যায় যে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মাত্র ৫০ জন কর্মীর বদলে ৩৫০ জন ভূ-তত্ত্ববিদ্ (Geologist), ভূ-পদার্থবিদ্ (Geophysicist) ও কারিগরী অফিসারের বিরাট বাহিনীতে পরিবর্তন, খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও সদ্ব্যবহারের উপায় নির্ধারণের জন্য ব্যুরো অব মাইনস্ স্থাপন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শক্তির উৎস নির্ধারণ ও যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন স্থাপন, আণবিক শক্তির উৎস বিভিন্ন খনিজের সন্ধানের জন্য এ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিশন স্থাপন প্রভৃতি খনিজের প্রতি আমাদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব জ্ঞাপনেরই নির্দেশক। আর ইহার ফলেই খনিকে কেন্দ্র করিয়া ড্রিলার, মাড্ এ্যাটেনড্যাণ্ট, কোর হাউস এ্যাসিসট্যাণ্ট, প্রেসেসম্যান, মাইন ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন জাতীয় ইঞ্জিনম্যান, স্ক্রিনিং প্ল্যাণ্ট এ্যাটেনড্যাণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া, বিভিন্ন খনিতে ম্যানেজারাদি দায়িত্বসম্পন্ন পদের জন্য খনির কাজে উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদেরও প্রয়োজন

রহিয়াছে। এই সব কর্মীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ধানবাদের দি ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস এণ্ড এ্যাপ্লাইড জিওলজিকে নূতন করিয়া সুসংগঠিত করা হইয়াছে। ধানবাদেই বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত ন্যাশনাল স্কুল অব মাইনস নামক আরেকটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও কলেজ অব মাইনিং এণ্ড মেটালার্জি নামক প্রতিষ্ঠানে খনিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব শিখাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ভূতত্ত্ব (Geology) পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু কি বনজ, কি খনিজ কোনো পদার্থই সাধারণত স্বভাবজ অবস্থায় আমাদের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা মিটাইতে পারে না। খাদ্যাদি ছাড়া পাট, শণ প্রভৃতি বহু কৃষিজাত দ্রব্যও অনুরূপভাবে স্বভাবজ অবস্থায় আমাদের কাজে লাগে না। তাই, এই সব দ্রব্যকে নানা যন্ত্রের সাহায্যে, নানা পদ্ধতিতে নিজ চাহিদা অনুসারে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা মানুষকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই করিতে হইয়াছে। এই চেষ্টার ফলেই শিল্পজগতের উদ্ভব। বর্তমানকালে, বড়ো বড়ো যন্ত্রের সাহায্যে বিশাল শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই রীতি—অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহাই অধিকতর লাভজনক।

শিল্পসংক্রান্ত জীবিকা

আদিম মানুষ প্রাকৃতিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজেদের চাহিদা নিজেরাই মিটাইত। পাথর কাটিয়া হয়তো অস্ত্র প্রস্তুত করিল, গাছের ছাল দিয়া বস্ত্র হইল। শিল্পসৃষ্টির সেই প্রথম উদ্ভব। ধীরে ধীরে শিল্পকার্যে তাহারা দক্ষতা অর্জন করিল। ক্রমে দক্ষ শিল্পীরা দলবদ্ধ হইয়া (Guilds) কারখানা স্থাপন করিয়া যৌথভাবে কাজ করিতে লাগিল এবং ঐ সব শিল্পদ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতে লাগিল। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে এই সকল কারখানা লোকবহুল অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিল, ক্রমশ নূতন নূতন আবিষ্কার হইতে লাগিল এবং শিল্পরচনা নিত্য নূতন রূপ ধারণ করিয়া বর্তমানের বিরাট ও জটিল সর্জন শিল্পে পরিণত হইল। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা অধ্যুষিত দেশে এই সর্জন শিল্প প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং এই জাতীয় শিল্পে ব্যাপক শ্রমবিভাগের ফলে যেমন বহুবিধ জীবিকার উদ্ভব ঘটিয়াছে, তেমনি বহু লোকের জীবিকার সংস্থানও হইয়াছে। তবে ঐসকল স্থানেও কুটিরশিল্প এবং কারখানা-শিল্পও প্রচলিত আছে এবং উহারা বৃহৎ

শিল্পের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করিয়া বহু লোকের জীবিকার সংস্থান করিয়া দিতেছে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বড়ো বড়ো শিল্প গড়িয়া ওঠার সুযোগ হয় নাই। আমাদের বিদেশী শাসকেরা এই দেশের সুপ্রচুর খনিজ, বনজ ও কৃষি সম্পদকে প্রধানত কাঁচামাল হিসাবেই স্বদেশে রপ্তানী করিয়াছে এবং বিদেশজাত ভোগ্যদ্রব্যাদি এই দেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে স্বভাবতই বড়ো বড়ো শিল্প গড়িয়া তোলার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছে। আমাদের জাতীয় সরকার এই ঝোঁককে শুধুই যে স্বাগত জানাইয়াছে তাহাই নহে, আমাদের জাতীয় পরিকল্পনাগুলিতে শিল্পায়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তাই, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে শিল্পখাতে বরাদ্দ হইয়াছিল মাত্র ১৭৯ কোটি টাকা, সেই জায়গায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পখাতে বরাদ্দ হইয়াছে ৮৮০ কোটি টাকা, আর তৃতীয় পরিকল্পনায় ২,৫০০ কোটি টাকা।

শিল্পের এই ক্রমবর্ধমান প্রসারের ফলে স্বভাবতই বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন কাজে দক্ষ বহু কর্মীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন শিল্পসংক্রান্ত এই বহু বিচিত্র জীবিকার সর্বাংগীণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ যে কোনো একটি শিল্পে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কর্মীদের নাম উল্লেখ করিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য কতো বিচিত্র কর্মী প্রয়োজন, কতো বিচিত্র জীবিকা তোমাদের পছন্দের অপেক্ষা করিয়া আছে। বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যাক। সেখানে ম্যানেজার বা করণিকদের বাদ দিয়াও স্পিনিং মিস্ত্রি, পোরকুপাইন টেণ্টার, উইলো এ্যাটেনড্যাণ্ট, স্কাচার এ্যাটেণ্ড্যাণ্ট, রোলার কাভারার, ষ্ট্রিপার, ক্যান মাইণ্ডার, মিউল স্পিনার টুইষ্টার, মেশিন টেণ্টার, ইয়ার্ণ টেষ্টার, রীলার, বেইলার, ববিন উইণ্ডার, মার্কার, মেশিন রেপার, লাইন জবার, ডাইয়ার, ব্রাশিং মেশিন অপারেটর, রোয়িং মেশিন অপারেটর, টেক্সটাইল টেকনোলজিষ্ট, স্পিনিং মাষ্টার, উইভিং মাষ্টার, সাইজিং মাষ্টার, ডাইং মাষ্টার, প্রিন্টিং মাষ্টার, উইভিং সুপারভাইজার, ডাইং সুপারভাইজার, ডিজাইনার প্রভৃতি অন্তত শতাধিক জীবিকার সংস্থান রহিয়াছে। শ্রমবিভাগের ফলে প্রায় সব শিল্পেই এই জাতীয় বিভিন্ন জীবিকার উদ্ভব ঘটিয়াছে।

নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এই সব বিভিন্ন জীবিকার জন্য দক্ষ কর্মী তৈরী করারও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে সেই কারণেই বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজনীয় কর্মীদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এক আমাদের পশ্চিমবংগেই বিভিন্ন শিল্পের জন্য ছুতার, ধাতুকার, ড্রাফটস্‌ম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, গ্রাইণ্ডার, মেশিনিষ্ট, মোল্ডার, পেইণ্টার, প্যাটার্ণ মেকার, প্লাম্বার, সার্ভেয়ার, টার্ণার, টুল মেকার, ওয়েল্ডার প্রভৃতি দক্ষ কারিগর গড়িয়া তোলার জন্য কলিকাতায় টালিগঞ্জে, গড়িয়াহাটায়, মধ্য কলিকাতায় সুরেন ব্যানার্জী রোডে এবং হাওড়ায়, কল্যাণীতে, ঝাড়গ্রামে, দুর্গাপুরে, কোচবিহারে, কৃষ্ণনগরে ও হুগলীতে রাজ্যের শিল্প-অধিকর্তার অধীনে দশটি শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে দার্জিলিং, সিউড়ী, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, মেদিনীপুর, মালদহ এবং রায়গঞ্জে আরও আটটি এই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আছে। এছাড়া রাজ্যের শিক্ষা-অধিকর্তার অধীনে যাদবপুর, হাওড়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, হুগলী, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর, সিউড়ী, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, কাশিমবাজার, বেলঘরিয়া, আসানসোল ও কলিকাতায় ১৭টি পলিটেকনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সব পলিটেকনিকে দক্ষ কারিগরের শিক্ষাদান ব্যতীত, সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন ভাষায়ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। আরও উচ্চতর টেকনিক্যাল বিদ্যা-শিক্ষার জন্য রহিয়াছে শিবপুর বেংগল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি এবং দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এতদ্ব্যতীত বিশেষ ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য আছে কলিকাতার কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, শ্রীরামপুরে কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, কলিকাতার বেলেঘাটায় বেংগল সেরামিক ইনষ্টিটিউট এবং বহরমপুরে কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষানবিসীর ব্যবস্থাও সরকারের তরফ হইতে করা হইয়াছে। সরকার এমন আইন করিতেছেন, যাহার ফলে প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানকেই নির্দিষ্টসংখ্যক কারিগরী শিক্ষানবিস লইতে হইবে।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য, দক্ষ কারিগর প্রস্তুত করার নিমিত্ত পশ্চিমবংগ সরকার এক নূতন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয়) স্থাপন করিতেছেন। অষ্টম শ্রেণীর পাঠশেষে এইসব বিদ্যালয়ে তিন বৎসরের জন্য (অন্যান্য বিষয়ের সংগে) বিশেষ ভাবে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়।

যানবাহন-সংক্রান্ত জীবিকা

কি শিল্পোন্নতি করণে, কি বাণিজ্যিক প্রসার সাধনে, কি খাদ্যের চাহিদা মিটাইতে বর্তমান জগতে পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই দিন দিনই উন্নততর যানবাহনের আবিষ্কার হইতেছে এবং পরিবহণের সাহায্যে দেশের প্রত্যেক অংশকে প্রত্যেক অংশের সংগে এবং দেশের সংগে বিদেশকে সংযুক্ত করার চেষ্টা চলিতেছে। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর ইহার সামগ্রিক উন্নতি পরিকল্পনার অংগ হিসাবে, পরিবহণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যোগাযোগের খাতে বরাদ্দ ৫৫৭ কোটি টাকার স্থলে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৩৮৫ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৬৫০ কোটি টাকা যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপেরই স্বীকৃতি। ইহার ফলে একদিকে যেমন দেশের সর্বত্র বহু রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতির নির্মাণ হইতেছে, নূতন নূতন রেলপথ স্থাপিত হইতেছে, জলপথ ও আকাশপথে যোগাযোগের নূতন ব্যবস্থা হইতেছে, তেমনি রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, জাহাজ, উড়োজাহাজ প্রভৃতি প্রত্যেকটি পরিবহণের মাধ্যম সংক্রান্ত জীবিকার সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। এক এক ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে যে কতরকমের দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয় তাহা জানিলে তোমরা আশ্চর্য হইবে। এক রেলের কথাই যদি ধর তাহা হইলে ম্যানেজার বা করণিকদের বাদ দিয়াও ট্রাফিক ইন্‌সপেক্টার, স্টেশন মাস্টার, ইয়ার্ড ফোরম্যান, ইয়ার্ড সুপারভাইজার, গার্ড, ব্রেকস্‌ম্যান, কেবিনম্যান, সিগন্যালম্যান, পয়েণ্টসম্যান, পাইলট জমাদার, লোকো ইনস্পেক্টর, শেড ফোরম্যান, ড্রাইভার, শাণ্টার, ফায়ারম্যান, ওয়ে ইন্সপেক্টর, ট্রেইন একৃজামিনার, টেপার, চেকার প্রভৃতি অন্তত চল্লিশ প্রকারের কর্মীর প্রয়োজন শুধু রেল চলাচলকে চালু রাখার জন্যই। রেল তৈরীর কারখানায় তো আরও বিচিত্র রকমের সুদক্ষ কারিগরের

দরকার। রেলের মত জাহাজেও (বিশেষ করিয়া সমুদ্রগামী) বিভিন্ন ধরনের কর্মী দরকার। উড়োজাহাজের জন্যও আমাদের কর্মীর প্রয়োজন নিতান্ত কম নহে। পরিবহণের এই দুই মাধ্যমই আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নূতন চালু হইয়াছে বলিয়া, ইহাদের জন্য দক্ষ কর্মীর অভাব অধিক অনুভূত হইতেছে। পরিবহণ কর্মীদের শিক্ষার জন্য নানা স্থানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা তাহাদের নিজেদের কর্মীদের শিক্ষা দিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নিজস্ব আলাদা আলাদা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছে।

সেবামূলক জীবিকা

ভোগ্যদ্রব্য ছাড়াও আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ, শাসন, শান্তি ও শৃংখলা প্রভৃতি সংক্রান্ত বহুবিধ সেবারও (services) চাহিদা রহিয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন আমাদের দেশে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষার সকল স্তরেই আজকাল চেষ্টা করিয়াও যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহ করা যাইতেছে না। শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত সরকার নানাধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। সর্বস্তরের শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া পশ্চিমবংগে বর্তমানে ৮৫টির উপর দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমানের জটিল সমাজ-জীবনে স্বাস্থ্যরক্ষাও এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই যাহারা জীবিকা হিসাবে ডাক্তারী গ্রহণ করিবে, তাহাদের জন্য বহুস্বীকৃত (recognised) এ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী এবং আয়ুর্বেদীয় কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। হাসপাতালের সেবার জন্য নার্স-এর প্রয়োজন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের শিক্ষার জন্যও অনেক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এ ছাড়া, সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগেও সেনিটারী ইনস্‌পেক্টার, ভেকসিনেটর, হেলথ ভিজিটর প্রভৃতি বহু জীবিকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও বহু বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। ফলে, সেই দিকেও জীবিকা সংস্থানের প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। অভিনেতা বা অভিনেত্রী হওয়া কিছুদিন আগেও সমাজের চোখে হেয় বৃত্তি ছিল। কিন্তু আজ সেই দৃষ্টিভংগি বদলাইয়া গিয়াছে। বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী অভিনয়কেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ

করিতেছেন। পশ্চিমবংগে নৃত্য, গীত এবং অভিনয়ের শিক্ষাদানের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার অভিনয়, নৃত্য, গীত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া কি মঞ্চে কি সিনেমা জগতে শব্দযন্ত্রী, আলো নির্দেশক, ফটোগ্রাফার প্রভৃতি বহুবিধ যান্ত্রিক কুশলীর প্রয়োজনও দেখা দিয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বা দেশের শান্তিশৃংখলা, নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজেও সরকারের বহু যোগ্য লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই প্রয়োজনই বিভিন্ন স্তরের বিচারপতি হইতে শুরু করিয়া করণিক পর্যন্ত, বা সৈন্যবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী বা আকাশবাহিনীর সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত বা উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার হইতে শুরু করিয়া সাধারণ আরক্ষক পর্যন্ত হাজারো রকমের জীবিকার দ্বার আমাদের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের বিদ্যালয় এবং ভবিষ্যৎ জীবিকার জন্য প্রস্তুতি

ভবিষ্যৎ জীবিকার কথা বিদ্যালয়-জীবন হইতেই ভাবিতে আরম্ভ করিতে হয়। লেখাপড়ার শেষে জীবিকার কথা ভাবিলে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। ধর, একজন ছাত্র সাধারণভাবে বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। তারপর জীবিকার সন্ধান করিতে গিয়া সে দেখিল যে এক কেরাণীগিরি ছাড়া আর কোন জীবিকার সে যোগ্য নয়। আবার কেরানীগিরির জন্য শূন্য চাকুরীর তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। কেরানীগিরি যে খুব ভালো চাকুরী এবং তাই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এমন নহে। সেই ছেলেটিরই মতো, আরও অনেকে পাঠ্যজীবনে ভবিষ্যৎ জীবিকার কথা না ভাবিয়া নিতান্ত গড্ডালিকার প্রবাহে বি. এ. পাশ করিয়া কেরানীগিরির প্রার্থী হিসাবে নাম লিখাইয়াছে। অথচ এই ছেলেদের মধ্যে অনেকেই হয়তো দক্ষ শিল্পী, দক্ষ কারিগর, বিচক্ষণ চিকিৎসক, বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি কতো কি হইতে পারিত। হয়তো নিজের অন্তর্নিহিত প্রবণতা অনুসারে পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন করে নাই বলিয়াই পড়াশুনায় তেমন ভালো করিতে পারে নাই—তাই অনার্স না লইয়া পাশ কোর্সে বি. এ. পড়িতে হইয়াছে। অনার্স না থাকার দরুণ

ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা না ভাবিলে পরে বিপদে পড়িতে হয়

এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হইতে পারে নাই। এইভাবে পূর্ব হইতে ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা চিন্তা না করার জন্য অনেকের জীবন ব্যর্থ হইতেছে।

এইসব কথা বিবেচনা করিয়া সরকার বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন। বহুমুখী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার জন্য সাত রকমের বিশেষ পাঠ্যতালিকার প্রবর্তন করা হইয়াছে। এইগুলি হইতেছে **সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, চারুকলা, কৃষি** এবং **গার্হস্থ্য বিজ্ঞান**। ইহাদের মধ্যে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান-পাঠের ব্যবস্থা শুধু মেয়েদের স্কুলেই এবং শিল্প-পাঠের ব্যবস্থা শুধু ছেলেদের স্কুলেই রহিয়াছে। এইসব এক এক ধরনের বিশেষ পাঠ্যতালিকার সহিত এক এক ধরনের বৃত্তির সম্পর্ক রহিয়াছে। কোনো কোনো ধরনের বিশেষ পাঠ্যতালিকার সহিত একাধিক ধরনের বৃত্তির সম্পর্ক আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃত্তিগত, শিল্পগত বা তৎসংক্রান্ত কর্মের সহিত শিল্প-পাঠ্যতালিকার, শাসনসংক্রান্ত বা পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মের সহিত সাহিত্য-পাঠ্যতালিকার, বিক্রয়সংক্রান্ত কর্মের সহিত বাণিজ্য-পাঠ্যতালিকার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে পাঠ্যকাল হইতেই ভবিষ্যৎবৃত্তির কথা ভাবিবে এবং নিজ নিজ প্রবণতা, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া, কোন ধরনের বিশেষ পাঠ্য-তালিকা অনুসরণ করিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি সংগ্রহ করা সহজতর হইবে তাহা স্থির করিবে। যাহারা দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, তাহাদের কাছেও যে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার অভাব হইবে তাহা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। তাহারা বিদ্যালয়ে পাঠকালে শুধু স্থির করিবে যে, বিজ্ঞান-সংক্রান্ত জীবিকা গ্রহণ করিলে তাহাদের পক্ষে ভালো হইবে, না অন্য কোনোরূপ জীবিকা গ্রহণ করার কথা তাহাদের চিন্তা করা উচিত। বিজ্ঞানসংক্রান্ত জীবিকা গ্রহণ করিতে হইলে, গণিতকে তাহাদিগকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে পাঠ করিতে হইবে। প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশের পর, দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিভিন্ন ধরনের জীবিকার প্রস্তুতি হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বিষয়পাঠের সুযোগ পাইবে।

বহুমুখী বিদ্যালয়ের বভিন্ন পাঠ্যতালিকা এবং বৃত্তির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ

বর্তমানে কোন ধরনের পাঠ্যতালিকা এবং ভবিষ্যতে কোন ধরনের বৃত্তি

গ্রহণ করিলে সুবিধা হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিবেচনা করিতে হয় :

পাঠ্যতালিকা এবং বৃত্তিনির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

১। নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা—সকল মানুষ সমপরিমাণ বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। আবার সকল ধরনের জীবিকায় সমপরিমাণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। আবার দুইটি ছাত্রের বুদ্ধির পরিমাণ হয়তো সমান, কিন্তু এক এক বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদের বুদ্ধির কার্যকারিতা কম বা বেশী। একটি ছাত্রের হয়তো গাণিতিক বিষয়পাঠে বুদ্ধি খোলে বেশী, আবার অপরের হয়তো সাহিত্যিক বিষয়পাঠে অধিকতর দক্ষতা প্রকাশ পায়। আমরা নিজেরা আবার নিজেদের বুদ্ধির পরিমাণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারি না। তাহার জন্য প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার। নিজেদের উপর মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা আমাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিয়া লইতে হইবে। পাঠ্যতালিকা নির্বাচনে যদি আমরা নিজেদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যাই, তাহা হইলে কার্যক্ষেত্রে বিফলতার গ্লানি বহন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

২। নিজেদের আগ্রহ—মানুষের ভালো লাগা মন্দ লাগা বলিয়াও একটা কথা আছে। কাহারো সাহিত্য পড়িতে ভালো লাগে, আবার কাহারো বা অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্তি। সাধারণত ক্ষমতা এবং আগ্রহ একই পথে চলে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের দরুণ সবসময় ইহারা একই পথে চলিতে নাও পারে। ধর, কোনো ছেলের বুদ্ধি সাহিত্য অপেক্ষা গাণিতিক বিষয়ে খোলে বেশী। কিন্তু অঙ্কের শিক্ষক ভালো না থাকার দরুণ এবং সাহিত্যের শিক্ষক ভালো হওয়ার ফলে, সাহিত্যে তাহার অধিকতর আগ্রহ জন্মিয়াছে। আগ্রহ ছাড়া কোনো কার্যে সফলতা অর্জন করা যায় না। কাজেই ভবিষ্যৎ পাঠ্যতালিকা বা বৃত্তিনির্বাচনে আগ্রহের কথা সবসময় বিবেচনা করিতে হয়।

৩। বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ—ক্ষমতা ও আগ্রহের তারতম্য এবং আরও নানাকারণে সকলের সকল বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান সমান হয় না। অপরদিকে আবার কোনো বিশেষ পাঠ্যতালিকা অনুসরণে বা বিশেষ বৃত্তিগ্রহণে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ধর, গাণিতিক জ্ঞান খুব বেশী না থাকিলে, কেহ বিজ্ঞান-

পাঠে কৃতকার্য হইতে পারে না। কাজেই নিজের অর্জিত জ্ঞানের কথা বিবেচনা না করিয়া বিশেষ পাঠ্যতালিকা নির্বাচন করিলে ভবিষ্যতে বিফলকাম হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

৪। সামাজিক পরিস্থিতি—কোনো কোনো বিষয়পাঠের জন্য আমাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে, আবার কোনোটিতে পাঠের ব্যবস্থা হয়তো তেমন ভালো নাই। তারপর কোনো বৃত্তিতে হয়তো কর্মের চাইতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী। আবার কোনো কোনো বৃত্তি আছে যাহার জন্য কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অল্প। বৃত্তির জন্য যেসব গুণ প্রয়োজন তাহা খুব কম লোকের মধ্যেই আছে। তারপর, আমাদের দেশে সকল ছাত্রের আর্থিক অবস্থাও সমান নহে। কাহারও হয়তো পরিবার হইতে দূরে থাকিয়া পড়াশুনার সংগতি নাই। কাহারও বা পিতা-মাতা স্কুল ফাইন্যালের পর দীর্ঘদিন ছেলের পড়াশুনার ব্যয়-নির্বাহ করিতে সক্ষম হন না। এত সব কথা ভাবিয়া বিশেষ পাঠ্য-বিষয় বা ভবিষ্যতের বৃত্তি স্থির করিতে হয়।

বিশেষ পাঠ্যতালিকা নির্বাচনে এবং বৃত্তি নির্বাচনে আমাদের ছাত্রেরা যাহাতে উপযুক্ত পরামর্শ পায় তাহার চেষ্টা পশ্চিম বংগ সরকারের শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব সংস্থা (ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজে) করিতেছেন। এই সংস্থা ছাত্রদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহ জানিবার জন্য অভীক্ষা প্রস্তুত করিয়াছেন। কোথায় কোন কোন ধরনের বৃত্তির জন্য বিশেষ প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে পাঠের ব্যবস্থা আছে, সে সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সংস্থা হইতে বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষকেরা (Career Masters) বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেছেন।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Describe the utility of the following to us and state what you know of the types of jobs available in each.

(a) Agriculture. (b) Animal husbandry and related activities. (c) Forestry. (d) Mining. (e) Fishing. (f) Industry. (g) Transport. (h) Social Services.

N. B. Each may be the subject-matter for a single essay.

2. State what do you know of the facilities for technical training in West Bengal.

3. Discuss what special considerations one should make in selecting a special course of study or in selecting a vocation.

B. Answer the following questions with as few sentences as you can :—

1. State why we should try to know of the jobs available in our country (Not more than 6 lines).

2. Name the classification made by the National Employment Service of jobs available in our country, with two illustrations for each type of job.

3. Name five training institutions for jobs in each of the following fields :—

(a) Agriculture (b) Animal husbandry and related activities (c) Forestry (d) Mining (e) Fishery (f) Industry (g) Transport (h) Social Services.

N. B. Each may be the subject-matter for a single answer.

4. Name at least five types of machines which are used in modern agriculture.

C. Below are given the names of some of the types of jobs available in our country. Put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 respectively inside the bracket in the right-hand side o each to indicate whether it belongs to the field of (1) Agriculture (2) Animal husbandry and related occupations (3) Forestry (4) Mining (5) Fishing (6) Industry (7) Transport (8) Social Services.

If a job belongs to more than one category, you may write more than one number.

Names of jobs :—

এণ্টমলজিষ্ট ( ) ওভারসিয়ার) ড্রিলার ( ) নার্স ( ) পুলিশ ( ) প্রসেসম্যান ( ) ডিজাইনার ( ) ববিন উইণ্ডার (ভেটারিনারি ডাক্তার ( ) ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান ( ) ইঞ্জিনিয়ার (স্ক্রিনিং প্ল্যাণ্ট অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট ( ) মেসিন অপারেটর ( ) ক্লক ( )

D. Write down in your scrap-book the types of jobs (not more than 5) in which you eel interested. Collect any information and any picture you can gather of them.

E. You may take up the following projects :—

1. Excursions to a training institution (e.g. Polytechnic) or job-place (e.g. Factory) near about, in which a good majority of pupils in your class may be interested.

N. B. The excursion should be executed in three stages—Planning and preparation, during which the pupils

(1) (a) should be given some idea of the place where they are going and what they should look for ; (b) the pupils should then be divided into small groups and each group should be assigned the responsibility of collecting information etc. on specific areas during the visit ; (c) every detail of the excursion, i.e. how to go, when to start, what things should be taken etc. should be planned in detail and responsibility assigned.

(2) The excursion—There should be supervision so that the excursion goes according to plan.

(3) A wall-newspaper may come out with the reports taken by the groups. At least the reports should be discussed.

2. A survey of occupations in the locality in which the school is situated may be made. Every pupil may collect the information about the occupations in five families of the locality under the following heads :—

(a) Name of the occupation (b) Qualifications, academic, skill, personality traits, etc. required for success in the occupation (c) . Places where training facilities for them are available (d) Salary etc. which may be available in the occupation (e) Any special drawback in the occupation.

N. B. The information may be obtained by questioning the person engaged in the occupation.

The information collected by the pupils should be put together and a wall-newspaper may be brought out.

আমাদের কৃষি

খাদ্যের চাহিদা মিটাইবার অন্যতম উপায় হিসাবে কৃষিকার্যের প্রচলন আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় যে সকল পুরা-নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেও সেখানে উন্নত কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল। বস্তুত, সেখানে যেসব জাতীয় গম বা যব উৎপন্ন করা হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আশ্চর্যের বিষয়, আজিও পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে সেইসব জাতীয় গম ও যবই উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। বৈদিক সাহিত্যে পশুপালন, ভূ-কর্ষণ, শস্যপর্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষিপদ্ধতির বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। পরবর্তী-কালের জাতক, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রাচীন ভারতের উন্নত কৃষি-প্রণালীর অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে কৃষি

আমাদের দেশের মতো নদীনালাবিধৌত পলিপ্রধান মাটির দেশে অবশ্য ইহাই স্বাভাবিক। আজিও কৃষিকার্যই আমাদের দেশের দশ কোটি লোকের প্রধান জীবিকা। আমাদের জাতীয় আয়েরও প্রায় অর্ধেকের উৎস কৃষিই। তাছাড়া কৃষিজ-দ্রব্য হইতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ও কম নহে। শর্করা, পাট প্রভৃতি আমাদের কয়েকটি বড়ো বড়ো শিল্প কাঁচা মালের জন্য একান্তভাবে কৃষির উপরই নির্ভরশীল। আমাদের দেশ দরিদ্র। বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করা আমাদের পক্ষে কঠিন। আবার, আমাদের লোকসংখ্যাও প্রচুর। তাই প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে না পারিলে আমাদের উপায় নাই।

ভারতে কৃষিকার্যের গুরুত্ব

কৃষিকার্যের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব

আমাদের দেশের কৃষিকার্যের উপর প্রাকৃতিক প্রভাবের কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্তিকা-বৈচিত্র্য, বৃষ্টিপাত বা জলবায়ুর পার্থক্য এদেশের চাষের প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইগুলি আবার কোন কোন শস্যাদির চাষ হইবে তাহাও নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে। তাই এদেশের চাষের কথা আলোচনা করিতে গেলে মৃত্তিকা বা জলবায়ুর কথাও স্বভাবতই আসিয়া পড়ে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মোটামুটিভাবে প্রধানত চারিজাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়—পলিমাটি (alluvial soil), কৃষ্ণমৃত্তিকা (black soil), লোহিত মৃত্তিকা (red soil) ও মাকড়া (laterite)।

মৃত্তিকার প্রভাব

ভারতের উত্তর ভাগে পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, গুজরাটের অধিকাংশ, উত্তর রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বংগ, আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকা প্রধানত পলিমাটি অঞ্চল। দক্ষিণ ভারতে ও সমুদ্র উপকূলে, এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর উপত্যকায় এই-জাতীয় মাটি প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এইজাতীয় মাটিতে চুন ও পটাশ নামক ক্ষার পদার্থ বেশী থাকে, কিন্তু ফসফরিক এসিড বা নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম। (কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা লোহিত মৃত্তিকাতেও অনুরূপ ক্ষারাদি থাকে)। পলিমাটি সাধারণত বেশ হালকা ও সরস, এবং বৎসরের কোনো সময়েই ইহার রস সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় না। স্বভাবতই এইজাতীয় মাটি উর্বর হয় বলিয়া চাষের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল (অবশ্য সর্বত্রই যে পলিমাটি সমান উর্বর তাহা নহে; যেমন—রাজপুতানার মাটি বালুকাময়, পার্বত্য অঞ্চলের পুরাতন পলিমাটি কংকরময়)। বস্তুত, ভারতবর্ষের ধান, গম প্রভৃতি প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের বা পাট প্রভৃতি চাষের এক বিরাট অংশই এই পলিমাটি-প্রধান অঞ্চল সমূহেই হইয়া থাকে। কিন্তু পলিমাটি একদিকে যেমন আমাদের কৃষিকার্যের সহায়ক, তেমনি নূতন পলিমাটি অঞ্চল স্বভাবতই কোমল বলিয়া সেখানে ভারী কৃষিযন্ত্রাদির ব্যবহার বিশেষ সম্ভব নহে। আমাদের দেশে শক্তিশালী কৃষিযন্ত্রাদির প্রসার বিশেষ না ঘটিবার ইহা অন্যতম কারণ।

গুজরাট, মালব মালভূমি, মধ্য প্রদেশ, বেরার, হায়দ্রাবাদ বা মাদ্রাজের কোনো কোনো অংশে প্রধানত কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল বিস্তৃত। এই মাটিতে অল্প নিম্নেই জল থাকে এবং ইহা অত্যন্ত আঁঠালো। এই মাটিও অত্যন্ত উর্বরা এবং কার্পাস, জোয়ার, তিসি প্রভৃতি চাষের অত্যন্ত উপযোগী। এই কারণেই এই অঞ্চল ভারতের প্রধান কার্পাস উৎপাদন অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

পরিবর্তিত শিলার রাসায়নিক পরিবর্তনে লোহিত মাটির উৎপত্তি। ইহা হাল্কা দো-আঁশ মাটি। লোহার (Iron Peroxide) সংযোগে ইহার রং লাল হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের কোনো কোনো অংশে, উড়িষ্যা,

ছোটনাগপুর, বিহারের সাঁওতাল পরগণা, উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি ও মির্জাপুর জেলা, পশ্চিম বংগের বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলা, রাজস্থানের কিয়দংশ এবং আরাবল্লী অঞ্চলে এইজাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। এইজাতীয় মাটি অত্যন্ত

শুষ্ক এবং চাষের উপযোগী সারপদার্থও ইহার মধ্যে বিশেষ থাকে না। সুতরাং প্রচুর সার ও জলসেচ ব্যতীত এই মৃত্তিকায় ভালো শস্য হয় না।

দক্ষিণ ভারতে ও আসামের চা-বাগান অঞ্চলে মাকড়া মাটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রধানত ল্যাটেরাইট-জাতীয় শিলা চূর্ণ হইয়াই এই মাটির

উৎপত্তি। এই মাটি সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল বলিয়া বৃষ্টি পড়িলেই জল শুকাইয়া যায়। তাছাড়া এই মাটিতে পচা সার (humus) প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও অন্যান্য কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ইহাতে বিশেষ কিছুই থাকে না। তাই প্রচুর পরিমাণে সার ও জলসেচ ছাড়া এই মাটিতেও ভালো চাষ সম্ভবপর নহে।

উপরিউক্ত চারি শ্রেণীর মৃত্তিকা ছাড়াও সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে নোনা-মাটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইজাতীয় মাটিতে লবণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী বলিয়া এই মাটি সাধারণ কৃষিকার্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তবে নারিকেল প্রভৃতির চাষ এইজাতীয় মাটিতে ভালো হয়। সাম্প্রতিককালে এইসব নোনামাটি অঞ্চলের চারিদিকে বাঁধ দেওয়া হইতেছে। তারপর মাটির লবণ যাহাতে বৃষ্টির জলে ধুইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে পারে সেইজন্য মধ্যে মধ্যে নালা কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্যের উপযোগী করার ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের কথা ইতিপূর্বেই তোমাদের বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে উষ্ণমণ্ডলের এবং মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও ইহার সর্বত্র বৃষ্টিপাত এক প্রকার নহে। পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর পরিমাণে হইলেও পশ্চিমদিকে বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশই কম। দক্ষিণ ভারতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম অঞ্চল মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রচুর বৃষ্টিপাত লাভ করিলেও উহার পূর্বাঞ্চল মোটেই বৃষ্টি পায় না। ফলে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগ বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। পূর্বঘাট পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে আবার প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

জলবায়ুর প্রভাব

ইহার ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র সবরকম ফসলের চাষ সম্ভব নহে। উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বোম্বাই বা মাদ্রাজে যেখানে উত্তাপ ও জল দুইই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে ধানের, ইক্ষুর এবং পাটের চাষ বেশী হইয়া থাকে। আবার উত্তর ভারতের মধ্যভাগে, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে উত্তাপ বেশী কিন্তু বৃষ্টিপাত কম সেখানে গম, যব, ভুট্টা, বিভিন্নজাতীয় ডাল, শস্য, সরিষা প্রভৃতির চাষ ভালো হইয়া থাকে। তুলার জন্য প্রচুর জলের কোনো প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন ভালো সারের।

তাই দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে উর্বরা কৃষ্ণমৃত্তিকায় তুলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু জমিতে জল জমিতে পারে না, অথচ বৃষ্টি বেশী হয় এবং উত্তাপও যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়া সেখানে আবার চা বা কফির চাষ ভালো হয়।

শুধু কোন জায়গায় কোন ফসল ভালো হইবে, জলবায়ু যে তাহাই নিয়ন্ত্রণ করে তাহা নহে, চাষ পদ্ধতির উপরও ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য।

রবি ও খারিফ শস্য

আমাদের দেশে দুইটি প্রধান শস্য-ঋতু রহিয়াছে—রবি ও খারিফ। বৃষ্টিপাতের ও উত্তাপের সহিত ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। খারিফ শস্য সংগ্রহ করা হয় শীতকালে যখন বৃষ্টিপাত থাকে না, অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে, আর রবিশস্য সংগ্রহ করা হয় গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর বৃষ্টি পাওয়া যায়, অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে। আমাদের দেশের প্রধান খারিফ শস্যগুলি হইতেছে ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, তুলা, ইক্ষু, বাদাম প্রভৃতি। প্রধান রবিশস্যগুলি হইতেছে গম, বার্লি, চা, তিল, সরিষা, এবং পশ্চিম বংগ ও দক্ষিণ ভারতে ধান এবং দক্ষিণ ভারতে জোয়ার ও তুলা প্রভৃতি।

চাষের প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

আমাদের দেশে কৃষিকার্য প্রধানত দুই উপায়ে হইয়া থাকে। সেই হিসাবে কৃষিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—রোপণ-কৃষি ও বপন-কৃষি।

চাষের প্রকৃতি

লাংগলের সাহায্যে মাটি ভালো করিয়া চাষ করিয়া মই দিয়া সেই মাটি গুঁড়াইয়া আগাছা নিড়াইয়া গম, যব, তৈলবীজ প্রভৃতির বীজ ঐ কর্ষিত জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এইগুলি বপন-কৃষি। কিন্তু নারিকেল গাছের চারা, চা, কফি প্রভৃতি গাছের চারা একস্থানে জন্মাইয়া পরে সেখান হইতে তুলিয়া অন্যত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইয়া দেওয়া হয়। সেইজন্য ইহাদের বলা হয় রোপণ-কৃষি। ধানের মধ্যে আমন ধানের চাষ রোপণ-কৃষি হইলেও, বর্ষাকালীন আউস ধানের চাষ বপন-কৃষি।

আগেই বলা হইয়াছে চাষের কাজ জলের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। জলের তারতম্যানুসারেও সেইজন্য কৃষির প্রকারভেদ ঘটিয়া থাকে।

কৃষির শ্রেণীভেদ

মোটামুটি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ অনুযায়ী কৃষিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—আর্দ্র-চাষ, সেচন-চাষ এবং শুষ্ক-চাষ। যেখানে বৃষ্টিপাত প্রচুর, জমি জলে ডুবিয়া যায়, সেখানকার চাষকে আর্দ্র-চাষ বলে। মালাবারে, পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে এবং নিম্নবংগে এইজাতীয় চাষ হয়। আবার এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে অন্য সময় জল হইলেও চাষের সময় উপযুক্ত পরিমাণে হয়তো জল পাওয়া যায় না। এইসব জায়গায় জলসেচন দ্বারা যে কৃষিকার্য হয় তাহাকে বলা হয় সেচন-চাষ। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই সেচন-চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু বৃষ্টি যেখানে স্বল্প, জলসেচের সুবিধাও নাই, সেখানেও অন্য উপায়ে কৃষিকার্য সম্ভব। এইসব জায়গায় যেটুকু জল পাওয়া যায় তাহারই পূর্ণ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মাটিকে খুব গভীরভাবে কর্ষণ করা হয়, পরে মাটিতে বীজ ছড়াইয়া ঐ মাটি উল্টাইয়া বীজ ঢাকা দিয়া উপরের মাটিকে খুব ভালোভাবে গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে বৃষ্টির জল সহজেই ভিতরে যাইতে পারে। তাহার পর বীজ হইতে চারা বাহির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। কোনোদিন বৃষ্টি হইলেই মই (harrow) দিয়া মাটি উল্টাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে জল মাটি চাপা থাকে। ইহাকে বলা হয় শুষ্ক-চাষ। দাক্ষিণাত্যে বা পশ্চিমের কোনো কোনো অঞ্চলে ঐজাতীয় শুষ্ক-চাষের প্রচলন রহিয়াছে।

উৎপন্ন শস্যের প্রকার ও পরিমাণ অনুযায়ীও কৃষিকার্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। আদিম মানুষ তাহার নিজের অভাব মিটাইবার জন্য একই জমিতে খাদ্য ও বস্ত্রের সকল উপাদান জন্মাইত। আজও ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে আদিবাসীরা এই জাতীয় চাষ করিয়া থাকে। ইহাকে বলা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ চাষ (self-sufficient agriculture)। কিন্তু মানুষ যখন জমিতে শুধু একই জিনিস উৎপন্ন করিয়া তাহার নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া বিনিময়ের কাজে উদ্বৃত্ত শস্য ব্যবহার করিতে লাগিল তখন হইতেই এক-ফসলী চাষের (one crop agriculture) সূত্রপাত ঘটিল। আজিও এদেশের বহু জায়গায় চা, ইক্ষু, কলা, আনারস প্রভৃতি এইজাতীয় এক-ফসলী শস্যের (অর্থাৎ একই বৎসরে একমাত্র যে ফসল উৎপন্ন হয়) চাষ হইয়া থাকে। অনেক সময় শুধুমাত্র বাণিজ্যের জন্যই যে

ফসলের চাষ হয় তাহাকে বলা হইয়া থাকে অর্থপ্রস্থ চাষ (cash crop agriculture)। আমাদের দেশে পাট, তুলা প্রভৃতি অর্থপ্রস্থ কৃষিদ্রব্য।

আবার, দেশে লোকসংখ্যার আধিক্য বা খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ীও চাষের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যেমন, যেদেশে খাদ্যশস্যের অভাব নাই সেদেশে অল্প যত্ন করিয়াই চাষ করা হইয়া থাকে, এবং প্রায়শই বিভিন্ন এক-ফসলী শস্যের চাষ হইয়া থাকে। ইহাকে বলে ব্যাপক-কৃষি (extensive agriculture)। আমাদের দেশে কোনো কোনো অনগ্রসর আদিম জাতি তাহাদের শস্যক্ষেত্রে শুধু এইজাতীয় কৃষিকার্য করিয়া থাকে। অন্য সব জায়গায় অধিক পরিমাণে এবং একাধিক শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রচুর জন ও ধনশক্তি নিয়োগ করিয়া সযত্নে চাষ করা হইয়া থাকে। ইহাকে বলা হয় নিবিড়-কৃষি (intensive agriculture)।

নিবিড় কৃষি প্রসংগে শস্যাবর্তনের (rotation of crops) কথাও আসিয়া পড়ে। শস্যাবর্তনের অর্থ, এক জমিতে প্রতি বৎসর একই শস্য না জন্মাইয়া বিভিন্ন বিভিন্ন বৎসরে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শস্য উৎপাদন করা। অর্থাৎ এক বৎসর হয়তো কোনো জমিতে পাট জন্মাইলে অপর বৎসর উহাতে হয়তো ধান জন্মানো হয়। শস্যাবর্তন শুধুই যে একাধিক শস্য উৎপাদনে সহায়ক তাহাই নহে, শস্যাবর্তনের ফলে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জমিতে শস্যের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যেসব রাসায়নিক দ্রব্যাদি থাকে ক্রমাগত একই শস্যের চাষ হইলে তাহা সহজেই নিঃশেষিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই সময় অন্য শস্য চাষ করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পায়। তাছাড়া ঐসব শস্যের ডাঁটা ও পাতাদিও জমিতে পড়িয়া পচিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইতে সাহায্য করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে শস্যাবর্তনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার আজিও হয় নাই।

শস্যাবর্তন

কৃষির জন্য জলসেচ ব্যবস্থা

তোমারা জান, এদেশের প্রায় সর্বত্র কৃষির উপযোগী উত্তাপ পাওয়া গেলেও, একমাত্র মালাবার উপকূল, মাদ্রাজ, পশ্চিম বংগ ও আসামের কিয়দংশ ব্যতীত অন্যত্র গ্রীষ্মকালে কৃষির পক্ষে উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য বৃষ্টিপাত হয় না। এদেশের বৃষ্টিপাতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে দেশের

বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের চরম পার্থক্য এবং বিভিন্ন বৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের বৈষম্য। আসামে বৎসরে যেখানে গড়ে বৃষ্টিপাত হয় ৪৬০", সেখানে রাজস্থানে বৃষ্টির পরিমাণ মাত্র ৩"। কাজেই, এদেশের অধিকাংশ স্থানেই কৃষির জন্য কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের প্রয়োজন বহুকাল হইতেই অনুভূত হইয়া আসিতেছে। এদেশে বিভিন্ন স্থানের ভূপ্রকৃতি এবং জল পাইবার উপায়ের পার্থক্যহেতু সুপ্রাচীনকাল হইতেই কূপ, জলাশয়, খাল প্রভৃতির সাহায্যে এই প্রয়োজন মেটানো হইয়া আসিতেছে।

এদেশে প্রাচীনকাল হইতেই গভীর ইঁদারা বা কাঁচা কূপ অথবা বাঁধানো কূপের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। কূপ হইতে প্রধানত দণ্ডযন্ত্র, গোবাহিত যন্ত্র ও পারসিক চক্রের সহায়তায় জলসেচন হইয়া থাকে। একটি খুঁটির উপরে একদিকে দড়িসহ বালতি ও অপর দিকে একখণ্ড ভারী পাথরযুক্ত একটি

কূপ
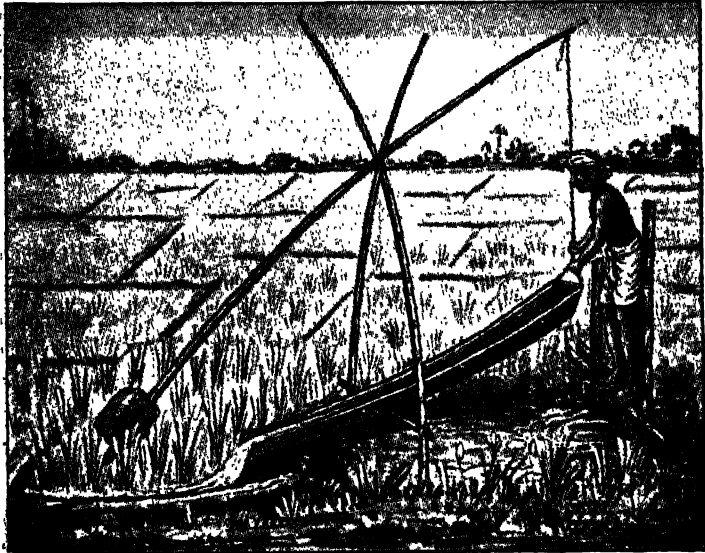
ডোংগার সাহায্যে জলসেচ

দণ্ড বসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। দড়ি টানিয়া বালতি সহজেই যেমন জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তেমনি অন্য প্রান্তের ভারের ফলে জলসহ বালতিও

সহজেই উপরে উঠিয়া আসে। গোবাহিত যন্ত্রে একখণ্ড দড়ির একপ্রান্তে বাঁধা থাকে বালতি আর অন্য প্রান্ত একটি কাঠের চাকার উপর দিয়া একজোড়া গোরু বা মহিষের জোয়ালের সংগে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কূপের একপাশে কতকটা জমি ঢালু থাকে। ঐ ঢাল বাহিয়া গোরু উপরে উঠিতে থাকিলে বালতি স্বভাবতই নীচে জলে নামিয়া যায়, আবার গোরু নীচে নামিতে থাকিলে জলভরা বালতি উপরে উঠিয়া আসে। তখন ঐ জল মাঠে ঢালিয়া দেওয়া হয়। উত্তর প্রদেশে এইজাতীয় যন্ত্রকে "চরষা" বলা হইয়া থাকে। পারসিক চক্র নানা প্রকারের হইয়া থাকে। তবে সাধারণত এই প্রকার চাকার গায়ে একটি শিকল এমনভাবে জড়ানো থাকে যে তাহার কিয়দংশ সবসময়ই কূপের জলের মধ্যে ঝুলিতে থাকে। শিকলটিতে অনেকগুলি বালতি লাগানো থাকে। গবাদি পশুর সাহায্যে ঐ চাকা ঘুরাইয়া বালতিগুলিতে ক্রমাগত জল তুলিয়া ক্ষেতে দেওয়া হইয়া থাকে। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিম বংগে কূপের সাহায্যে সেচন-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। তবে, পারসিক চক্রের ব্যবহার পূর্ব পাঞ্জাবে, কাথিয়াবাড়ে, রাজপুতানায় এবং মালাবার উপকূলেই প্রধানত দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে অবশ্য অনেক স্থানে নলকূপের সাহায্যে বা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে জল তুলিয়াও জলসেচনের কাজ হইয়া থাকে।

বিল, হ্রদ প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয় বা পুকুর, দীঘি প্রভৃতি কৃত্রিম জলাশয় হইতে ডোংগা প্রভৃতি দ্বারা জল তুলিয়া সেচন করার পদ্ধতিটিও প্রাচীন। মাদ্রাজে, মহীশূরে ও হায়দ্রাবাদে এইরূপ জলাশয় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম বংগে বা উত্তর প্রদেশেও এই জাতীয় সেচব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। সাম্প্রতিককালে অনেক জায়গায় নদীর উপত্যকায় বাঁধ দিয়া বর্ষাকালে জল ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরে ঐ জল কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপ জলাশয়ের মধ্যে বোম্বাইতে লোণাভ্লা বাঁধ, মধ্য প্রদেশের রামটেক বাঁধ, মহীশূরের কৃষ্ণরাজা বাঁধ ও মাদ্রাজের মেটুর বাঁধ প্রভৃতি জলাশয়-সমূহ প্রসিদ্ধ।

জলাশয়

খাল দ্বারা জলসেচনই সেচকার্যের শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্ষাকালে নদীতে জলস্ফীতি হইলে ঐ জল খালের মধ্য দিয়া জমিতে লইয়া সেচকার্য করার

রীতি এদেশে প্রাচীনকাল হইতেই চালু আছে; ইহাদিগকে বলা হয় প্লাবন খাল (Inundation canal)। কিন্তু প্লাবন খালের ফলে কৃষির খুব বেশী উপকার হয় না। কারণ, শীতকালে বা গ্রীষ্মকালে যখন চাষের জন্য জলের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী, তখন প্লাবন খালে জল থাকে না। তাই সাম্প্রতিককালে বহু নদীতে এপার-ওপার বাঁধ দিয়া একপাশে জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়া বর্ষাকালে তথায় জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। পরে খালের মধ্য দিয়া ঐ জল প্রয়োজন অনুসারে চাষের জমিতে নেওয়া হয়। এইরূপ খালে সারাবৎসরই জল

সেচখাল

গভীর নলকূপের দ্বারা জলসেচ

পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের বলা হয় স্থায়ী বা নিত্যবহ খাল (Perennial canal)। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যেসব স্থায়ী খাল রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে পাঞ্জাবে পশ্চিম যমুনা খাল, শিরহিন্দ খাল ও বারিদোয়াব খাল, উত্তর প্রদেশে পুর্ব যমুনা খাল, নর্মদা খাল ও শোন, বেতোয়া, দশন এবং কেন নদীর খাল, অন্ধ্র প্রদেশে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর বিভিন্ন খাল, মাদ্রাজের মেটুর খাল, মহীশূর ও কেরালার পেরিয়ার-ভাইগাই খাল, এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের গোদাবরী, প্রভা, কৃষ্ণা, ভীমা প্রভৃতির খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেচখাল প্রসংগে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক বিভিন্ন নদী-উপত্যকা

পরিকল্পনাগুলির সম্বন্ধেও সম্যক জানা প্রয়োজন। বহুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন খালগুলিকে শুধুমাত্র সেচকার্যের জন্যই ব্যবহার করা হইয়াছে। আবার কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম্ বা উত্তর-পশ্চিম গুজরাটের খপোলী প্রভৃতি কেন্দ্রে শুধুই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইয়াছে। পরে অবশ্য গংগা খালে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন—দুই-ই করা হইয়াছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের নদীগুলিকে বহুপ্রকারে কার্যকরী করার জন্য যে বিস্তৃত বহুমুখী পরিকল্পনা-সমূহ গ্রহণ করা হইয়াছে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসে তাহার গুরুত্ব অনেক। কারণ এইসব পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে নদীর উন্নয়ন ও উহার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শুধুই যে জলসেচের মাধ্যমে কৃষির বা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্পের উন্নতি হইবে তাহা নহে, একই সংগে নৌবহন, জলপথে ভ্রমণ, বন্যা নিবারণ, মৎস্যের চাষের উন্নতিবিধান, ম্যালেরিয়া নিবারণ, বন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রভৃতিও সম্ভব হইবে। ইহার ফলে ভারত-বর্ষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভবপর হইবে। উদাহরণস্বরূপ নীচে কয়েকটি প্রধান বহুমুখী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা

আমাদের পশ্চিম বংগে দামোদর নদীতে বৎসরে বৎসরে বন্যা লাগিয়াই থাকিত। ইহার কারণ, দামোদর নদ তাহার মধ্য ও নিম্নগতিতে বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও, ঊর্ধ্বগতিতে বিহারের পালামৌ, হাজারীবাগ ও মানভূম জেলার মালভূমি অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত, এবং সেখানে তাহার স্রোতও প্রখর। ফলে, ঐ মালভূমির মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া খরস্রোতা দামোদর কর্তৃক বাহিত হইয়া যখন বর্ধমান জেলার সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন সেখানে স্রোতের বেগ কম বলিয়া ঐ মাটি নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। এইভাবে ক্রমশ নদীর তলদেশ উঁচু হইয়া ওঠার ফলে এবং নদীর মোহানা সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ার ফলে দামোদরের অববাহিকায় অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলেই সেই অতিরিক্ত জল সহজেই বাহির হইয়া সমুদ্রে যাইয়া পড়িতে পারিত না। ইহারই ফলে দামোদরে বৎসরে বৎসরে বন্যা দেখা দিত, বিহার ও বাংলার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ঘরবাড়ী ভাসিয়া যাইত, কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইত। ইহার প্রতিরোধকল্পে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

দামোদর পরিকল্পনা

(Damodar Valley Corporation বা সংক্ষেপে D. V. C.) নামক প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই অনুযায়ী ঐ নদীর প্রথমাংশে ছোটনাগপুর মালভূমির উপর ক্রমান্বয়ে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড় এই চারি জায়গায় চারিটি বাঁধ দিয়া জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোনার ছাড়া অন্য তিন জায়গায়ই
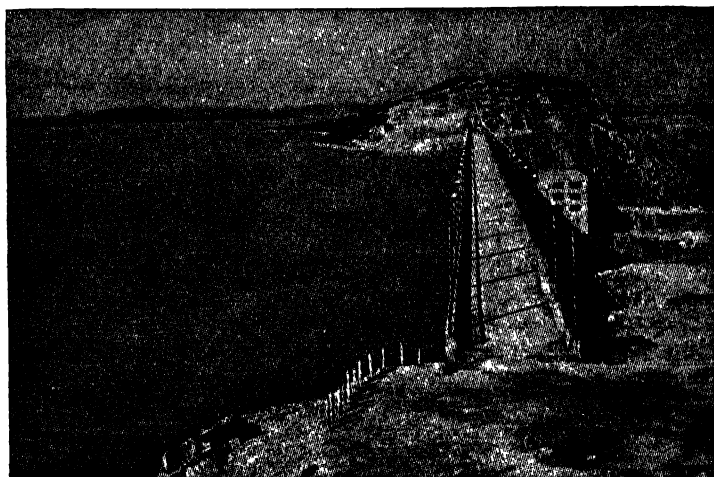
দামোদরের তিলাইয়া বাঁধ

১,০৪,০০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Hydel Power House) স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বোকারো ও দুর্গাপুরে একটি করিয়া তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র (Thermal Station) স্থাপিত হইয়াছে। তাছাড়া, দুর্গাপুরে একটি ৩৮ ফিট উঁচু ও ২,২৭১ ফিট লম্বা জাংগাল (barrage) নির্মিত হইয়াছে। ফলে, একদিকে যেমন কলিকাতা, জামসেদপুর বা অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মধ্য দিয়া শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তেমনি স্রোতের জল নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বন্যার আশংকাও দূর হইয়াছে। দুর্গাপুরের জাংগাল হইতে প্রায় ১৫৫০ মাইল লম্বা খালে প্রায় নয় লক্ষ একর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে, ইহার ফলে প্রায় ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন শস্য বেশী উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে। ইহা ছাড়াও, মৎস্যের চাষ,

দুর্গাপুর হইতে নৌপথে কলিকাতা আগমনের ব্যবস্থা, নূতন বনসৃষ্টির মাধ্যমে ভূক্ষয় নিবারণ প্রভৃতিও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

দামোদরের মতো ময়ূরাক্ষীরও তলদেশ এত উঁচু হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহারও তীরে ক্রমশই বন্যা এবং তাহার ফলে শস্যহানি লাগিয়াই ছিল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা গৃহীত হয় সেই অনুযায়ী বিহারে মাসাঞ্জোর গ্রামে একটি ২১৭০ ফিট লম্বা ও ১০৫ ফিট উঁচু বাঁধ নির্মাণ করিয়া একটি জলাধার তৈরী করা হইয়াছে। এখান হইতে জলসেচন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন দুইই করা হইয়া থাকে। আবার মাসাঞ্জোরের ২০ মাইল নীচে তিলাপাড়া নামক স্থানে একটি জাংগাল এবং বক্রেশ্বর ও দ্বারকায় অপর দুইটি জাংগালও নির্মিত হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন বিহারে ৩৫ হাজার একর ও পশ্চিম বংগে ৭·২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তেমনি মোট প্রায় চার হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

পাঞ্জাবে কয়লা বা পেট্রোল না থাকায় সেখানে কোনো শিল্পসৃষ্টি বহুদিন পর্যন্ত সম্ভব হইতেছিল না। ইহারই প্রতিকারকল্পে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলায় যে ভাখরা-নাংগল পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইয়াছে, তাহাই ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শতদ্রু নদীর উপরে ভাখরা নামক স্থানে ৭৪০ ফিট উঁচু বাঁধ দেওয়া হইবে এবং তাহার পাদদেশে দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ইহার আট মাইল নীচে নাংগল নামক স্থানে ইতিমধ্যেই নাংগল নদীর উপর একটি অপসারণ জাংগাল বাঁধিয়া নদীটিকে ৪০ মাইল দীর্ঘ নাংগল জলবিদ্যুৎ-প্রজনন খালে (Hydel chanel) প্রবেশ করানো হইয়াছে, এবং এই খালের উপর গাংগুয়াল ও কোটলা-তে দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদক-কেন্দ্রও স্থাপন করা হইয়াছে। নাংগল খালের শেষে রুপারের জলসেচ খাল শুরু হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ৬৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের এবং প্রায় ৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। এই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে পাঞ্জাবের শিল্পসম্প্রসারণ সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভাখরা-নাংগল পরিকল্পনা

অন্যান্য যেসব বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বা সম্পূর্ণ হওয়ার পথে আগাইয়া চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে উড়িষ্যার মহানদী পরিকল্পনা, বিহারের কুশী পরিকল্পনা, অন্ধ্র ও মহীশূরের তুংগভদ্রা পরিকল্পনা, অন্ধ্র ও উড়িষ্যার মাচকুন্দ পরিকল্পনা, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানের চম্বল পরিকল্পনা, মহীশূরের ভদ্রাবতী

অন্যান্য পরিকল্পনা

পরিকল্পনা, মহারাষ্ট্রের কাকড়াপাড় পরিকল্পনা, মাহী পরিকল্পনা, রাজস্থান ও গুজরাটের কৃষ্ণা-পেন্নার পরিকল্পনা, কয়না পরিকল্পনা, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মধ্য প্রদেশের রিহান্দ পরিকল্পনা প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য

তোমরা জান, আমাদের দেশে যেসব কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার সবই খাদ্যশস্য নহে। ইহাদের মধ্যে ধান, গম প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, আর পাট, শন প্রভৃতি বাণিজ্যিক বা অর্থপ্রসূ ফসল ব্যবহৃত হয় নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরীর কাজে। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার চা প্রভৃতি এক-ফসলী আবাদী শস্যও (plantation crops) আমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

খাদ্যশস্য

এদেশের বিভিন্ন অংশে যেসব খাদ্যশস্য জন্মায় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত শস্যাদি উল্লেখযোগ্য—

(১) **ধান**—ধান আমাদের দেশের সর্বপ্রধান কৃষিজ দ্রব্য ও খাদ্যশস্য। এদেশের শতকরা ৩০ ভাগ আবাদী জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। ধান্য উৎপাদক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির স্থান নিম্নরূপ—মাদ্রাজ, বিহার, পশ্চিম বংগ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম ও মহারাষ্ট্র। কিন্তু ভারতে ধান বেশী উৎপন্ন হইলেও এখানে জমি প্রতি ফলন বেশী নহে। য়ুরোপে যেখানে হেক্টর প্রতি (১ হেক্টর = ২·৪৭ একর) ফলন ৪২·২ শত কিলোগ্রাম, সেখানে ভারতে হেক্টর প্রতি মাত্র ১২·২ শত কিলোগ্রাম ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(২) **গম**—খাদ্যশস্য হিসাবে ধানের পরেই গমের স্থান। মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের ইহাই প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা শীতকালীন শস্য। এদেশের আবাদী জমির প্রায় শতকরা ১২ ভাগে গমের চাষ হয়। তবে, এদেশে মোট যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই আসে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ হইতে। বাকী গম উৎপন্ন হয় গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান ও বিহার প্রমুখ রাজ্যে।

(৩) **যব** (Barley)—গমভোজীদেরই অপর একটি প্রিয় খাদ্যশস্য। এদেশের আবাদী জমির মাত্র শতকরা তিন ভাগ অঞ্চলে প্রায় ২৪ লক্ষ টন যবের চাষ হয়। অবশ্য ইহার বেশীর ভাগই জন্মে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে।

(৪) **রাগি, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি** (Millets)—দাক্ষিণাত্যের দরিদ্র কৃষিজীবীদের প্রধান খাদ্যশস্য। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির নিকৃষ্ট শুষ্ক

জমিতে জলসেচ ভিন্নই ইহা জন্মে। এইজাতীয় অপর একটি শস্য, ভুট্টা, উত্তর ভারতের বহু লোকের প্রিয় খাদ্যশস্য। যদিও ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ভুট্টা জন্মায়, উত্তর প্রদেশ ও বিহারেই ইহার চাষ বেশী হয়।

(৫) **ডাল** (Pulses)—ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছোলা, মটর, খেসারি, মুগ, মসুর, অড়হর, কলাই প্রভৃতি কোনো-না-কোনো রকমের ডাল জন্মায়। ডাল ভারতবাসীর একটি প্রধান খাদ্য। বস্তুত, নিরামিষাশীদের জন্য ইহা প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের অভাব দূর করিয়া থাকে।

(৬) **মসলা** (Spices)—ভারতবর্ষে বিভিন্ন মসলা যদিও অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে জন্মায়, তবু লংকা, এলাচি, কাজু বাদাম (Cashewnut), আদা এবং হরিদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রধানত কেরালায় এবং কিয়ৎ পরিমাণে মহীশূর, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে লংকা উৎপন্ন হয়। এলাচির চাষ প্রধানত সুদূর দক্ষিণে হইয়া থাকে। পশ্চিম উপকূলে কন্যাকুমারিকা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত এবং পূর্ব উপকূলে উত্তরে বহরমপুর পর্যন্ত কাজু বাদাম জন্মায়। আদারও প্রধান উৎপাদক রাজ্য কেরালা। অবশ্য উত্তর প্রদেশেও কিয়ৎ পরিমাণে আদার চাষ হয়। হরিদ্রার চাষ প্রধানত অন্ধ্র ও উড়িষ্যায় হইয়া থাকে। তাছাড়া, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও কেরালায়ও কিছু পরিমাণ হরিদ্রা জন্মায়।

বাণিজ্যিক ফসল

এদেশের বিভিন্ন অংশে নিম্নলিখিত বাণিজ্যিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে:—

(১) **আখ**—পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে জন্মায় আমাদের দেশে (প্রায় ৪৫ লক্ষ টন)। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগই জন্মায় উত্তর প্রদেশ ও বিহারে। পূর্ব পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মহীশূর ও মাদ্রাজেও আখের চাষ হয়।

(২) **তৈলবীজ** (Oilseeds)—আখের মত তৈলবীজও পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে আমাদের দেশেই জন্মায়। ইহাদের মধ্যে চিনাবাদাম, নারিকেল পাওয়া যায় গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, কেরালা, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বংগে; সরিষা উত্তর ভারতের সর্বত্রই উৎপন্ন হয়; তিল জন্মায় প্রধানত মধ্য প্রদেশ, বিহার আর উত্তর প্রদেশে; আর রেড়ি জন্মায় মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে।

খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য যেসব তৈলবীজ আমাদের দেশে জন্মায় তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে কার্পাস বীজ, তিসি প্রভৃতি। ভারতের তৈল-বীজাদির মধ্যে চিনাবাদামের পরেই কার্পাস বীজের স্থান। তাহা অধিক

পরিমাণে মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে জন্মে। তিসি প্রধানত জন্মায় মধ্য প্রদেশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশে।

(৩) **পাট**—পাট উৎপাদনে পূর্ব পাকিস্তানের পরেই পৃথিবীতে ভারতের স্থান। আর এই পাটের অর্ধেকই উৎপন্ন হয় পশ্চিম বংগে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও উত্তর প্রদেশে বাকী পাট জন্মায়।

(৪) **কার্পাস**—ভারতের প্রধান অর্থপ্রসূ শস্য। কার্পাস উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পরেই ভারতের স্থান। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্য প্রদেশের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত নিকৃষ্ট কার্পাস জন্মে। মধ্য ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস জন্মায় পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজে।

(৫) **শণ** (Hemp)—ইহার চাষ ভারতে খুব বেশী না হইলেও মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম বংগে যে শণ জন্মায় তাহা প্রধানত বস্তা ও ক্যানভাস তৈরীর কাজে লাগে।

(৬) **রেশম**—ভারতবর্ষে যে পরিমাণ রেশম জন্মায় তাহার প্রায় দুই-তৃতায়াংশ আসে মহীশূর হইতে। এছাড়া পশ্চিম বংগের মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বীরভূম, উত্তর প্রদেশের পর্বতগড় ও দেরাদুনে, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে এবং কাশ্মীরেও রেশমের চাষ হয়। তুঁতগাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশম-কীট প্রতিপালন করিয়া সেই কীট হইতে এই রেশম উৎপাদন করা হয়। রেশমের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে তসর বিহারের ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, আসাম ও উত্তর প্রদেশে; এণ্ডি আসামে ও পশ্চিম বংগের জলপাইগুড়ি জেলায়; মুগা আসামে ও মণিপুরে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আবাদী ফসল

এদেশের আবাদী ফসলের চাষ হয় প্রধানত পশ্চিম বংগের উত্তরাঞ্চলে, আসামে, নীলগিরি পর্বতাঞ্চলে এবং কেরালায়। আবাদী ফসলের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান:—

(১) **চা**—ভারতবর্ষে প্রায় ৬০০০ আবাদে ৭ লক্ষ একর জমিতে চা-র চাষ হইয়া থাকে। ইহার প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগই চাষ হয় উত্তর-পূর্ব ভারতে, অর্থাৎ পশ্চিম বংগের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় এবং আসামে। বাকী চা উৎপন্ন হয় মাদ্রাজ, ত্রিপুরা, কেরালা, উত্তর প্রদেশের দেরাদুন অঞ্চল এবং পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়।

ভারত
বাণিজ্যিক কৃষি-সম্পদ
ও
উৎপাদন-ক্ষেত্র
জম্মু ও কাশ্মীর
পাঞ্জাব
রাজস্থান
উত্তর প্রদেশ
বিহার
আসাম
পশ্চিম বঙ্গ
গুজরাট
মধ্যপ্রদেশ
উড়িষ্যা
মহারাষ্ট্র
অন্ধ্র প্রদেশ
মাদ্রাজ
তৈলবীজ
চীনাবাদাম
নারিকেল
সরিষা
তিল
রেড়ি
আখ
পাট
কার্পাস
রেশম
শন
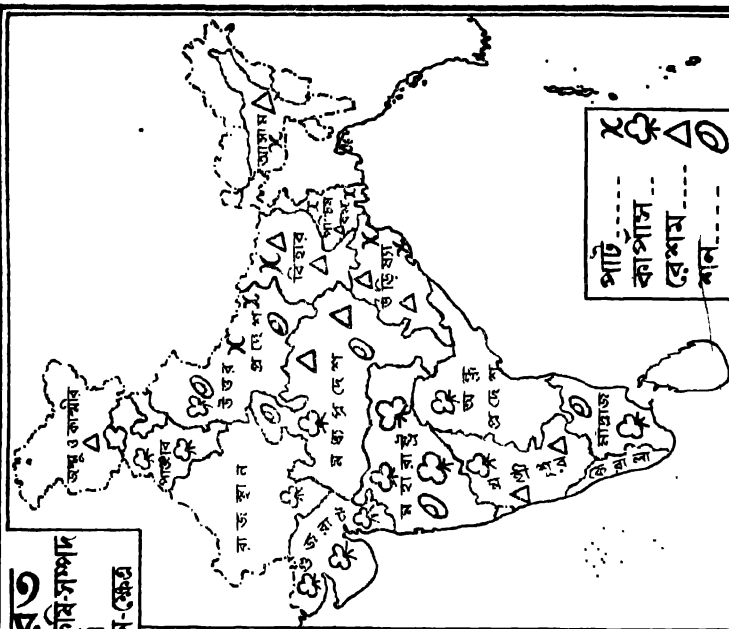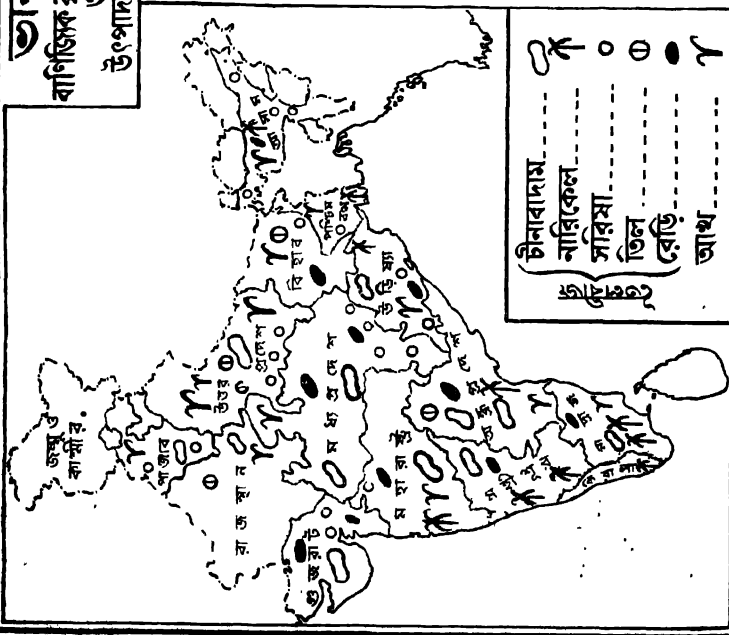
(২) **কফি**—প্রায় ১০,৮৫১ আবাদে মোটামুটি ২ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহার বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় দক্ষিণে মহীশূর, মাদ্রাজ, কুর্গ, ত্রিবাংকুর, কোচিন প্রভৃতি স্থানে। বাকী কফির চাষ হয় উড়িষ্যা, আসাম এবং মধ্য প্রদেশে।

(৩) **রবার**—ইহার চাষ কেরালা, মালাবার, কুর্গ ও মহীশূরে হইয়া থাকে।

(৪) **সিংকোনা**—ভারতবর্ষে এই গাছের চাষ সরকারের অধীন। প্রধানত নীলগিরি, আসাম ও দার্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চলে সিংকোনার চাষ হইয়া থাকে।

পশ্চিম বংগে ধানের চাষ

তোমাদের যে বিভিন্ন রকমের ধান-চাষের কথা বলা হইয়াছে, পশ্চিম বংগে সেই সবরকমের ধান-চাষই হয়। শীতের শেষে পশ্চিম বংগের নদীর ধারে, বিলের ধারে বা জলা জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়। এই ধান খুব তাড়াতাড়ি জন্মায়। কথায় বলে, বোরো ধান ষাট দিনের মধ্যেই পাকিয়া যায়। এই ধানের চাউলগুলি কিন্তু একটু মোটা হয়; তেমন স্বাদও নাই। সাধারণত দরিদ্ররাই এই ধানের চাউল খাইয়া থাকে। বসন্তের শেষের দিকে পশ্চিম বংগে আউশ ধান লাগানো হয়। প্রচুর জল না হইলে এই ধান ভালো হয় না। সাধারণত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এই ধান কাটা হয়। নাম আউশ বা "আশু" হইলেও এই ধান পাকিতে বোরো ধান হইতে বেশী সময় নেয়। শরতের প্রথম দিকে বাংগালী চাষী আমন ধান রোপণ করে। বর্ষায় যেসব জমিতে বেশী জল হয়, উহাতে আমন ধান বসন্তকালে লাগাইতে হয়। এইরকম জমিতে অনেক সময় আউশ ও আমন ধান একত্র লাগানো হয়। বর্ষাকালে আউশ ধান এবং শীতকালে আমন ধান ঘরে ওঠে। জমি উর্বর হইলে এবং ভাল করিয়া সার ব্যবহার করিলে কোনো ফসলেরই ক্ষতি হয় না। ধানের মধ্যে আমন ধানই শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আমন ধানের চাউলই খাইয়া থাকেন।

তিন প্রকারের ধানের ফলন

পশ্চিম বংগের আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে ধান চাষ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বোরো ধান জন্মায় সব চাইতে অল্প পরিমাণ জমিতে—মাত্র ০·৪ ভাগ জমিতে। আউশ ধানের ফলন বোরো ধান হইতে অনেক বেশী। ইহা জন্মায় ৭·১ ভাগ জমিতে। সব শেষে আমন ধান। ইহার চাষ হয় ৭১·৯ ভাগ জমিতে। উপরের সংখ্যাগুলি ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাব অনুসারে দেওয়া হইল। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে কিছুটা নূতন জায়গা পশ্চিম বংগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহাতে আবাদী জমির পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়াছে এবং উপরিউক্ত হিসাবেরও কিছুটা অদলবদল হইয়াছে।

বিভিন্ন ধরনের ধান ফলনের পরিমাণ

উপরের হিসাব হইতে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে পশ্চিম বংগে আমন ধানের উৎপাদন সব চাইতে বেশী। বর্ধমান জেলায় আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে আমন ধান জন্মায়। মেদিনীপুরে আমন ধানের উৎপাদন আরও বেশী ; শতকরা ৯৩ ভাগ আবাদী জমিতে আমন ধানের রোপণ করা হয়। চব্বিশ পরগণায় আবাদী জমির তুলনায় আমন ধান উৎপন্নকারী জমির পরিমাণ বর্ধমান জেলারই মতো। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যও আমন ধান। শুধু নদীয়া জেলার আবাদী জমির শতকরা ৭৫ ভাগে আউশ ধান জন্মায়। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বোরো, আউশ ও আমন এই তিনরকম ধানেরই ফসল হয়। কোচ-বিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ধানও আমন।

পশ্চিম বংগে ধান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যে একান্ত প্রয়োজন, একথা তোমরা সকলেই জান। চাউলই বাংগালীর প্রধান খাদ্য। চাউলের পরিবর্তে বাংগালীকে কিছু কিছু আটা খাইবার অভ্যাস করিবার নিমিত্ত আবেদন ব্যর্থ হইয়াছে। যদিও খাদ্য হিসাবে আটা হয়তো নানাদিক দিয়া উৎকৃষ্ট, তবু দীর্ঘদিনের খাদ্যাভ্যাসে আমরা এমনই শৃংখলে আবদ্ধ যে ভাতের বদলে কিছুটা আটা খাইবার কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। অথচ পশ্চিম বংগে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তাহাতে আমাদের চাউলের চাহিদা মিটিতে পারে না। চাউলের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। একেতো লোকসংখ্যানুপাতে আমাদের

ধানের ফলন বৃদ্ধি করার চেষ্টা

আবাদী জমি নিতান্ত অল্প, তাহার উপর কৃষিপ্রথায় নানারূপ দোষ-ত্রুটি থাকার ফলে ধান উৎপাদন আমাদের বেশী হয় না। তাই পশ্চিম বংগ সরকার নানা-ভাবে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সাহায্যে কি করিয়া আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে, সে কথা তোমাদের পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আমেরিকার সাহায্যে, বর্ধমান জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করার এক বিশেষ পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে। পশ্চিম বংগে ধানের ফলন বৃদ্ধি করার যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

পশ্চিম বংগে পাটের চাষ

পশ্চিম বংগে পাটের চাষের গুরুত্বও বেশী। পাট হইতে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করার যেসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার সবকয়টিই পশ্চিম বংগে অবস্থিত। তারপর, পাটজাত দ্রব্য আমাদের বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পাটজাত দ্রব্যের বাজার ভারতের এবং পাকিস্তানের প্রায় একচেটিয়া। দেশ বিভাগের ফলে, পাট উৎপাদনকারী অধিকাংশ জমি পূর্ব পাকিস্তানে থাকিয়া যায় এবং আমাদের পাটশিল্প গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। এদিকে, পশ্চিম বংগ এবং আসাম ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যের জমি পাট-উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নহে। নীচের হিসাব হইতে বুঝিতে পারিবে যে ভারতবর্ষে বর্তমানে পাট উৎপাদনে পশ্চিম বংগই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে—

পশ্চিম বংগে পাটচাষের গুরুত্ব

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্যের নাম	মোট আবাদী জমির অংশ	মোট ফলনের শতাংশ
১।	পশ্চিম বংগ	৪৪.৭	৪৭.৯
২।	আসাম	২১.৫	২৫.৮
৩।	বিহার	২৫.৩	১৯.২
৪।	ত্রিপুরা	৪.৯	৪.১
৫।	উত্তর প্রদেশ	২.৩	১.৮

কিন্তু, আমরা ধান-চাষ সম্বন্ধেই স্বাবলম্বী নহে। তোমরা দেখিয়াছ, আমরা

যে পরিমাণ ধান উৎপাদন করি, তাহাতে আমাদের চাউলের প্রয়োজনের নিবৃত্তি হয় না। এখন যদি আমরা পাট-চাষ বৃদ্ধি করিতে গিয়া ধান-চাষের জমি পাট-চাষের জন্য ব্যবহার করি তাহা হইলে পশ্চিম বংগে খাদ্যসংকট বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়াছেও। পাট-চাষ অধিক লাভজনক বলিয়া অনেক কৃষক আজকাল ধানের জমিতে পাট-চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই আমাদের পাটের চাষ বাড়াইতে হইলে নূতন নূতন জমিতে পাট-চাষ বৃদ্ধি না করিয়া, জমি প্রতি পাট উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার তাই পাট কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই কেন্দ্র হইতে পাট-চাষের এক নূতন পদ্ধতি বাহির করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে সোজা সারিবদ্ধভাবে পাটের বীজ বপন করিতে হয়। এক ধরনের ড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে লাইনে বীজ বোনা হয় এবং "হুইল হো" যন্ত্রের সাহায্যে ঘাস নিড়ানো হয়। এই পদ্ধতিতে চাষ করিলে, অল্প খরচে শ্রেষ্ঠতর পাট একর প্রতি অধিকতর পরিমাণে জন্মায়। পশ্চিম বংগে এই ধরনের পাট-চাষপ্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশের অধিকাংশ কৃষকই নিরক্ষর। তাহারা এই প্রথায় পাট-চাষে এখনও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই।

নূতন পদ্ধতিতে পাট-চাষ

পশ্চিম বংগের অনেক জেলায়ই এখন পাট চাষ হয়। বর্ধমান জেলায় আজকাল পাট-চাষ বেশ ভালোভাবেই হইতেছে। আগে পাট-চাষ শুধু কালনা ও জামালপুর থানায়ই হইত। বর্তমানে ইহা বর্ধমান জেলায় প্রায় সকল অঞ্চলেই বিস্তৃত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ, হুগলী, নদীয়া, হাওড়া এবং চব্বিশ পরগণা—এইসকল জেলায়ও পাট-চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোচবিহারেও ধানের চাষ কমিয়া পাটের চাষ বাড়িতেছে। দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলেও প্রচুর পাট জন্মায়। ধান-চাষের জমি কমাইয়া পাট-চাষের জমি ক্রমেই বর্ধিত হওয়ায় পশ্চিম বংগে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিভিন্ন জেলায় পাট-চাষ

আমাদের দেশে যে পাট-চাষ হয় তাহা প্রধানত দুই ধরনের, তিতা পাট ও মিঠা পাট। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম হইতেছে যথাক্রমে ক্যাপসুলারিস

(Capsularis) এবং ওলিটোরিয়াস (Olitorius)। তিতা পাট হইতে খুব মোটা আঁশ পাওয়া যায়, কিন্তু উহা মিঠা পাটের আঁশের মতো ততো সূক্ষ্ম ও নরম নহে। পশ্চিম বংগে মিঠা পাটের চাষই অধিক হইয়া থাকে।

দুই ধরনের পাট

পাট-চাষে বীজ বপন করিতে হয় ; চারা রোপণ করা হয় না। গাছ বড়ো হইলে গোড়ার ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করিয়া পাট গাছ যখন যতখানি বড়ো হইবার ততখানি হইয়া যায়, তখন উহার পাতা কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং ডাঁটাগুলি বাঁধিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। যখন ডাঁটাগুলি ভিজিয়া নরম হইয়া যায়, তখন উহাদের আঁশ রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়। এই আঁশগুলিই পাট। রৌদ্রে শুকাইবার পর পাট ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়।

পাট-চাষের পদ্ধতি

পশ্চিম বংগে চা-চাষ

চা-ও পশ্চিম বংগের আর একটি প্রধান কৃষিসম্পদ। ইহার সাহায্যেও ভারত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে। পূর্বে চা-চাষের ব্যাপারে ইংরেজরাই অগ্রণী ছিলেন। পশ্চিম বংগে অনেক চা-কর চা-বাগান করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর অনেক ইংরেজ কোম্পানীই নিজেদের ব্যবসা গুটাইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। ফলে, বর্তমানে চা-চাষের ব্যাপারে নিযুক্ত অধিকাংশ মূলধনই ভারতীয়।

বিশেষ ধরনের জলবায়ু ব্যতীত চা-গাছ জন্মাইতে পারে না। ইহার জন্য ভংগুর মাটি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত (কিন্তু দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা-সহ) প্রয়োজন। পাহাড়ের ঢালু জমিতে তাই চা-চাষ ভালো হয়। উত্তর বংগে চা-চাষের জন্য আদর্শ জমি আছে। আমাদের জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স ও দার্জিলিংএর চা পৃথিবী বিখ্যাত।

চা-গাছও বীজ হইতে জন্মায়। কিন্তু চায়ের চারা তিন বছর পর্যন্ত আলাদাভাবে নার্সারীতে বড়ো করিতে হয়। তারপর সেই চারা গাছ তুলিয়া একটি একটি করিয়া, পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব রাখিয়া, রোপণ করিতে হয়। চা-গাছ পূর্ণ বাড়ন্ত হইতে প্রায় সাত বৎসর লাগে। ১০০ বছরের পুরানো চা-গাছও দার্জিলিংএর কোনো কোনো বাগানে আছে।

চা-গাছ দীর্ঘদিন ধরিয়া চা পাতা যোগাইলেও দুই তিন বৎসর অন্তর অন্তর উহাদের পাতা ছাটাই করিয়া দিতে হয়।

চা-গাছের ডগার দুইটি পাতা ও একটি কুঁড়ি হইতে চা হয়। প্রায় দেড় দিন ঐগুলিকে রৌদ্রে শুকাইতে হয়। তারপর আরও কয়েকটি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া গিয়া উহা পূর্ণতা লাভ করে। আমরা বাজারে যে চা পাতা কিনিতে পাই সেইটিই চায়ের পূর্ণ রূপ।

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা

আমাদের কৃষি ব্যবস্থার সহিত অন্যান্য কয়েকটি দেশের কৃষি ব্যবস্থার তুলনা এইস্থানে অপ্রাসংগিক হইবে না। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কৃষি-পদ্ধতি, কৃষিজ দ্রব্যাদি ও ফসলের পরিমাণ এই তিন পর্যায়ে আমাদের আলোচনাকে ভাগ করিতে পারি।

ট্র্যাক্টর

কৃষি পদ্ধতি

আমাদের দেশে, তোমরা জান, এখনও বলদের বা মহিষের সাহায্যে ইস্পাতের ফলাযুক্ত লাংগল টানিয়া মাটি চাষ করা হইয়া থাকে। চাষের পর কাঠের মই অথবা বিদের উপর মানুষ দাঁড়াইয়া পশুর সাহায্যে উহা টানিয়া লয়। এইভাবে চাষ করা মাটির ঢেলাগুলি গুঁড়ানো হইয়া থাকে। তাহার পর ঐ ভাংগা গুঁড়ানো মাটি

নিংড়াইয়া আগাছা বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া হয় বীজ ছড়াইয়া নচেৎ চারা রোপণ করিয়া আমাদের চাষের কাজ হইয়া থাকে। বিদেশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই জমি চাষের কাজে শক্তিশালী যন্ত্রেরও প্রয়োগ হইতেছে। সেইসব দেশে আজকাল ইঞ্জিনচালিত মোটর-লাংগল অথবা ট্র্যাক্টর দ্বারা জমি চাষ করা হয় এবং তারপর হ্যারো, রোলার প্রভৃতির সাহায্যে ঐ মাটি গুঁড়াইয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় ইঞ্জিনচালিত বিপুল মোটর-লাংগল দিয়া এক সংগেই চাষ এবং জমির ঢেলা ভাংগিয়া সমতল করা হয়। ঐসব মোটর-লাংগলের সহিত যে অনেকগুলি ধাতুনির্মিত ধারালো দাঁত সংযুক্ত থাকে উহারাই ঢেলাগুলিকে ভাংগিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেয়। আগাছা উৎপাটনের জন্য হো-জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তবে মিশরে অবশ্য এখনও প্রধানত আমাদের দেশের মতোই প্রাচীন পদ্ধতিতেই চাষের কাজ হইয়া থাকে। রাশিয়া বা আমেরিকায় বপন-কৃষিরই প্রাধান্য। আর সেই বপনকার্যের জন্যও তাহারা ড্রিল প্রভৃতি বীজ-বপনযন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। ফলে, অল্প সময়ে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষ সম্ভব হয়। জাপানে কিন্তু রোপণ-কৃষিই বেশী হইয়া থাকে। তবে সেখানে আমাদের দেশের মত যেনতেনপ্রকারে ধানাদির চারা রোপণ করা হয় না। সুশৃংখল সারিবদ্ধভাবে সেখানে চারাগুলি রোপণ করা হয়। ফলে, শস্যের ফলনও বেশী হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও সাম্প্রতিককালে জাপানীপ্রথায় ধান-চাষ শুরু হইয়াছে। এই প্রসংগে আরও একটি কথা বলা দরকার। আমাদের দেশের কৃষকেরা বীজ ছড়ানো বা বোনার সময় তাহা বাছিয়া দেখার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন না। কিন্তু ভালো বীজ না হইলে ভালো শস্যও পাওয়া সম্ভব নহে। বিদেশে তাই বীজ বোনার আগে নীরোগ বীজগুলিই বাছিয়া লওয়া হয়। তাছাড়া, তুঁতের জল বা ফরমালিন মিশ্রিত জল প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেও বিদেশে বীজকে শোধন করা হয়। তেমনি আবার বিভিন্নজাতীয় রাসায়নিক সারের সাহায্যে বিদেশীরা মাটিকেও সবসময়ই সতেজ রাখিতে সচেষ্ট থাকেন। আমাদের দেশের কৃষকেরা এখনও গোবরের সার ছাড়া অন্যবিধ রাসায়নিক সার ব্যবহারে খুব বেশী উৎসাহী নহে। শস্যাবর্তনের মধ্য দিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির প্রতিও

বিদেশের কৃষক-সমাজ আগ্রহী। তবে আমেরিকায় কিন্তু চাষের জমি বিস্তর হওয়ার ফলে একই জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের চেষ্টা হয় না, বরং এক এক অংশে পৃথক পৃথক ফসলের চাষ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের মতো জাপানেরও প্রধান কৃষিদ্রব্য ধান। দেশের উত্তর ও মধ্য অংশে অধিক শীতের জন্য ধান-চাষ সম্ভব নহে। সেখানে গম, যব ও রাইয়ের চাষ হয়। সেখানে তামাক, ডাল প্রভৃতিও বহুস্থানে উৎপন্ন হয়। সেদেশের দক্ষিণ অংশে প্রচুর পরিমাণে চা এবং সেখানকার বিভিন্ন উপত্যকাতে তুঁতগাছের তথা রেশমের চাষ হয়। মিশরের প্রধান কৃষিদ্রব্য কার্পাস। তাছাড়া সেখানে প্রচুর পরিমাণে যব, তামাক, আখ, ধান, বীট, গম প্রভৃতিরও আবাদ হইয়া থাকে।

কৃষিজ দ্রব্যাদি : জাপান ও মিশর

সুবিশাল সোভিয়েট রাশিয়ায় বিভিন্ন জলবায়ুর প্রবাহে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাশিয়ার মধ্যভাগের ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ষ্টেপ অঞ্চলের স্বল্পবৃষ্টি ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলের মতোই গম, যব, বীট, রাই, তিসি প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বদিকের সমভূমিতে ধান ও সয়াবীনের চাষ হয়। আবার দক্ষিণের উষ্ণতর অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টি পাওয়া যায় বলিয়া (যেখানে বৃষ্টি প্রচুর নহে সেখানে জলসেচের দ্বারা জলের অভাব মেটানো হইয়া থাকে) আমাদের দেশের মতোই কার্পাস, আখ, ধান, তৈলবীজ, তামাক প্রভৃতির চাষ হয়। পাট-চাষের উপযোগী জলবায়ু এদেশে নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্তে কেনাফ গাছের চাষ এখানে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ককেশাস অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে চা-ও যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়া

আগেই বলিয়াছি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক একটি অংশে পৃথক পৃথক ফসলের চাষ হইয়া থাকে। ফলে, এদেশে বিভিন্ন কৃষি-বলয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মেক্সিকো সাগরের উপকূল অঞ্চলে যেখানে উত্তাপ ও বৃষ্টি দুইই প্রচুর সেখানে আমাদের দেশের মতোই ধান ও আখের চাষ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে আটলান্টিক উপকূল হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত অঞ্চলে যেখানে উত্তাপ অপ্রচুর নহে সেখানে প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়। কার্পাস-বলয়ের উত্তরে গ্রীষ্মকালে

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

যথেষ্ট তাপ ও শীতকালে শীত খুব বেশী না হওয়ার ফলে ভুট্টা ও শীতকালীন গমের চাষ হয়। এই অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলের জলবায়ু তামাক-চাষের উপযোগী বলিয়া সেখানে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। উহার উত্তরে শীতকালে বহুদিন প্রচুর তুষারপাত হয় বলিয়া সেখানে বসন্তকালীন গমের চাষ হয়। আবার
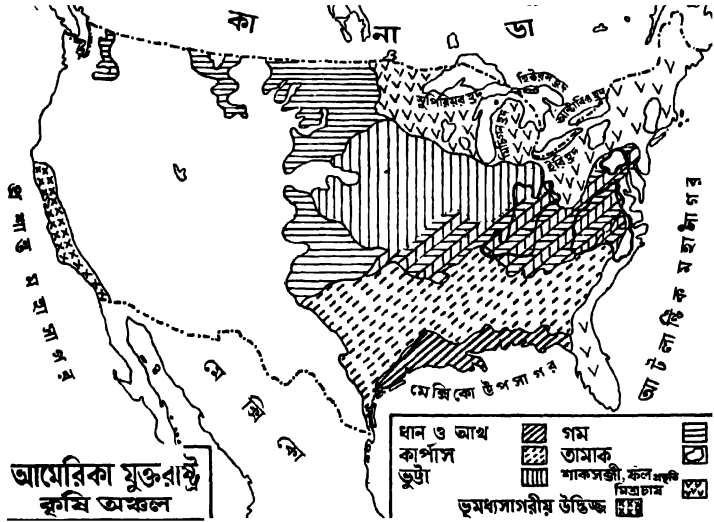
ইহার পূর্বদিকের হ্রদ অঞ্চলে লোকবসতি খুব ঘন বলিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের বিবিধ খাদ্য-চাহিদা মিটাইবার জন্য এখানে শাক-সবজি, ফল প্রভৃতির মিশ্র চাষ হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ভূমধ্য-সাগরীয় জলবায়ু দেখা যায় বলিয়া সেখানে জলপাই, আংগুর, কমলা প্রভৃতি প্রচুর ফল এবং গম ও তুঁতগাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কৃষিজ খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থানই আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে প্রথম। এখানেই পৃথিবীর প্রায় ২২% ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ধানের পরিমাণ পৃথিবীর সমস্ত ধানের মাত্র ২·৪%। কিন্তু ভারতে ধান বেশী উৎপন্ন হইলেও এখানে ফলন বেশী নহে। জাপানে যেখানে হেক্টর প্রতি ধানের ফলন ৪৮·১ শত কিলোগ্রাম, সেখানে ভারতের ফলন

কৃষির ব্যাপারে ভারতের পৃথিবীতে স্থান

হেক্টর প্রতি মাত্র ১২'২ শত কিলোগ্রাম। দেশহিসাবে সর্বপ্রধান গম-উৎপাদন স্থান খুব সম্ভবত রাশিয়া। তাহার পরেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন গমের প্রায় শতকরা ১৮ ভাগই এখানে উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদক হিসাবে ভারতের স্থান পঞ্চম (৫'৪%), চীন এবং কানাডার নীচে। মিশর প্রভৃতি অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে যবও অনেক কম চাষ হয়। বিভিন্ন মসলার চাষ যদিও স্বল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে তবু বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহা ভারতকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে। ফলের উৎপাদনও অবশ্য আমাদের দেশ অপেক্ষা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেশী।

বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে আখ ভারতবর্ষেই সবচাইতে বেশী ফলিয়া থাকে। আখ উৎপাদক হিসাবে ভারতবর্ষের পরে আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরা ও তাহার পরে মিশরের স্থান। চিনি তৈরীর অপর অন্যতম উপাদান বীট উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম ও তাহার পরই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। তৈলবীজের মধ্যে তিসির উৎপাদন সবচাইতে বেশী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। তাহার পর রাশিয়া ও ভারতবর্ষের স্থান। পৃথিবীতে যত তিসি জন্মায় তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ আমাদের দেশে জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য তৈলবীজের মধ্যে কার্পাস বীজ, সয়াবীন, সরিষা প্রভৃতিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই বেশী হইয়া থাকে। কিন্তু আবার তিল, চিনাবাদাম, নারিকেল, রেড়ি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ফলনের দিক হইতে অন্যান্য দেশগুলি অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান। পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় (অর্থাৎ পাকিস্তানের পরেই)। সেদিক হইতে পাট এদেশের সর্বপ্রধান অর্থপ্রসূ চাষ। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অন্যান্য দেশে পাটের বদলে সমগোত্রীয় অন্য বৃক্ষাদির চাষের চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রসংগে রাশিয়ার কেনাফ গাছের কথা তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে। কার্পাস উৎপাদনেও সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদক দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ)। তারপর হয়তো রাশিয়া এবং তারও পরে ভারতবর্ষ (প্রায় ১২%) এবং মিশর (প্রায় ৫%)। তবে ভালো জাতের তুলা উৎপাদক হিসাবে মিশরই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার তুলার আঁশও ভালো, এবং চাহিদাও সেই কারণেই বেশী। ইন্দ্রশন বা ফুলশন উৎপাদনে সবচাইতে অগ্রণী রাশিয়া;

তাহার পরেই ভারতের স্থান। সর্বশেষে রেশম উৎপাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কিন্তু জাপান (পৃথিবীর প্রায় ৬০ শতাংশ) ; তাহার পরেই শ্রেষ্ঠ উৎপাদন স্থান রাশিয়া। ভারতবর্ষে পৃথিবীর প্রায় ৫ শতাংশ রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আবাদী ফসলের মধ্যে চা উৎপাদনে মোটামুটি হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় (চীনের পরেই)। আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতের পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের স্থান। আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতেই কফি ও রবারের চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে ঐ দ্রব্যাদির উৎপাদনে কিন্তু ভারতের স্থান বহু নিম্নে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৃথিবীর সমস্ত রবারের মাত্র এক-শতাংশের মতো ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সমস্যা

উপরের আলোচনা হইতে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ, খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ভারতের স্থান মোটেই আশাপ্রদ নহে। বস্তুত, আমাদের দেশে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় আমাদের ক্রমবর্ধমান অধিবাসীদের চাহিদার তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। অথচ কৃষির উন্নতি না করিতে পারিলে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। ঋণ করিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি। কিন্তু আমরা দরিদ্র দেশ। খাদ্যদ্রব্যের যদি মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রায় উপবাস করিয়া মরিতে হয়। আবার খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি রোধ করিতে হইলে, কৃষির উন্নতিবিধান একান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয় আমাদের কৃষি অনেক দিন হইতেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির (Law of Diminishing Returns) আওতায় পড়িয়াছে। ব্যাপারটি একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশের জমি হইতে তো আমাদের প্রয়োজনানুরূপ ফসল উৎপন্ন হইতেছে না। তাহা হইলে, আমাদের কি করা উচিত? হয় আমাদের নূতন জমি চাষ করিতে হয়, আর না হইলে যে জমি আছে, তাহার উপরই আরও বেশী অর্থব্যয় করিয়া তাহা আরও গভীরভাবে চাষ করিতে হয়। কিন্তু, একই জমিতে যদি ক্রমান্বয়ে অধিকতর

ব্যয় করিয়া, অধিকতর শ্রম ইত্যাদি নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা বাড়িলেও, অর্থব্যয়ের হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। ইহাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি বলে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি বুঝিতে সহজ হইবে—

বৎসর	জমির পরিমাণ	অর্থ নিয়োগের পরিমাণ	সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণ	অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ
প্রথম	১ বিঘা	১০ টাকা	১০ মণ ধান	
দ্বিতীয়	„	২০ টাকা	২৫ মণ ধান	১৫ মণ
তৃতীয়	„	৩০ টাকা	৩০ মণ „	৬ মণ
চতুর্থ	„	৪০ টাকা	৩২ মণ „	২ মণ

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে দেখিবে যে, দ্বিতীয় বৎসর যে হারে জমিতে অর্থ নিয়োগ করা হইয়াছিল, উৎপাদনের হার তার চাইতে বেশী ছিল। দ্বিগুণ অর্থ নিয়োগ দ্বারা আড়াই গুণ ফসল পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তারপর হইতে প্রতি বৎসরই অর্থ নিয়োগের হারের চাইতে উৎপাদনের পরিমাণের হার কম হইতেছিল। কাজেই এই জমি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির আওতায় পড়িয়াছে। আমাদের দেশের সকল চাষের জমিই প্রায় এই বিধির আওতায় পড়ে। অথচ আমাদের দেশে অতিরিক্ত জমির পরিমাণ সামান্য। নূতন নূতন জমি চাষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের এতটা নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। বর্তমানে আমাদের চাষপ্রথার যেসব ত্রুটি আছে তাহা দূর করিয়া, আমরা হয়তো আমাদের জমিকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির আওতা হইতে দূরে রাখিতে পারি। একই জমিকে উন্নততর প্রথায় চাষ করিয়া তাহার ফলন খুব বেশী পরিমাণে বাড়াইতে পারি।

আমাদের দেশের কৃষির এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবার কারণ, আমাদের কৃষকরা এখনও মধ্যযুগীয় কৃষি-ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যখন উন্নত ধরনের কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদের দ্বারা জমি প্রতি শস্যের ফলন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সারের প্রয়োগে ঐ সকল দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, শস্যা-বর্তন, বীজ নির্বাচন প্রভৃতির দ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদিত হইতেছে, আমাদে

দেশের চাষীরা তখনও কাঠের লাংগল, মই, গোবর সার, সাধারণ গতানুগতিক বীজ লইয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। ফলে, যে জাপান মাত্র বিশ পঁচিশ বছর আগেও আমাদের দেশ হইতে বা ব্রহ্মদেশ হইতে কয়েক কোটি টাকার শুধু ধানই কিনিত, সেই জাপানও নিজের খাদ্যে ধানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিয়াছে, অথচ আমাদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই।

আমাদের দেশে ফসলের কম ফলনের কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়—(১) বৈজ্ঞানিক চাষের পদ্ধতির অনুপস্থিতি, (২) ভালো বীজের অভাব, (৩) জলসেচের সুবিধার অভাব, (৪) উপযুক্ত সারের অভাব, (৫) এক-ফসলী চাষ ইত্যাদি। সংক্ষেপে এই কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসংগিক হইবে না।

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের দেশের চাষপদ্ধতি এখনও মধ্যযুগীয়। তাহার অন্যতম কারণ আমাদের দেশের জমির আয়তন খুব ছোটো। একজন কৃষকের জমি অনেকগুলি ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত। আবার এই খণ্ডগুলি দূরে দূরে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। যৌথপরিবার প্রথা দ্রুত ভাংগিয়া পড়ার ফলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এবং আমাদের উত্তরাধিকার আইনের জন্য (পিতার মৃত্যুর পর সকল ভাই-বোনের উপরই জমির উত্তরাধিকার বর্তায়) জমি এত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে চাষের ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে এবং জমির ফলন কমিয়াছে। জমি একত্র থাকিলে একখানা লাংগল ও একজোড়া বলদ দিয়া একজন চাষী যে জমি চাষ করিত, জমি খণ্ড খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে, সেই জমি চাষ করিতে তাহার তিনখানা লাংগল, তিন জোড়া বলদ ও তিনজন চাষীর প্রয়োজন। তারপর, জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িলে, প্রত্যেক খণ্ডের সীমানা মাটির আল দিয়া বাঁধিয়া স্থির করিতেও কিছুটা জমি নষ্ট হয়। ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত চাষের জমির সব চাইতে বড়ো অসুবিধা হইতেছে যে, উহাতে আধুনিকতম যন্ত্রের সাহায্যে চাষ চলে না।

দীর্ঘদিনের সংস্কারের বশে অথবা চাষীদের সামাজিক অস্বীকৃতির জন্য আমাদের দেশে কৃষিকাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। অবশ্য, অন্যান্য দেশে জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা কম হওয়ায় যন্ত্রের

প্রয়োজন যে পরিমাণে অনুভূত হইয়াছে, আমাদের দেশে জমির আয়তনের তুলনায় কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী হওয়ার জন্য যন্ত্রের জন্য প্রয়োজন ততো বেশী দেখা দেয় নাই। তাছাড়া, আমাদের দেশের মাটি পাললিক হওয়ায়, বিশেষ কঠিন নহে বলিয়াও, শক্তিশালী ভারী যন্ত্রের চাহিদা বিশেষ অনুভূত হয় নাই। তাই আমাদের দেশে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করিতে হইলে কতকগুলি ব্যাপারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় :—

(ক) আমাদের কৃষক সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে যন্ত্রবিদ্যা শেখানো ;

(খ) আমাদের কোমল ভূমির উপযোগী শক্তিশালী যন্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা ;

এবং, (গ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্রের মালিকেরাও যাহাতে এইসব যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে সেই জন্য যৌথ খামারের প্রচলন।

আমাদের দেশের কৃষকদের মূলধনের অভাবও কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহারের অন্যতম বাধা। অধিকাংশ কৃষকেরই আজ খাইলে কাল খাওয়ার নাই। অধিকন্তু তাহারা ঋণভারে জর্জরিত। এই অবস্থায় দামী যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার কথাও তাহারা ভাবিতে পারে না। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থা না হইলে চাষীদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হওয়ার উপায় নাই। নানা কারণেই চাষীরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উচিত মূল্য পায় না। অভাবের তাড়নায় অনেকেই ফসল উৎপন্ন হওয়ার সংগে সংগেই তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। স্বভাবতই সেই সময় ফসলের দাম কম থাকে। অনেকে তো আবার ফসল উৎপন্ন হইবার পূর্বেই মহাজনের নিকট হইতে দাদন লইয়া রাখে, এবং উৎপন্ন ফসল সোজাসুজি গিয়া মহাজনের ঘরে ঢোকে। ফলে, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও চাষীদের কোনো সুবিধা হয় না। মহাজন, দালাল ইত্যাদি লাভ করে। অনেক স্থানে উপযুক্ত রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের অভাবেও কৃষিজাত দ্রব্য বাজার অনুপাতে সঠিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না।

শুধু কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত বিক্রয়-ব্যবস্থার দ্বারাই চাষীদের

আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা যাইবে না। শুধু কৃষির আয় কাহারও পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না। তাহার সংগে উপজীবিকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কৃষিকার্য করিয়া কৃষকের হাতে সময়ও থাকে প্রচুর। কাজেই ইচ্ছা করিলে সে নানাধরণের উপজীবিকা গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশে পূর্বে ঘরে ঘরে বিভিন্ন শিল্পকার্য করা হইত। কিন্তু বৃটিশ আমলে তাহাদের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। উহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, কৃষকদের উপজীবিকার সুযোগ না দিতে পারিলে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে না। চাষের সংগে সংগে বিধিবদ্ধভাবে পশু ও পক্ষীপালন এবং দুধের ব্যবসাও চাষীরা করিতে পারে।

ভালো বীজের অভাব যে কৃষিকার্যের উন্নতির অন্যতম অন্তরায় এক্‌থা আগেই বলা হইয়াছে। বিদেশে চাষীরা নীরোগ বীজের ব্যবহার করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের দেশেও চাষীরা উদ্যোগী হইলে এই সমস্যার সমাধান করা দুঃসাধ্য হইবে না।

বৃষ্টির অনিশ্চয়তাও বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের কৃষিকার্যের প্রধান অন্তরায় হইয়া ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনার কল্যাণে অবশ্য এই সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য, এই প্রসংগে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। জলসেচনের মতো জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবও চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। বেশী জল দাঁড়াইয়া থাকিলে একদিকে যেমন জমির ক্ষার বেশী গলিয়া গিয়া জমি ক্রমেই অনুর্বর হইয়া পড়ে, তেমনি অন্যদিকে গাছের শিকড়ের যে বায়ু চলাচল প্রয়োজন, সেই বায়ু গাছের শিকড়ে পৌঁছাইতে পারে না, ফলে গাছের পুষ্টিসাধনও হয় না। তাই জমিতে জলসেচনের মতো জলনিকাশেরও ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আমাদের কৃষকেরা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সারের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রায় একেবারেই অজ্ঞ। তাহারা শুধু গোবরের সারের ব্যবহারই জানে। অথচ আমাদের দেশে যে পরিমাণ গোবর পাওয়া সম্ভব, তাহার বহুলাংশই জ্বালানীরূপে আমরা অপচয় করিয়া ফেলি। সুতরাং কৃষির উন্নতি করাইতে হইলে আমাদের কৃষকদের বিভিন্ন প্রকার সারের গুণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত করানো যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বল্পমূল্যে তাহারা যাহাতে

ঐসব সার পাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার।

আমাদের দেশে ধান কাটার পর বেশীর ভাগ ক্ষেতেই সমস্ত গোরুকে মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং সেইহেতু ঐসব ক্ষেতে আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। অথচ শস্য পরিবর্তন শুধুই যে খাদ্যাভাব পূরণের কাজেই সহায়তা করিবে তাহাই নহে, উহার ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইয়া পরোক্ষভাবে দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানেও সাহায্য করিবে।

আমাদের কৃষকদের স্বাস্থ্যও ভাল নহে। ম্যালেরিয়া, জ্বর, আরও নানা ধরনের অসুখ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহারা জর্জরিত। সুস্থ শরীর এবং সবল মন লইয়া তাহারা কার্য পরিচালনা করিতে পারে না। কিন্তু সব কিছুর উপরে রহিয়াছে কৃষকদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। এতক্ষণ পর্যন্ত কৃষিকার্যের উন্নতির অন্তরায় হিসাবে যেসব কারণের উল্লেখ করা হইল, তাহাদের প্রায় সব কয়টির অন্তত আংশিক প্রতিকার হইতে পারে, যদি কৃষকেরা যথাযথ শিক্ষা পায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই নিরক্ষর। তারপর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এখনও প্রবর্তিত না হওয়ার ফলে, কৃষকদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইবে সে ভরসা নাই।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করার উপায়

কি করিলে আমাদের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তাহা কৃষি ব্যবস্থার অবনতির কারণ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতেই তোমরা অনুমান করিতে পার।

প্রথমেই জমির একত্রীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। যতদিন কৃষকদের জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আধুনিক প্রথায় কৃষির প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। এইভাবে সমস্যা সমাধানের আলোচনা করা যায়। প্রথমত, পাঞ্জাবে যেরূপ সমবায় প্রথায় খণ্ড খণ্ড জমি একত্রিত করিয়া, জমির মালিকেরা মিলিয়া মিশিয়া জমি চাষ করিয়া থাকে সেইরূপ সমবায় প্রথার প্রবর্তন করা যায়। পাশাপাশি জমির মালিকগণ যদি তাহাদের অন্যস্থানে অবস্থিত জমি পরস্পরের মধ্যে বদল করিয়া লন তবেও এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থা কার্যকরী করা প্রথম ব্যবস্থা হইতে আরও কঠিন। আর একটি উপায় আছে। সরকার বাধ্যতামূলক আইন

করিয়া চাষে সমবায় প্রথার প্রবর্তন করিয়া দিতে পারেন। গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে অবশ্য ঐরূপ আইন করা খুব বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি কৃষকদের মংগলের জন্য, দেশের মংগলের জন্য ঐ ধরনের আইন প্রণয়নের কথা ভাবা যাইতে পারে।

আমাদের সেচব্যবস্থার উন্নতি যে একান্ত আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহারেও আমাদের কৃষকদের অভ্যস্ত হইতে হইবে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাহাদিগকে সহজ ঋণ-দানের ব্যবস্থা এবং কৃষিজাত-দ্রব্যের উপযুক্ত বিক্রয়ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষীদের বিভিন্ন উপজীবিকার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে ডাক্তারখানার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে এবং বয়স্কদের জন্য সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ বই না পড়িয়াও যাহাতে আধুনিক যুগে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্ঞান তাহারা পায়, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। একই পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বিষয়ে তাহাদিগকে বিস্তারিত জ্ঞান দিতে হইবে।

সর্বশেষে, আধুনিকতম পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উন্নত বীর্জ ব্যবহারের সুযোগ চাষীদের দিতে হইবে। যন্ত্রপাতির ব্যবহারেও তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে।

কৃষিকার্যে সরকারের উন্নতির চেষ্টা

বলা বাহুল্য, উপরে যাহা আলোচিত হইল, রাষ্ট্রের সরকারী সহায়তা ব্যতীত তাহার দ্রুত-রূপায়ণ সম্ভব নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের সমস্ত সামর্থ্য লইয়া কৃষির উন্নতির কাজে ব্রতী হইয়াছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় সরকারও এই উদ্দেশ্যে প্রচুর প্রয়াস পাইতেছেন। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে কৃষিখাতে বরাদ্দ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে (দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫৬৮ কোটি টাকার স্থলে তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪৭৫ কোটি টাকা)। কৃষির সামগ্রিক উন্নতিবিধানে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রে

কৃষিবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। কৃষিসংক্রান্ত বিবিধ গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেমন অর্থসাহায্য দিয়া পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে, তেমনি সরকারী অর্থানুকূল্যেই কটকে সেণ্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, সিমলায় সেণ্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কুলুতে সেণ্ট্রাল ভেজিটেবল ব্রীডিং স্টেশন, কানপুরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব স্থগার টেকনোলজি, কোয়েম্বাটুরে ও কর্ণালে স্থগার-কেন ব্রীডিং ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার সরকারী অর্থানুকূল্যেই বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য সম্বন্ধে গবেষণা চালানোর জন্য বোম্বাইতে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি, কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি, ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল অয়েল-সীডস্ কমিটি, কানপুরে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল স্থগার-কেন কমিটি, কয়ানগুলমে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোকোনাট কমিটি, রাজমহেন্দ্রীতে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল টোবাকো কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন Commodity Committee স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিরাজ্যে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের পশ্চিম বংগে কল্যাণীতে বিড়লা কৃষি মহাবিদ্যালয় এই জাতীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এছাড়া, সরকারী অর্থানুকূল্যেই উত্তর প্রদেশের রুদ্রপুরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। সর্বোপরি, জাতীয় সরকার একদিকে যেমন বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেছেন, বা কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন কার্যপরিকল্পনাকে (Work schemes) রূপ দিতেছেন, তেমনি অন্যদিকে চাষীদের উন্নততর বীজাদি, সার প্রভৃতি সহজে ও স্থলভে যোগান দিবারও (Supply schemes) ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সরকার এবং তোমরা যাহারা কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আমাদের দেশের কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Discuss, with examples, the influence of character of soil and climate on Indian agriculture.

2. Describe the characteristics of the following types of soils, found in India, with the types of crops usually grown in them—(a) Alluvial Soil (b) Black Soil (c) Red Soil (d) Laterite Soil.

3. Write a short essay on the nature and classifications of agriculture in India.

4. Discuss the drawbacks of Indian agriculture and how they may be removed.

5. Describe, with examples, the different kinds of irrigation methods in use in India, indicating the parts (of India) where they are popular.

6. Write a short essay on the river valley projects in India with special reference to the Damodar Valley and Mayurakshi projects.

7. Write a short essay on the principal agricultural products of India.

8. Compare agriculture in India with (a) Japan (b) Egypt (c) Soviet Union (d) U. S. A.

9. Discuss the problem of self-sufficiency in food for India. What steps are being taken to solve the problem ?

10. State what you know of the production of Rice, Jute and Tea in West Bengal.

11. Write an essay on Government efforts to improve our agriculture.

B. Answer the following questions in not more than 70 words :—

1. Explain why agriculture should be considered as very important to India.

2. Explain why heavy machineries cannot be used to a very great extent in Indian agriculture.

3. Explain what you understand by "Rabi" and "Kharif" crops, giving examples of each.

4. Explain what is the utility of rotation of crops.

5. Explain what is meant by economic crops. Give examples.

6. Distinguish, with examples, between planting (রোপণ) and sowing (বপন) in agriculture.

7. Distinguish, with examples, between self-sufficient agriculture and one-crop agriculture.

8. Distinguish, with examples, between wet agricultre and irrigation agriculture.

C. 1. Find in the left-hand column below certain names of types of agriculture and in the right-hand column, certain phrases. Match the names to the phrases by putting the number on the left of the name inside the bracket in the right of the phrase to which it is related. If more than one name relates to a single phrase, you can put more than one number.

Names	Phrases
1. Planting agriculture	Spreading seeds in the field ( ) Plenty of rainfalls ( ) Tea and coconut plants ( ) Foot of the Himalayas ( ) Water is not available at the time of agriculture ( ) Very little rainfall ( ) Land is ploughed deeply ( ) One crop raised from the soil in a year ( ) Certain parts of the Deccan ( ) Digging of wells ( ) More than one crop is raised during a year ( ).
2. Sowing agriculture	
3. Dry agriculture	
4. Wet agriculture	
5. Irrigation agriculture	
6. Extensive agriculture	
7. Intensive agriculture	

2. Find in the left-hand column below certain names of crops and in the right-hand column certain phrases. Match the names to the phrases by putting the number on the left

of the name inside the bracket on the right of the phrase to which it is related. If more than one name relates to a single phrase, you can put more than one number.

Names

1. Paddy
2. Wheat
3. Barley
4. Millets
5. Pulses
6. Spices
7. Oilseeds
8. Sugarcane

Phrases

Earns foreign exechange ( ) Grows more or less throughout India ( ) 12 p.c. of arable land of India is under the crop ( ) $\frac{3}{4}$ of the total production of the crop comes from Punjab and U. P. ( ) Principal food of the poor cultivators of the Deccan ( ) 30 p.c. of arable land of India is under this crop ( ) Only 3 p.c. of arable land in India is under this crop ( ) India is the largest producer of it in the world ( ) Grows mostly in U. P. ( ) Madras is the largest producer of the crop in India ( ) 12·2 hundred kilograms of the crop is grown per hectare in India ( ) India produces about 45 lakhs of tons of this crop in a year ( ) West Bengal occupies the third place in regard to the production of the crop ( ) It is the most important food crop for people of Northern, Central and Western India ( ) It is a substitute of protein food for vegetarians ( ).

D. The following is for your scrap-book :—

1. In separate outline maps of India, show the following :—

(a) Distribution of (i) Alluvial soil (ii) Black soil (iii) Red soil (iv) Laterite soil.

(b) Location of the different River Valley Projects.

(c) Production of different kinds of food crops in different parts of India.

(d) Production of different kinds of economic crops in different parts of India.

2. Fix as many of the following pictures as possible :—

(a) About River Valley Projects (b) About different types of cultivation (c) About different types of irrigation (d) Wheat field (e) Sugarcane field (f) About agricultural products.

3. Fix in your scrap-book as many samples of agricultural crops as you can collect.

E. The following projects may be undertaken :

1. In villages, every student should visit an agricultural field and take down what a cultivator says about cultivation.

In cities and towns, the whole class may go on an excursion for the purpose.

2. Preparation of a model of any of the River Valley Projects.

3. In villages, every student should visit a place of irrigation and collect information from the farmer about irrigation work.

In towns and cities, the work can be planned as an excursion.

4. A class dramatisation may be undertaken :—

Students may play the role of different crops in India and narrate how they are cultivated, where they are grown and what is their utility to people.

কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্যাদি

শুধু কৃষিজাত দ্রব্যাদি দ্বারাই আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন তাহার অন্যতম অংগ প্রোটিন ও চর্বি-জাতীয় খাদ্য কৃষিজ দ্রব্যাদি হইতে বিশেষ পাওয়া যায় না। ইহা পাওয়া যায় জীবদেহজাত মাংসাদি বা পশুজাত দুগ্ধাদি খাদ্য হইতে। তাই খাদ্য হিসাবে ভাত-ডাল-গম প্রভৃতির সহিত মাছ-মাংস-দুধ প্রভৃতিও আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে আমাদের দেশের অবস্থা এখনও খুব আশাপ্রদ নহে। তাহার কারণ, কি গো-জাতীয় পশুপালনে, কি হাঁস-মুরগী প্রভৃতি পালনে, বা কি মৎস্য-চাষে কৃষির মতই আমরা এখনও বহু পিছাইয়া আছি। উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রথায় পশুপালন বা প্রজনন, মাছের চাষ প্রভৃতি আমাদের দেশে সরকারী প্রচেষ্টায় শুরু হইলেও এখনও সর্বত্র স্বীকৃত ও সমাদৃত হয় নাই। পশুপালন বা মৎস্য-চাষ প্রভৃতি জীবিকা হিসাবে এখনও তাহাদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায় নাই।

ভারতে কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্যাদির উন্নতির প্রয়োজন

শুধু খাদ্যের উৎস হিসাবেই নহে, পশুজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন খাদ্য-শিল্প, চর্ম-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প, সারতৈরী-শিল্প প্রভৃতির কাঁচা মাল হিসাবেও একান্ত প্রয়োজনীয়। এইসব শিল্পের উন্নয়নের জন্যও তাই আমাদের পশু-সম্পদের উন্নতি একান্ত দরকার। তাছাড়া, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দেশে পুরাপুরি যন্ত্রের ব্যবহার কৃষিকার্যের জন্য শুরু হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত কৃষিকার্যের জন্য গব্যাদি পশুর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে এই কারণেই উন্নততর পশুপালন-পদ্ধতি ও প্রজনন ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

পশুপালন

ভারতবর্ষের পশ্বাদিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা চলে—(১) গো-জাতীয় (Bovine)—যথা, গোরু, ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি; (২) মেষ-জাতীয় (Ovine)—যথা, ছাগল, ভেড়া, প্রভৃতি এবং (৩) অন্যান্য—যথা, ঘোড়া, গাধা, শূকর প্রভৃতি।

গো-জাতীয় পশু আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য দুধের যোগান দেয়। ভারতবর্ষে প্রায় ষোল কোটি গোরু ও ষাঁড এবং প্রায় সাড়ে চার কোটি মহিষ রহিয়াছে। তুলনামূলকভাবে বলা চলে, পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গোরু ও ষাঁড় এবং দুই-তৃতীয়াংশ মহিষ ভারতবর্ষেরই সম্পদ। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের গোরু নিতান্ত অল্প দুধ দেয়। যেখানে হল্যাণ্ডে প্রতি গোরু বৎসরে গড়ে ৮০০০ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭০০০ পাউণ্ড, সুইডেনে ৬০০০ পাউণ্ড এবং আমেরিকায় ৫০০০ পাউণ্ড দুধ দেয়, সেখানে ভারতবর্ষে ঐ হার মাত্র ৪১৩ পাউণ্ড। ফলে, ভারতবর্ষের অধিবাসীরা খুব অল্পই দুধ খাইতে পায়। যেখানে হল্যাণ্ডে লোকে মাথাপিছু দৈনিক দুধ পায় ২৪৪ আউন্স, ডেনমার্কে ১৪৮ আউন্স, ইংল্যাণ্ডে ১৪০ আউন্স, আমেরিকায় ২৭ আউন্স সেখানে ভারতবর্ষে ঐ হার মাত্র ৫·৮ আউন্স।

গো-জাতীয় পশু

ইহার কারণ, ভারতবর্ষে ভালোজাতের গোরু-মহিষ খুব বেশী পাওয়া যায় না। অবশ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গো-পালন আমরা জানিও না। আমাদের দেশের গোরু ও ষাঁড়গুলিকে সিন্ধী, শাহীওয়াল, হরিয়ানা, গির প্রভৃতি পঁচিশটি সুনির্দিষ্ট ও উৎকৃষ্ট জাতে, এবং মহিষগুলিকে জাফেরবাদী, মুরা, সুরাটী প্রভৃতি
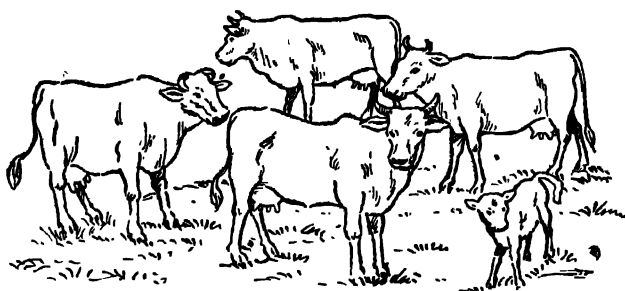
বিভিন্ন জাতির গোরু

ছয়টি জাতে ভাগ করা চলে। কিন্তু এইসব জাতের গোরু বা ষাঁড় বা মহিষ প্রায় সবই ভারতের মধ্যভাগে বা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই দেখা যায়। পূর্বাঞ্চলে বা দক্ষিণে যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী সেখানে এইসব জাতের গো-মহিষাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন

অঞ্চলের দুধের মাথাপিছু ব্যবহারের (per capita consumption) পরিমাণ লক্ষ্য করিলেই এই কথা সুস্পষ্ট বোঝা যাইবে। যেখানে পাঞ্জাবে মাথাপিছু দুধ সরবরাহ হয় ১৪'৭৫ আউন্স, উত্তর প্রদেশে ৮'২ আউন্স, বা রাজস্থানে ৮'১ আউন্স, সেইজায়গায় মাদ্রাজে উহার পরিমাণ মাত্র ২'৭ আউন্স, কেরালায় ১'৪ আউন্স, আসামে ১'৯ আউন্স, উড়িষ্যায় ১'৮ আউন্স এবং পশ্চিম বংগে ২'৬ আউন্স। চাষের ব্যাপারেও বলা হইয়া থাকে, যেখানে পূর্বাঞ্চলে এক জোড়া বলদ মাত্র ৭'৬ একর জমি চাষে সহায়তা করিতে পারে, সেখানে পশ্চিমাঞ্চলে একজোড়া বলদ পারে ১৯'২ একর জমি চাষে সহায়তা করিতে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের বৃষ্টিপাতের মানচিত্রের সহিত এখানকার গো-জাতীয় পশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

সাম্প্রতিককালে আমাদের সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে কৃষির ন্যায় উন্নত পশুপালন পদ্ধতির উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ স্কীম, গোসাধন স্কীম, গোশালা স্কীম প্রভৃতি পশু-প্রজনন ও উন্নত ধরনের পশুপালনের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বাংগালোরে সেণ্ট্রাল ষ্টাড্ ফার্ম নামক কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারী কলেজ গড়িয়া উঠিতেছে। রিণ্ডারপেষ্টজাতীয় গবাদি পশুর প্রধান শত্রু বিনষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় রিণ্ডারপেষ্ট কণ্ট্রোল কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, এবং রাণীপেট, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, হিসার ও ইজ্জাৎনগরে রিণ্ডারপেষ্টের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে টীকা তৈরীর কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

মেষজাতীয় পশু

গুরুত্বের দিক দিয়া গবাদি পশুর পরেই মেষজাতীয় পশুর স্থান। পশম, মাংস, চামড়া এবং দুধ প্রভৃতি উৎপাদনের দ্বারা গবাদি পশুর ন্যায় ইহারাও জাতীয় আয়ের ভাণ্ডারে যথেষ্ট জোগান দিয়া থাকে। ভারতবর্ষে আনুমানিক প্রায় তিন কোটি আশী লক্ষ মেষ, এবং প্রায় পাঁচ কোটি আশী লক্ষ ছাগল রহিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে মেষগুলিকে চৌদ্দটি বিভিন্ন জাতে ভাগ করা গেলেও, প্রধানত ইহাদের লোমশ এবং পশমী—এই দুই ভাগেই ভাগ করা হইয়া থাকে। পশমীজাতীয় মেষের মধ্যে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, ও পশ্চিম বংগে হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চলের গুরেজ, রামপুর, বুসের,

পশমিনা, কর্ণাহ প্রভৃতি জাতীয় মেষপালই ভালো শাদা পশমের জোগান দিয়া থাকে। দক্ষিণ দেশের মেষজাত পশম এই পশমের ন্যায় শাদা নহে। অবশ্য উভয়েরই আঁশ (staple) ছোটো ছোটো। ভারতবর্ষে প্রতি বছরে প্রায় ছয় কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মেষপ্রতি পাওয়া যায় তিন-চতুর্থাংশ পাউণ্ড হইতে চারি পাউণ্ড পর্যন্ত
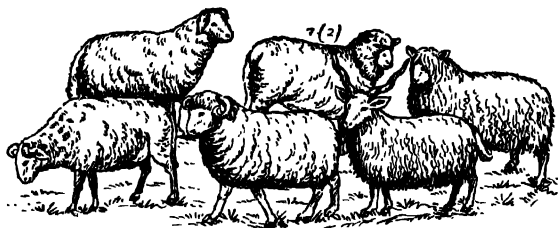
বিভিন্ন জাতির মেষ

(যেখানে অষ্ট্রেলিয়ায় মেষপ্রতি পশম পাওয়া যায় প্রায় সাড়ে সাত পাউণ্ড)। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পশম উৎপাদনের কেন্দ্র হইতেছে পাঞ্জাবের হিসার জেলা, উত্তর প্রদেশের গাঢ়ওয়াল, আলমোড়া ও নৈনীতাল, মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর ও বেল্লারী জেলা, বিকানীর ও মহীশূর। শেষোক্ত রাজ্যে বাংগালোরে পশম তৈরীর কারখানা রহিয়াছে।
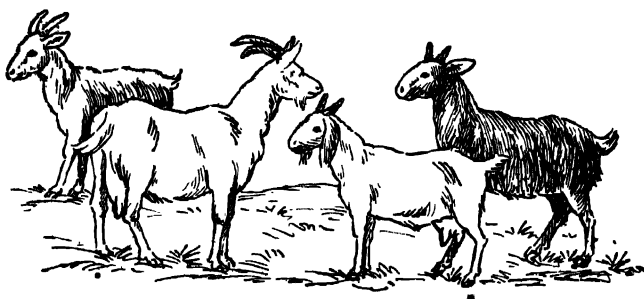
বিভিন্ন জাতির ছাগল

ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় মাংসের জোগান হইয়া থাকে প্রধানত ছাগল-জাতীয় জীব হইতে। ইহাদের প্রধানত দাক্ষিণাত্যের আমনাপুরী, পশ্চিম-ভারতের সুর্তী, পশ্চিম বংগ ও গঞ্জামের শাদা দাড়িযুক্ত ছাগল এবং সুদূর

দক্ষিণের তেলেংগানা—এই কয় জাতে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহারা দুধের জোগানও দিয়া থাকে, তবে ভারতবর্ষের সামগ্রিক দুধের জোগানের মাত্র শতকরা তিনভাগ ছাগলের দুধ হইতে আসে। গড়ে এক একটি ছাগল বছরে আনুমানিক মাত্র দুইশত পাউণ্ড দুধ দিয়া থাকে। গবাদি পশুর ন্যায় উন্নততর প্রজনন ব্যবস্থার দ্বারা ইহাদের দুধ সরবরাহের ক্ষমতাও বাড়ানো সম্ভব। বস্তুত, ভারতের বিভিন্ন সরকারী পশু গবেষণা কেন্দ্রে সেই প্রচেষ্টাই চলিতেছে।

বিভিন্ন জাতির ঘোড়া

অন্যান্য পশু
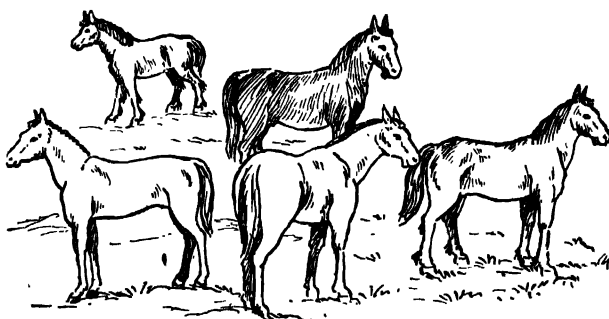
আমাদের দেশের অন্যান্য পশুদের মধ্যে শূকর প্রধানত দুই জাতের—বন্যবরাহ, যা ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়; আর বামনাকৃতি শূকর, যাহা সিকিম, ভূটান, পশ্চিম বংগের হিমালয় পাদদেশ অঞ্চলে দেখা যায়। ইহাদের শক্ত লোম, চর্বি, মাংস, লবণ শোধিত পঞ্জর ও পৃষ্ঠের মাংস (bacon) এবং চামড়া প্রধান পণ্যদ্রব্য। কিন্তু সামাজিক সংস্কারবশতই শূকর-পালন এখনও ভারতবর্ষে প্রধানত নিম্নজাতির লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত ঘোড়াও ভারতের একটি বিশিষ্ট পশুসম্পদ। প্রধানত পরিবহণের কাজেই এদেশে ঘোড়ার ব্যবহার হইয়া থাকে। কাথিয়াবাড়ের কাথি, মহারাষ্ট্রের মারাঠা পণি, ভুটিয়া পণি, মণিপুরী পণি, দাক্ষিণাত্যের ডিমথাডি প্রভৃতি এদেশীয় বিভিন্ন জাতের ঘোড়া তাহাদের পরিবহণ ক্ষমতা ও সহ্যশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ।

মৎস্যশিকার

পরিপূরক খাদ্য হিসাবে মৎস্যের স্থান অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অসংখ্য খাল, বিল, পুষ্করিণী, নদী, নালা, হ্রদ প্রভৃতি এবং ইহার অসংখ্য উপসাগর, খাড়ি, অন্তর্মুখী বাঁক প্রভৃতি যুক্ত প্রায় ৩,৫৩৫ মাইল বিস্তৃত উপকূল রেখা-সংলগ্ন প্রায় একলক্ষ দশ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী মৎস্যচারণ ক্ষেত্র। এইখানে বিভিন্ন জাতীয় মৎস্য ধরিবার যে প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইতেছে না বলিয়া মনে করার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে। যদিও ভারতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় আট লক্ষ মেট্রিক টন আভ্যন্তরীণ মৎস্য ও প্রায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মৎস্য ধরা হইয়া থাকে, তবু ফুড এ্যাণ্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (F. A. O.) নামক বিশ্বসংস্থা যে অনুসন্ধান চালাইয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে ভারতবাসী মাথা পিছু বছরে মাছ খাইয়া থাকে মাত্র ৩·৯৮ পাউণ্ড। অবশ্য মৎস্যের ব্যবহার এত কম হওয়ার কারণ পশ্চিম বংগ, মাদ্রাজ, কেরালা প্রভৃতি সমুদ্র সংলগ্ন রাজ্যগুলিতেই মাছ বেশী খাওয়া হইয়া থাকে। মধ্য, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে খাদ্য হিসাবে মাছের ব্যবহার খুবই কম (কেরালায় মাথা পিছু বছরে মাছ খাওয়া হয় প্রায় ২১ পাউণ্ড, পশ্চিম বংগে ১৩ পাউণ্ড, মাদ্রাজে ১২ পাউণ্ড, মহারাষ্ট্রে ৭ পাউণ্ড, আর পাঞ্জাবে মাত্র ·০৮ পাউণ্ড। কিন্তু তাহা হইলেও তোমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই তোমরা জান যে আমাদের পশ্চিম বংগের মতো মৎস্যপ্রিয়দেশেও প্রয়োজনীয় মৎস্যের খুব সামান্য ভগ্নাংশেরই জোগান হইয়া থাকে।

মৎস্যবিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভারতের অভ্যন্তরে এবং উপকূলবর্তী সমুদ্রে প্রায় ১৮০০ বিভিন্নজাতীয় মাছ রহিয়াছে। কিন্তু খাওয়ার জন্য যেসব জাতীয় মাছ ধরা হয় তাহাদের সংখ্যা সীমিত। সমুদ্রজাত মৎস্যের মধ্যে ইলাসমোব্রঙ্কেশ (elasmobranches) ইল (eel), ক্যাট ফিস (cat fish), সিলভার বার (silver bar), হেরিং (herring), বোম্বে ডাক (bombay duck), ম্যাকারেল (mackerel), সিলভার বেলি (silver belly), পমফ্রেট (pomfret), মুলেট (mullet), স্যামন (salmon), জু ফিস (jew fish), ক্রাস্টেশন্ (crustacean) প্রভৃতি পনেরোটি প্রধান।

আভ্যন্তরীণ মৎস্যকে ক্যাট ফিস (cat fish), প্রন (prawn), মুরেল (murrel), হেরিং (herring) প্রভৃতি আটটি প্রধান জাতে ভাগ করা হইয়া থাকে। অবশ্য আভ্যন্তরীণ মৎস্যের প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগই হইতেছে কার্প-জাতীয় মাছ, যথা, রুই, কাতলা, মিরগেল,
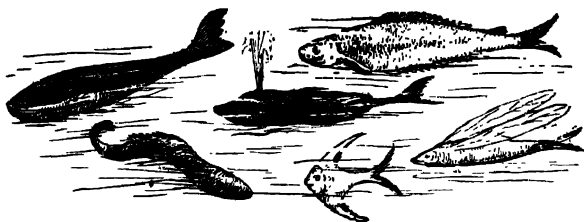
সামুদ্রিক মৎস্য

কালিবাউস প্রভৃতি। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ মৎস্যের শতকরা প্রায় ৭২ ভাগই আসে পশ্চিম বংগ, বিহার ও আসাম হইতে।
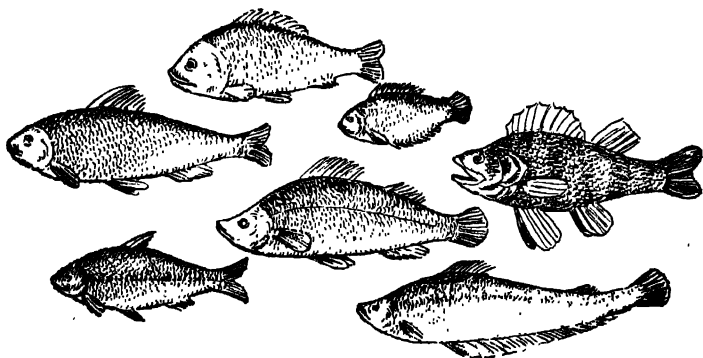
আভ্যন্তরীণ মৎস্য

মাদ্রাজ, গুজরাট, কানাড়া, মালাবার, ও করমণ্ডল উপকূলে এবং মান্নার উপসাগরে প্রধানত সামুদ্রিক মৎস্য শিকার হইয়া থাকে। কিন্তু এইসব অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া তাহারা সমুদ্রে মাছ ধরার উপযোগী নৌকা প্রভৃতি বিশেষ সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে, উপকূল হইতে ৬০-৭০ ফিট অপেক্ষা বেশী দূরে যাওয়া তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

খাদ্যের যোগান ছাড়াও মৎস্যাদি হইতে তেল, সার, পাকাশয় (maw)

প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে তেল। বর্তমানে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে হাংগরের তেল ও সার্ডিন তেল তৈরী হইয়া থাকে। রং, নরম সাবান তৈরী, পশুর চামড়া নরম করা প্রভৃতি কাজে এই তেল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৎস্যের যকৃৎজাত তেলে প্রচুর পরিমাণে এ ও বি ভিটামিন থাকায় ক্ষয়জাত রোগের চিকিৎসায় ইহা অপরিহার্য। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও কেরালা সরকার প্রচুর পরিমাণে হাংগরের যকৃতের তেল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্যামন, জু ফিস, ক্যাট ফিস প্রভৃতি হইতে ইসিন গ্লাস (Isin-glass) নামক যে পদার্থ তৈরী হয়, মদ পরিষ্কারের জন্য তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজের পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম বংগের সুন্দরবন অঞ্চলে এই ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

ছোটো ছোটো মৎস্যাদিকে পশ্বাদির জন্য অতিরিক্ত প্রোটিন যুক্ত খাদ্য হিসাবে রূপান্তরিত করা হইয়া থাকে। যেসব মাছ নষ্ট হইয়া যায় তাহাদের পচাইয়া বা মাছের ডানা, হাড়, আঁশ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভালো সার তৈরী করা হয়। এতদ্ব্যতীত, মৎস্য শুষ্ক করা বা লবণাক্ত করাও ভারতবর্ষের মৎস্য-সংক্রান্ত একটি বিশেষ শিল্প।

কৃষি, পশুপালন প্রভৃতির ন্যায় মৎস্য-চাষের দিকেও ভারত সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। এজন্য তাহারা রোহিতাদি প্রধান মৎস্যের পোনা সংগ্রহ, উপযুক্ত জলাশয় রক্ষা, কোনো রাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত পোনা অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ, মৎস্য-শিকার, মৎস্য রক্ষণ, মৎস্যের চালান ও বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নতি করা ও তাহাদের মধ্যে যৌথ কারবার করিবার সুবিধার প্রসার করা, মৎস্য লবণাক্ত ও শুষ্ক করার উন্নততর ব্যবস্থা করা, মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া, অসামুদ্রিক মাছের চাষের জন্য জলাশয় নির্বাচন করা, ও সামুদ্রিক মাছের শিকারের ও চালানের জন্য উপযুক্ত বাষ্পীয় পোত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে অন্যূন ৫০টি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা সাহায্যদান এবং ২৪ লক্ষ টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মৎস্য-শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালানোর জন্য কলিকাতায় সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ রিসার্চ স্টেশন, মাদ্রাজের মণ্ডপমে সেণ্ট্রাল মেরাইন রিসার্চ স্টেশন, কোচিনে সেণ্ট্রাল ফিসারিজ

টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ স্টেশন ও বোম্বাইতে ডিপ সীজ ফিসিং স্টেশন নামক চারিটি গবেষণাকেন্দ্রও স্থাপন করা হইয়াছে।

কুক্কুটাদি পক্ষীপালন

ভারতে প্রতিপালিত বিভিন্ন জাতীয় পাখীর মধ্যে পাতিহাঁস, রাজহাঁস মুরগী, পেরু (Turkey) নামক মুরগীজাতীয় পাখী, পায়রা প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের মধ্যে অবশ্য সর্বপ্রধান মুরগী। ১৯৫৬ সালের গণনা অনুযায়ী ভারতে প্রায় নয় কোটি সত্তর লক্ষ কুক্কুটাদি গৃহপালিত পাখী রহিয়াছে। আমাদের দেশে কুক্কুটাদি পাখী বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রতিপালিত হয় না। উন্নতজাতীয় হাঁস-মুরগীরও আমাদের দেশে অভাব। ইহাদের যথোপযুক্ত খাদ্যও দেওয়া হয় না। রোগে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা নাই। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ডিম হইতে বাচ্চা জন্মানোর পদ্ধতিও আমাদের অজ্ঞাত। ফলে, পাশ্চাত্য দেশগুলির কুক্কুট-সম্পদের সহিত আমাদের কুক্কুট-সম্পদ কোনো-দিকেই তুলনা করা চলে না। কুকুট-সম্পদের মধ্যে মুরগীই শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে তিন কোটি ষাট লক্ষ মুরগী আছে। এইসব মুরগীর প্রতিটি গড়ে বছরে ৫৩টি করিয়া ডিম দিয়া থাকে। অবশ্য পৃথিবীর পক্ষীপালনে সেরা দেশগুলি যেখানে গড়ে বছরে এক একটি মুরগী ১২০টি করিয়া ডিম দিয়া থাকে, তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। কুক্কুটাদির মাংসও আমাদের দেশে খুব বেশী খাওয়া হয় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক কুক্কুটমাংস প্রয়োজন হয় ২৯·৩২ পাউণ্ড, সেখানে আমাদের দেশে গড়ে মাথাপিছু প্রয়োজন হয় মাত্র ·২৯ পাউণ্ড। কুক্কুটাদি প্রতিপালনে ভারতে সবচাইতে অগ্রগামী মাদ্রাজ রাজ্য (২৫·২%)। তারপর যথাক্রমে পশ্চিম বংগ (১২·৬%), বিহার (১১·২%), আসাম (৮·৯%), গুজরাট ও মহারাষ্ট্র (৮·৫%), এবং মধ্যপ্রদেশ (৬%)। ভারতের সমস্ত হাঁসের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগই পশ্চিম বংগ এবং মাদ্রাজেই পালন করা হইয়া থাকে। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, পশ্বাদি প্রতিপালনে আমাদের দেশের যেসকল অঞ্চল অনগ্রসর, বা যে সকল অঞ্চলে পশ্বাদি ভালো জাতের হয় না, আশ্চর্যের বিষয়, কুক্কুটাদি কিন্তু সেইসব অঞ্চলেই বেশী প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

কুক্কুটাদি উন্নত পদ্ধতিতে পালনেও ভারত সরকার বিশেষ অগ্রণী

হইয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই উদ্দেশ্যে পাঁচটি আঞ্চলিক খামার এবং ৩০০টি কুক্কুটাদি পাখী প্রতিপালনের প্রসার ও উন্নয়নমূলক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রায় ২৫৯ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। এছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যকে উন্নত জাতের মুরগী সরবরাহ করিবার জন্য আমেরিকা হইতে একদিন বয়স্ক ত্রিশ হাজার মুরগীর বাচ্চাও আকাশপথে আনানো হইয়াছে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতীকরণ

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের দেশে গবাদি পশুপালন করা প্রধানত দুধের জন্যই। অথচ, তোমরা দেখিয়াছ, আমাদের চাহিদার তুলনায় কতো অল্প দুধই পাওয়া যাইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ, এতদিন পর্যন্ত দুগ্ধ সরবরাহ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের দায়িত্ব প্রধানত ব্যষ্টিগতভাবে গোয়ালারাই বহন করিয়াছে। উন্নতপ্রথায় উহা বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া, তোমরা জান, গবাদি পশুর উন্নয়নের জন্যও এদেশে এতদিন পর্যন্ত বিশেষ কোনো প্রচেষ্টাই হয় নাই। গোজাতির বা মেষজাতির সামগ্রিক উন্নতিবিধানের সংগে সংগে দুগ্ধসরবরাহ ও ঘি, মাখন, চীজ প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের দিকেও জাতীয় সরকার বিশেষ নজর দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে, প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনাকালে ৭·৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, ১৭·৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬টি শহর এলাকায় দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায়, ৩০টি গ্রামীণ মাখনাদি তৈরীর কেন্দ্র ও ৮টি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরীর কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাদি ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী সায়ান্স এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কাউন্সিল, পাঞ্জাবে কর্ণালে ন্যাশন্যাল ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বাংগালোরে ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হইয়াছে।

তোমরা হয়তো জান যে, আমাদের পশ্চিম বংগে হরিণঘাটায় একটি দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতায় আর একটি দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রেও কাজ শুরু হইয়াছে। ভারতের

হরিণঘাটার দুগ্ধকেন্দ্র
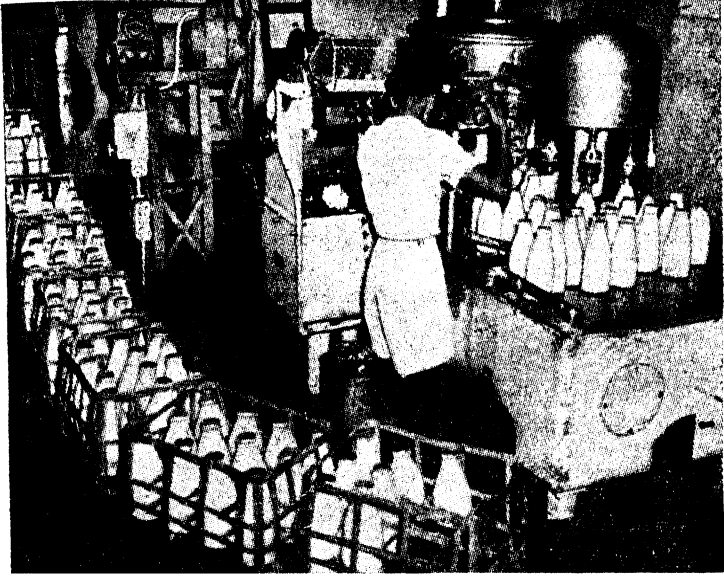
বিভিন্ন স্থানেও দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র এবং ডেয়ারী স্থাপনের কাজ চলিতেছে। এই প্রসংগে, বোম্বের (Aarey Milk Colony), মাদ্রাজের (Madhavaran Milk Colony) এবং দিল্লীর (Central Dairy) দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আহমদাবাদ, পুনা, গুন্টুর, চণ্ডীগড়, গয়া, আগরতলা ইত্যাদি আরও অনেক স্থানে দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র এবং ডেয়ারী প্রতিষ্ঠার কার্য অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যার একটি প্রধান কারণ এদেশে খাদ্য সংরক্ষণের কোনো সুব্যবস্থাই প্রায় নাই। বিভিন্ন ঋতুতে যেসব ফল জন্মায় তাহা অনেক সময়ই প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া অপচয় হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয় তাহারও এক বিরাট অংশ পরিবহণের সুব্যবস্থার অভাবে অনেক সময় অন্যান্য অঞ্চলের চাহিদা মেটানোর কাজে লাগে না। দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

অবশ্য মাছের ব্যাপারে পূর্ব হইতেই মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পশ্চিম বংগের

উপকূল অঞ্চলে প্রাচীন প্রথায় মাছ কাটিয়া শুকাইয়া বা লবণ মিশাইয়া সংরক্ষণের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। মাখনাদির ব্যাপারেও বোম্বাইর পলসন কোম্পানী বা আলিগড়ের ক্যাভেণ্ডার কোম্পানী প্রভৃতি কতিপয় প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ার্থে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় এইসব ব্যবস্থা প্রায় নগণ্য।

খাদ্য সংরক্ষণ

আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধানের অন্যতম অংগ হিসাবেই তাই আজ খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই শিল্প ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। প্রধানত দুইভাবে এই সংরক্ষণ কাজ হইয়া থাকে—(১) বিদেশের ন্যায় এদেশেও কাঁচা খাদ্যদ্রব্যাদিকে ভিনিগার প্রভৃতির সাহায্যে কৌটায় ভরিয়া অথবা ঐ সব খাদ্যদ্রব্যাদি হইতে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া (যথা, বিভিন্ন জেলি, জ্যাম, জুস্ প্রভৃতি) তাহা কৌটায় বা শিশিতে ভরিয়া সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এখনও পর্যাপ্ত নহে। (২) খাদ্যবস্তুর রূপ পরিবর্তিত না করিয়া, ঠাণ্ডা ঘরের (cold storage) ব্যবস্থা করিয়া সেখানে কাঁচা খাদ্যদ্রব্যাদিকেও বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। এই প্রথায় খাদ্য সংরক্ষণের জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন শহরে ঠাণ্ডা গুদামঘরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইতেছে। সরকারও এই কার্যে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। ইহার ফলে অবশ্য একদিকে যেমন অনেক ফল, মাছ প্রভৃতি খাদ্য অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে এবং অসময়ের খাদ্য পাওয়া যাইতেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের আরও লাভ করিবার প্রচেষ্টার ফলে বহু কাঁচা মাল ঠাণ্ডাঘরে আবদ্ধ হইয়া দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে ঠাণ্ডাঘর জনকল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডাকিয়া আনিবে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Contrast the production and consumption of milk in some Western countries with those of India. Discuss the reasons for this state of affairs. State the steps which are now being taken to improve the situation.

2. Give some idea about the sheep resources of India. State also how these resources are being utilised.

3. Give some idea about the fish resources of India and their consumption in the country.

4. State (besides taking as food) what are the other purposes for which fish is being utilised in our country. State also the steps which are being taken in India to increase the supply of fish.

5. Give some idea about the poultry resources of India. State what steps are being taken to increase these resources.

6. Give some idea about the efforts which are being made to establish milk supply centres and dairies in India.

7. Describe the steps which are being taken for food preservation in India.

B. Answer the following questions in not more than 60 words :—

1. State why we need to improve the supply of such foods in our country as are not produced through agriculture.

2. State why the consumption of milk in Eastern and Southern states is much less than it is in Western and Central states.

3. Quote some figures to show that the consumption of milk in Eastern and Southern states is much less than that in Western and Central states.

4. Name the three classes into which the domesticated animal resources of India can be divided. Give two examples in each case.

C. Below are given some names. Write 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 respectively inside the bracket at the right side of each name, to indicate whether it belongs to the group of Cow, Buffalo, Sheep, Goat, Sea-fish, Fresh-water fish and Poultry.

The names—

Turkey ( ), Telengana ( ), Eel ( ), Silver bar ( ), Swan ( ), Rampur-Busher ( ), Hariyana ( ), Shahiwal ( ), Surati ( ), Mura ( ), Pashmina ( ), Surti ( ), Amanpuri ( ), Prawn ( ), Salmon ( ), Carp ( ),

D. The following pictures may be collected for your scrap-book :—

(1) As many varieties of cows (2) As many varieties of fish (3) As many varieties of goats (4) The two varieties of sheep (5) As many varieties of ducks, swans and hens. (6) Milk colony and dairy.

E. The following projects may be undertaken :—

1. Village students may make a survey of the domesticated animals in the locality in which they reside (each pupil may take up the survey of 5 houses). The class should draft a form for this survey which would include the categories of animals, their particular needs, their yields each day, etc.

2. Town students may go on an excursion to any cattle or poultry farm or to any milk supply centre or dairy. A wall-newspaper should be the outcome of the excursion.

3. Village students may also go on an excursion to a Community Development Centre.

আমাদের বনজ দ্রব্যাদি

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে বনজ দ্রব্যাদির দানও কম নহে। দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অথবা প্রায় ২·৮ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চল বনাবৃত। আমাদের দেশের জলবায়ুর বৈচিত্র্য অনুযায়ী এই বহুবিস্তৃত অরণ্যানী আবার বিভিন্ন জাতের। যে-সব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয় সেখানে চিরহরিৎ ঘন বন; মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ভেজা পর্ণমোচী বৃক্ষের বন; আবার যেখানে বৃষ্টিপাত খুবই কম সেখানে শুধুই শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষ বা কাঁটাগাছের বন। এই বহুবিচিত্র বন হইতে প্রতি বৎসরে ৫০ কোটি কিউবিক ফিট শক্ত কাঠ এবং ৫ কোটি কিউবিক ফিট নরম কাঠ ছাড়াও নানাপ্রকারের ওষধি এবং কাঁগজ, দেশলাই, রবার, তারপিন তেল প্রভৃতি তৈরীর কাঁচা মাল পাওয়া যায়। বনের কল্যাণে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জীবিকার সংস্থান হইয়া থাকে।

অরণ্যসম্পদের গুরুত্ব

ভৌগোলিক অবস্থিতি, মাটির প্রকৃতি আর জলবায়ুর বিভিন্নতার ফলে অরণ্যের প্রকৃতিও বিভিন্ন হইতে পারে। যেমন, যেজাতীয় পাথর চূর্ণ হইয়া মাটির সৃষ্টি করিয়াছে, সেই মাটির উপর কি জাতীয় বৃক্ষের বন সৃষ্ট হইবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে। আবার জায়গাটা সমতল কি পার্বত্য তাহাও বনকে প্রভাবান্বিত করে। জলবায়ুর মধ্যে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের ফলেই বনের প্রকৃতির পার্থক্য হয়।

অরণ্য সংস্থান

উপরিউক্ত তিনটি কারণের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিভিন্নজাতীয় অরণ্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে মোটামুটিভাবে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) **পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য**—প্রধানত সরলবর্গীয় বৃক্ষের এই অরণ্যে প্রধান গাছ হইতেছে দেওদার, স্প্রুস, চিলপাইন, সিলভার ফার প্রভৃতি। তাছাড়া, নানারকমের ওকগাছ, রোডোডেনড্রন গাছ, চিরপাইন গাছ প্রভৃতি এখানে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে নানাজাতীয় লরেল, শিরীষ, কাঞ্চন প্রভৃতি গাছের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

(২) **পূর্ব হিমালয়ের অরণ্য**—এই অরণ্যের প্রধান গাছ সিলভার ফার। এর ফাঁকে ফাঁকে আছে নানাজাতীয় রোডোডেনড্রন গাছ। নিচের

দিকে আছে বিভিন্ন রকমের ওক গাছ, ইউট্রি, স্প্রুস্ গাছ প্রভৃতি। আরও নিচে দেখা যায় লাল ও শাদা চাঁপা, চেষ্টনাট, পিপলি, শিরীষ, শিমূল প্রভৃতি বৃক্ষ।

ফার পাইন শিমূল

(৩) **শাল অরণ্য**—শাল অরণ্য দুইটি সারিতে বিস্তীর্ণ। এক সারি হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে দেরাদুন অঞ্চল হইতে পূর্বে কুমায়ুন, নেপাল, তরাই, ডুয়ার্স, গোয়ালপাড়া হইয়া গারো পাহাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। আর
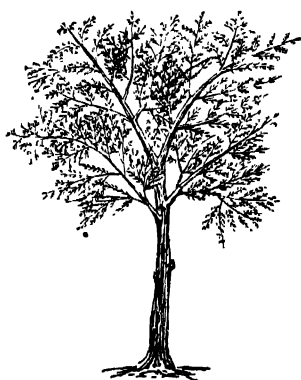
বাবলা শাল

এক সারি মধ্য প্রদেশ হইতে শুরু করিয়া পূর্বে সিংভূম, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া হইয়া পূর্ব পাকিস্থান পর্যন্ত, এবং দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৪) **সুন্দরবনের অরণ্য**—ইহাকে বলা হইয়া থাকে জোয়ারের অরণ্য। এই অঞ্চলে জোয়ারের সময় জল দাঁড়ায়, ভাটার সময় জল নামিয়া গিয়া হয় কাদা। এইজাতীয় মাটিতে কেওড়া, সুন্দরী, গরাণ, গেঁওয়া প্রভৃতি গাছ ছাড়া অন্য গাছ বাঁচিতে পারে না। এখানকার অরণ্য প্রধানত এইসব গাছের।

(৫) **পাঞ্জাব ও রাজস্থানের অরণ্য**—এই শুষ্ক অঞ্চলে বাবলা ও কুল-জাতীয় বৃক্ষের বনই শুধু দেখা যায়।

(৬) **দাক্ষিণাত্যের অরণ্য**—মধ্য ভারত হইতে দক্ষিণাঞ্চলে সেগুন, ধাওরা, বিজাশাল, কদম প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছের বনই প্রধান।

বনজসম্পদের ব্যবহার

এই বিচিত্র বনজ সম্ভারকে মানুষ বহুভাবে তাহার বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর কাজে লাগাইয়া থাকে। প্রথমেই কাঠের কথা ধরা যাক। প্রধানত

কাঠ

বড়ো বড়ো গাছ কাটিয়া যে কাঠের তক্তা বাহির করা হয় তাহা বাড়ীর দরজা, জানলা, কড়ি, বরগা, দেয়াল, মেঝে, পুলের পাটাতন, রেলিং; ঘরের বা বেড়ার খুঁটি, রেলওয়ে স্লীপার; সেচ খালের মাঝের দরজা, নদীর বাঁধের ধার; তেলের ঘানি, চরকা, তাঁত; জাহাজ, নৌকা, মাস্তুল, দাঁড়, হাল; চেয়ার, টেবিল, আলমারী, আলনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের আসবাব; গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রেলগাড়ীর বিভিন্ন অংশ; বাটি, থালা, চামচ, খেলনা, শৌখীন বাক্স, মূর্তি; পেন্সিল, কলম, দেশলাই বাক্স ও কাঠি; চাষের কাজের জন্য লাংগল, মই, জলসেচের জন্য ডোংগা; বন্দুকের বা অন্য অস্ত্রের হাতল; হারমোনিয়াম, বেহালা, সেতার প্রভৃতি বাজনার খোল; ক্রিকেট, হকি, টেনিস প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম—ইত্যাদি হাজারো রকমের জিনিস তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠের মণ্ড (ঘাস এবং বাঁশের মণ্ডও) কাগজ তৈরীর প্রধান উপাদান। কাঠের ঊর্ধ্বপাতিত ও ক্ষারিত দ্রব্যাদির মধ্যে চন্দনের তেল, দেওদার গাছের

তেল, খয়ের, অগুরু কাঠের আতর, পাইন ও সেগুন হইতে আলকাতরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রায় সব কাঠই জ্বালানী কাঠ হিসাবেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

বাঁশ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অরণ্যে যে বাঁশ পাওয়া যায় তাহা ঘরের খুঁটি, বেড়া প্রভৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, বাঁশ হইতে চাটাই, ধামা, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরী হয়। নদীপ্রধান অঞ্চলে বাঁশ বাঁধিয়া যে চালি (raft) তৈরী হয় তাহাতে নদীর উপর চলাচল করা যায়। এছাড়া, বাঁশের মণ্ড হইতে যে কাগজ তৈরী করা হয় সে কথাতো আগেই তোমাদের বলা হইয়াছে।

ঘাস

ঘাসের ব্যবহার প্রধানত তিন রকমের। ঘাসের মণ্ড হইতে কাগজ তৈরী তো করা হয়ই, ঘাস দিয়া ঘর ছাওয়াও হইয়া থাকে। আবার রোশা ঘাস বা লেমন ঘাস হইতে এসেন্সও তৈরী করা হয়।

বনজ হইতে রাসায়নিক দ্রব্য

অল্প বাতাসের মধ্যে কাঠ পোড়াইলে কাঠকয়লা ছাড়াও পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড নামক যে পদার্থ পাওয়া যায়, উহা হইতেই অ্যাসেটিক এসিড, ক্রিয়োজোট, পিচ, আলকাতরা প্রভৃতি উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। চন্দন তেল, অগুরু তেল প্রভৃতি এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই বনজ দ্রব্যাদি হইতে উৎপন্ন করা হইয়া থাকে।

বাবলা, পলাশ, জিওল প্রভৃতি গাছের রস হইতে আঠা এবং শাল, সলাই প্রভৃতি গাছ হইতে রজন পাওয়া যায়। পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্যজাত পাইন গাছ হইতে রেজিন নামক যে জিনিস বাহির করা হয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা হইতে তার্পিন তেল ও রজন পাওয়া যায়। রবার অবশ্য খুব বেশী আমাদের অরণ্য হইতে পাওয়া যায় না।

বনজ ঔষধ

ভারতের বিভিন্ন বনজ গাছ-গাছড়া হইতে অসংখ্য প্রকার ওষধি ইত্যাদি তৈরী করা হইয়া থাকে। যথা, কুরচি হইতে আমাশয়ের ঔষধ, বাসক হইতে জ্বর ও কাশির ঔষধ, চিরেতা হইতে টনিক, জরিনা হইতে ব্ল্যাকওয়াটার জ্বরের ঔষধ প্রভৃতি।

বনজ ফল-ফুলের মধ্যে চালতা, মহুয়া ফুল, আমড়া, কুল, স্ট্রবেরী, ডুমুর, আমলকী, আখরোট প্রভৃতি মানুষ খাদ্যহিসাবেও গ্রহণ করিয়া থাকে।

বনজের অন্যান্য ব্যবহার

প্রায় সবরকম বাঁশ, বেত প্রভৃতিই চুপড়ি, টুকরি ইত্যাদি তৈরীর কাজে লাগিয়া থাকে। অনেক সময় বড়ো বড়ো ঘাস, বনঝাউ, নিসিন্দে, পলাশ, কাঞ্চন, শাল প্রভৃতি গাছের পাতা দিয়াও এই কাজ হইয়া থাকে।

সর্বশেষে, বন হইতে যেমন বিভিন্নজাতীয় পশু শিকার করিয়া খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো যায়, তেমনি আবার কুলজাতীয় গাছে একজাতীয় কীট যে গালা তৈরী করে, বা বনের সুউচ্চ গাছে মৌমাছিরা যে মধু ও মোম সংগ্রহ করিয়া জড় করে, সেগুলিও মানুষের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইয়া থাকে। এছাড়া পশুমাংসের কথা বাদ দিয়াও হরিণের শিং, হাতীর দাঁত প্রভৃতিও মানুষের নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতের বনসম্পদ যে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হইয়া থাকে একথা মনে করা ভুল হইবে। ফরাসী দেশে যেখানে একরপ্রতি বছরে ৫৬'৮ কিউবিক ফিট কাঠ পাওয়া যায়, বা জাপানে ৩৭ কিউবিক ফিট বা আমেরিকা

আমাদের দেশে বনজ সম্পদের ব্যবহার

যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ কিউবিক ফিট, সেখানে ভারতের অরণ্য হইতে প্রতি একরে পাওয়া যায় মাত্র ২'৫ কিউবিক ফিট কাঠ! তাছাড়া, অন্যান্য বনজ দ্রব্যাদির তালিকা পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় ভারতবর্ষের প্রয়োজনের তুলনায় বনজ উৎপন্ন দ্রব্যাদি একটি ছোটো অংশ পরিপূরণে মাত্র সমর্থ হয়। ইহার অন্যতম কারণ, বিদেশী শাসকদের আমলে তাহাদের স্বার্থে এদেশে যে পরিমাণ বন কাটিয়া ফেলা হইয়াছে সেই পরিমাণ নূতন বন আবাদ করা হয় নাই। বস্তুত, রাশিয়ায় যেখানে মাথাপিছু (per capita) বনের আয়তন ৩'৫ হেক্টর (১ হেক্টর=২'৪৭১ একর), বা আমেরিকায় ১'৮ হেক্টর, ভারতবর্ষের মাথাপিছু বনের আয়তন সেক্ষেত্রে মাত্র '২ হেক্টর। ইহার ফলে শুধুই যে বনজসম্পদলাভে আমাদের দেশ বঞ্চিত হইতেছে তাহাই নহে, বনের অনুপস্থিতির ফলে একদিকে যেমন মৃত্তিকা ক্ষয়ীকরণও দ্রুততর হইয়া থাকে, তেমনি বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমিয়া যায়। অরণ্যের ধ্বংস যে বন্যাও ডাকিয়া আনে সেই কথা তো তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে।

এইসব কারণেই ভারত সরকার বন সংরক্ষণ ও নূতন নূতন বৃক্ষ রোপণের বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে বন-সংক্রান্ত যে নীতি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের জমিতে বনের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কোথায় কি পরিমাণ জমিতে বন আবাদ হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই অনুসারে সিন্ধু-গাংগেয় উপত্যকায়, যেখানে মৃত্তিকার ক্ষয় একটা বড়ো সমস্যা নহে, সমগ্র অঞ্চলের শতকরা ২০ ভাগে বন আবাদ হইবে। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকাক্ষয় দুইই বেশী সেখানে অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ অঞ্চলে বন আবাদ করিতে হইবে। এর অর্থ হইতেছে, ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় বনের আবাদ করা হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে উর্বর জমিতে গাছ লাগাইয়া জমিকে অরণ্যে পরিণত করা। যেসব জমিতে চাষ-আবাদ ভালো হয় না, সেইসব জমিকেই অরণ্যে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিম বংগে এই চেষ্টা বিশেষভাবে চলিতেছে।

এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র প্রতি বৎসর বনমহোৎসব সপ্তাহ পালনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য জনসাধারণকে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করা। সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ফরেষ্ট্রী নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহার লক্ষ্য উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য বনবিভাগীয় কর্মী সৃষ্টি, বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে বন-সংক্রান্ত যেসব গবেষণাদি হইবে তাহার সমন্বয় বিধান, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অরণ্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনমত আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা, বর্তমানে যে অরণ্য রহিয়াছে তাহার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। দেরাদুন, কোটাল, বাসদ, বেল্লারী, উটকামণ্ড, ছাতরা, চণ্ডীগড় ও আগ্রায় সেণ্ট্রাল সয়েল কনজারভেশন বোর্ডের অধীনে যে সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেগুলি মৃত্তিকা সংরক্ষণ-সংক্রান্ত কাজ ব্যাপকভাবে করিয়া চলিয়াছে। যোধপুরে অবস্থিত ডেজার্ট এফোরেস্টেশন রিসার্চ স্টেশনে নূতন নূতন বৃক্ষ রোপণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার কাজ পরিচালিত হইতেছে। ইহারই অধীনে রাজস্থানের নয়টি জেলায় নূতন নূতন বন আবাদ করিয়া মরুভূমির প্রসার রোধের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এছাড়াও, বনবিভাগীয় বিভিন্ন কার্যাদিতে ও বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে কর্মীদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট কলেজ, বাংগালোর ফরেষ্ট কলেজ, কোয়েম্বাটুর ফরেষ্ট কলেজ ও দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট রেঞ্জার্স কলেজকে সমৃদ্ধতর করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Describe the different forest regions in India and indicate the types of trees growing in them.

2. Write a short essay on the forest products of India.

3. State how in the past we failed to put our forests to their best uses. State also the steps which are being taken at present for preserving and increasing our forest resources.

B. Answer the following questions in not more than 60 words :—

1. Explain why the character of the forest in one region may be different from that in another region.

2. Name 10 different types of use of timber to satisfy 10 types of our needs.

3. Explain why forests are important to us.

4. Discuss the problems which have developed in India as a result of afforestation.

5. Name 4 forest plants which have medicinal uses along with the names of diseases in which they are used.

6. Name the chemicals which may be had from forest products.

7. State the different uses of forest-grass.

8. State the different uses of bamboo.

C. Match the name in the left-hand column below to the phrase in the right-hand column by putting the number at the left of the name in the bracket at the right of the phrase. If necessary, you may put more than one number inside a bracket and the same number in more than one bracket.

Names	Phrases
1. Keora (কেওড়া)	Found in the upper ridges of the Himalayas ( ) Oil from seeds used for medicinal purpose ( ) Available in Sundarban area ( ) Used for tanning leather ( ) Yellow colour ( ) Brown colour ( ) Paper is made out of its bark ( ) Oil from seeds used for soap-making ( ).
2. Kanchan (কাঞ্চন)	
3. Kagatia (কাগতীয়া)	
4. Mahua (মহুয়া)	
5. Chalmugra (চালমুগরা)	
6. Babla (বাবলা)	
7. Akhrot (আখরোট)	
8. Palas flower (পলাশ ফুল)	

D. 1. Fix in your scrap-book the pictures of as many kinds of trees as you can find. You can collect their leaves and barks as well.

2. On an outline map of India show its different forest regions.

3. Collect as many pictures as you can of the different types of things produced from (a) timber, (b) bamboo.

E. The following projects may be undertaken :—

1. Write letters to the different forest institutes, mentioned in your book, requesting them to give you some idea about their work and also to send you pictures etc. which may be available. The replies of the letters may be edited in the form of a wall-newspaper.

2. Collection of forest products (special types) for the school museum. Every pupil should make some contribution.

আমাদের খনিজ দ্রব্যাদি

উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থের মতো আমাদের চাহিদার আর এক জোগানদার হইতেছে খনিজ দ্রব্যাদি। খনিজ শব্দের মৌলিক অর্থ যাহা খনি বা মাটির নিচ হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু খনিজ মাত্রকেই যে মাটির নিচ হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয় এমন নহে, অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের উপরও খনিজ পাওয়া গিয়া থাকে, যথা, মাটি ও জল। ইহারাও বিশেষ অর্থে খনিজ বলিয়া গণ্য। মোটকথা, স্বভাবজাত অজৈব পদার্থমাত্রকেই (তাহাদের মাটির নিচ বা উপর যেখানেই পাওয়া যাক না কেন) আমরা খনিজ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। কাঠ বা হাড় যথাক্রমে উদ্ভিজ্জাত বা জীবদেহসম্ভূত বলিয়া জৈব পদার্থ। সেইকারণেই ইহারা খনিজ পদার্থ বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু কোনো উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থ যদি প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে খনিজের মধ্যে গণ্য করা হয়। যথা, কাঠ হইতেই বহু বছরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্ট পাথুরে কয়লা, বা হাড় হইতে সৃষ্ট খড়ি খনিজ পদার্থ। ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করিয়া থাকেন, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতির মূল বস্তু পেট্রোলিয়ামও কোনো জৈব পদার্থেরই রাসায়নিক রূপ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে খনিজের আর একটি অর্থ আছে। স্বভাবজাত যেসব অজৈব বস্তুর রাসায়নিক উপাদান ও গঠন সুনিয়ত, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াবশে বা অবস্থা বিশেষে কেলাসিত (crystallised), অর্থাৎ মিছরির দানার মতো জ্যামিতিক আকার ধারণ করে, তাহাদিগকেও খনিজ বলা হয়। যথা, স্ফটিক, অভ্র, খনিজ লবণ প্রভৃতি।

ভারতের ভূপ্রকৃতি ও গঠন

আমাদের ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার খনিজ বস্তু পাওয়া যায়। কোথায় কি অবস্থায় খনিজ পাওয়া যায় তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে ভারতবর্ষের ভূমির উৎপত্তি, প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। কারণ ভূপ্রকৃতির গঠনের সহিত খনিজদ্রব্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতি পুরাকালে হিমালয়ের কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না। উত্তর ভারতসহ তিব্বত, ব্রহ্মদেশ এবং চীনের এক

বিরাট অংশ ছিল এক বিশাল সমুদ্রে নিমগ্ন। তাহারা এই সমুদ্রের নাম দিয়াছেন টেথিস (Tethys)। কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত তখনও ছিল। আর ছিল দক্ষিণ ভারত, আরব সাগর, আফ্রিকা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও অষ্ট্রেলিয়া লইয়া গঠিত এক বিরাট মহাদেশ, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড (Gondwanaland)। পরবর্তীকালে, একদিকে যেমন কালক্রমে এই মহাদেশের বহু অংশ জলমগ্ন হওয়ার ফলে দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আলাদা হইয়া পড়ে, তেমনি অন্যদিকে সাইবেরিয়া অঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতের ভূমি ভূ-আন্দোলনের ফলে অতি ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে আগাইয়া যাইবার ফলে ঐ চাপে মধ্যবর্তী টেথিস সমুদ্রের তলদেশও ঠেলিয়া উঁচু হইয়া ওঠে, এবং বর্তমান সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালার ও তিব্বতের মালভূমি অঞ্চলের সৃষ্টি করে। আরও পরবর্তীকালে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে গংগা-যমুনা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বহু নদী নির্গত হইয়া যখন নিচে নামিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাদের স্রোতের বেগে ভাংগিয়া বা ক্ষয় হইয়া যে পাথরের টুকরা, বালি, মাটি প্রভৃতি উহাদের সংগে সংগেই আসিয়াছে, তাহাই ক্রমশ স্তরে স্তরে থিতাইয়া কালক্রমে উঁচু হইয়া উত্তর ভারতের সমভূমি তৈরি করিয়াছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা আরও বলিয়া থাকেন, হিমালয়ের শিলাদেহের প্রধান উপাদান মারবেলজাতীয়—সাগরতলের স্তরীভূত প্রাণীকংকাল হইতে উৎপন্ন চুনাপাথরের পরিবর্তিত রূপ। উত্তরাপথের বেশীর ভাগই পাললিক অথবা রূপান্তরিত শিলা। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশই ব্যাসল্টজাতীয় শিলা বা তাহার রূপান্তর। পুরাকালে বারে বারে অগ্ন্যদ্গারণের ফলে নির্গত লাভা নামক পদার্থ ইহার মূল উপাদান।

ভারতে খনিজ পদার্থের অবস্থান

এই কারণেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ খনিজ সম্পদেরই আকর স্থান দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীনতম অংশ বা তৎসংলগ্ন অঞ্চল। বস্তুত, ভারতবর্ষে যত খনিজ পাওয়া যায় তাহার শতকরা ৪০ ভাগই আসে বিহার হইতে। বিহারের পূর্বভাগ ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম বংগের পশ্চিম ভাগ কয়লার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন স্থান। এই অঞ্চলে, অর্থাৎ পশ্চিম বংগ, বিহার ও উড়িষ্যার মিলনস্থানে লোহাপাথরেরও বিপুল ভাণ্ডার। তাছাড়া, এই অঞ্চল অভ্র, ম্যাংগানিজ,

তামা, বক্সাইট প্রভৃতি বহু খনিজেরও আকরস্থান। তারপরেই মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহীশূর ও কেরালার স্থান। মধ্য প্রদেশেও কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের অন্যান্য নবসৃষ্ট পলিমাটি গঠিত অঞ্চলে খনিজ পদার্থ প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। একমাত্র আসামে কিছু পরিমাণে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজ্যহিসাবে খনিজ দ্রব্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কোথায় কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার একটি মোটামুটি তালিকা নিচে দেওয়া গেল :—

আসাম—পেট্রোলিয়াম, কয়লা, চুনাপাথর, সিলিম্যানাইট।

পশ্চিম বংগ—কয়লা, লোহা, লবণ।

বিহার—কয়লা, লোহা, তামা, ম্যাংগানিজ, অভ্র, বক্সাইট, ক্রোমাইট, চুনাপাথর, টাংস্টেন, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট, কোয়ার্ট্‌জ্‌, ষ্টিয়াটাইট।

উড়িষ্যা—লোহা, কয়লা, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট, সিলিম্যানাইট।

উত্তর প্রদেশ—বেলেপাথর, ক্ষারলবণ, কোয়ার্ট্‌জ্‌।

মধ্য প্রদেশ—ম্যাংগানিজ, বক্সাইট, চুনাপাথর, মারবেল, কয়লা, এ্যাসবেসটস, সিলিম্যানাইট।

রাজস্থান—লবণ, মারবেল, জিপসাম, কয়লা, গ্রাফাইট, এ্যাসবেসটস, সীসা, কোবাল্ট।

পাঞ্জাব—লবণ, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, জিপসাম।

জম্মু-কাশ্মীর—বক্সাইট, জিপসাম।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাট—লবণ, বক্সাইট, ম্যাংগানিজ, এ্যাসবেসটস, জিপসাম, লোহা।

কেরালা—মোনাজাইট, ইলমেনাইট, সিলিম্যানাইট, গ্র্যাফাইট।

মহীশূর—সোনা, রূপা, লোহা, এ্যাসবেসটস, বক্সাইট, ক্রোমাইট, ম্যাংগানিজ, গ্রাফাইট।

অন্ধ্র ও মাদ্রাজ—লবণ, ম্যাগনেসাইট, ম্যাংগানিজ, অভ্র, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট।

বলাবাহুল্য, এই তালিকায় শুধু প্রধান প্রধান খনিজেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিল্পোন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য

শিল্পোন্নয়নের জন্য দুইটি খনিজ সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হয়, ইহারা হইতেছে কয়লা ও লৌহ।

কয়লা আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তোমরা দেখিয়াছ যে পশ্চিম বংগ, বিহার উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, আসাম, মহীশূর, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানে কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কয়লার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই পশ্চিম বংগ এবং বিহারে কেন্দ্রীভূত। উপরিউক্ত অন্যান্য রাজ্যগুলিতে যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায় তাহা সামান্যই বলিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খনি হইতে নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ভারতবর্ষে ২,০০০ কোটি টন। কিন্তু সবশুদ্ধ নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, উৎকৃষ্ট জাতের নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ভারতে মাত্র ৫০০ কোটি টন। নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার অনুপাতে, উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ খুবই কম। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারতে মোট কয়লা উৎপন্ন হইত বৎসরে মাত্র ৩৬০ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ছয় কোটি টন করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করিবার বিষয়, কিছু পরিমাণ কয়লা আমরা বিদেশেও (পাকিস্তান) রপ্তানী করিয়া থাকি।

কয়লা

পশ্চিম বংগ এবং বিহারে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কয়লা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি দূর অঞ্চলে কয়লা পাঠানো ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিয়া থাকিবে যে রেলগাড়ীর ওয়াগনের অভাবের জন্য কয়লা পাঠানো যাইতেছে না বলিয়া কোনো কোনো স্থানে কয়লা-সংকট দেখা দিয়াছে। বর্তমানে নদীপথে নৌকার সাহায্যে কয়লা পাঠানোর ব্যবস্থা হইতেছে।

শিল্পোন্নয়নে লৌহের প্রয়োজনও অপরিহার্য। হিসাব করিয়া দেখা

গিয়াছে ভারতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ মজুত আছে। ভারতে মজুত লৌহের পরিমাণ নাকি প্রায় ৮০০ কোটি টন। ভারতে যে পরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা দিয়া শুধু ভারত কেন সমগ্র পূর্ব এশিয়ার চাহিদা পূরণ সম্ভব। ভারতের লৌহ-খনিগুলি পশ্চিম বংগ, বিহার, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। মধ্য প্রদেশ ও মহীশূরের কয়েকটি অঞ্চলেও লৌহখনি আছে। মজুত কয়লার মতো লৌহের পরিমাণের তুলনায় লৌহের উৎপাদনও ভারতে কম। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ২০ লক্ষ টন লৌহ এবং ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই উৎপাদনে দেশের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটে না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিনটি নূতন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় লৌহের উৎপাদন ভারতে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে লৌহের চাহিদাও দিন দিনই বাড়িতেছে। তথাপি প্রতি বৎসর ভারত হইতে কিছু পরিমাণ আকরিক লৌহ বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

লৌহ

বর্তমান যুগে শক্তির উৎস হিসাবে পেট্রোলের প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু ভারতে খুব কম পরিমাণ পেট্রোলই পাওয়া যায়। একমাত্র আসামের ডিগবয়-এ পেট্রোলিয়ামের ভালো খনি আছে। পাঞ্জাবে ও গুজরাটে সামান্য পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। ফলে, প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল আমদানী করিতে হয়।

পেট্রোলিয়াম

লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক ও কাঁচ শিল্পে ম্যাংগানিজের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই ধাতুতে ভারত যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ। একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোনো দেশে ভারতের মতো এত ম্যাংগানিজ নাই। মধ্য প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে মধ্য প্রদেশের ম্যাংগানিজ উৎকৃষ্ট ধরনের।

ম্যাংগানিজ

অভ্রের উৎপাদনে ভারতের স্থান সর্বপ্রথম। বৈদ্যুতিক শিল্পে অভ্রের খুবই প্রয়োজন। কাঁচের বদলেও অনেক সময় অভ্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে বেশী অভ্র পাওয়া যায় বিহারে। মাদ্রাজ ও রাজস্থানেও কিছু কিছু অভ্রের খনি আছে।

অভ্র

ভারতে স্বর্ণের উৎপাদন খুবই কম। স্বর্ণ উৎপাদনের জন্য মহীশূরের কোলার খনি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ছাড়া মাদ্রাজেও কিয়ৎ পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। স্বর্ণের উৎপাদন আমাদের দেশে অল্প হইলেও ইহার দ্বারা আমাদের শিল্পের চাহিদা মোটামুটি মিটিয়া যায়। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে, স্বর্ণকে অলংকার হিসাবে পরিবার রীতি আমাদের মধ্যে খুব বেশী। তারপর স্বর্ণকে সঞ্চয় করিতেও আমরা দীর্ঘ দিন হইতে অভ্যস্ত। ফলে, বর্তমানে আমাদের দেশে স্বর্ণের মূল্য

স্বর্ণ
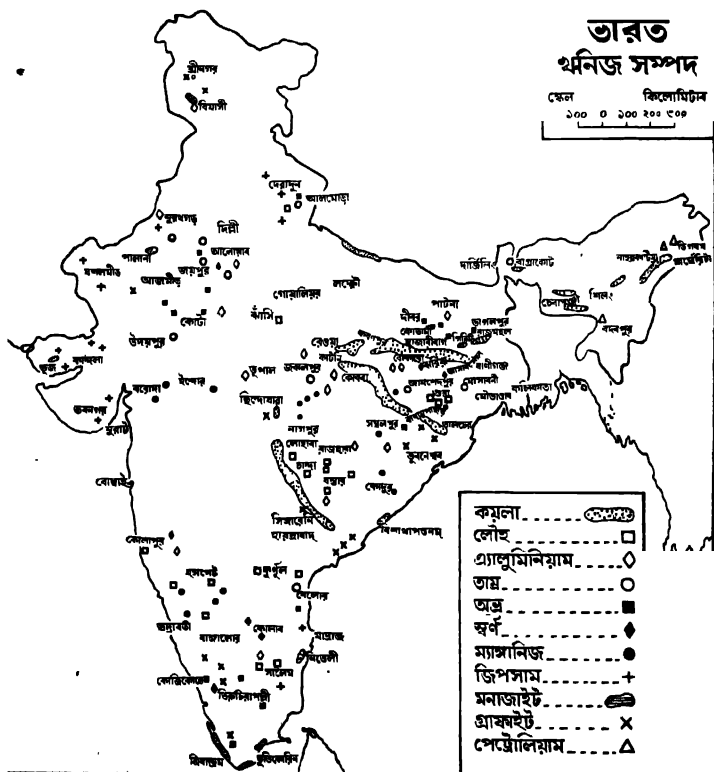
অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই, অধুনা, "গোল্ড কণ্ট্রোল অর্ডার" দ্বারা সরকার ১৪ ক্যারেটের অধিকতর বিশুদ্ধতাযুক্ত সোনার গহনা নূতন

করিয়া নির্মাণ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিশুদ্ধ সোনা মজুত রাখাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ক্রোমাইট, বক্সাইট, জিপসাম, তামা, দস্তা, সীসা, টিন, গন্ধক ইত্যাদিও শিল্পবিস্তারের জন্য প্রয়োজন। ক্রোমাইট ব্যবহারের জন্য কোনো বিশেষ শিল্প এখনও আমাদের দেশে হয় নাই তাই আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ক্রোমাইট বিদেশে রপ্তানী হয়। বিহার, মহীশূর, অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে ক্রোমাইট পাওয়া যায়। বক্সাইট দ্বারা অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হয়। বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যে বক্সাইট পাওয়া যায়। যে পরিমাণ বক্সাইট আমাদের দেশে পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। জিপসামের প্রয়োজন হয় রাসায়নিক সার ও সিমেণ্ট প্রস্তুতের কাজে। রাজস্থানে প্রচুর পরিমাণে এই খনিজ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সিংভূম অঞ্চলে (বিহার) তামা এবং জয়পুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে সীসা ও দস্তা পাওয়া যায়। দেশ হিসাবে ইহাই আমাদের খনিজ প্রাপ্তির হিসাব।

অন্যান্য খনিজ

প্রাচুর্যের ভিত্তিতে ভারতের খনিজ দ্রব্যের বিভাগ

ভারতবর্ষে সমগ্র খনিজ সম্পদকে প্রাচুর্যের ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

১। যে সকল খনিজ ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর এবং বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করা হইয়া থাকে—যথা, লোহা, ম্যাংগানিজ, ম্যাগনেসাইট, বক্সাইট, টিটানিয়াম, অভ্র, সিলিকা, মনাজাইট, ইলমেনাইট প্রভৃতি।

২। যে সকল খনিজ ভারতের চাহিদা মেটায় অথচ রপ্তানী করার মতো পাওয়া যায় না—যথা, ফেলসপার, ক্রোমাইট, সোনা, জিপসাম, চীনামাটি, লবণ প্রভৃতি। এবং,

৩। যে সকল খনিজ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর, এবং যাহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়—যথা, নিকেল, তামা, সীসা, পেট্রোলিয়াম, গন্ধক, পারদ, টিন, দস্তা প্রভৃতি।

যে পরিমাণ খনিজ দ্রব্য আমাদের আছে সেই অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি এখনও

আমাদের দেশে হয় নাই। তাই এই সকল খনিজের অধিকাংশই রপ্তানী করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লোহা প্রভৃতি যে শাদা রং দিয়া কলংক নিবারণের জন্য ঢাকা হয়, সেই শাদা রং বা টিটোনিয়াম ডাই-অক্সাইড ইলমেনাইট নামক খনিজ হইতে প্রস্তুত করা হয়। ত্রিবান্দ্রমে টিটোনিয়াম ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করার কারখানা আছে সত্য, কিন্তু প্রয়োজনমত সালফিউরিক এসিডের অভাবে এদেশে চাহিদা অনুযায়ী টিটোনিয়াম তৈরী সম্ভব হয় না, এবং সেইজন্যই বহু ইলমেনাইট বাহিরে রপ্তানী করিতে হয়। কয়লা হইতে পীচ, আলকাতরা, বেনজল, এমোনিয়া, ন্যাপথলিন, ক্রিয়োজোট প্রভৃতি উপদ্রব্য (by-products) তৈরীর ব্যবস্থা হইলেও আরও বহু উপদ্রব্যের জন্য এখনও আমরা পরমুখাপেক্ষী। ভারতের খনি হইতে যে তামা পাওয়া যায় তাহা সাধারণত আগুনে পোড়াইয়া শোধন করা হয, বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা বিশ্লেষণের (Electrolytic Copper refining) বিশেষ ব্যবস্থা নাই। ফলে, এই তামায় কিছু পরিমাণে নিকেল থাকিয়া যায় বলিয়া তাহার দ্বারা বিদ্যুৎবাহী তার প্রস্তুত করা যায় না। সীসা এবং দস্তা শোধনের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের নাই বলিয়া এই দুই খনিজই জার্মানীতে শোধনের জন্য রপ্তানী করা হইয়া থাকে।

স্বাধীন ভারতে খনিজসম্পদের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই খনিজসম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের দিকেও আমাদের জাতীয় সরকার বিশেষ নজর দিয়াছেন। প্রথম দিকে অবশ্য কয়লা ও তেল এই দুইটি খনিজের ক্ষেত্রেই সরকারী ব্যবস্থা সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয়। ঐ দুই খনিজের নূতন নূতন খনির সন্ধান ও আবিষ্কার এবং বর্তমান খনির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে। আবার উহাদের ময়লা নিষ্কাশন করিয়া শোধনের জন্যও নূতন নূতন শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তেলের জন্য শোধনাগার স্থাপনের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। নূতন শিল্পনীতিবিষয়ক প্রস্তাব অনুযায়ী হীরক, তামা, জিপসাম, ম্যাংগানিজ, বক্সাইট প্রভৃতির খনিগুলিকেও সরকারী ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া নামক প্রতিষ্ঠানটিকে বহুগুণ বড়ো করিয়া গড়া হইয়াছে। ব্যুরো অব মাইনস, অয়েল এণ্ড গ্যাচার্যাল গ্যাস কমিশন, ফুয়েল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, গ্লাস রিসার্চ ল্যাবরেটরী, মেটালার্জিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, ন্যাশন্যাল মিনারেল ডেভলপমেণ্ট করপোরেশন প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। উপযুক্ত খনিসংক্রান্ত কর্মী গড়ার জন্য ধানবাদস্থ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনসকেও পুরাপুরি নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে খনিতত্ত্বের আলাদা ফ্যাকাল্টি (বা বিভাগ) খোলা হইয়াছে ও বানারসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক কলেজ অব মাইনিং এণ্ড মেটালার্জি স্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে বিদেশী সরকারের আমলে আমাদের খনিজের বেশীর ভাগই বেপরোয়া খরচ করা হইয়াছে, মুনাফার আশায় বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছে। স্বার্থান্বেষী খনি-মালিকেরা খনির উন্নতির কথাও যেমন ভাবে নাই, তেমনি খনিজ ফুরাইয়া গেলে কি হইবে তাহাও চিন্তা করে নাই। জাতীয় সরকার খনিজের যথাযোগ্য সংরক্ষণের জন্য ১৯৫৭ সালে মাইনস এণ্ড মিনারেলস (রেগুলেশন এণ্ড ডেভলপমেণ্ট) এ্যাক্ট পাশ করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে খনি-সংস্করণ সংক্রান্ত এবং মালিকানা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Explain, with examples, what is meant by the term "minerals".

2. Describe the problems which face us in regard to our mineral resources. What steps are being taken to solve them.

3. Classify the mineral resources of India in terms of their availability.

B. 1. On an outline map of Africa, Asia and Australia, indicate the following by drawing lines—

(a) Tethy's sea (b) Gondwanaland

2. On a map of India (with boundaries of states marked) indicate the minerals available in each state.

C. Answer the following questions in not more than 50 words :—

1. Name the different kinds of oil which are produced by refining mineral oil.

2. State why most of the mineral resources in India lie in the Deccan region.

3. State why the Himalayas are not so rich in minerals.

D. Collect the following for your scrap-book :—

(a) Pictures of as many kinds of mines as you can get.

(b) Pictures of oil refineries.

(3) Pictures of mines and mine-machineries in Western countries.

E. The following projects may be undertaken :—

1. Write letters to the relatives of students in the class, who may be working in mines, to send pictures and information about the mines and their mine-products. The letters may be composed by groups of students and the information edited for a class wall-newspaper.

2. Every student may draw a map indicating the availability of mineral resources in India, statewise.

আমাদের শিল্প

কৃষিজ, বনজ বা খনিজ দ্রব্যাদি অনেক সময়ই স্বভাবজ অবস্থায় আমাদের সকল চাহিদা মিটাইতে পারে না। আদিম অবস্থায় অবশ্য মানুষ প্রাকৃতিক উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া নিজেদের অভাব নিজেরাই মিটাইত। কিন্তু কালক্রমে যতই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই যেমন তাহার চাহিদা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে, তেমনি ঐ বহুবিচিত্র চাহিদা মেটানোর তাগিদে স্বভাবজ উপকরণাদিকে বিভিন্ন ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদিতে পরিণত করার তাগিদও অনুভূত হইয়াছে। আর ইহার ফলেই ঘটিয়াছে শিল্পের উদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে বস্তুর (স্বভাবজাত বা কৃত্রিম) পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাকে মানুষের প্রয়োজন-উপযোগী করার নামই হইতেছে শিল্প। তাই সকল শিল্পের জন্যই আবশ্যক কাঁচা মাল বা উপাদান (বস্তু)। উপাদানের পরিবর্তন সাধনের নিমিত্ত আবার প্রয়োজন হাতিয়ার বা যন্ত্র, এবং কায়িক শ্রম বা ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বয়ন শিল্পে উপাদান বা বস্তু সুতা বা রেশম বা পশম, যন্ত্র তাঁত, আর ক্ষমতা তাঁতীর পায়ের ও হাতের শক্তি অথবা এঞ্জিন বা মোটরের শক্তি।

শিল্প কাহাকে বলে

শিল্পে এই তিনের রকমফেরের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে শিল্পে বেশী দামী যন্ত্রাদি সরঞ্জাম দরকার হয় না, যাহার জন্য বেশী শ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না, আর যাহার উপাদান অল্প মূলধনেই সংগ্রহ করা যায়, তাহাকে বলা হয় কুটির শিল্প। অন্যদিকে, যে শিল্পে বিরাট বিরাট যন্ত্রাদির প্রয়োজন, প্রয়োজন বহু শ্রমিকের ও প্রচুর মূলধনের, তাহাকে বলা হইয়া থাকে ভারী শিল্প (heavy industries)। খুব সম্ভবত, এই জাতীয় শিল্পে উৎপাদনের জন্য ভারী ভারী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় বলিয়াই ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। অবশ্য কালক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্বে যেগুলি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল,

কুটির শিল্প ও ভারী শিল্প

তাহাদের অনেকগুলিই বর্তমানে বিরাট আকারের যন্ত্রপাতির সাহায্যেই উৎপাদিত হইতেছে।

ভারী শিল্প

আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের পূর্বে বিশেষ কোনো ভারী শিল্প গড়িয়া ওঠার সুযোগ পায় নাই। কারণ বিদেশী শাসকেরা একদিকে যেমন এই দেশ হইতে কাঁচামাল সস্তায় সংগ্রহ করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে এই দেশের বাজারে চড়া দামে তাহাদের নিজেদের দেশের তৈরী মাল বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এই দেশে কোনো বৃহৎ শিল্প গড়িয়া ওঠার সম্ভাবনাকে সুনজরে দেখে নাই। কিন্তু দেশ স্বাধীনতালাভের পরেই এই দিকে
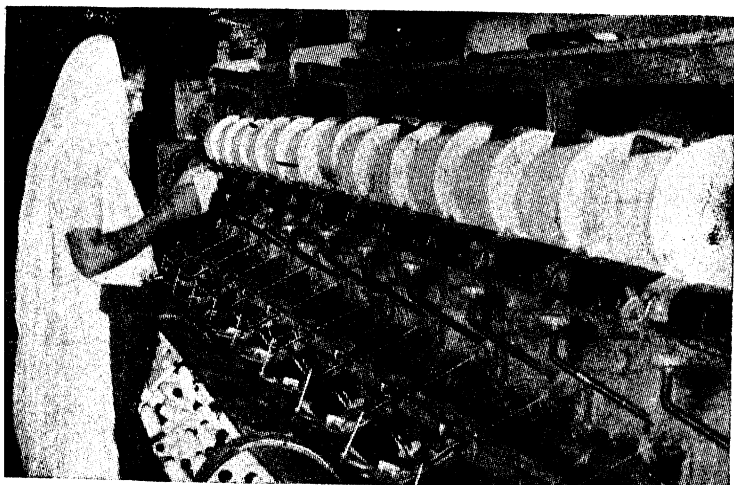
কাপড়ের কলের একাংশ

আমাদের জাতীয় সরকারের নজর পড়িয়াছে। দেশে কৃষির উন্নতির সংগে সংগে ব্যাপক শিল্পায়নেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং হইতেছে। আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় খনি ও বৃহৎ শিল্পখাতে মোট ১৭৯ কোটি টাকার জায়গায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮৯০ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ভারী শিল্পের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বেরই স্বীকৃতি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় সরকারের ভারী শিল্পসংক্রান্ত নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসংগিক হইবে না। স্বাধীনতালাভের পর প্রথমই প্রশ্ন উঠিল, এতদিন যেমন চলিয়া আসিতেছে—অর্থাৎ অর্থশালী লোকেরা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং দেশের স্বার্থ এবং শ্রমিকদের ভালো-মন্দের কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শুধু ব্যক্তিগত মুনাফার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিল্পপরিচালনা করিতেছেন, তেমনি আর চলিবে না, সরকারই নিজে দেশের স্বার্থ,শ্রমিকদের স্বার্থের নিমিত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইবেন। স্বাধীনতালাভের পরই জাতীয় স্বার্থে ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল ভারত সরকার এক শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। তাহাতে শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারীমালিকানার সহিত সরকারী মালিকানার উপর জোর দেওয়া হয়, এবং শিল্পের মূল নীতি মুনাফা অপেক্ষা জনকল্যাণের দিকে ঘুরিবার সুযোগ লাভ করে।

আমাদের জাতীয় শিল্পনীতি

১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকার আর এক নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির পরিবর্তন করিয়া শিল্পের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃত্ব চালু করিয়া শিল্পোন্নয়নের অধিকতর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই নূতন শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে:—

(ক) প্রথম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত যে ১৭টি শিল্প আছে তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে যেগুলিতে বেসরকারী মালিকানা সরকার অনুমোদন করিয়াছেন সেগুলি ছাড়া পুরাতন সব শিল্প সরকার নিজের হাতে আনিবেন এবং এই শ্রেণীর নূতন শিল্প সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে:—(১) অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দেশরক্ষার সরঞ্জাম; (২) আণবিক শক্তি; (৩) লৌহ ও ইস্পাত; (৪) লৌহ ও ইস্পাতের ভারী ঢালাই; (৫) কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন, খনি, যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ও অন্যান্য মৌলিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম নির্মাণ; (৬) বৃহদাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি; (৭) কয়লা; (৮) খনিজ তৈল; (৯) খনি হইতে লৌহের মাক্ষিক (ore), ম্যাংগানিজ-মাক্ষিক, ক্রোম-মাক্ষিক, জিপসাম, গন্ধক, সোনা

সরকারী পরিচালনাধীন মূলশিল্প (key industries)

ও হীরক উত্তোলন ; (১০) তামা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি খনি হইতে উত্তোলন ও কার্যোপযোগীকরণ ; (১১) ১৯৫৩ সালের আণবিক শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নির্দেশে উল্লিখিত খনিজসমূহ ; (১২) বিমান ; (১৩) আকাশপথ পরিবহণ ব্যবস্থা ; (১৪) রেলপথ পরিবহণ ; (১৫) জাহাজ নির্মাণ; (১৬) টেলিফোন ও টেলিফোনের তার, টেলিগ্রাফ ও বেতারের যন্ত্রপাতি ; এবং (১৭) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও বণ্টন।

সরকারী ও বেসরকারী পরিচালনাধীন শিল্প

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিম্নলিখিত ১২টি শিল্প স্থান পাইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে এই সব শিল্পে সরকার অধিকতর অংশ গ্রহণ করিবেন। অবশ্য সরকার কর্তৃক এই শ্রেণীর নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বেসরকারী প্রচেষ্টায়ও এই সব শিল্পের প্রসারের সুযোগ দেওয়া হইবে :—(১) ১৯৪৯ সালের খনিজ সুবিধা দান আইনে উল্লিখিত "অপ্রধান খনিজসমূহ" ছাড়া অন্যান্য খনিজ ; (২) এলুমিনিয়াম ও উপরিউক্ত প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত লৌহসম্পর্কহীন ধাতুগুলি বাদে অন্যান্য লৌহসম্পর্কহীন ধাতু ; (৩) যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম ; (৪) লৌহমিশ্রিত ধাতু ও যন্ত্রের ইস্পাত ; (৫) ঔষধ, রং, প্ল্যাষ্টিক প্রভৃতি রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মৌলিক ও মধ্যবর্তী পণ্যসমূহ ; (৬) এ্যান্টিবাওটিক্‌স্ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ঔষধ ; (৭) সার ; (৮) কৃত্রিম রবার ; (৯) কয়লার অংগার-উৎপাদন (carbonisation of coal) ; (১০) রাসায়নিক মণ্ড (pulp) ; (১১) রাজপথ পরিবহণ ; এবং (১২) সামুদ্রিক পরিবহণ।

বেসরকারী পরিচালনাধীন শিল্প

(গ) উপরিউক্ত দুই শ্রেণীতে উল্লিখিত শিল্পসমূহ ছাড়া বাকী শিল্পগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি হইতেছে, এইগুলি প্রধানত বেসরকারা পরিচালনাধীন থাকিবে। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহারা যথাসম্ভব সরকারী আর্থিক সাহায্য পাইতে পারিবে। তাহা ছাড়া, সরকার প্রয়োজন বোধ করিলে এই শ্রেণীর কোনো শিল্পেরও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

উপরিউক্ত শিল্পনীতি অনুযায়ী শিল্পোন্নয়নের ফলে আমাদের দেশে যে সব

প্রধান প্রধান ভারী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে নিম্নে তাহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল :—

(১) **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প**—বর্তমান সভ্যতাকে অনেক সময় লৌহ সভ্যতা বলা হয়। লৌহ ব্যতীত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যানবাহনাদি, ঘরবাড়ী প্রভৃতি কিছুই প্রস্তুত হইতে পারে না। কাজেই প্রচুর পরিমাণে লৌহ নিজের আয়ত্তের মধ্যে না থাকিলে কেহ যন্ত্র সভ্যতায় অগ্রগামী হইতে পারে না। ভারতের লৌহ শিল্পকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: (ক) মৌলিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (basic iron and steel industries), এবং (খ) পুনর্গঠন লৌহ ও ইস্পাত (rerolling iron and steel industries)। লৌহপ্রস্তর হইতে যে কাঁচা লোহা ও ইস্পাত কারখানায় তৈরী হয় তাহাকেই মৌলিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পদ্রব্য বলা হয়। আর বৃহৎ ইস্পাত শিল্প যন্ত্রের ছোটো ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা লইয়া অথবা ভাংগা গাড়ী, ভাংগা লোহার জিনিস, ভাংগা রেলের টুকরা প্রভৃতি হইতে যে সকল লৌহদ্রব্য পুনরায় গঠন করা হয় তাহাদের পুনর্গঠন লৌহ শিল্পদ্রব্য বলা হইয়া থাকে।

মৌলিক ও পুনর্গঠন : লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

স্বাধীনতালাভের পূর্বে এদেশে মৌলিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধানত তিনটি কেন্দ্র ছিল—(১) পশ্চিম বংগে হীরাপুর, কুলটি ও বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ইস্পাত শিল্পের কারখানা, (২) বিহারের জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর কারখানা, এবং (৩) মহীশূরে ভদ্রাবতীতে মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানা। লৌহ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান এইসব অঞ্চলে সহজে ও সুলভে পাওয়া যাইবার ফলেই এই তিন জায়গায় লৌহ শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল। পশ্চিম বংগে বার্ণপুর অঞ্চলে লৌহখনি কিছু দূরে অবস্থিত হইলেও কয়লা অঞ্চল একেবারেই নিকটে। কয়লা আনিবার কোনো খরচ না থাকাতে লৌহের পরিবহণের জন্য যা কিছুটা বেশী খরচ হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি হয় না। লৌহ গলাইবার জন্য আবশ্যকীয় বিদ্রাবক ম্যাংগানিজ বা ডলোমাইটের প্রাপ্তিস্থানও বার্ণপুর হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে। ম্যাংগানিজ পাওয়া যায় মধ্য প্রদেশে আর চুনাপাথর ও

মৌলিক লৌহ শিল্পের কারখানা

ডলোমাইট আসে বিস্‌রা ও গাংপুর হইতে। এ অঞ্চলে যেমন শ্রমিক প্রচুর ও সুলভ, তেমনি দামোদর হইতে প্রয়োজনীয় জল পাইবারও সুবিধা আছে।

জামসেদপুর কারখানার জন্য আবশ্যকীয় লোহার প্রাপ্তিস্থান গুরুমহিষানি, সুলাইপেত, নোয়ামুণ্ডি, বাদাম পাহাড় অঞ্চল মাত্র ৫৫ মাইল দূরে, এবং কয়লা প্রাপ্তির স্থান ঝরিয়া অঞ্চল ১১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাংগানিজ, ডলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতির প্রাপ্তিস্থানও ১১০ মাইল অপেক্ষা দূরে নহে। নিকটেই সাঁওতাল পরগণা থাকায় সুলভে বিস্তর শ্রমিক পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া কারখানার নিকটেই খরখৈ ও সুবর্ণরেখা নদী থাকায় প্রয়োজনীয় প্রচুর জল পাইবারও কোনো অসুবিধা নাই। বস্তুত, এইসব সুবিধার জন্যই পশ্চিম বংগ ও বিহারের এই অঞ্চল ভারতের প্রধান লৌহ শিল্প-অঞ্চল হিসাবে গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মহীশূরের কারখানার লৌহপ্রাপ্তিস্থান বাবাবুদান পাহাড়ে কেম্মানগুণ্ডি খনিও মাত্র ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় চুনাপাথরও মাত্র ১৪ মাইল দূরবর্তী ভাণ্ডিগুড্ডা হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ অঞ্চলে কোক কয়লার বিশেষ অভাব থাকায় উহার পরিবর্তে নিকটবর্তী বন হইতে কাঠ কয়লা ও জগ জলপ্রপাত হইতে আহরিত জলবিদ্যুৎ শক্তি কারখানার কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বার্ণপুর, জামসেদপুর এবং মহীশূর এই কারখানা তিনটির বৎসরে ২২ লক্ষ ২১ হাজার টন কাঁচা লোহা (pig iron) ও ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টন পাকা ইস্পাত (finished steel) প্রস্তুত করার ক্ষমতা আছে। [দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মহীশূরের কারখানার ইস্পাত উৎপাদন আরও এক লক্ষ টন বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।]

ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত তিনটি কারখানা ছাড়াও ভারত সরকার আরও তিনটি ইস্পাত তৈরীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে উড়িষ্যার অন্তর্গত রাউড়কেল্লার কারখানা জার্মাণীর ক্রুপ-ডেমাগ কোম্পানীর সহযোগিতায় প্রায় ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত হইয়াছে, এবং আশা করা যাইতেছে ইহা হইতে প্রতি বৎসর ৭ লক্ষ ২০ হাজার টন ইস্পাত পাওয়া যাইবে। মধ্য প্রদেশের ভিলাই-র

মৌলিক লৌহ শিল্পের নবনির্মিত কারখানা

কারখানা স্থাপিত হইয়াছে রুশ সরকারের সহযোগিতায় এবং প্রায় ১৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ; ইহার আনুমানিক বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম বংগের দুর্গাপুরেও কয়েকটি বৃটিশ কোম্পানীর সহযোগিতায় প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ; ইহার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই কয়টি লৌহ কারখানায় সম্পূর্ণভাবে কাজ শুরু হইলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে প্রায় ৬০ লক্ষ টন লোহা প্রতি বৎসরে উৎপন্ন হইবে।

লৌহদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী

বর্তমানে আমাদের দেশে কাঁচা লৌহের উৎপাদন একেবারে কম না হইলেও লৌহজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে আমরা এখনও স্বাবলম্বী হইতে পারি নাই। লৌহ দ্বারা ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে এখনও প্রস্তুত হইতেছে না। ছোটো ছোটো যন্ত্রপাতি কিছু কিছু প্রস্তুত হইলেও তাহা যথেষ্ট নহে। এখন আমাদের দেশে লৌহ দ্বারা ভারী ও পাতলা কড়ি, ভারী রেলের পাটি, টিন-প্লেট, লোহার তার, চাকা, স্প্রিং প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। এদেশে এই উদ্দেশ্যে পাকা ইস্পাতের (finished steel) প্রয়োজন প্রতি বৎসরে প্রায় ২৪.৪ লক্ষ টন। কিন্তু আমরা প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ প্রস্তুত করিতে পারি। ফলে, অবশিষ্ট আমদানী করিতে হয়। প্রধানত যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান হইতে আমরা এই সব জিনিস আমদানী করিয়া থাকি। অবশ্য কাঁচা লোহা ও ইস্পাত যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানে রপ্তানী করাও হইয়া থাকে।

পুনর্গঠন লৌহ শিল্প

এদেশের পুনর্গঠন লৌহ শিল্প দ্রব্যাদির মধ্যে টিন-প্লেট (লৌহপাতের উপর টিন লাগাইয়া টিন-প্লেট তৈরী হয়), দস্তামোড়া লৌহদণ্ড (galvanised iron bar), রেলপথের বল্টু, ওয়াগন, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রধান। এজন্য আমাদের দেশে প্রায় ১৪২টি পুনর্গঠন লৌহ শিল্প কারখানা (rerolling mills) রহিয়াছে।

(২) **কার্পাস বয়ন শিল্প**—ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অর্থপ্রসূ হইতেছে কার্পাস বয়ন শিল্প। মোটামুটি হিসাবে,

ইহার মূলধন প্রায় ১২০ কোটি টাকা। প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে কাজ করিয়া থাকে। এই শিল্পে নিযুক্ত মিলের সংখ্যা ৪৮২টি এবং এই সব মিলে এক কোটি ত্রিশ লক্ষের বেশী টাকু এবং দুই লক্ষের অধিক তাঁতের কাজ হইতেছে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন কার্পাস দ্রব্যের মূল্য মোটামুটি হিসাবে প্রায় ৪০০ কোটি টাকারও অধিক।

ভারতবর্ষে কার্পাস শিল্পের ইতিবৃত্ত

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রস্তুত কার্পাস বস্ত্রাদি বিদেশে বিশেষ সমাদৃত হইত। সূক্ষ্মতার জন্য প্রাচীন য়ুরোপের বাজারে বাংলা দেশের মসলিন কাপড়ের বিশেষ চাহিদা ছিল। দক্ষিণ ভারতের কালিকটের তৈরী কাপড় (ঐ স্থানের নাম হইতেই ক্যালিকো কাপড়ের নাম হইয়াছে) বা মসলিপত্তনের ছিটও প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক এদেশ অধিকারের পরে বিদেশী শাসকের স্বার্থে এদেশের কার্পাস-বয়ন শিল্পের অবনতি ঘটে। তাহাদের অপকৌশল ও অত্যাচারে একদিকে যেমন এই দেশে শিল্প হিসাবে কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, তেমনি বিদেশী মালে এই দেশের বাজার ভরিয়া যায়। কিন্তু পরে ইংরেজদের চেষ্টায়ই, তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে সুতার কল প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদে এবং শোলাপুরেও মিল স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এই মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৩টি। সেই সময়ই বাংলা ও বোম্বাই ছাড়াও মধ্য প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশে এই সব সুতার কল ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পুনরায় জাপান ও চীনের তৈরী কার্পাস সুতার সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের কার্পাস সুতা তৈরী শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কিন্তু বাণিজ্যক্ষেত্রে কার্পাস সুতার ব্যাপারে ভারতকে পিছনে হটিয়া আসিতে হইলেও ইহার পরোক্ষ ফল হিসাবেই ভারতে কার্পাস সুতার বদলে কার্পাস বস্ত্র তৈরী শুরু করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। শুধু সুতা নহে, কাপড় তৈরীর জন্যও ভারতে বহু মিল গড়িয়া ওঠে। নিজের সুতায় ভারত নিজের কাপড় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনও এই ঝোঁককে আরও বাড়াইয়া দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের অংগ হিসাবে ভারত বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে। ফলে, দেশে বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য

মিলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে কার্পাস বয়ন শিল্পে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর হইতেছে বোম্বাই অঞ্চল। এখানে প্রায় দুইশত মিল রহিয়াছে এবং ভারতবর্ষের মোট উৎপন্ন কার্পাসদ্রব্যের প্রায় অর্ধেক এই সব মিলেই প্রস্তুত হয়। ইহার কারণ, অবস্থান, মূলধন, শ্রমিক, কাঁচামাল বা পরিবহণের সুব্যবস্থা—শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুরই এই অঞ্চলে অপূর্ব যোগাযোগ ঘটিয়াছে। বোম্বাই বন্দরের অবস্থানের ফলে এই অঞ্চলে আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা যেমন বেশী, তেমনি বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনিবার পক্ষেও এই স্থানই নিকটতম। এই অঞ্চলের পার্শী সম্প্রদায় ইতিপূর্বেই ইংল্যাণ্ড ও চীনের মধ্যে তুলাসংক্রান্ত বাণিজ্যে আংশিকভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, যখন এদেশে কার্পাস বয়নশিল্পের পুনরভ্যুত্থান ঘটে, তখন এই অঞ্চলের মিলগুলি ধনী পার্শী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রচুর মূলধন লাভে সমর্থ হয়। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল তুলা উৎপাদনের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ; সুতরাং কাঁচামাল প্রাপ্তির দিক দিয়াও এই অঞ্চলের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। তাছাড়া, বোম্বাই বা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সুলভে শ্রমিক সংগ্রহ করাও এখানকার মিলগুলির পক্ষে কষ্টকর হয় নাই।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের কার্পাস শিল্প : বোম্বাই

বোম্বাইর পরই কার্পাস শিল্পে দ্বিতীয় স্থান মাদ্রাজ রাজ্যের। বলা হইয়া থাকে ভারতবর্ষের কার্পাস বয়নশিল্পে যে পরিমাণ সুতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশই নাকি ব্যবহৃত হয় মাদ্রাজে। প্রথমদিকে অবশ্য প্রধানত এই অঞ্চলে সুতার কলই শুধু গড়িয়া উঠিয়াছিল ; কয়লার অভাবে বড়ো বড়ো মিল স্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে এই অঞ্চলে যন্ত্র পরিচালনার জন্য শক্তির অভাব দূর হইয়াছে এবং বড়ো বড়ো কার্পাস বস্ত্র তৈরীর কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে মাদ্রাজে ও অন্ধ্র প্রদেশে মোট মিলের সংখ্যা প্রায় ১৪৫টি।

মাদ্রাজ

পশ্চিম বংগে কার্পাস বস্ত্র বয়নের মিলগুলি প্রধানত কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটবর্তী হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলায় গড়িয়া উঠিয়াছে। নিকটবর্তী কলিকাতা বন্দরের অবস্থিতি প্রয়োজনীয় আমদানী-রপ্তানীর

পক্ষে যেমন সহায়ক হইয়াছে, তেমনি কলিকাতা বড়ো বড়ো ব্যাংক ও ধনীব্যবসায়ীর মিলনস্থল হওয়ার ফলে এই শিল্পের মূলধন লাভেও বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। বাংলাদেশে স্বদেশী যুগে বিদেশী বস্ত্র ত্যাগের ও স্বদেশী বস্ত্র পরিধানের যে আন্দোলন শুরু হয়, তাহাও এই দেশে এই শিল্পকে গড়িয়া উঠিবার ব্যাপারে প্রচুর সহায়তা করে। কিন্তু, পশ্চিম বংগে তুলার বিশেষ অভাব; ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল বা বিদেশ হইতে তাহাকে প্রয়োজনীয় তুলা আমদানী করিতে হয়। এই কারণেই পশ্চিম বংগে বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো কার্পাস বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি ঘটিতে পারে নাই।

পশ্চিম বংগ

বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পশ্চিম বংগ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য যেসব অঞ্চলে কার্পাস বয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ ও কেরালা। এ ছাড়া, পাঞ্জাব, দিল্লী, পণ্ডিচেরী, বিহার ও উড়িষ্যায়ও কয়েকটি করিয়া মিল স্থাপিত হইয়াছে।

কার্পাস বয়ন-শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র

বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণ কাপড় তৈরী হয় নিজের দেশের মধ্যে বিক্রয় ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে তাহার একটি বৃহৎ অংশ রপ্তানী করা হইয়া থাকে। শুধু মধ্য বা সুদূর প্রাচ্যই নহে, ভারতবর্ষের কোনো কোনো কাপড় যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও রপ্তানী করা হয়। অন্যদিকে ১৯৪৯ সালের পর হইতে শাদা ধোওয়া ধুতি, কোরা কাপড়, রংগীন কাপড়, ছাপানো কাপড়, ছাতার কাপড় প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাপড় ছাড়া অন্য কাপড়ের আমদানী এদেশে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রধানত যুক্তরাজ্য, জাপান, সুইজারল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি জায়গা হইতে এই সব কাপড় আমদানী করা হইয়া থাকে।

কার্পাস দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী

(৩) **পাট শিল্প**—পাট শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। বস্তুত, ইহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একচেটিয়া সম্পদও বলা যাইতে পারে। বর্তমানে ভারতে পাটশিল্পে নিয়োজিত মূলধন প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা। গড়ে প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পের কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে।

পূর্বে অবশ্য পাটের এদেশে বিশেষ কোনো মূল্যই ছিল না। গৃহস্থরা ঘরেই পাটের মোটা সুতা কাটিয়া তাহার দ্বারা গৃহস্থালীর জন্য দড়ি প্রভৃতি তৈরী করিয়া লইত। পরে ধীরে ধীরে চট, থলে প্রভৃতি তৈরী করা শুরু হইল এবং বিদেশেও তাহা রপ্তানী করা হইত। এক প্রাচীন হিসাবে দেখা যায় শুধু ১৮৫০-৫১ সালেই বিদেশে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকার পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করা হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজরা কার্পাস শিল্পের মতো পাটশিল্পেরও অগ্রগতি ব্যাহত করে। এদেশে এই শিল্প গড়িয়া ওঠার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডাণ্ডি হইতে আমদানীকৃত পাটজাত দ্রব্য। এই দেশ হইতে পাট ডাণ্ডিতে পাঠাইয়া সেখান হইতে ঐ সব পাটজাত দ্রব্য এদেশে আমদানী করা শুরু হয়। কিন্তু পরে য়ুরোপীয়রাই নিজেদের স্বার্থে বাংলা দেশের হুগলী নদীর দুই তীরে চটকল স্থাপন করা শুরু করে। ১৮৫৯ সালে বরাহনগরে প্রথম বিদ্যুৎচালিত পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে শুধু পশ্চিম বংগে ১০১টি পাটকল রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্ধ্র প্রদেশে ৪টি, বিহারে ৩টি, উত্তর প্রদেশে ৩টি ও মধ্য প্রদেশে ১টি চটকল আছে। এইসব কল প্রধানত চট, হেসিয়ান, কার্পেট, কম্বল, টারপলিন প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্য বর্তমানে তৈরী করিয়া থাকে।

পাটশিল্পের ইতিবৃত্ত

ভারত বিভাগের পরে অবশ্য ভারতবর্ষের পাটশিল্পকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। উৎকৃষ্ট পাট পূর্ব বংগে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সামগ্রিকভাবে এই উপ-মহাদেশের অধিকাংশ পাটই উৎপন্ন হয় সেখানেই। পশ্চিম বংগে অপকৃষ্ট পাটের সহিত পূর্ব বংগের পাটের উৎকৃষ্ট আঁশ না মিশাইলে ভালো হেসিয়ান তৈরী সম্ভব নয়। অথচ, ভারত বিভাগের পরে প্রথম দিকে ভারত-পাকিস্তান চুক্তির ফলে পাকিস্তান হইতে পাট পাওয়া গেলেও সাম্প্রতিককালে ঐ দেশ হইতে পাটের আমদানীর পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। ইহার একটি কারণ, ইতিমধ্যেই সেখানে খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় কয়েকটি পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ষ্টার্লিং মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস হইলে ভারতবর্ষ যদিও মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে, কিন্তু পাকিস্তান তাহা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাটশিল্পের সমস্যা

করে নাই। ফলে, পাটের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, এবং পাট আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে সমূহ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব অসুবিধা দূরের জন্য অবশ্য সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের সহিত ভারত সরকারের কয়েকটি বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে সাময়িকভাবে কিছু সুবিধাও হইয়াছে। আমরা নিজেরাও পাট উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছি।

(৪) **রেশম শিল্প**—সিল্কের বস্ত্রাদি পরিধান করিতে এদেশের লোকেরা চিরদিনই ভালোবাসে। পূজা-পার্বণে রেশমের বস্ত্রকে আমরা পবিত্র মনে করি। প্রাচীন ভারতের রেশম শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও পরবর্তীকালে এই শিল্পে ভাটা পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে পুনরায় এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে মোট যে পরিমাণ কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় অর্ধেকই উৎপন্ন হয় মহীশূরে। কাঁচা রেশম উৎপাদনে অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে যথাক্রমে আসাম, পশ্চিম বংগ, মাদ্রাজ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে যে রেশম উৎপন্ন হয় তাহাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা চলে—(ক) তুঁত গাছের রেশম-কীট হইতে যে রেশম পাওয়া যায় (mulberry raw silk); এবং (খ) তুঁত ছাড়া অন্যান্য গাছের রেশম-কীট হইতে যে রেশম পাওয়া যায় (non-mulberry raw silk)। প্রথমোক্ত জাতের রেশম একান্তভাবেই দেশরক্ষা বিভাগে প্যারাসুটের দড়ি প্রভৃতি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়োক্ত জাতের রেশমই সাধারণের প্রয়োজনীয় কাপড়াদি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রেশম শিল্প উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগ

সাম্প্রতিককালে রেশম শিল্পের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে সেণ্ট্রাল সিল্ক বোর্ড আইন পাশ করিয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৫৮ সালে বিভিন্ন জাতীয় রেশম-কীটের উৎপাদনের ব্যাপারে গবেষণার জন্য শ্রীনগরে কেন্দ্রীয় রেশম-কীট কেন্দ্র (Central Silkworm Station) স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে বহরমপুরে যে রেশম-চাষ গবেষণা কেন্দ্র (Sericulture Research Station) স্থাপিত হইয়াছিল, ভারত

সরকার উহাকে বর্ধিত করিয়া সর্বভারতীয় শিক্ষাসংস্থায় পরিণত করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

(৫) **পশম শিল্প**—পশম শিল্পে আজ অবধি আমরা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। তাহার কারণ আমাদের দেশে ভালো জাতের পশম উৎপাদন হয় না। ভারতবর্ষ বছরে প্রায় সাত কোটি পাউণ্ড পশম উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এর অধিকাংশই লোমশ এবং মোটা জাতের। ইহার প্রায় অর্ধেকই বিদেশে রপ্তানী হয়; রপ্তানীকৃত পশমের মূল্য আনুমানিক চৌদ্দ কোটি টাকা। এই দেশে যেসব উন্নত ধরনের পশমদ্রব্য উৎপন্ন করা হয়, তাহার প্রয়োজনীয় পশমের জন্য পশম শিল্পের কারখানা-গুলিকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রতি বছর এদেশে আমদানীকৃত পশমের পরিমাণ প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড, এবং তাহার মূল্যও প্রায় এগারো কোটি টাকার কম নহে।

সম্ভবত ভালো জাতের পশম উৎপন্ন হয় না বলিয়াই ভারতবর্ষে পশম শিল্পের যে সব কারখানা রহিয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগই ছোটো ছোটো। কিন্তু সংখ্যায় ইহারা নিতান্ত কম নয়। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৮৭৫টি। ইহাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানায় অবস্থিত। অবশিষ্ট কারখানাগুলি উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বংগ, দিল্লী ও বোম্বাইতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই সব কারখানায় প্রধানত পশমজাত বস্ত্রাদি তৈরী করা হয়। অবশ্য বস্ত্রাদি ছাড়াও কোনো কোনো কারখানায় পশম হইতে তোয়ালে, কম্বল, ফেল্ট, ফার-কোট প্রভৃতিও উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

(৬) **রেয়ন শিল্প**—সুতী, রেশম বা পশম ছাড়াও কৃত্রিম বস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারেও সাম্প্রতিককালে ভারত ব্রতী হইয়াছে। বর্তমানকালে ভারতবর্ষে উৎপন্ন রেয়নের পরিমাণ বছরে প্রায় দুই কোটি পাউণ্ড। অথচ এদেশে প্রথম রেয়ন শিল্পের মিল প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র ১৯৫০ সালে; উহা ত্রিবাংকুরে অবস্থিত এবং নাম ত্রিবাংকুর রেয়ন লিমিটেড। এতদ্ব্যতীত এদেশে অপর যে চারিটি রেয়ন মিল রহিয়াছে তাহারা হইতেছে—বোম্বাইর অন্তর্গত কল্যাণে ন্যাশনাল রেয়ন করপোরেশন, হায়দ্রাবাদের সিরসিল্ক লিঃ (Sirsilk Ltd.), গোয়ালিয়রের গোয়ালিয়র রেয়ন সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, এবং নব প্রতিষ্ঠিত কল্যাণের সেঞ্চুরী রেয়ন লিঃ।

(৭) **রাসায়নিক শিল্প**—বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে মানুষ তাহার বহুবিচিত্র চাহিদা মেটানোর জন্য দিন দিনই রাসায়নিক শিল্পের উপর উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। দুই বা ততোধিক বস্তু মিশ্রিত করার পর যদি তাহাদের প্রত্যেকটির গুণ অব্যাহত থাকে এবং প্রত্যেকটিকে সাধারণ উপায়ে সহজেই পৃথক করা যায় তাহা হইলে সেই মিশ্রিত বস্তুসমূহকে বলা হইয়া থাকে সামান্য মিশ্র বা mechanical mixture। কিন্তু যদি দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ এমন ভাবে মিশিয়া যায় যাহার ফলে মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে ব্যবহৃত পদার্থগুলির কোনো গুণ দেখা যায় না এবং উহা হইতে পূর্বের বস্তুগুলিকে সহজে আলাদাও করা যায় না, তাহা হইলে তাহাকে বলা হইয়া থাকে রাসায়নিক সম্মিলন বা Chemical compound। এইজাতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হয় বা করা যায়, তাহারাই রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। কালি, সাবান, সার, বিভিন্ন রং-দ্রব্য, গন্ধ দ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, প্লাস্টিক দ্রব্য প্রভৃতি আমাদের চাহিদার অনেক সামগ্রী, রাসায়নিক শিল্পেরই দান।

রাসায়নিক শিল্পের সংজ্ঞা

রাসায়নিক শিল্পকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—(১) সালফিউরিক এসিড ও তাহা হইতে উৎপন্ন ফটকিরি, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, এমোনিয়ম সালফেট প্রভৃতি এবং সোডা, কষ্টিক সোডা প্রভৃতিকে বলা হইয়া থাকে হেভি কেমিক্যালস্ (Heavy Chemicals) বা ভারী রাসায়নিক পদার্থ; আর, (২) ইহাদের সাহায্যে অন্যান্য কাঁচামাল হইতে উৎপন্ন ঔষধপত্রাদি সাধারণত ফাইন কেমিক্যালস্ (Fine Chemicals) বা লঘু রাসায়নিক পদার্থ বলিয়া পরিচিত।

রাসায়নিক শিল্পের দুই বিভাগ

রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ। **খনিজ** কাঁচা মালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বিভিন্ন ধাতুপ্রস্তর (ore), পাথুরে কয়লা, গন্ধক, লবণ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি। ইহারা উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর রাসায়নিক শিল্পের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কয়লা শুধুই যে শক্তির উৎস তাহাই নহে, কয়লা অসংখ্য অত্যাবশ্যক রাসায়নিক শিল্পের অপরিহার্য কাঁচা মালও

বটে। আবার পাথুরে কয়লা হইতে উৎপন্ন বেনজিন, জাইলিন, টলুয়িন ন্যাপথলিন প্রভৃতি দ্রব্যও বহুবিধ রাসায়নিক শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষে এই জাতীয় কাঁচা মালের যেমন অভাব নাই, তেমনি রাসায়নিক শিল্পের উপযোগী **উদ্ভিজ্জ** কাঁচা মালেরও অভাব নাই। খনিজ কাঁচা মালের মতো এইজাতীয় কাঁচা মাল হইতেও যেমন একদিকে নাইট্রিক এসিড, ট্যানিক এসিড, নিকোটিন, ষ্ট্রিকনিন, ক্যাফিন, কুইনিন প্রভৃতি হাজারো রাসায়নিক শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হইয়া থাকে, তেমনি অন্যদিকে এই জাতীয় কাঁচা মাল হইতে উৎপন্ন অ্যাসিটোন, অ্যাসেটিক এসিড, অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড, ইথাইল এসিটেট প্রভৃতি পদার্থ অন্যান্য নানাপ্রকারের রাসায়নিক শিল্পের জন্য একান্ত দরকারী। **প্রাণিজ** কাঁচা মাল বলিতে বোঝা যায় নিহত গবাদি পশুর হাড়, চামড়া, গণ্ড প্রভৃতি। গণ্ড হইতে ইনসুলিন, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনালিন পিটুইট্রিন প্রভৃতি ঔষধ, হাড় হইতে ভালো ফসফেট সার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; আবার নিহত পশুর রক্ত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে যে সক্রিয় কার্বন বা জান্তব কয়লা প্রস্তুত করা যায় তাহা বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী।

রাসায়নিক শিল্পের কাঁচা মাল

আগেই বলা হইয়াছে কাঁচা মালের অভাব আমাদের নাই। খনিজ দ্রব্য এদেশে প্রচুর আছে। এদেশে বিভিন্ন প্রধান প্রধান শহরে যে প্রায় মোট ৩০ লক্ষাধিক গবাদি পশু খাদ্যের জন্য বছরে নিহত হয়, তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রাণিজ কাঁচা মালও সংগৃহীত হয়। উদ্ভিজ্জ কাঁচা মালেরও অনেক-গুলিতেই আমাদের একচেটিয়া অধিকার। তবু ভারতবর্ষে উপযুক্ত সংখ্যায় রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। তাহার প্রধান কারণ, উপযুক্ত কর্মীর ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব। ভারী রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে সালফিউরিক এসিড, বিভিন্ন ক্ষার দ্রব্য, এলম বা ফটকিরি, এপসম সল্ট, কপার সালফাইড, হাইড্রোক্লরিক এসিড প্রভৃতি এদেশে প্রস্তুত হয়। এক সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের জন্যই আসাম, পশ্চিম বংগ, বিহার, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরল প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৫০টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ফাইন কেমিক্যালসের মধ্যে এসিটিক এসিড, এ্যালকোহল, গ্লিসারিন, ক্রিয়োজোট তেল, ন্যাপথলিন প্রভৃতি প্রাণিজ

রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য, এবং ক্যাফিন, ষ্টিকনিন, মেফাক্রিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ঔষধের ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে উৎপাদন শুরু হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইতে পেনিসিলিনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাছাড়া এদেশে প্রায় ৩০টি রঞ্জনদ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সিন্ধ্রিতে রাসায়নিক সারের যে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা। ইহা ছাড়াও পশ্চিম বংগ ও বিহারে ৭টি এবং ত্রিবাংকুরে ১টি সারের কারখানা রহিয়াছে।

রাসায়নিক শিল্পদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী

ভারতবর্ষে বর্তমানে যেসব রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পটাসিয়াম ব্রোমাইড, পটাসিয়াম বাইক্রোমেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি এদেশের চাহিদা মিটাইয়াও বিদেশে কিছু পরিমাণে রপ্তানী হয়। এদেশে যে ব্লিচিং পাউডার, নাইট্রিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রভৃতি উৎপন্ন হয় তাহা হইতে আমাদের চাহিদা কোনো রকমে মেটে মাত্র। এ্যামোনিয়া সালফেট যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের চাহিদার এক-সপ্তমাংশ মেটায় মাত্র।

(৮) **জাহাজ নির্মাণ শিল্প**—এদেশে জাহাজ নির্মাণের এবং একটি আধুনিক জাহাজ নির্মাণ জেটি স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা করেন সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী, ১৯১৯ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টায় সিন্ধিয়া কোম্পানী ১৯৪১ সালে বিশাখা-পত্তনমে একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ "জলউষা"-র নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঐ জাহাজ জলে ভাসানো হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারত সরকার ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে বিশাখাপত্তনমের জাহাজ তৈরী ঘাঁটির কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। বর্তমানে উহা সরকারী নিয়ন্ত্রিত হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হয়। উহার মূলধনের দুই-তৃতীয়াংশ জাতীয় সরকারের এবং এক-তৃতীয়াংশ সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর। এখন পর্যন্ত এই জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে ২৩টি সমুদ্রগামী জাহাজ

এবং ২টি ছোটো জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে কোচিনে আর একটি জাহাজ নির্মাণ ঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনা চলিতেছে। বোম্বাই ও কলিকাতাতে জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(৯) **রেলগাড়ী নির্মাণ শিল্প**—স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় রেলগাড়ী প্রভৃতি নির্মাণের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। এই ব্যাপারে সরকার জামসেদপুরস্থ টাটা লোকোমোটিভ এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিয়া ঐ কোম্পানীকে রেলগাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারীর ব্যাপারে উৎসাহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম বংগে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস নামক যে প্রতিষ্ঠান ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই কারখানা হইতেও প্রয়োজনীয় গাড়ীর কামরা, ইঞ্জিন প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। ১৯৫৫ সালে মাদ্রাজের অন্তর্গত পেরামবুরে যে ইনটিগ্র্যাল কোচ বিল্ডিং ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে তাহাও যাত্রীবাহী কামরার ব্যাপারে ভারতবর্ষকে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তাছাড়া বাংগালোরস্থ হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাক্ট লিমিটেডও সম্পূর্ণ ইস্পাতের যাত্রীবাহী তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নির্মাণ করিতেছে। পশ্চিম বংগে কাঁচড়াপাড়া ও খড়্গপুরে, বিহারের জামালপুরে ও উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে রেলগাড়ী মেরামত হইয়া থাকে।

(১০) **মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প**—ভারতবর্ষে প্রথম মোটর গাড়ী আমদানী হয় ১৮৯৮ সালে। তাহার পর হইতে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত এই দেশে কোনো মোটর শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। এমন কি স্বাধীনতালাভের পরেও বিদেশ হইতে গাড়ীর বিভিন্ন অংশ আমদানী করিয়া এদেশে তাহাদের একত্র (assemble) করা হইত। কিন্তু ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার এই শিল্পের ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ বছরই ভারত সরকার স্থির করেন, শুধুমাত্র সেইসব প্রতিষ্ঠানকেই মোটর নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হইবে যাহারা ধীরে ধীরে এই দেশেই সমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী থাকিবে। বর্তমানে এদেশে এই জাতীয় ছয়টি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে :—কলিকাতাস্থ হিন্দুস্থান মোটরস ; বোম্বাইর প্রিমিয়র অটোমোবাইলস ও মহীন্দ্র এ্যাণ্ড মহীন্দ্র ; মাদ্রাজের

অশোক লেল্যাণ্ড, ও স্ট্যাণ্ডার্ড মোটর প্রোডাক্টস; এবং বোম্বাইস্থ টাটা লোকোমোটিভ এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী। ১৯৫৭ সালের হিসাবে জানা যায় এই সব কোম্পানীর সেই বছরের নির্মিত মোটরের সংখ্যা ৩৬,৪৬৮।

(১১) **উড়োজাহাজ নির্মাণ শিল্প**—উড়োজাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এখনও অনেক পিছাইয়া আছে। কি অসামরিক, কি সামরিক—উড়োজাহাজাদির জন্য আমাদের এখনও বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। তবে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট লিমিটেড সাম্প্রতিককালে উড়োজাহাজ নির্মাণ করিতেছে। ১৯৫৯ সালে ঐ কোম্পানী ২৫টি লঘু "পুষ্পক-১" নামক উড়োজাহাজ নির্মাণ করিয়াছে। সামরিক উড়োজাহাজের ব্যাপারে ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার বৃটিশ হকার সিড্‌লে এভিয়েশন কোম্পানীর সহিত একটি চুক্তি করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী এই কোম্পানীকে পুরানো ডাকোটাগুলিকে বদলানোর জন্য "এভরো-৭৪৮" নামক উডোজাহাজ তৈরীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কানপুরে এয়ার ফোর্সের মাটিতে এই উড়োজাহাজ নির্মাণ করা হইবে।

(১২) **অন্যান্য শিল্প**—পশ্চিম বংগে বাটানগর এবং উত্তর প্রদেশের কানপুর চর্ম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যও চর্ম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি গোচর্ম, সাড়ে তিন কোটি ছাগচর্ম ও এক কোটি সত্তর লক্ষ মেষচর্ম উৎপাদন হয়। এদেশে মোট প্রায় ৭২৫টি চামড়া শোধন কারখানা রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র ৭৪টিতে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা পঞ্চাশের বেশী। অন্যান্যগুলি অল্পসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যেই পরিচালিত হয়। বর্তমানে এদেশে ১২টি জুতা তৈরীর বড়ো কারখানা রহিয়াছে।

চর্ম শিল্প

পশ্চিম বংগে টিটাগড়, রাণীগঞ্জ, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি প্রভৃতি স্থানে; উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, সাহারাণপুর ও কানপুরে; বিহারের ডালমিয়ানগরে, এবং বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যে কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভারতের একটি অন্যতম শিল্প বলিয়া পরিগণিত। ১৯৫৯ সালে এদেশে প্রায় ২,৯২,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার মূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা। বর্তমানে বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ ২৪ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উহা বৃদ্ধি

কাগজ শিল্প

করিয়া নয় লক্ষ টন কাগজ উৎপাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত এই শিল্পে প্রধানত বিদেশী মণ্ড ব্যবহার করা হইত; এক্ষণে ক্রমশ দেশীয় গাছ, বাঁশ ও সাবুই ঘাসের মণ্ড ব্যবহৃত হইতেছে।

ছোটনাগপুরের মুরিতে, উড়িষ্যার হিরাকুঁদে, কেরালার আলোয়েতে, পশ্চিম বংগের বেলুড়ে ও আসানসোলের নিকটবর্তী অনুপনগরে এলুমিনিয়ামের

এলুমিনিয়াম শিল্প

কারখানা রহিয়াছে। সাম্প্রতিককালে উত্তর প্রদেশের রিহাঁদ বাঁধে এবং মাদ্রাজের মেট্টুরে দুইটি নূতন এলুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী চিনি ও গুড় উৎপাদন হইয়া

থাকে। এই শিল্পে প্রায় ৭২ কোটি টাকার মূলধন ও প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক খাটিতেছে। বর্তমানে উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে প্রায় ১৫৭টি কারখানা চিনি উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে।

চিনি শিল্প

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মাদ্রাজে প্রথম সিমেন্টের উৎপাদন শুরু হইলেও পরবর্তীকালে এই দেশে এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। ১৯৪৭ সালে এদেশে মাত্র ১৮টি সিমেন্টের কারখানা ছিল এবং তাহাদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৪৪ মিলিয়ন টন। বর্তমানে বিহারের ডালমিয়ানগরে, জাপলা, খেলারি এবং চাইবাসায়, মধ্য প্রদেশের কাটনি, কাইমুর ও গোয়ালিয়রে, গুজরাটের পোরবন্দর, দ্বারকা ও জামনগরে, মাদ্রাজের ডালমিয়াপুরমে এবং মহীশূরের ভদ্রাবতী প্রভৃতি জায়গায় ৩২টি সিমেন্টের কারখানা রহিয়াছে। ১৯৫৯ সালে এইসব কারখানায় মোট উৎপন্ন সিমেন্টের পরিমাণ প্রায় ৬.৮২ মিলিয়ন টন।

সিমেন্ট শিল্প

কুটির শিল্প

আগেই বলা হইয়াছে, যে শিল্পে বেশী দামী যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না, যার জন্য বেশী শ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না, আর যার উপাদান অল্প মূলধনেই সংগ্রহ করা চলে, তাহাকেই বলা হয় কুটির শিল্প। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রামপ্রধান দেশে কুটির শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কুটির শিল্প গ্রাম-জীবনের দ্বিতীয় আয়ের পথ, এবং কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের জীবিকাসংস্থানের অন্যতম প্রধান আশ্রয়স্থল। ভারতের মতো যে দেশে লোকসংখ্যা অধিক এবং তার মধ্যে অনেকেই বেকার, তেমন দেশের লোকের কর্ম-সংস্থানের জন্য কুটির শিল্পের প্রয়োজন। কারণ, ভারী শিল্পগুলিতে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের ফলে, কাজের তুলনায়, শ্রমিকের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। তারপর নানা কারণেই ভারী শিল্পগুলি শ্রমিকদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের কতকগুলি কুটির শিল্প এশিয়া ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ক্রমে দেশীয় ও বিদেশীয় বৃহৎ শিল্পের প্রবল প্রতি-যোগিতায় ও বিদেশীয় শাসকের অনুদার নীতির ফলে ইহাদের মধ্যে

অনেক শিল্পেরই বিশেষ অসুবিধা ঘটে এবং কালক্রমে কতক লোপও পাইয়া যায়। যাহারা টিকিয়া থাকে তাহাদের অবস্থাও বিশেষ ভালো ছিল না।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৃহৎ শিল্পের ন্যায় কুটির শিল্পের দিকেও জাতীয় সরকারের দৃষ্টি পড়ে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ই কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য ঐ সংক্রান্ত সর্বভারতীয় সংস্থাগুলিকে সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ কোটি টাকা আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঐ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া হয় ২০০ কোটি টাকা; আর তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে বরাদ্দ হইয়াছে ২৫০ কোটি টাকা। উপরিউক্ত হিসাব হইতেই কুটির শিল্পের গুরুত্বের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।

কুটির শিল্প সংক্রান্ত সরকারী নীতি

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৫ সালে কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে অধ্যাপক জি. ডি. কার্ভের নেতৃত্বে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কমিটি নামে একটি কমিটিও নিয়োগ করিয়াছিলেন। কার্ভে কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, এইসব শিল্পে কর্মসংস্থান এবং এই শিল্পক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থার প্রসারের সুপারিশ ছিল। তাহারা মোট ২৫৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার এক উন্নয়ন কর্মসূচীও সুপারিশ করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে এই কর্মসূচী কার্যকরী হইলে এই সব শিল্পে ৪৫ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান হইবার সম্ভাবনা আছে। অতঃপর ১৯৫৬ সালে পণ্ডিত নেহেরু যে নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন, তাহাতেও নীতিগতভাবে বলা হয়, কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনবোধে সরকার বহুল উৎপাদনকারী শিল্পেও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। কুটির শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সর্বাংগীণ উন্নতি সাধনের জন্য ভারত সরকার ছয়টি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করিয়াছেন; এইগুলি হইতেছে—অল ইণ্ডিয়া খাদি এ্যাণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিশন, অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস্ বোর্ড, অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড, কয়ার (coir) বোর্ড, এবং সেণ্ট্রাল সিল্ক বোর্ড।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কুটির শিল্পের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—

(১) তাঁত শিল্প—তাঁত শিল্প ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কুটির শিল্প। এদেশে প্রায় ২৮ লক্ষ তাঁত রহিয়াছে এবং এই সব তাঁতে প্রতি বৎসর প্রায় দেড়শ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন হয়; অর্থাৎ দেশের কাপড়ের চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই তাঁতের কাপড় মেটায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন তাঁতবস্ত্রের মধ্যে মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, মণিপুর ও পশ্চিম বংগে সূতীর ধুতি ও শাড়ী; বেনারসী ও হায়দ্রাবাদের জমকালো সিল্কের কাপড়; মুর্শিদাবাদ, ফরক্কাবাদ, জয়পুর ও বোম্বাইর ছাপা শাড়ী ও কাপড়; শান্তিনিকেতনের বাটিকের কাজ করা কাপড়; মৌসলী-পত্তনের কলমাকরী; জয়পুর, মহীশূর, পশ্চিম বংগ ও কাশ্মীরের সিল্ক শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্র; কাশ্মীরের পশম বস্ত্র; এবং কাশ্মীর, মির্জাপুর, ভাদ্রোহি, ইলোর, বাংগালোর ও জয়পুরের কার্পেট ও রাগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কুটির শিল্প

(২) "বিদরী" কাজ—প্রাচীন বিদর নামক জায়গায় এই কাজের উৎপত্তি বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। তামা ও দস্তার মিশ্রণের বুকে সোনা বা রূপার পাত বা তার নানারূপ নক্সা অনুযায়ী পিটাইয়া বসানো হয়। তামা ও দস্তার মিশ্রণটি পরে কালো হইয়া যায় এবং তাহার বুকে সোনা বা রূপার নক্সা সুন্দরভাবে ফুটিয়া ওঠে। বিদরী কাজযুক্ত সিগারেটের বাক্স, ছাইদানী, ফুলদানী, পাউডার কেস, ফলের পাত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়।

(৩) ফুলকরি—পাঞ্জাবের বিখ্যাত রাগ ও ফুলকরি শালের সাধারণ নাম ফুলকরি। সিল্কের বা খদ্দরের কাপড়ের উপর বহুবর্ণের সুতা দিয়া এম্ব্রয়ডারী করিয়া নানারূপ সুন্দর সুন্দর নক্সা তুলিয়া এই সব শাল তৈরী করা হইয়া থাকে।

(৪) শিং-এর কাজ—শিং-এর কাজ প্রধানত উড়িষ্যারই একচেটিয়া কুটির শিল্প। প্রধানত মহিষের শিং এই কাজে ব্যবহৃত হইলেও, বাইসন এবং হরিণের শিং-ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে অবশ্য কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ ও পশ্চিম বংগেও কিছু কিছু শিং-এর কাজ হইয়া থাকে।

(৫) হাতীর দাঁতের কাজ—কেরালা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ, পশ্চিম বংগ, দিল্লী এবং রাজস্থানে হাতীর দাঁত হইতে সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরী করা হইয়া থাকে।

(৬) "নির্মল" কাজ—অন্ধ্র প্রদেশের আদিলাবাদ জেলার অন্তর্গত নির্মল নামক জায়গায় যে হালকা কাঠের পুতুল তৈরী হইয়া থাকে তাহা নির্মল কাজ নামে বিখ্যাত। শুধু পুতুলই নহে, এই জায়গায় কাঠের ট্রে, বালা, বাতিদানী, সিগার ও সিগারেট কেস প্রভৃতিও তৈরী হয়।

(৭) সিল্কের কাজ—পশ্চিম বংগে মুর্শিদাবাদের নরম সিল্কের কাপড়, মহীশূরের সোণালী বা রূপালী পাডযুক্ত নানাবর্ণের সিল্ক শাড়ী, কাশ্মারী পুরু সিল্কের শাড়ী, সম্বলপুরের তসর, আহমেদাবাদের মোগিয়া, আসামের মুগা ও এণ্ডি, বরোদার "পাটোলা" সিল্ক, কাথিয়াবাড়ের সিল্ক, সাটিন প্রভৃতি শুধু এদেশে নহে বিদেশেও বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে।

(৮) ধাতু শিল্প—জয়পুর, কাশ্মীর, মোরাদাবাদ ও বারানসীর খোদাই করা অথবা এনামেল করা কাঁসার পাত্র, মাদুরা ও তাঞ্জোরের তামা, কাঁসা বা ব্রোঞ্জের তৈরী বিভিন্ন মূর্তি প্রভৃতি এই দেশের উন্নত ধাতু শিল্পের নিদর্শন। এছাড়াও এদেশের বিভিন্ন জায়গায় ধাতুনির্মিত ফুলদানী, ধূপদানী, মোমবাতি-দানী, ফলদানী, পাউডার কেস প্রভৃতি তৈরী হইয়া থাকে।

এছাড়া এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁশের দ্রব্যাদি, বেতের দ্রব্যাদি, কাঠের আসবাবপত্র, ছাতা, সাবান, বিড়ি ও চুরুট, নারিকেলের দড়ির তৈরী দ্রব্যাদি, হাতে তৈরী কাগজ প্রভৃতিও কুটির শিল্পজাত পণ্য হিসাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পশ্চিম বংগের কুটির শিল্প

পশ্চিম বংগে বহুপ্রকার কুটির শিল্প আছে। বোধ হয় ভারতবর্ষের সব শিল্পেরই কিছু না কিছু পশ্চিম বংগে আছে। নিম্নে তাহাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

তাঁত শিল্প পশ্চিম বংগের বিখ্যাত কুটির শিল্প। হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর প্রভৃতি জায়গা এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

মৃৎশিল্পের দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত হইতেছে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর, কলিকাতার কুমারটুলী এবং বাঁকুড়া।

রেশম দ্রব্যাদির চাহিদা বর্তমানে কিছুটা কমিয়া গেলেও মালদহ,

মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং জেলায় এখনও বছরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড রেশমী সুতা ও আড়াই লক্ষ গজ রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার গ্রামগুলি পিতল-কাঁসার দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত। বহরমপুরের কাঁসার বাসন বিখ্যাত।

হাতে প্রস্তুত কাগজ হয় হাওড়া জেলার মইনান, হুগলী জেলার দশঘরা, মুর্শিদাবাদ জেলার মহাদেবনগর ও বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতনে।

শ্রীনিকেতন ও কলিকাতায় সুন্দর সুন্দর চামড়ার কাজ করা জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি তৈরী হয়।

বাঁশের ও বেতের চেয়ার প্রভৃতি জিনিস তৈরীর জন্য উত্তর বংগের জলপাইগুড়ি জেলা বিখ্যাত।

চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় প্রচুর পরিমাণে তাল ও খেজুরের গুড় তৈরী হইয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদে হাতীর দাঁতের কাজ বিখ্যাত।

কলিকাতার উপকণ্ঠে, হাওড়ায় এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রামে ঢালাই পিতলের অনেক রকম জিনিস তৈরী হয়।

কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচির সুনাম আছে।

চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের মাদুর শিল্পও বিখ্যাত।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Describe the growth of Iron and Steel industries in India with reference to the centres of production. Also indicate the position of India in regard to their export and import.

2. Give an account of the growth of Textile industries in India with reference to the centres of production. Also indicate the position of India, in regard to the export and import of textile goods.

3. Describe the growth of Jute industry in India with reference to the centres of production. Discuss also the problems which are being faced by the industry since the partition of India and what attempts are being made to overcome them.

4. State what are the two kinds of silk produced in India. Name the states where they are produced. Give an account of the efforts which are being made by the Government of India to improve silk production in the country.

5. State what do you know of Chemical Industries in India.

6. Write an essay on Cottage Industries in India.

7. Write an essay on the Industrial Policy Statement of the Government of India in 1948 and 1956.

B. Answer the following questions in not more than 60 words (for each sub-section of a question, where there are sub-sections) :—

1. Explain the following with examples :

(a) Industry (b) Cottage Industry (c) Heavy Industry (d) Re-rolling Industry (e) Chemicals.

2. State the circumstances which favoured the growth of Textile industries in (a) Bombay (b) West Bengal.

3. Explain the necessity of encouraging cottage industries in India.

4. Show the importance which is being attached to Heavy industries in India, by quoting figures from the three Five-Year Plans.

5. State the basic principles of the Industrial Policy of the Government of India in 1948.

C. Answer the following questions in not more than 100 words (for each sub-section of a question) :—

1. State what do you know of the following in India : (a) Rayon Industry (b) Woollen Industry (c) Motor car-making

Industry (d) Ship-building Industry (e) Aircraft Industry (f) Railway Engine and Coach-making Industry.

D. Find below the names of certain industries. Write 1, 2 and 3 respectively within the bracket in the right side of each industry as they are under Government control, Government and private control, according to the Government of India's Industrial Resolution (1956).

Names of Industries

Sugar ( ), Medicine ( ), Jute ( ), Important Minerals ( ), Machines and tools ( ), Atomic Energy ( ), Arms and Armaments ( ), Textile ( ), Iron and steel ( ), Heavy Electricals ( ), Fertiliser ( ), Chemical Pulp ( ), Carbonisation of Coal ( ), Wool ( ), Electric Power ( ), Mineral Oil ( ), Ship-building ( ).

E. 1. Collect the following in your scrap-book :— (a) Pictures of industries which appeal to you most, with a note on the production process. (b) Any statement about industrial policy. (c) Any information you get about the Export and Import of industries.

2. Mark the following on outline maps :—

(a) Distribution of Heavy industries in India (b) Distribution of Cottage industries in India.

F. The following projects may be undertaken :—

(a) Visit to an industry nearest to the school and preparing a wall-newspaper on it, on the basis of the following information—(i) Total capital involved (ii) Total labour involved (iii) Total amount produced (iv) Places of sale and consumption (v) Products imported and exported by the industry (if any) (vi) Types of jobs available in that industry (vii) Raw materials required (viii) Production process.

আমাদের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

যে কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কি বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে, কি শিল্পের উন্নয়নে, কি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বজনিত বিভেদ দূরীকরণে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। তোমরা জান, স্থানান্তরের সহিত বাণিজ্যের প্রধান বাধা দূরত্ব। আর এই দূরত্বের বাধা দূর করার প্রধান উপায়ই হইতেছে সুষ্ঠু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার। আবার, আমরা কেহই বা আমাদের দেশের কোনো অঞ্চলই আমাদের সর্ববিধ চাহিদার ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল নহি। অন্যান্য অঞ্চলে যে সব জিনিস তৈরী হইতেছে তাহা হয়তো আমাদের অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না। ফলে, ঐসব জিনিস পাইতে হইলেও আমাদের একান্ত-ভাবেই পরিবহণের উপরই নির্ভর করিতে হয়। শিল্পোন্নয়নের জন্য যেসব কাঁচা মাল প্রয়োজন তাহাও সব সময় শিল্পকেন্দ্রেই উৎপন্ন হয় না, বাহির হইতেই আমদানী করিতে হয়; সেই জন্যও পরিবহণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার একান্তই প্রয়োজন। বস্তুত, শিল্পোন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা অংগাংগী-ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আবার, আমাদের মতো বিরাট দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সমতা আনিয়া জাতীয় সংহতি গড়িয়া তোলার কাজেও পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দান অনস্বীকার্য। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সম্প্রীতি ততই গড়িয়া ওঠে যত এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসে। পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে ইহা সম্ভব নহে। শুধু তাহাই নহে। বেতার, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে বিভিন্ন অঞ্চলের দান সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হই। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য যে সকলের দানেই সমৃদ্ধ সেই বোধ জাতীয় সংহতির কাজকে সহজতর করিয়া তোলে।

পরিবহণ ও যোগা-যোগের প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপায়ে পরিবহণ কার্য

সম্পাদিত হয়। যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারেও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। নিম্নে মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ও পরিবহণের কয়েকটি প্রধান প্রধান উপায় উল্লেখ করা গেল :—

পরিবহণ ও যোগাযোগের বিভিন্ন ব্যবস্থা

১। ডাক
২। তার
৩। টেলিফোন
৪। বেতার ও রেডিও
৫। পত্র-পত্রিকা
৬। রাস্তা
৭। রেলপথ
৮। জলপথ
৯। আকাশপথ

যোগাযোগ ব্যবস্থা

এদেশে আধুনিককালে ডাক বিভাগের প্রবর্তন হয় ১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইভের আমলে ; কিন্তু সেই সময় ডাক বিভাগ শুধুই সরকারী চিঠিপত্রাদি আদান-প্রদানের কাজেই ব্যবহৃত হইত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় (১৭৭২-৮৫ খৃষ্টাব্দ) প্রথম সরকারী চিঠি ছাড়াও জনসাধারণের চিঠিপত্রাদি ডাক বিভাগ মারফৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ডাক-টিকিট বা ষ্ট্যাম্পের প্রচলন করা হয়। তারপর ডালহৌসীর আমলে ভারতীয় ডাক বিভাগ পুরাপুরি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কাজ আরম্ভ করে বলা যাইতে পারে।

ডাক ও তার বিভাগের ইতিকথা

ভারতবর্ষে প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, তদানীন্তন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়ম বি. ও. সাংগৃহ্‌নেসী। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত ২১ মাইল ব্যাপী টেলিগ্রাফের তার ছিল সেই সময় পৃথিবীতে সবচাইতে লম্বা টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সহিত আগ্রাকে টেলিগ্রাফ লাইন দ্বারা যোগ করা হয়, এবং আরও পরে আগ্রা হইতে একদিকে পেশোয়ার ও অন্যদিকে বোম্বাই পর্যন্ত ঐ টেলিগ্রাফের ব্যবস্থাকে বিস্তৃততর করা হয়। ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাও টেলিগ্রাফ লাইন দ্বারা যুক্ত হয়। বর্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ মাইল টেলিগ্রাফের তার এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

ডাক বিলির সুবিধার্থে কি শহর কি গ্রামাঞ্চলে কতকগুলি ডাক এলাকা ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রতিটি এলাকার জন্য আলাদা আলাদা ডাকঘর বসানো হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছিল ২০০০ লোক সমন্বিত প্রত্যেক গ্রামসমষ্টিকে ৪ মাইলের মধ্যে ডাকঘরের সুবিধা দেওয়া হইবে; সেই অনুযায়ী প্রায় ২০,০০০ নূতন ডাকঘর বসানো হইয়াছে। এছাড়া ন্যূনতম ৫০০ জন লোক সমন্বিত প্রত্যেকটি গ্রাম যাহাতে সপ্তাহে অন্তত একবার পিয়নের সাক্ষাৎ পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা, নাগপুর, মাদ্রাজ, দিল্লী ও বোম্বাই শহরে ভ্রাম্যমান ডাকঘরের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

ডাক বিভাগের কার্যাদি

বর্তমানে ডাক বিভাগ শুধু যে বিভিন্ন মাশুলে চিঠি বিলির ব্যবস্থাই করে তাহা নহে, বিভিন্ন জিনিসও ডাক বিভাগের মারফত অন্যত্র পাঠানো চলে। এমন কি ডাক বিভাগ মারফত অন্যত্র টাকা পাঠানো বা জিনিস পাঠাইয়া তাহার দাম সংগ্রহ করাও চলে। এতদ্ব্যতীত ডাকঘরসমূহে যে সেভিংস ব্যাংক রহিয়াছে, তাহাতে টাকা জমা রাখাও চলিতে পারে। নিচে ডাক বিভাগ বিভিন্ন কাজের জন্য যে মাশুল লইয়া থাকে তাহার বর্ণনা দেওয়া গেল। এই মাশুলের এক বিরাট অংশ সরাসরি জাতীয় সরকারী আয়ের ভাণ্ডারে জমা পড়িয়া থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালের হিসাব অনুযায়ী এই মাশুলের পরিমাণ ছিল ৩৭·৮৭ কোটি টাকা।

ডাক মাশুল

চিঠি

পোষ্টকার্ড—৬ নয়া পয়সা

খাম (ওজনে ১৫ গ্রামের কম)—১৫ নয়া পয়সা (পরবর্তী প্রতি ১৫ গ্রামের জন্য দশ নয়া পয়সা করিয়া দেয়।)

দেশের মধ্যে লেখার জন্য ইনল্যাণ্ড খাম—১০ নয়া পয়সা

পার্শেল

প্যাকেট প্রথম ৫০ গ্রাম ওজনের জন্য—৮ নয়া পয়সা

পরবর্তী প্রতি ২৫ গ্রামের জন্য ৩ নয়া পয়সা

পার্শেল প্রতি ৪০০ গ্রামের জন্য—৬০ নয়া পয়সা

রেজিস্ট্রেশন

যে কোনো চিঠি বা পার্শেলের জন্য—৫৫ নয়া পয়সা

কোনো রেজিষ্টার্ড. দ্রব্য বা চিঠি পৌঁছিল কিনা তাহার প্রাপ্তি সংবাদের জন্য—১০ নয়া পয়সা

কোনো মুল্যবান দ্রব্য রেজিষ্ট্রি করিলে তাহা দৈবাৎ হারাইয়া গেলে যাহাতে মুল্য পাওয়া যায়, সেই জন্য ইনসিওর ফিঃ প্রথম ১০০ টাকা মুল্যের জন্য—৪০ নয়া পয়সা, পরবর্তী প্রতি ১০০ টাকা মুল্যের জন্য—২০ নয়া পয়সা।

মণি অর্ডার

টাকা পাঠাইতে হইলে মণি অর্ডার ফি প্রতি দশ টাকার জন্য—১৫ নয়া পয়সা

পোষ্টাল অর্ডার—৫০ নয়া পয়সা হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত—৫ নয়া পয়সা

সাড়ে পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকা পর্যন্ত—১০ নয়া পয়সা

ভি. পি. পি.

কোনো জিনিস ডাকে পাঠাইয়া ডাক মারফৎ উহার মুল্য সংগ্রহ করিতে হইলে (V.P.P.)—

এক টাকা হইতে পনেরো টাকা মুল্য পর্যন্ত—সাধারণ ডাকমাশুল + ৫৫ নয়া পয়সা রেজিস্ট্রেশন ফি + ৫ নয়া পয়সা

১৬ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্যন্ত সাধারণ ডাকমাশুল + ৫৫ নয়া পয়সা + ১০ নয়া পয়সা

পঁচিশ টাকার উর্ধ্ব মুল্যের জন্য—সাধারণ ডাকমাশুল + ৫৫ নয়া পয়সা + ১৫ নয়া পয়সা

১৯৪৯ সাল হইতে বোম্বাই, কলিকাতা, নাগপুর, মাদ্রাজ ও দিল্লী শহরের মধ্যে সমস্ত ডাক, মণি অর্ডার প্রভৃতি দ্রুত বিলির উদ্দেশ্যে এয়ার সার্ভিস মারফত পাঠানো হইয়া থাকে। ইহার জন্য আলাদা মাশুল দিতে হয় না। অন্যত্র এই এয়ার মেইলে চিঠিপত্রাদি পাঠাইতে হইলে নিম্নলিখিত হারে আলাদা মাশুল দিতে হয় :—

প্রতি ১০ গ্রামের জন্য—৪ নয়া পয়সা

পার্শেল প্রতি ২০০ গ্রামের জন্য—৩৫ নয়া পয়সা

উপরিউক্ত সমস্ত মাশুলের হারই দেশের অভ্যন্তরে ডাক বিলির জন্য নেওয়া হইয়া থাকে। পাকিস্তান, নেপাল ও সিংহলের জন্যও একই হার প্রযোজ্য। কিন্তু অন্য কোনো দেশের বেলায় ডাক মাশুল ভিন্ন হয়।

১৯৫৩ সালে ভারতীয় তার বিভাগ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করিয়াছে। এই উপলক্ষে মহকুমা শহরগুলিতে মহকুমা তারবিভাগীয় কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে এদেশে তার অফিসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১০,৭৪৬। সাম্প্রতিক কালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার বিভাগীয় যে সব উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—

তার বিভাগের কার্যাদি

(১) ১৯৪৯ সাল হইতে দেবনাগরী হরফে লেখা যে কোনো ভারতীয় ভাষায় তার পাঠানোর ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। বর্তমানে এদেশে প্রায় ১,৪০০ তার অফিসে এই সুযোগ রহিয়াছে।

(২) ফ্ল্যাশ মেসেজ (Flash Message) নামক এক নূতন ব্যবস্থা ১৯৪৭ সাল হইতে পত্রিকার জন্য করা হইয়াছে। পত্রিকার সংবাদদাতারা এই জাতীয় তার মারফত সংবাদ প্রেরণ করিলে তাহা দ্রুত পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

(৩) দুর্ঘটনা, মৃত্যু বা গুরুতর পীড়ার সংবাদ হিউম্যান লাইফ টেলিগ্রাম (Human Life Telegram) নামক আর এক জাতীয় তার মারফত দ্রুত প্রেরণ করা চলে। এই জাতীয় তার অপর সকলজাতীয় তারের চাইতে অগ্রাধিকার পাইয়া থাকে।

(৪) বিদেশে ফটো টেলিগ্রাম পাঠাইবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

(৫) বিদেশে কোনো লোকের ঠিকানা সঠিক জানা না থাকিলেও টেলিগ্রাম-টু-ফলো (Telegram to Follow) নামক বিশেষজাতীয় টেলিগ্রাম মারফত তাহাকে সংবাদ দেওয়া চলে। এইজাতীয় তারে যাহার কাছে তার করা হয় তাহার বিভিন্ন ঠিকানা দেওয়া হইয়া থাকে, এবং এক জায়গায় না পাইলে অন্যত্র সেই তার পাঠানো হয়।

(৬) সাম্প্রতিককালে দ্রুত তার পাঠানোর জন্য টেলিফোন মারফতও তারের বিষয়বস্তু তার অফিসকে জানাইয়া দেওয়া চলে।

(৭) বিভিন্ন আনন্দোৎসবে শুভেচ্ছা বাণী স্বল্প খরচে পাঠানোর জন্য

গ্রাটিংস টেলিগ্রামের (Greetings Telegram) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদেশেও এই জাতীয় টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

নিচে বিভিন্ন জাতীয় তারের মাশুল দেওয়া গেল :—

তার মাশুল

সাধারণ তারে প্রথম দশটি শব্দের জন্য—এক টাকা

সাধারণ তারে পরবর্তী প্রতি শব্দের জন্য—১০ নয়া পয়সা

জরুরী তারে প্রথম দশটি শব্দের জন্য—দুই টাকা

জরুরী তারে পরবর্তী প্রতিটি শব্দের জন্য—২০ নয়া পয়সা

Greetings Telegram-এর ক্ষেত্রে যাহার কাছে প্রেরণ করা হইতেছে তাহার নাম ও ঠিকানা, শুভেচ্ছা বাণী ও প্রেরকের নাম লইয়া আটটি শব্দের জন্য সাধারণ তারে—৭৫ নয়া পয়সা

Greetings Telegram-এ উপরোক্ত আট শব্দের জন্য জরুরী তারে—১ টাকা ৫০ নয়া পয়সা

অতিরিক্ত প্রতিটি শব্দের জন্য সাধারণ তারে—১০ নয়া পয়সা

অতিরিক্ত প্রতিটি শব্দের জন্য জরুরী তারে—২০ নয়া পয়সা

১৯৫৮-৫৯ সালের হিসাবে জানা যায় তার বিভাগীয় মাশুল হইতে সরকারী আয়ের পরিমাণ ছিল ৮.২৬ কোটি টাকা।

টেলিফোন

বেল সাহেব (Bell) কর্তৃক ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কারের মাত্র পাঁচ বছর পরেই (১৮৮১ সালে) ভারতবর্ষে কলিকাতায় ৫০টি লাইনযুক্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। অথচ আজ এদেশে হাজার মাথাপিছু টেলিফোনের সংখ্যা মাত্র ৭টি (সেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ঐ সংখ্যা হইতেছে ৩১০টি) ডাক-তার বিভাগের মতো স্বাধীনতা পরবর্তীকালে টেলিফোন বিভাগের উন্নতির জন্যও আমাদের জাতীয় সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে সরকার টেলিফোন শিল্প নিজের হাতে গ্রহণ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় এবং পরে ঐ পরিমাণ বাড়াইয়া ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একই উদ্দেশ্যে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে টেলিফোনকে অধিকতর জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে "Own your own telephone" আন্দোলন শুরু হয়। এই

পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিকাতা ও বোম্বাই শহরে ২৫০০ টাকা এবং অন্যত্র ২০০০ টাকা অগ্রিম জমা দিয়া ২০ বছরের জন্য টেলিফোন সংযোগ লাভ করা যায়; প্রতি মাসে শুধুমাত্র ২ টাকা করিয়া maintenance charge দিতে হয়। বর্তমানে এদেশে টেলিফোনের সংখ্যা (১৯৫৮-৫৯ সালের হিসাব মতো) ৩ লক্ষ ৭৮ হাজারটি। সাধারণত, টেলিফোনের জন্য একটা মাসিক ভাড়া দিতে হয়, এবং তাহা ছাড়াও telephone call-এর সংখ্যা অনুযায়ী টাকা দিতে হয়। কোনো কোনো ছোটো শহরাঞ্চলে অবশ্য 'কল' প্রতি টাকা দিতে হয় না, মাসিক ভাড়াই শুধু দিতে হয়। স্থানীয় 'কল' ছাড়া বাহিরের কোনো এক্সচেঞ্জের অন্তর্গত কোনো টেলিফোনের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে (ইহাকে Trunk-call বলা হয়) অবশ্য আলাদা মাশুল প্রতি 'কল' হিসাবে দিতে হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের হিসাব অনুযায়ী জানা যায় ঐ বছর টেলিফোন মাশুল হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংযোগ ছাড়াও ভারতবর্ষে বেতার মারফত খবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সাধারণত টেলিগ্রাফের পাশাপাশি বেতারেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে, যাহাতে প্রথমটি কোনো কারণে বিকল হইলেও খবর আদান-প্রদানের ব্যাঘাত না ঘটে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি সমুদ্র সন্নিকটবর্তী বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ বা সমুদ্রগামী উড়োজাহাজের সহিত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার কাজেও বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাছাড়া বড়ো বড়ো শহরে পুলিশও বেতার মারফতই খবর আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

বেতার

ভারতবর্ষে রেডিও ব্রডকাষ্টিংএর কাজ প্রথম শুরু করে ১৯২৭ সালে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। তাহারা কলিকাতা ও বোম্বাইতে রেডিও ষ্টেশন বসায়। কিন্তু ১৯৩০ সালে ঐ কোম্পানী বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, ইহার কিছুদিন পরে ১৯৩২ সালে তৎকালীন ভারত সরকার অনিচ্ছাকৃত ভাবেই ঐ দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলিয়া লন। ১৯৩৬ সালে রেডিও সংক্রান্ত সরকারী দপ্তরটির নামকরণ হয় অল ইণ্ডিয়া রেডিও। বর্তমানে এই দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে কেন্দ্রীয় ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং মিনিষ্ট্রির তত্ত্বাবধানে

রেডিও

অল ইণ্ডিয়া রেডিওই পালন করিয়া থাকে। ইহার অপর নামকরণ হইয়াছে আকাশবাণী।

ভারতীয় বেতারের উন্নতিকল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ হয় ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ হয় ৯ কোটি টাকা। বর্তমানে এদেশে ২৯টি বেতার কেন্দ্র রহিয়াছে। ঐ সব কেন্দ্রে প্রেরণযন্ত্রের (transmitters) সংখ্যা প্রায় ৫৭টি, ১৯৫৮ সালের হিসাবে প্রকাশ, সেই সময়ই এদেশে রেডিও সেটের সংখ্যা ছিল ১২,৯১,৮১২টি; তাছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন কেন্দ্র, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে রেডিওর সংখ্যা ছিল ১,০৯,৬২৫টি।

রেডিও ও জাতীয় সংস্কৃতি

আগেই বলা হইয়াছে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রচারে ও সংরক্ষণে এবং জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে রেডিওর দান অনেকখানি। নিচে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যে সকল বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান বেতারস্থ হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা গেল; উহা হইতেই উপরোল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য বোঝা যাইবে :—

(১) সংগীত—এই জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহে বিখ্যাত শিল্পীদের কণ্ঠে জাতীয় মার্গ সংগীত প্রচারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এ ছাড়াও লঘু সংগীত, বিভিন্ন আঞ্চলিক লোক সংগীত, পাশ্চাত্য সংগীত, বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানের ধারা বিবরণী প্রভৃতিও প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বিশিষ্ট শিল্পীদের লইয়া এক জলসারও ব্যবস্থা করা হয়।

(২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে বক্তৃতা।

(৩) বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা। তাছাড়া প্রতিবৎসর জাতীয় কবি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(৪) জাতীয় অগ্রগতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত বিচিত্রাসমূহ।

(৫) পল্লী অঞ্চলের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান।

(৬) বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান।

(৭) শিল্পাঞ্চলের কর্মীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান।

(৮) শিশু ও মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান।

(৯) গৌহাটি, রাঁচি, ভূপাল ও বেজওয়াদা হইতে প্রচারিত উপজাতীয়দের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান।

(১০) সংবাদ প্রচার ও সংবাদ পরিক্রমা—বর্তমানে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় দৈনিক ৪৬টি দেশীয় সংবাদ প্রচারিত হয়; এতদ্ব্যতীত, বিদেশের জন্য প্রচারিত সংবাদের সংখ্যা দৈনিক ৩০টি।

(১১) বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারিত নাটকের অনুষ্ঠান।

টেলিভিশন

আকাশবাণীর অধীনেই ১৯৫৯ সাল হইতে দিল্লীতে টেলিভিশন কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ ১২ মাইল ব্যাপী এলাকায় এই টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখা যায়। দিল্লীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে টেলিভিশনের মারফত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

পত্র-পত্রিকা

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে, আর শুধু এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলই বা বলি কেন, এদেশের সহিত বিদেশেরও সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক খবরা-খবর আদান-প্রদানের ও যোগাযোগ রক্ষার আরেকটি অন্যতম বাহন পত্র-পত্রিকা। এইসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে কোনোটি দৈনিক, কোনোটি সাপ্তাহিক, কোনোটি পাক্ষিক, কোনোটি মাসিক ইত্যাদি ভিত্তিতে বাহির হয়। ইহারা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতালাভের পরে এদেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৭ সালে এদেশের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা যেখানে ছিল ৫৯৩২, ১৯৫৮ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৯১৮; আর ১৯৫৯ সালে সেই সংখ্যা আরও বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৭,৬৫১টি। ইহার মধ্যে ৫টির দৈনিক প্রচারসংখ্যা লক্ষাধিক। এ ছাড়া ৯টি ইংরেজী, ২টি হিন্দী, ২টি তামিল, ২টি বাংলা, ২টি মালয়ালম এবং ১টি মারাঠী দৈনিক পত্রিকার দৈনিক প্রচারসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশী। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকা নিয়মিত পড়িয়া থাক।

পরিবহণ ব্যবস্থা

রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশের মতো বিরাট ভূখণ্ডে রাস্তাঘাটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রেলপথাদি অন্য বিকল্প ব্যবস্থা না থাকিলেও রাস্তাঘাট থাকিলে মোটর ও লরী তাহার উপর দিয়া যাত্রী ও মাল বহন করিতে পারে। বস্তুত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায়ই রেলপথ নাই; সেখানে রাস্তাযোগেই পরিবহণ কার্য চলিয়া থাকে। রাস্তার উপর দিয়া পশুপৃষ্ঠে বা পশুচালিত গাড়ীতে

অথবা মোটরযোগে পরিবহণ কার্য সম্পাদিত হয়। রাস্তা না থাকিলে এইসব গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্য দ্রব্যের আদান-প্রদান অসম্ভব হইয়া পড়িত, মানুষের জীবনযাত্রা কষ্টকর হইত। শুধু তাই নহে। দেশের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্যও বিস্তৃত রাস্তাঘাটের প্রয়োজন। আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে রাস্তাঘাট না থাকিলে ফসল গৃহে বা বাজারে লইয়া যাওয়া সহজসাধ্য নহে। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে যে শিল্পোন্নয়ন হইতেছে. সেই জন্যও রাস্তাঘাট দরকার। কারণ তাহা না হইলে শিল্পের উৎপাদনস্থান ও বিক্রয়স্থানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভবপর নহে। সর্বোপরি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যও রাস্তাঘাট দরকার; কারণ তাহা না হইলে দ্রুত সৈন্য চলাচল সম্ভবপর নহে।

এদেশের রাস্তাঘাটের

বর্তমান ভারতের রাস্তাঘাট প্রকৃতপক্ষে পাঠান ও মোগল সম্রাটদের তৈরী রাস্তাঘাটের পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র। লর্ড বেন্টিংকের আমলেই এদেশের রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি পড়ে। কিছু পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার রাস্তাঘাটের দায়িত্ব প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের হাতেই ছাড়িয়া দেয়। আর প্রাদেশিক সরকারও জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের হাতে উহার ভার ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ফলে, এদেশের রাস্তাঘাটের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। আমাদের কি বাণিজ্যিক, কি অর্থনৈতিক, কি কৃষিসংক্রান্ত অনগ্রসরতার জন্য এই রাস্তাঘাটের অব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্য বাহিনীর যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাটের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইলে তৎকালীন ভারত সরকার রাস্তাঘাট উন্নয়নে নজর দেন। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে মোটর চলাচল বহুগুণ বাড়িয়া যায়, কিন্তু নূতন রাস্তাঘাট তেমন বেশী নির্মাণ হয় না। ফলে, সেই সময় এদেশে যেসব রাস্থাঘাট বর্তমান ছিল তাহাও খারাপ হওয়া শুরু করে। অবশেষে ১৯২৭ সালে ডাঃ এম. আর. জয়াকরের নেতৃত্বে এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯২৮ সালে জয়াকর কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন সেই অনুযায়ী প্রতি গ্যালন পেট্রোলের উপর দুই আনা ট্যাক্স বসাইয়া সেই টাকায় একটি কেন্দ্রীয় রাস্তা তহবিল খোলা হয়, এবং সেই তহবিল হইতে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে রাস্তার জন্য অর্থ-

সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে নাগপুরে ১৯৪৩ সালে এক পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় স্থির হয় কৃষি অঞ্চলে ৫ মাইলের মধ্যে এবং অন্যান্য অঞ্চলে ২০ মাইলের মধ্যে সদর বড়ো রাস্তা তৈরী করিতে হইবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবশ্য এদেশের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জোর প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে এদেশে

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এদেশের রাস্তাঘাট

প্রায় ৯৭,০০০ মাইল বাঁধানো ও প্রায় ১,৪৭,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে প্রায় ১০,০০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ২০,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং প্রায় ১০,০০০ মাইল পুরানো রাস্তার সংস্কার সাধন করা হয়। এর জন্য কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিলের সাহায্য সহ প্রায় ১৫৫ কোটি টাকার মতো খরচ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রাস্তাখাতে ২৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে আরও ২৫ কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা হয়। এইভাবেই নাগপুর পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নাগপুর সম্মেলনে এদেশের রাস্তাঘাটকে মোটামুটি চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) জাতীয় রাজপথ, (২) প্রাদেশিক রাজপথ, (৩) জেলার

জাতীয় রাজপথ

রাস্তা, এবং (৪) গ্রাম্য রাস্তা। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সরকার জাতীয় রাজপথগুলির দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। বর্তমানে ১৪টি জাতীয় রাজপথ রহিয়াছে—(১) কলিকাতা হইতে অমৃতসর পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড, (২) আগ্রা হইতে বোম্বাই, (৩) বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ, (৪) মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা, (৫) কলিকাতা হইতে বোম্বাই (নাগপুর হইয়া), (৬) কাশী হইতে কেপ কমোরিন, (৭) দিল্লী হইতে বোম্বাই (আহমেদাবাদ হইয়া), (৮) আহমেদাবাদ হইতে কান্দলা বন্দর, (৯) আম্বালা হইতে তিব্বত সীমানা (সিমলা হইয়া), (১০) দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ, (১১) লক্ষ্ণৌ হইতে বিহারস্থ বারৌনী, (১২) আসাম এ্যাকসেস (access) রোড, (১৩) আসাম ট্রাংক রোড, এবং (১৪) জম্মু-

শ্রীনগর-উরি জাতীয় রাজপথ। এই কয়টি রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩,৯২৪ মাইল।

এদেশে বর্তমানে যে সকল রাস্তা রহিয়াছে তাহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৫৭,৫৭৬ মাইল। উল্লেখযোগ্য যে, নাগপুর পরিকল্পনার লক্ষ্য

ছিল ৩,৩১,০০০ মাইল রাস্তা)। ইহার মধ্যে অবশ্য ২,২৩,৯৬৬ মাইল রাস্তা এখনও কাঁচা। এদেশের প্রায় সর্বত্রই গ্রামাঞ্চলে কাঁচা ও পাকা, উভয় রাস্তায়ই গোরুর বা মহিষের গাড়ী চলে। কোনো কোনো গ্রাম অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলেও ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন রহিয়াছে; আবার কোথাও কোথাও উটের গাড়ীরও প্রচলন আছে। পাকা রাস্তার উপর দিয়া পরিবহণের কাজ চালায় মোটর গাড়ী, বাস ও মোটর লরী। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে আর একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিবহণের উপায় হইতেছে সাইকেল। শহরাঞ্চলে কোথাও কোথাও মনুষ্যচালিত বা সাইকেলচালিত বা মোটরসংযুক্ত রিক্সাও পরিবহণের কাজ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শহরাঞ্চলে স্কুটার এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতায় ট্রামগাড়ী পরিবহণের অন্যতম উপায় হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

রাস্তায় পরিবহণ ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রধান প্রধান শহরগুলিকে সংযুক্ত করিয়া প্রায় ৩৫,০৮১ মাইল দীর্ঘ রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাতে ভারত এশিয়াতে প্রথম এবং পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। শুধু তাহাই নহে; রেল ভারতবর্ষের সব চাইতে বৃহৎ জাতীয় ব্যবসা। কেন্দ্রীয় সরকার রেলপথের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বেসরকারী হস্তে যে ৪৫৩ মাইল রেলপথ রহিয়াছে, তাহাও সরকারী নিয়ম-কানুন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এদেশে দৈনিক গড়ে প্রায় ৭৫০০টি যাত্রী এবং মালবাহী গাড়ী বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করে। যাত্রীবাহী গাড়ীগুলি গড়ে প্রায় ৪০ লক্ষ যাত্রী বা মালবাহী গাড়ীগুলি গড়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন মাল দৈনিক বহন করে।

রেলপথ

ভারতে বর্তমানে তিন প্রকার বিস্তারের রেলপথ রহিয়াছে—(১) বড় মাপের (Broad Gauge—সাড়ে পাঁচ ফুট), (২) মধ্যম মাপের (Metre Gauge—তিন ফুট ৩৪ ইঞ্চি) এবং (৩) ছোটো মাপের (Narrow Gauge—আড়াই ফুট বা দুই ফুট)। ছোটো মাপের রেল লাইন দিয়া অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপের ইঞ্জিন এবং গাড়ী চলাচল করিতে পারে। এই সব রেল লাইনের ইঞ্জিন খুব দ্রুত চলিতে পারে না। যেসব স্থানে রেল

রেলপথের বিভিন্ন মাপ

লাইন উঁচু পাহাড়ের উপর উঠিয়াছে (যেমন শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং) সে সব স্থানের লাইনও ছোটো মাপের। বেসরকারী সমস্ত রেলপথই ছোটো মাপের এবং তাহারা আঞ্চলিক যোগাযোগ (Local Communication) সাধন করে মাত্র। প্রধানত বড়ো মাপের বা মধ্যম মাপের রেলপথগুলিই দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করিতেছে। তাহারা সবই সরকারী কর্তৃত্বাধীন। তবে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে প্রায় সবই বড়ো মাপের রেলপথ। সেখানে মধ্যম মাপের রেলপথ নাই ; সেখানে রেলগাড়ীর গতিও দ্রুততর। কিন্তু উত্তর ও মধ্য ভারতের রেলপথে বড়ো মাপের রেলপথ বেশী হইলেও মধ্যম মাপের রেলপথও রহিয়াছে। দক্ষিণ, পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব ভারতে আবার মধ্যম মাপের রেলপথই বেশী, বড়ো মাপের রেলপথ সেখানে কম। ফলে, ঐসব অঞ্চলের গাড়ীর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম।

ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার প্রথমদিকে কোনো পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় নাই। ফলে, স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে বিভিন্ন আঞ্চলিক রেলপথসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। ১৯৪৭ সালের পর এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার যে কমিটি বসান তাহাদের মতামত অনুসারে ১৯৫১ সালে এদেশের রেলপথগুলিকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়—(১) উত্তর রেলপথ, (২) পশ্চিম রেলপথ, (৩) মধ্য রেলপথ, (৪) দক্ষিণ রেলপথ, (৫) পূর্ব রেলপথ, এবং (৬) উত্তর-পূর্ব রেলপথ। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে পূর্ব রেলপথকে ভাংগিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, এবং ১৯৫৮ সালে উত্তর-পূর্ব রেলপথকে ভাংগিয়া উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ করা হইয়াছে। বর্তমানে তাই এদেশের রেলপথগুলি ৮টি স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চলে বিভক্ত।

রেলপথ অঞ্চল (Railway Zones)

ইহাদের মধ্যে (১) **উত্তর রেলপথ** অঞ্চল পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে বিস্তৃত। পূর্ব রেলপথের সহিত ইহার সংযোগস্থল মোগলসরাই। ইহা প্রায় ৬৩৩৮·৬৩ মাইল বিস্তৃত এবং ইহার সদর দপ্তর দিল্লী। (২) **পশ্চিম রেলপথ** অঞ্চল উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাট রাজ্যে বিস্তৃত। ইহা আগ্রাতে ও এলাহাবাদে উত্তর রেলপথের সহিত এবং ভুপালে মধ্য রেলপথের সহিত যুক্ত। আমেদাবাদের উৎপন্ন বস্ত্রাদি এবং রাজস্থানের খনিজ দ্রব্যাদি এই পথেই চালান করা হয়। ইহা প্রায়

৬০১২'৯৩ মাইল বিস্তৃত, এবং ইহার সদর দপ্তর বোম্বাই। (৩) **মধ্য রেলপথ** অঞ্চলের সদর অফিসও বোম্বাই। ইহা উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ্র প্রদেশের উপর দিয়া প্রায় ৫২৯৫'৯২ মাইল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের চামড়া, তৈলবীজ, কার্পাস, কার্পাস শিল্পজাত দ্রব্য ও চুন প্রভৃতি এইপথেই রপ্তানী হয়। (৪) **দক্ষিণ রেলপথ** অঞ্চল মহারাষ্ট্র মহীশূর, কেরালা, অন্ধ্র ও মাদ্রাজের উপর দিয়া প্রায় ৬১০০'০৪ মাইল বিস্তৃত। ইহার সদর দপ্তর মাদ্রাজে অবস্থিত। মহীশূরের লৌহ-শিল্প, বিমান-শিল্প, তাঁত-শিল্প এবং মাদ্রাজের তাঁত-শিল্প ও অভ্র অঞ্চল এই রেলপথের উপরই নির্ভরশীল। (৫) **পূর্ব রেলপথ** অঞ্চল পশ্চিম বংগ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রায় ২৩২৪'৬৮ মাইল বিস্তৃত। ইহার সদর দপ্তর কলিকাতা। চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন-শিল্প, আসানসোলের লৌহ, এলুমিনিয়ম, সাইকেল-শিল্প, বার্ণপুরের লৌহ-শিল্প, সিন্ত্রির সার-শিল্প প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া বিহার ও পশ্চিম বংগে পাট, ধান, চাল, জুতা, চর্মদ্রব্য, কাঁচ, কাগজ, চিনি, বস্ত্রাদি এই রেলপথের সাহায্যেই রপ্তানী হয়। (৬) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** অঞ্চল পশ্চিম বংগ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের উপর দিয়া বিস্তৃত। উড়িষ্যার নূতন তাপসহ ইট প্রস্তুত করার কারখানা, রৌড়কেল্লায় লৌহ কারখানা, ভিলাইর লৌহ কারখানা প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। তাছাড়া, এই অঞ্চলের লোহা, অভ্র, কয়লা, সিমেণ্ট প্রভৃতিও এই পথেই রপ্তানী হয়। ইহা প্রায় ৩৪২৩'৫৬ মাইল বিস্তৃত। ইহারও সদর দপ্তর কলিকাতা। (৭) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ** অঞ্চলের সদর দপ্তর গোরক্ষপুর এবং ইহা বিহার ও উত্তর প্রদেশের প্রায় ৩০৬০'৩০ মাইল জায়গা জুড়িয়া বিস্তৃত। এই অঞ্চলের চিনি, পাট ও চাল প্রধান ব্যবসায় দ্রব্য। (৮) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত** অঞ্চল বিহার, পশ্চিম বংগ ও আসামের প্রায় ১৭৩৮ মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। আসাম ও পশ্চিম বংগের চা এই পথে রপ্তানী হয়। তাছাড়া উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্ত প্রতিরক্ষার কাজে ইহার গুরুত্ব অনেকখানি। ইহার সদর দপ্তর পাণ্ডু।

বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে এদেশে যেসব রেলপথ রহিয়াছে তাহারা হইতেছে (১) আহমদপুর হইতে কাটোয়া, (২) আরা হইতে সাসারাম,
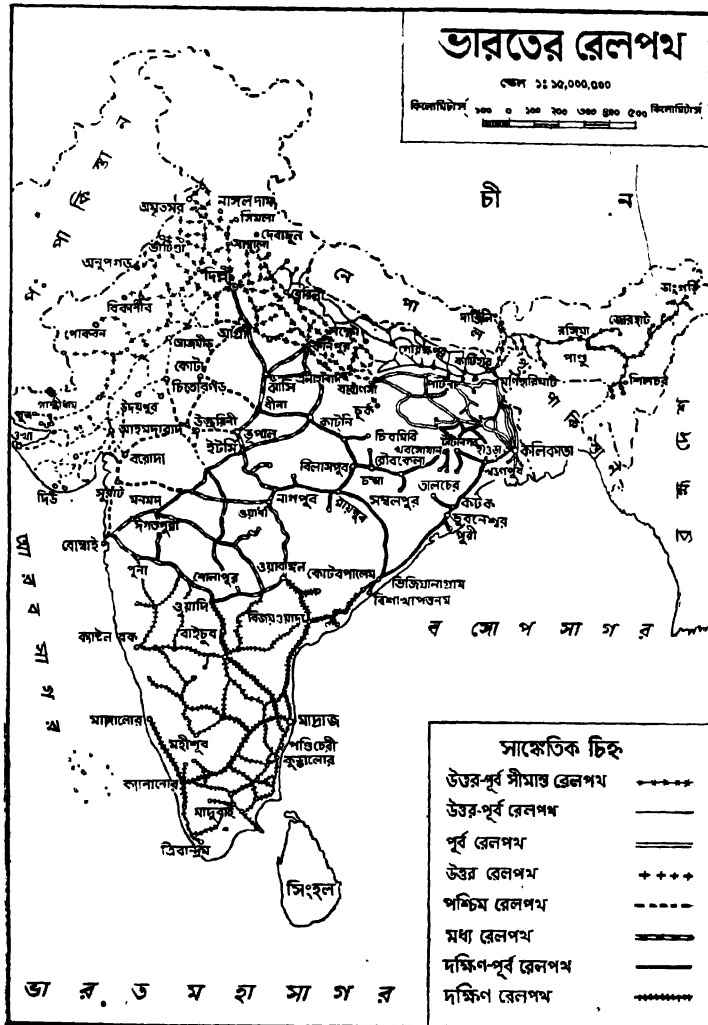
বেসরকারী রেলপথ

(৩) বাঁকুড়া হইতে রায়নগর, (৪) বক্তিয়ারপুর—বিহার, (৫) বর্ধমান হইতে কাটোয়া, (৬) দেহরী হইতে রোটাস, (৭) ফতোয়া হইতে ইসলামপুর, (৮) হাওড়া হইতে আমতা,

(৯) হাওড়া হইতে শিয়াখালা ও (১০) সাহদারা হইতে সাহারাণপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথ। এইসব রেলপথ যে সবই ছোটো মাপের তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রেলপথে সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার্থেও বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান গাড়ীতে দূরগামী যাত্রীদের তৃতীয় শ্রেণীর জন্য স্বল্পব্যয়ে বসিবার বা ঘুমাইবার আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা, গাড়ীতে খাওয়ার সুবিধা, প্রথম শ্রেণীর কোনো কোনো গাড়ীতে পুরাপুরি এয়ারকণ্ডিশনের ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা এবং দূরগামী গাড়ীগুলির মধ্যে "জনতা" গাড়ীর (শুধু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী লইয়া) প্রচলন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও দ্রুত পরিবহণের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিম বংগে হাওড়া হইতে বর্ধমান পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল শুরু হইয়া গিয়াছে। শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট পর্যন্ত বৈদ্যুতীকরণের কাজ চলিয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ১৩২৮·৮৭ মাইল রেলপথে বৈদ্যুতীকরণ করার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। মধ্য রেলপথে ১৮৪·৮৫ মাইল, দক্ষিণ রেলপথে ১৮·১৪ মাইল, পশ্চিম রেলপথে ৩৭·২৫ মাইল এবং পূর্ব রেলপথে (প্রায় ১২৯৩ মাইল) ডিজেলের সাহায্যেও ইঞ্জিন চালনা করা হইতেছে।

স্বাধীনতালাভের পর রেলপথে যাতায়াতের উন্নতি

রেলপথের পাশাপাশি জলপথেও পরিবহণের কাজ চলিয়া থাকে। বস্তুত, আমাদের ন্যায় নদীমাতৃক দেশে পরিবহণ কার্যে জলপথ যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাছাড়া জলপথে পরিবহণ অল্প ব্যয়-সাধ্য এবং সুবিধাজনকও বটে; কারণ পণ্যদ্রব্য জলযানে ভালোভাবে বহন করা যায়, বিশেষ নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন হয় না। সেইজন্যই রেলগাড়ী দ্রুতগামী হইলেও অনেক সময়ই ব্যবসায়ীরা জলপথই বেশী পছন্দ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানাকারণে ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথের তেমন প্রসার হয় নাই।

জলপথ

অবশ্য, বহু নদী থাকিলেও উত্তর ভারতে প্রধানত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র,

ও সিন্ধুতেই সারাবৎসর জল থাকে বলিয়া উহাদের সর্বপ্রধান বাণিজ্য-বাহী নদী বলা যায়। বর্তমানে কলিকাতা হইতে ব্রহ্মপুত্র-পথে ডিব্রুগড় পর্যন্ত, এবং কলিকাতা হইতে গঙ্গা-পথে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত যথাক্রমে ১১৭৫ মাইল ও ৯২০ মাইল জলপথই ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ আভ্যন্তরীণ জলপথ। এদেশের বর্তমান নাব্য জলপথ প্রায় ৫০০০ মাইল দীর্ঘ। ইহার মধ্যে প্রায়

ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথ

১৭৬০ মাইল পথে স্টীমার বা জাহাজ চলে, অন্যত্র পরিবহণের কাজ চলে প্রধানত দেশীয় নৌকায় বা ষ্টীম লঞ্চে। দক্ষিণ ভারতে খালপথই জলপথ। এ অঞ্চলে নদীগুলিতে শুধুমাত্র বর্ষায় জল থাকে বলিয়া নৌচালনার বিশেষ উপযোগী নহে। ফলে মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের গোদাবরী খাল, ভাম্মাগুডান খাল, কৃষ্ণা খাল, বাকিংহাম খাল, কুর্নুল খাল, মহানদী খাল প্রভৃতিই প্রধান জলপথ। উত্তর ভারতেও অবশ্য প্রচুর খালপথ রহিয়াছে। দেশীয় নৌকাই এই পথের প্রধান বাহন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সীমানার মধ্যে জলপথে যেটুকু পড়ে, সেই রাজ্যই সেই জলপথটুকুর যাতায়াতের বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকে। ফলে, খুবই অসুবিধা হয়। অবশ্য যে নদীগুলি জাতীয় জলপথ বলিয়া

বিজ্ঞাপিত হইবে, তাহার বিধিব্যবস্থার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত হইবার কথা আছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো নদীই জাতীয় জলপথ হিসাবে ঘোষিত হয় নাই। তবে ১৯৫২ সালে উত্তর ভারতের জন্য Ganga-Brahmaputra Water Transport Board নামক একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বংগ ও আসাম সরকারের মধ্যে স্বীকৃতির ভিত্তিতে এই বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ড গংগা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই বহিঃস্থ জলপথকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা চলে—(১) উপকূলপথ (২) সমুদ্রপথ। ভারতবর্ষের উপকূল প্রায় ৩৫০০ মাইল দীর্ঘ হইলেও অভগ্ন বলিয়া তথায় বন্দর অত্যন্ত কম।

বহিঃস্থ জলপথ

বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই চারিটি মাত্র বড় বন্দর। সম্প্রতি কলিকাতার সন্নিকটে হল্‌দিয়ায় আরেকটি বন্দর গড়িয়া উঠিতেছে। এই উপকূলে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে বা এই উপকূল বন্দর হইতে ব্রহ্মদেশ, সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি, সিংহল, আফ্রিকা, পাকিস্তান বা মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে যেপথে বাণিজ্য চলে, তাহাই উপকূলপথ বলিয়া স্বীকৃত। এই পথে উপকূল বাণিজ্য চলে, হয় বড়ো বড়ো দেশী নৌকায় নয়তো বাষ্পীয় পোতে। পূর্বে উপকূলপথের বাণিজ্যে বিদেশী বাষ্পীয় পোতের একচেটিয়া কারবার থাকিলেও ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে সরকারী নির্দেশে ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজ ছাড়া অন্য কোনো জাহাজ এই উপকূলপথে বাণিজ্য করিতে পারিতেছে না।

বর্তমানে এই কাজে নিযুক্ত ভারতীয় জাহাজের মালবহন ক্ষমতা প্রায় ২·৭৪ লক্ষ টন (gross ton)। সমুদ্রপথে বাণিজ্যে ভারত প্রথম অংশ গ্রহণ করে ১৯৪৭ সালে। ১৯৫৭ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতীয় পাঁচটি জাহাজ কোম্পানীর ৪৩ খানি জাহাজ সমুদ্রপথে মোট প্রায় ২৮৯,২৭৩ টন মাল বহন করিয়া থাকে। ভারত সরকার সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য ভারতীয় জাহাজের প্রসারের প্রচুর চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬০ কোটি টাকা (জাহাজ চলাচলের জন্য ২৬ কোটি আর

বন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৪ কোটি টাকা), এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯৩ কোটি টাকা (৪৮ কোটি + ৪৫ কোটি) বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বর্তমানে নিম্নলিখিত পথে ভারতের বাণিজ্যপোত নিয়মিতভাবে যাতায়াত করিতেছে—

(ক) ভারত—যুক্তরাজ্য—য়ুরোপ

(খ) ভারত—জাপান

(গ) ভারত—সিংগাপুর

(ঘ) ভারত—পূর্ব আফ্রিকা

(ঙ) ভারত—কৃষ্ণ-সমুদ্র।

ভারতের সমুদ্রপথ
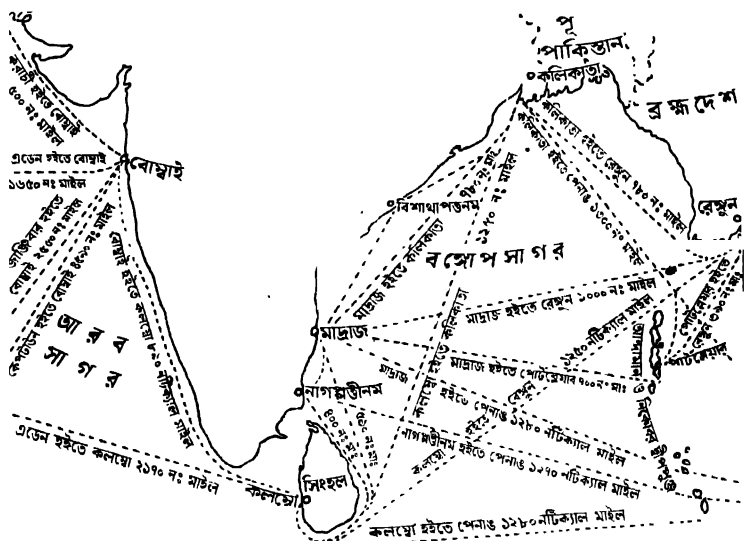
স্থলপথ ও জলপথের ন্যায় সাম্প্রতিককালে আকাশপথেও পরিবহণের ব্যাপারে ভারতবর্ষ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এদেশে মাত্র দুইটি বেসরকারী কোম্পানী কয়েকটি ছোটো ছোটো এরোপ্লেন চালাইত। তখন কোনো বিমান বন্দরও (airport) ছিল না। ১৯২৭ সালে এদেশে প্রথম বেসরকারী বিমান দপ্তর (Civil Aviation Department) স্থাপিত হয় এবং ১৯২৯ সাল হইতে ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সাপ্তাহিক বিমান চলাচল শুরু হয়। ১৯৩১ সালে কলিকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লী ও করাচীতে বিমান বন্দর স্থাপিত হইলে এদেশের অভ্যন্তরে নিয়মিত বিমান চলাচল শুরু হয়।

আকাশপথ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য বহু বিমান বন্দর গড়িয়া ওঠে এবং যুদ্ধান্তে যুদ্ধের উদ্বৃত্ত বিমানপোতসমূহ ক্রয় করিয়া বহু প্রতিষ্ঠান পরিবহণ ব্যবসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ইহাদের আর্থিক ব্যবস্থা বিশেষ ভালো ছিল

না। স্বাধীনতার পর তাই ভারত সরকার Air Corporation Act, 1953 নামে এক আইন পাশ করিয়া বিমান-পরিবহণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লন।

বর্তমানে আভ্যন্তরীণ বিমান-পরিবহণ কার্য চালাইবার জন্য The Indian Airlines Corporation এবং আন্তর্জাতিক আকাশপথে বিমান যান চালানোর কার্যের জন্য The Air India International Corporation নামে দুইটি সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রথমটির পরিচালনায় বর্তমানে পূর্বাঞ্চলে মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম, ভুবনেশ্বর, কলিকাতা, গৌহাটি, আগরতলা, ইম্ফল প্রভৃতি স্থানে; পশ্চিমাঞ্চলে ত্রিবান্দ্রম, কোচিন, ম্যাংগালোর, বোম্বাই, জামনগর প্রভৃতি স্থানে; এবং মধ্য অঞ্চলে বোম্বাই, বাংগালোর, মাদ্রাজ, কলিকাতা, বানারসী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুরে; ও উত্তরাঞ্চলে শ্রীনগরের মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচল করিতেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহল, পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও নেপালও আকাশপথে ভারতের সহিত যুক্ত। আন্তর্জাতিক আকাশপথেও ভারতীয় বিমান নিয়মিতভাবে দ্বিতীয়টির অধীনে চলাচল করিয়া থাকে। প্রত্যহ কলিকাতা হইতে দিল্লী—বোম্বাই—কায়রো—দামস্কাস—বেইরুট—রোম—জেনেভা—জুরিখ—প্রাগ—প্যারিস—ডুসেলডর্ফ—লণ্ডন বিমান চলাচল হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ—সিংগাপুর—ডারউইন এবং কলিকাতা হইতে ব্যাংকক—হংকং—টোকিও বিমান চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আফ্রিকাগামী বিমান বোম্বাই হইতে এডেন হইয়া সপ্তাহে দুইবার নাইরোবি যায়।

স্বাধীন ভারতে আকাশপথে পরিবহণ ব্যবস্থা

উপরিউক্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান দুইটি ছাড়াও আটটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (Non-Scheduled Airline Operators) আভ্যন্তরীণ পরিবহণের কাজ চালাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছে। ভারতের উপর দিয়া যেসব বৈদেশিক কোম্পানীর বিমান পথ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে প্যান এ্যামেরিকান এয়ারওয়েজ, বৃটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন, ট্রান্স-ওয়ার্লড এয়ারলাইনস, রয়েল ডাচ এয়ারলাইনস, কোয়ান্টাস এম্পায়ার এয়ারওয়েজ এবং এয়ার ফ্রান্স।

১৯৫৬ সালের হিসাবে এদেশে মোট ৮৩টি বিমানবন্দর আছে ; তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসাবে গণ্য তিনটি—কলিকাতা (দমদম), বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), এবং দিল্লী (পালাম)।

দেশ-বিদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা

উপরের আলোচনা হইতে দেখিয়াছ ভারতবর্ষে প্রধানত স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে পরিবহণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবার স্থলপথে শহরাঞ্চলে যেমন মোটর, স্কুটার, ট্রাম, রেলগাড়ী, সাইকেল প্রভৃতির প্রাধান্য,

ইয়াক

গ্রামাঞ্চলে তেমনি সাইকেল বা পশুবাহিত গাড়ীই বেশী প্রচলিত। অবশ্য সেখানে অন্যান্য ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা যে একেবারেই নাই তাহা নহে ; তবে তাহা একেবারেই নগণ্য। তেমনি, জলপথে উপকূল পথে বা সমুদ্রপথে বা সমুদ্র সন্নিকটবর্তী নদীপথে, বাষ্পীয় পোতই প্রধান পরিবহণের কার্যাদি চালাইয়া থাকে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে দেশী নৌকা, ভেলা প্রভৃতিই পরিবহণের প্রধান উপায়।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উপরিউক্ত পরিবহণ ব্যবস্থাগুলির কোনো-না-কোনোটির যদিও সাক্ষাৎ মেলে, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, যথা, পার্বত্য অঞ্চলে বা মরুভূমি অঞ্চলে বা তুন্দ্রা অঞ্চলে স্থলপথে বা জলপথে এই সব পরিবহণ ব্যবস্থা অচল। নিচে এই সব অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য প্রধানত পশুশক্তির উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয়। সেখানে অন্য কোনো পরিবহণ ব্যবস্থাই কার্যকরী নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিব্বতে যাবতীয় পরিবহণ কার্যের জন্য নিযুক্ত হয় ইয়াক নামক ভারবাহী পশু। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও বলিভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে লামা নামক জীব পরিবহণের কার্য সম্পাদন করে। বোঝা লইয়া পর্বতের উপর দিয়া, বিশেষত পর্বতের ঢালু স্থানের উপর দিয়া, চলিতে তাহার মতো অন্য জন্তু বিরল। অবশ্য কোনো কোনো পার্বত্য অঞ্চলে শক্তিশালী পার্বত্য

পার্বত্য অঞ্চলে

ডুলি কাঁধে মানুষ

অধিবাসীরাও পরিবহণের কার্য করিয়া থাকে। যেমন কেদার-বদরীর পথে পিঠে ডুলি বাঁধিয়া তাহাতে যাত্রী বসাইয়া বহু লোক জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। জাপানের পথে মনুষ্যবাহী রিক্সাই একমাত্র পরিবহণের মাধ্যম।

মরুভূমির বুকেও পশুই একমাত্র পরিবহণের কাজ করিয়া থাকে। তবে

সেখানে মানুষের প্রধান অবলম্বন হইতেছে উট। কারণ উট বহুদিন পর্যন্ত জল ছাড়া বাঁচিতে পারে এবং মরুভূমির কাঁটাগাছ প্রভৃতি খাইয়া থাকিতে পারে। ইহার উপরের চোখের পাতা পুরু হওয়ায় সূর্যের প্রখর আলোতেও ইহার বিশেষ কষ্ট হয় না। তাছাড়া, মরুভূমিতে বালুর ঝড় উঠিবার পূর্বেই উট বুঝিতে পারে এবং ঝড়ের সময় নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া উহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। মরুভূমির প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ঘোড়া এবং গাধাও কিছু কিছু পরিবহণের কাজ করিয়া থাকে।

মরুভূমি অঞ্চলে

শ্লেজ

তুন্দ্রা অঞ্চলের পরিবহণের কাজে বল্গা হরিণ ও কুকুর অপরিহার্য। এখানকার পরিবহণ ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন শ্লেজগাড়ী উহারাই টানিয়া লইয়া যায়। বরফের উপর দিয়া চাকার গাড়ী চলা সম্ভব নহে, কারণ বরফের বুকে চাকা বসিয়া যায়। তাই এই সব শ্লেজগাড়ীতে কোনো চাকা থাকে না। ইহারা দেখিতে অনেকটা তলা-চ্যাপ্টা নৌকার মতো। প্রধানত কাঠের ফ্রেমের উপর সীল

তুন্দ্রা অঞ্চলে

মাছের চামড়া লাগাইয়া ইহাদের তৈরী করা হয়। পুরুষরা যে শ্লেজগাড়ী ব্যবহার করে তাহাকে বলা হয় কায়াক (Kayaks), আর মেয়েরা যে শ্লেজগাড়ী ব্যবহার করে তাহার নাম হইতেছে উমিযাক (Umiaks)।

যানবাহনের ইতিকথা

পরিবহণ ব্যবস্থার আলোচনা শেষ করিবার আগে যুগ যুগ ধরিয়া যানবাহনাদির উদ্ভবের বিচিত্র কাহিনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হইবে না।

পৃথিবীর দুর্গমতম অঞ্চলে বা অনগ্রসর অঞ্চলে আজও যেমন পশুই প্রধান বাহন, আদিম যুগে যখন গাড়ীর উদ্ভব হয় নাই, তখনও পশুই ছিল মানুষের প্রধান সহায়। আরো পরে উদ্ভব হয় পাল্কীর বা ডুলির। তার বাহন ছিল মানুষ। আজও আমাদের দেশের কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে এই মনুষ্যবাহিত পাল্কী দেখিতে পাইবে। সেই যুগে আরও এক প্রকারে মানুষ মাল বহন করিত; সেটা হইতেছে লতা বা দড়ির সাহায্যে বাঁধিয়া মাটির উপর দিয়া টানা যে শ্লেজগাড়ী। আজও তুন্দ্রা অঞ্চলে দেখা যায়, শ্লেজগাড়ী এই ভাবে চলে। তবে সেইগুলি টানে কুকুরে বা বল্গা হরিণে।

আদিম যানবাহন ব্যবস্থা

আরও পরে তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ যখন সভ্যতার বড়ো বড়ো কেন্দ্রগুলি গড়িতে শুরু করিল তখন তাহাদের আরেকটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। মিশরে বড়ো বড়ো মূর্তি, পিরামিডগুলি তৈরী করার জন্য দূর দূরান্ত হইতে পাথর আনিতে হইত। নীলনদের বুকে কাঠ ভাসাইয়া তাহার উপর পাথর বসাইয়া জলপথে আনা গেলেও স্থলপথে তাহা বহন করা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। শেষ পর্যন্ত মানুষ কাঠের গুঁড়ি ফেলিয়া তাহার উপর ঐ পাথর বসাইয়া এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াস পাইল। ঐরূপ অবস্থায় টানিলে কাঠের গুঁড়িগুলি গড়াইয়া যাইত, এবং পাথরগুলি আগাইয়া যাইত। এই ভাবেই চাকার আদিমতম রূপের উদ্ভব ঘটিল। পরবর্তীকালে প্রথমে কাঠের গুঁড়িগুলিকে ছোটো ছোটো করিয়া কাটা হইত, এবং আরও পরে উহার মধ্য দিয়া ছিদ্র করিয়া কাঠের

চাকার ব্যবহার

গজাল ঢুকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য আরও পরে উহাকে আরও হাল্কা করার জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়।

চাকার উদ্ভবের সংগে সংগেই মানুষ রথের ব্যবহারও শিখিয়া ফেলে। প্রাচীন আসীরিয়ায়, বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে, প্রাচীন মিশরে, গ্রীসে বা রোমে বিভিন্ন জাতীয় রথের প্রচলন যে ছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সব রথের সবগুলিতেই মাত্র দুইটি করিয়া চাকা থাকিত এবং ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি পশু উহাদের টানিত। আজও আমাদের দেশে যে সব গোরুর গাড়ী দেখা যায়, এই সব রথ তাহারই আদিম সংস্করণ।

আরও পরবর্তীকালে গাড়ীতে দুইটির পরিবর্তে চারিটি চাকা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ডে বা য়ুরোপে এই জাতীয় চার-চাকার গাড়ী খুবই প্রচলিত ছিল। এই সব গাড়ীও সাধারণত ঘোড়ায় টানিত। আমাদের দেশে এখনও এই জাতীয় চার চাকার ঘোড়ার গাড়ী দেখা যায়।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল মানুষ ততই জীবজন্তুর সাহায্য ছাড়াই গাড়ী চালানোর কথা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার ফলে আবিষ্কৃত হইল

শে গাড়ী

শে (Shay); ইহাতে ছিল দুইটি বড়ো বড়ো চাকা এবং একটি বসিবার আসন। বসিবার আসনে বসিয়া পা দিয়া ঠেলিয়া শে চালাইতে হইত। পরবর্তীকালে এই শে গাড়ীই বিবর্তনের পথ ধরিয়া একালের সাইকেল গাড়ীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে জেমস ওয়াট বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে ইঞ্জিনের পরিকল্পনা করিলেন। ১৭৮৫ সালে মারডকের ইঞ্জিন প্রথম

বাষ্পের ব্যবহার

যেদিন রাস্তায় বাহির হইল সেদিনটি মানুষের পরিবহণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। পরবর্তীকালে ঐ ইঞ্জিন পূর্বেকার ঘোড়ার গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে ষ্টিফেনসন ইঞ্জিনের অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং রেল লাইন আবিষ্কার করেন। ফলে, রেলপথে রেলগাড়ীর চলাচল শুরু হয়। আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই রেলগাড়ী পরিবহণের অন্যতম উপায়। সাম্প্রতিককালে বাষ্পের বদলে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেও যে রেলগাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে সেকথা তো আগেই বলা হইয়াছে।
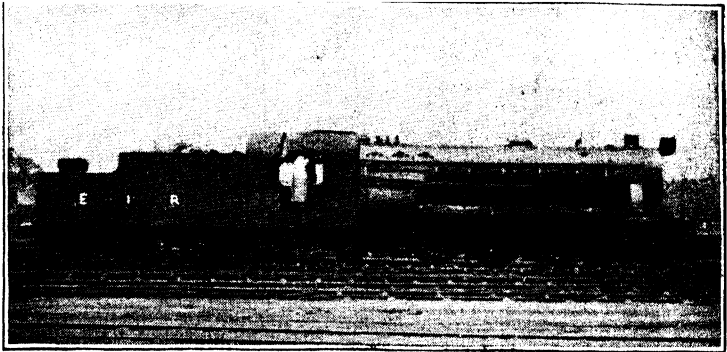
বাষ্পচালিত ইঞ্জিন

ইংল্যাণ্ডে যখন বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে উন্নততর রেলগাড়ী চালাইবার নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে, সেই সময় অটো নামক একজন জার্মান একটি ইঞ্জিন তৈরী করেন, যেটি বাষ্পচালিত নহে; গ্যাসোলিন নামক একপ্রকার খনিজ তৈল দিয়া তাহাকে চালাইতে হইত। অটোর এই আবিষ্কারের ফলে স্থলপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়া গেল।

গ্যাসের ব্যবহার

এখন রেললাইন ছাড়াও দ্রুতগামী গাড়ীর চলাচল সম্ভবপর হইল। অটোর সহকারী ডেমলার এই গাড়ীর অনেক উন্নতি সাধন করেন। মার্ডকের বাষ্পীয় গাড়ী প্রথম চালু হওয়ার প্রায় একশ বছর পরে ১৮৭৫ সালে পেট্রোলচালিত মোটর গাড়ী প্রথম চলা শুরু করিল। আজ মোটর, জীপ, বাস, লরী, স্কুটার প্রভৃতির সর্বত্রই সাক্ষাৎ মেলে। বিদেশে সাম্প্রতিককালে অবশ্য আণবিক শক্তির সাহায্যেও যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে। ইহার পরে গাড়ীর গতি অনেক দ্রুততর করা সম্ভব হইবে।

স্থলপথে যানবাহনের এই বিচিত্র বিবর্তনের সংগে সংগে জলপথেও মানুষ কাঠের যানবাহনের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। আদিম কালে গুঁড়ির সাহায্যে জলপথে পরিবহণের কাজ চালানো হইত তাহা তোমরা জান। এই ভাবে কাঠের গুঁড়ির ভেলা ভাসাইতে ভাসাইতেই মানুষ একদিন নৌকার ব্যবহার

জলপথে যানবাহন ব্যবস্থার বিবর্তন

শিখিল। আরও পরে বড়ো বড়ো নৌকায় পাল বসাইয়া দাঁড়ের সাহায্যে উহাদের লইয়া মানুষ সমুদ্র পাড়ি দিবার চেষ্টায় সফল হইল। প্রাচীন ফিনিসীয়রা ও মিশরীয়রা সমুদ্রগামী নৌকার প্রভূত উন্নতি সাধন করে। প্রাচীন ভারতেও যে নৌ-শিল্পের প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

মানুষের শূন্যপথ বিজয়

শূন্যপথে চলার প্রয়াস শুরু হয় অনেক পরে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিলার নামে এক ভদ্রলোক এরোষ্ট্যাটের আবিষ্কার করেন। ইহাতে একজন মানুষ দুই হাত দিয়া যাহাতে পাখীর মতো ডানা নাড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর জার্মানীতে অটো লিলিয়েন্থাল গ্লাইডার তৈরী করেন। কিন্তু অল্পক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারিলেও নামিবার সময় যন্ত্রটি পড়িয়া ভাংগিয়া যাওয়ায় তিনি বিশেষ আহত হন এবং মারা যান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শূন্যে চলাচলের ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করেন আমেরিকার অরভিল রাইট। তিনি এরোপ্লেন তৈরী করিয়া তাহাতে পেট্রোল ইঞ্জিন বসাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৮ সালে তিনি যেদিন প্রথম তাহার এরোপ্লেন চালাইয়া শূন্যপথে এক ঘণ্টা বিচরণ করেন সেদিন সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

তাহার পর মাত্র কয়েক দশক কাটিয়াছে, কিন্তু মানুষের শূন্যপথ জয়ের ইতিহাসে এই কয়টি দশক সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। শুধু বহুক্ষণ আকাশে স্থায়ী নানাপ্রকারের এরোপ্লেনই সৃষ্ট হয় নাই, আজ মানুষ মহাশূন্য অভিযানেও ব্রতী হইয়াছে।

মহাকাশযান

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ঐ দিনই রাশিয়া মহাশূন্য অভিযানে তাহার প্রথম মহাশূন্য যানটি (spaceship) পাঠাইতে সক্ষম হয়। স্পুটনিক (১) নামক এই মহাকাশযানটি পৃথিবীর কক্ষপথে তাহার উপগ্রহ হিসাবে স্থাপন করা হয়। তাহার পর হইতে অসংখ্য মহাকাশযান রাশিয়া ও আমেরিকা কর্তৃক মহাশূন্যে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কয়েকটি এখনও তাহাদের কক্ষপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের মধ্যে এক্সপ্লোরার, ভ্যানগার্ড, লুনিক, পাইওনিয়র,

ডিসকভারার, টাইরস, ট্রানজিট, মিডাস, একো, কোররিয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সাহায্যে মহাশূন্যের বহু অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ জানা সম্ভবপর হইয়াছে। সাম্প্রতিক সংবাদে জানা যায়, ভারতবর্ষও মহাকাশ সন্ধানী কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write an essay on the development of Postal and Telegraphic systems in India, since the coming of the British.

2. Write what you know of the development of Telephonic and Wireless communication in India.

3. Write an essay on Radio and Television services in India.

4. Write an essay on the development of Roads in India since the coming of the British.

5. Write an essay on the development of Indian Railways.

6. Write an essay on the development of Transport through the ages (on a world background).

B. Answer the following questions in not more than 80 words :—

1. Describe the development of Newspapers, Journals, etc. in India.

2. State what are the different types into which Railways in India may be classified. Indicate the parts of India where they may be found.

3. Name the different Railway Zones in India describing jurisdiction of each.

4. Write what you know of private Railways in India.

5. Describe what improvements have been effected in railway transport since independence.

6. Trace the development of sea and coastal communication in India since independence.

7. Describe the development of Air Transport in India since independence.

8. Write what you know of River navigation system in India.

9. Describe the importance of transport and communication to a country.

C. 1. Below are given the names of some forms of transport. Write 1, 2, and 3 respectively under them as they belong to Desert, Mountain or Tundra regions. Put a (X) under the names which are not related to any of the regions.

Forms of Transport

Shay, Cycle, Kayaks, Camels, Aeroplane, Llama, Umiaks, Yaks, Sledge, Horses, Men, Donkeys, Railways.

2. Make a *nine-point test* of the different things through which the transport and communication of a country may be carried on.

3. Below are given the list of some items of postal and telegraphic communication. Write inside bracket on the right side of each the cost for it.

The items

Inland letter ( ) Envelope ( ) Postal parcel weighing 75 grams ( ) & Acknowledgement due ( ) Money order fees for Rs. 10/- ( ) V. P. P. for Rs. 25/- ( ) Fees for the six-lettered Greeting Telegram ( ) Fees for the ten-lettered Ordinary telegram ( ) Fees for ten-lettered Urgent telegram ( ).

D. Add the following to your scrap-book :—

(1) Maps of Indian Railways, zonalwise (2) Map of Indian Airlines (3) Map showing the Indian sea and coastal routes (4) Pictures of as many kinds of interesting transport as you can collect, e.g. different types of Engines, Aeroplanes, Carriages, Motor cycles, Boats, Ships, etc. (5) Different kinds of stamps, postal and telegraphic forms may be collected (6) Collect a radio programme, for any whole day.

E. The following projects may be undertaken :—

1. Models of telephone, telegraph and radio may be made.

2. Excursion to a Post Office, or Telegraph Office, Broadcasting Station to collect its detailed working.

3. Excursion to a Steamer Office, an Aerodrome, or a Railway Station to collect detailed information about its service.

4. Survey of the area to collect information about the transport and communication services available in it.

বিশ্বনাগরিক মানুষ

বিশ্বনাগরিক মানুষ

পরিবহণ ব্যবস্থার আলোচনার প্রসংগে তোমরা দেখিয়াছ, গত দুই শতকের মধ্যে মানুষ পরিবহণ ব্যবস্থার কতো উন্নতিই না করিয়াছে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে যেদিন মারডকের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ইংল্যাণ্ডের রাস্তায় প্রথম চলে সেদিন যে উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল, আজ ইঞ্জিন বা রেলগাড়ী দেখিয়া পৃথিবীর কেহই সেই উত্তেজনা বোধ করে না। সমতলের বুকের উপর দিয়া, নদীর পুলের উপর দিয়া, জংগলের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গায়ে, এমন কি পাহাড়ের মধ্যেও টানেল খুঁড়িয়া তাহার মধ্য দিয়া রেলগাড়ীর চলাচল আজ সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এইসব রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে ; আধুনিক রেল ইঞ্জিনগুলির গতিবেগ অবশ্য আরও বেশী—ঘণ্টায় এমন কি ১০০।১২০ মাইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অটো কর্তৃক খনিজ তৈলদ্বারা চালিত ইঞ্জিন, এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ডেমলার কর্তৃক সেই ইঞ্জিন চালিত মোটর গাড়ী আবিষ্কারের ফলেও স্থলপথে চলাচল অনেক দ্রুততর ও সহজতর হইয়া পড়িয়াছে। তেমনি, প্রায় দেড়শ বছর আগে ফুলটন সাহেব যেদিন প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ তৈরী করেন, তাহার পর জাহাজ নির্মাণের কলাকৌশলও কতই না উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে সমুদ্র একদিন অজানা রহস্য আর আতংকে ঢাকা ছিল, আজ মানুষ অবলীলাক্রমে তাহা পার হইয়া যাইতেছে। যে আটলান্টিক মহাসাগর পার হইতে কলম্বাসের দশ সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল, আজ মাত্র চারদিনে জাহাজে সেই সমুদ্র পার হওয়া যায়। সর্বশেষে, এই শতকের প্রথম দশকে অর্ভিল রাইট পেট্রোলচালিত মোটর ইঞ্জিনসহ উড়োজাহাজ চালাইয়া যে আকাশপথ জয়ের সূচনা করেন, মানুষের শূন্যবিজয়ের সেই অভিযান আজিও অব্যাহত চলিয়াছে। বর্তমানকালের এরোপ্লেনের গতি প্রচণ্ড, ঘণ্টায় ৪০০ হইতে ৭০০ মাইল। কোনো কোনো জেটপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ১১০০ মাইল পর্যন্ত। এমনি ভাবে, জল, স্থল, শূন্য সর্বপথেই মানুষ তাহার গতিপথ অবারিত করিয়াছে, গতিবেগ বহুগুণ বৃদ্ধি

বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান লোপ

করিয়াছে। ফলে পৃথিবীর সব দেশই আজ পরস্পরের অতি কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথ সুগম করিয়া উহাদের ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। দিন দিনই বিভিন্ন দেশের দূরত্ব কম হইতে আরও কম হইয়া যাইতেছে।

বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

পরিবহণ ব্যবস্থার এই ক্রমোন্নতির ফলে শুধু যে বিভিন্ন দেশের দূরত্ব কম হইয়া আসিতেছে তাহাই নহে, বিভিন্ন অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্যাদির জন্যও বিভিন্ন দেশ ক্রমেই একে অন্যের উপর বেশী নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। কোনো দেশের পক্ষেই তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন করা বা উহার চাহিদা সম্পূর্ণ মেটানো সম্ভবপর নহে। কোনো কোনো দেশের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ও ভূমির বৈশিষ্ট্যের জন্য সেখানে বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, আবার কোনো কোনো দেশ খনিজ পদার্থের প্রাচুর্যের কারণে নানা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের বিশেষ সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রভৃতি কারণে ভারতবর্ষে পাট উৎপাদনের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। এই কারণেই অন্যান্য দেশ ভারত হইতে পাট ক্রয় করিয়া থাকে। অন্যদিকে, নানাবিধ সুবিধাহেতু ইংল্যাণ্ডে যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া বিভিন্ন দেশ ইংল্যাণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। পূর্বে সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মালপত্রের এই আদান-প্রদান তত বেশী ছিল না। কিন্তু বর্তমানে উহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন যে দেশ নিজে যাহা উৎপাদন করিতে পারে না তাহা অন্য দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে পারে, তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেক দেশেরই শ্রম ও মূলধনের সর্বাধিক সুব্যবহার হয় এবং তাহার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দুইই বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, ইহারই ফলে কোনো দেশের দুর্ভিক্ষের সময় অন্যদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের জনগণের জীবনরক্ষা করাও সম্ভবপর হইতেছে। এমনিভাবে যেমন বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে,

তেমনি দ্রব্যের আদান-প্রদানের সংগে সংগে ভাবেরও আদান-প্রদানের ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যও বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে আন্তর্জাতিক শান্তি যে প্রত্যেক জাতির পক্ষে অপরিহার্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব নহে, তাহাও মানুষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। আজিকার দিনে বিভিন্ন জাতি তাহার উন্নতির তথা অস্তিত্বের জন্যই অন্যান্য জাতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তাহা সম্ভবপর নহে। একমাত্র শান্তিকালীন আবহাওয়াতেই পরস্পরের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর। প্রত্যেক জাতির স্বীয় অস্তিত্বের জন্যই তাই যুদ্ধ নহে, শান্তি অপরিহার্য। মানুষের এই উপলব্ধি বিশ্বশান্তি কামনায় বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে।

বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা.

লীগ অব নেশনস্

প্রথম মহাযুদ্ধের পরই বিশ্বশান্তির প্রয়োজন খুব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের বিশেষ করিয়া য়ুরোপের জনগণের যে চরম দুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য সকলেই সচেষ্ট হইয়া ওঠে। শান্তির জন্য এই ব্যাপক আকাংখা হইতেই প্রথম বিশ্ব সংঘ বা লীগ অব নেশনস্ (League of Nations) গড়িয়া ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসনই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনের জন্য আহূত ভার্সাই সম্মেলনে, বিশ্বে শান্তি রক্ষার নিমিত্ত, চৌদ্দদফা শর্ত সম্বলিত এক প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়াই লীগ অব নেশনস্ গঠিত হয়।

সংক্ষেপে লীগ অব নেশনসের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা করা। ন্যায় এবং সততার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবে, আন্তর্জাতিক আইন (International Law) মানিয়া চলিবে, পারস্পরিক চুক্তি ও সন্ধির সর্তগুলি সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি মিটাইতে চেষ্টা করিবে—এই সব বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্তই লীগ অব নেশনস্

এর সৃষ্টি। কোনো দেশ যদি অন্যায়ভাবে অপর দেশকে আক্রমণ করে তাহা হইলে লীগ অব নেশনসের মাধ্যমে অপরাপর রাষ্ট্রগুলি আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে নিরস্ত্র করিবে ও প্রয়োজনবোধে তাহার উপর অর্থনৈতিক চাপ দিবে—এমন কি সামরিক শক্তির প্রয়োগে উহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবে।

গত যুদ্ধের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া অনেক রাষ্ট্রই লীগ অব নেশনসের সভ্য হয়। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লীগ অব নেশনস্ নানাভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল—লীগ অব নেশনস্ উহা বন্ধ করিতে পারিল না। কিছুদিন হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কমিয়া আসিতেছিল। অনেক ক্ষেত্রে লীগ অব নেশনস্ প্রসংশনীয় কার্য করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সীমা লইয়া বিবাদের মীমাংসার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীস ও বুলগেরিয়া এবং লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বিবাদও লীগ অব নেশনস্ নিরপেক্ষভাবে মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে লীগ কোনো শক্তিশালী সভ্যের স্বার্থে জড়িত ছিল সেসব ক্ষেত্রে সব সময় উহা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংগ-মিশর এবং ইংগ-চীন বিবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলে, পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির চোখে এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা হানি হয়। তারপর শক্তিশালী রাজ্যগুলি লীগের নির্দেশ অমান্য করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে জাপান ও জার্মানী লীগ একেবারেই পরিত্যাগ করে। বস্তুত-পক্ষে মানুষের মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব তখনও ভালোভাবে দানা বাধে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি সাময়িকভাবে তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল। কিন্তু লীগ অব নেশনসে সমবেত হইয়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিতে লাগিল। ফলে, লীগ অব নেশনস্ ব্যর্থ হইল। ইহার নিষ্ক্রিয়তার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের ইতিকথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর, পৃথিবী আবার শান্তিকামী হইয়া ওঠে। লীগ অব নেশনস্ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী বিশ্বসংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন সকল রাষ্ট্রই বিশেষভাবে অনুভব করে।

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে আটলান্টিক মহাসাগরে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল মিলিত হন। আলোচনার পর ইঁহারা বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আটলান্টিক চার্টার (Atlantic Charter) নামে এক ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণাটি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত নীতিগুলি গ্রহণ করিতে আহ্বান জানায় :—

(১) কেহ কোনোরূপ "বিস্তারনীতি" অনুসরণ করিতে পারিবে না। (২) অপর কোনো রাষ্ট্রের সীমা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে হইলে স্থানীয় অধিবাসীদের মত অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। (৩) রাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতালাভে সাহায্য করিতে হইবে—প্রত্যেক দেশেরই যাহাতে নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকে সে বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা করিতে হইবে। (৪) ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে, ছোটো-বড়ো, বিজিত-বিজেতা সকল দেশের প্রতিই সমান ব্যবহার করিতে হইবে। (৫) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শ্রমিক সেবা কল্যাণ সাধন প্রভৃতি ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে। (৬) সমুদ্রপথ সকল দেশের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে। (৭) প্রত্যেক দেশই নিজ সীমার মধ্যে বহিরাক্রমণের ভয় এবং অভাব-অনটনের হাত হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে উন্নততর জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে সেই চেষ্টাই করিবে। (৮) সকল রাষ্ট্রই জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া বিশ্বে যাহাতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিবে। ২৬টি রাষ্ট্র আটলান্টিক চার্টারের নীতি গ্রহণ করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করে। ভারতবর্ষ প্রথম স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ছিল। পরে আরও ১৯টি রাজ্য এই চার্টারে স্বাক্ষর করে।

আটলান্টিক চার্টারে এত রাষ্ট্রের স্বাক্ষর দান হইতেই বোঝা যায়, পৃথিবী শান্তির জন্য কতখানি উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল।

জাতিসংঘের ইতিকথা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে যুদ্ধে লিপ্ত অথবা নিরপেক্ষ সকল জাতিকেই আতংকিত করিয়া তুলিল। আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ তাহাদের মনে স্থিরবিশ্বাসের সৃষ্টি করিল যে আন্তর্জাতিক সংঘ গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশা

যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে মানুষের আর পরিত্রাণ নাই। এই উদ্দেশ্য লইয়াই ১৯৪৪ সালের ২৫শে এপ্রিল হইতে ২৬শে জুন পর্যন্ত পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে এমন ৫০টি রাজ্যের সাড়ে আটশত প্রতিনিধি সানফ্রান-সিস্কো শহরে সম্মিলিত হন। তাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা ও তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান করা, সমানাধিকারের ভিত্তিতে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সকল জাতি যাহাতে পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া যে সনদ গৃহীত হয়, তাহারই ভিত্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation সংক্ষেপে U. N. O.) গড়িয়া উঠিয়াছে (২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৫)। বর্তমানে শতাধিক জাতি ইহার সদস্য।
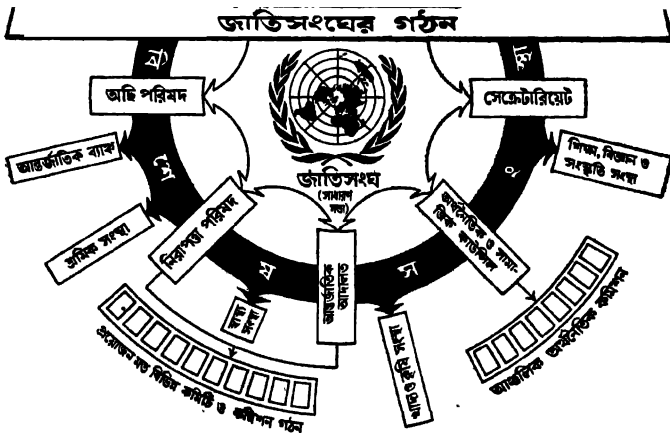
যে ব্যাপক উদ্দেশ্য লইয়া জাতিপুঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই ইহার সাংগঠনিক দিকও ব্যাপকতর করিয়া তুলিতে হইয়াছে। ইহার প্রধান সাংগঠনিক অংশ হইতেছে সাধারণ সভা (General Assembly), স্বস্তি

জাতিপুঞ্জের সংগঠন

পরিষদ (Security Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ (Trusteeship Council), এবং দপ্তরখানা (Secretariat)।

প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ সভা গঠিত। সাধারণত ইহার অধিবেশন বৎসরে একবার হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করা সাধারণ সভার প্রধান কাজ। জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সাংগঠনিক অংশগুলির ক্ষমতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকারও সাধারণ সভার রহিয়াছে। এই সভায় পাঁচজন করিয়া সদস্য পাঠাইলেও কোনো রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দিবার অধিকার নাই। সাধারণ বিষয়ে অধিকাংশের ভোটেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন।

সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীন এই পাঁচটি রাজ্যের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং প্রতি দুই বৎসরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন সদস্য—এই মোট এগারোজন সদস্য লইয়া স্বস্তি পরিষদ গঠিত। এই পরিষদের প্রধান কাজ হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান করা। শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহার পাক্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। যে কোনো ব্যাপারে সাতজন সদস্য একমত হইলেই পরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। তবে স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিলে পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত বলবৎ করা যায় না। স্থায়ী সদস্যের এই ক্ষমতাই ভেটো (Veto) নামে পরিচিত।

একজন প্রধান সচিবের অধীনে আটটি বিভাগ লইয়া দপ্তরখানা গঠিত। সংঘের অন্যান্য অংশ যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহাকে কার্যকরী রূপ দেওয়াই দপ্তরখানার কাজ। প্রধান সচিব স্বস্তি পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় হল্যাণ্ডের হেগ নামক শহরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত পনেরো জন বিচারপতিকে লইয়া এই

বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আদালতের প্রধান কার্য। এতদ্ব্যতীত জাতিপুঞ্জের যে কোনো সংগঠন আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে এই আদালতের মতামত আহ্বান করিতে পারে।

লীগ অব নেশনসের সময়ই অছি পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। উহাই কিছু পরিবর্তিতরূপে নূতনভাবে গঠিত হইয়া বর্তমানে কাজ করিয়া চলিয়াছে। ইহার সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নহে। স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছিশাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিগণ এবং অছিশাসনের ভারপ্রাপ্ত ও ভারপ্রাপ্ত নহে অছিপরিষদের এই দুই প্রকার সদস্যদের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া অছি পরিষদ গঠিত হইয়া থাকে। অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক করা অছি পরিষদের প্রধান কাজ।

যদিও বিগত সতেরো বছরে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, কংগো সমস্যা, বার্লিন সমস্যা, আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান জাতিপুঞ্জ করিতে পারে নাই, তবু আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা ভুল হইবে। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে এই উদ্দেশ্য সাধনে ইহার অবদান অল্প নহে। বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলিয়াছে, ইহার প্রচেষ্টাতেই তাহা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আজও পরিণত হয় নাই। জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায়ই বিশেষ রক্তপাত না ঘটাইয়াও মধ্যপ্রাচ্যের ইস্রায়েল রাজ্যের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে; ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে ইহার কৃতিত্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সংক্ষেপে দেওয়া গেল :—

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান : জাতিপুঞ্জের অবদান

(১) সিরিয়া ও লেবানন প্রসংগে—১৯৪৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সিরিয়া ও লেবানন তাহাদের রাজ্যে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যশক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে স্বস্তি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ বৎসর এপ্রিল মাসের মধ্যে সিরিয়া হইতে এবং জুন মাসের মধ্যে লেবানন হইতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অপসারণ সম্ভব হয়।

(২) কর্ফু প্রণালী প্রসংগে—১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী বৃটিশ যুক্তরাজ্য তাহার ও আলবেনিয়ার মধ্যে কর্ফু প্রণালীতে বৃটিশ রণতরীর ক্ষতিসাধনকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত বিরোধ সম্পর্কে স্বস্তি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বস্তি পরিষদ বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে পাঠাইলে, বিচারালয় আলবেনিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য নির্দেশ দেন।

(৩) কোরিয়া প্রসংগে—১৯৫০ সালের জুন মাসে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। স্বস্তি পরিষদ অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং ঐ পরিস্থিতির মীমাংসার্থে সৈন্যদল প্রেরণ করে। ইহারই প্রচেষ্টার পরে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৪) ইন্দোচীন প্রসংগে—ভিয়েৎমিন ও ভিয়েৎনামের মধ্যে যে সুদীর্ঘ বিরোধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধাইবার উপক্রম করিয়াছিল, জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায়ই তাহার সাময়িক বিরতি ঘটে। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে জেনেভা সম্মেলনে ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য লাওসকে কেন্দ্র করিয়া বিরোধের আজও সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয় নাই।

(৫) সুয়েজ খাল প্রসংগে—১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণের অল্প পরেই নভেম্বর মাসে হঠাৎ বৃটিশ যুক্তরাজ্য মিশর আক্রমণ করিয়া খাল এলাকা দখল করিয়া বসে। জাতিপুঞ্জ স্বীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া এই আক্রমণ প্রতিহত করে, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অপসারণ সম্ভবপর হয়।

(৬) গাজা প্রসংগে—অনুরূপ ভাবে ইস্রায়েলী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত মিশরের গাজা অঞ্চল হইতেও জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলেই ইস্রায়েলী বাহিনীর অপসারণ সম্ভবপর হয়।

(৭) হাংগেরী প্রসংগে—১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে হাংগেরীতে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দেয়। বিপ্লবের পশ্চাতে পশ্চিমী শক্তির হস্তক্ষেপ রহিয়াছে এই ধারণায় রাশিয়া দৃঢ়হস্তে ঐ বিপ্লব দমন করার জন্য স্বীয় সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করে। জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলেই শেষ পর্যন্ত হাংগেরী হইতে রুশ সেনাবাহিনীর অপসারণ সম্ভবপর হয়।

(৮) উপনিবেশসমূহ প্রসংগে—জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায়ই ঘানা, লিবিয়া প্রভৃতি উপনিবেশগুলি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে তাহাদের স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হইয়াছে।

(৯) ইস্রাইল প্রসংগে—১৯৪৮ সালের ১৪ই মে প্যালেষ্টাইনের ইহুদীরা ইস্রাইলকে স্বাধীন ইহুদী রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলে আরব রাজ্যসমূহ উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলেই এই যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং ইহুদীদের স্বাধীন ইস্রায়েলী রাজত্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

জাতিপুঞ্জের সনদে বলা হইয়াছে, অস্ত্রসম্ভারের অধিকারই যুদ্ধের একমাত্র কারণ নয়। তাই এই সনদে বলা হয়-যে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের সর্ববিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য ও তাহা হইতে উদ্ভূত অসন্তোষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ প্রভৃতিও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাহা যুদ্ধ বা বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটাইতে পারে। কল্যাণ সাধনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও যৌথ কার্যকলাপের উপরও প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনে জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তোমরা দেখিয়াছ, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের বহু অবদান সত্ত্বেও কোনো কোনো সমস্যার সমাধানে জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার জন্য সমালোচনার অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্যার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি অবিসংবাদীভাবে প্রমাণ করিয়াছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবকল্যাণ প্রভৃতি ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, সম্ভবপরও বটে।

আন্তর্জাতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধানে জাতিপুঞ্জের অবদান

এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organisation; সংক্ষেপে I L O) দেশবিদেশের শ্রমিকদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন, তাহাদের কাজের নিয়মকানুনের উন্নতি প্রভৃতির দ্বারা শ্রমিকদের সামাজিক ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ করিয়া দিয়া শ্রমিক-বিক্ষোভ দূর করার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organisation ; U N E S C O) শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুশীলনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া সর্বদেশের, সর্বধর্মের, সর্বজাতির, সর্বভাষাভাষীর মৌলিক স্বাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার এবং তাহার মধ্য দিয়া ন্যায় ও বিচারের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agriculture Organisation ; F A O) মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, বিভিন্ন জাতিকে জীবনধারণের মান উন্নয়নে সহায়তা করা ; সকল দেশের কৃষি, বনজ ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে সাহায্য করা ; গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি করা ; সকল দেশের সকল মানুষ যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা ; এবং এই সব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সকল মানুষের উৎপাদনমূলক কাজে অংশ গ্রহণে সুযোগ বৃদ্ধি করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation ; W H O) লক্ষ্য হইতেছে পৃথিবীর সকল দেশে রোগ নিবারণ করা এবং সকল মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা। পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংকের (International Bank for Reconstruction and Development ; I B R D) উদ্দেশ্য হইতেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল সমূহের পুনর্গঠনে বা অনগ্রসর দেশগুলির উন্নতির জন্য সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক ঐ সব দেশকে সরাসরি অর্থ ধার দিয়া থাকে। একই উদ্দেশ্য লইয়া আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাও (International Finance Corporation ; I F C) গড়িয়া উঠিয়াছে। যে আণবিক শক্তি ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা যায়, উহাকেই আবার মানুষের কল্যাণসাধনেও নিয়োগ করা সম্ভবপর। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এই উদ্দেশ্য সাধনে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (International Atomic Energy Agency ; I A E A) গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (International Civil Aviation Organisation ; I C A O), আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগ ইউনিয়ন (International Tele-communication Union ; I T U), বিশ্ব পোষ্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union ; U P U), আন্তঃ-সরকার নৌচলাচল পরামর্শদাতা সংস্থা (Inter-Governmental Maritime

Consultative Organisation ; I M C O) প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সংস্থা (International Refugee Organisation ; I R O) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন উদ্বাস্তুদের এবং আরব দেশগুলির সাম্প্রতিক হাংগামার ফলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক শিশুমংগল অর্থভাণ্ডার (United Nations International Children Emergency Fund ; U N I C E F) দেশবিদেশের শিশুদের, বিশেষ ভাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলির শিশুদের, আশুপ্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের সকল রকম উন্নতির চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। এইভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যার সমাধান করিয়া সার্বিক উন্নতিবিধানের জন্য জাতিপুঞ্জ যে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তাহা অতুলনীয়।

তবু সংশয় থাকিয়া যাইতে পারে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের যে সব ব্যর্থতা দেখা দিয়াছে তাহাতে ইহার ভবিষ্যতও কি লীগ অব নেশনসের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন? জাতিপুঞ্জ এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহযোগিতার ভিত্তিতে ইহার জন্ম। আজ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষাকল্পে এই প্রতিষ্ঠান যে প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে, মানুষকে সর্ববিধ্বংসী যুদ্ধের হাত হইতে তাহাই রক্ষা করিতেছে। জাতিপুঞ্জের শক্তি তখনই বৃদ্ধি পাইবে, যখন সকল দেশের সকল মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিবে। হয় আমরা ক্ষমতালিপ্সুদের বিশ্বব্যাপী আণবিক যুদ্ধে সমর্থন জানাইয়া সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস সাধনের কারণ হইব নয় আমরা একই পৃথিবীর মানুষ, পরস্পরের সহিত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে বাঁচিয়া থাকিয়া মানব সভ্যতাকে আরও উন্নতির পথে লইয়া যাইব। এই দুইয়ের একটি পথ আজ পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে বাছিয়া লইতে হইবে।

বিশ্বমানবিকতা বোধের প্রয়োজনীয়তা

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Discuss how the world has come together and why it needs an international organisation for the preservation of peace.

2. State what you know of the League of Nations. Discuss the causes for its failure.

3. State the circumstances which led to the establishment of the U. N. O.

4. Describe the organisations of the U. N. O.

5. Discuss the contributions of the U. N. O. to the preservation of peace so far. Give six examples.

B. Answer the following questions in not more than sixty words :—

1. State the purpose of the following U. N. O. organisations :

(a) Educational, Scientific and Cultural Organisation
(b) International Labour Organisation
(c) Food and Agriculture Organisation
(d) International Children Emergency Fund.

2. Describe the efforts of the U. N. O. to maintain peace in the following disputes :

(a) Suez Canal (b) Korea (c) Israel (d) Syria and Lebanon.

C. The following are for your scrap-book :—

Read the United Nations' Charter and write in your scrap-book what appeals to you most, e.g. Charter of Human Rights ; Statement about Causes of War.

D. The following projects may be undertaken :—

1. The class may organise the celebration of the U. N. O. day. An exhibition with diagrams and photography to present the organisations and activities of the U. N. O. may be organised.

2. A fake dispute may be presented to a fake session of the Security Council.

3. A fake debate on any issue in the U. N. O. Assembly may be organised.

4. A drama may be undertaken in the class in which every student will identify himself with one organisation or important office of the U. N. O. and describe its functions in the first person.

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

ঐতিহাসিক পটভূমি, আমাদের ধর্ম, আমাদের ভাষা,
আমাদের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা, আমাদের স্থাপত্যকলা,
আমাদের সংগীতকলা, আমাদের নৃত্যকলা

ঐতিহাসিক পটভূমি

আমাদের দেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক সম্পদাদির কথা তোমরা আগেই পড়িয়াছ। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও ইহাদের অবদান অনেকখানি। উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে সমুদ্র এদেশকে যেমন অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি এই স্বাতন্ত্র্যের ফলেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহার স্বীয় স্বতন্ত্র ঐতিহ্য লইয়া গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। হিমালয় হইতে নির্গত নদনদী আর মৌসুমী জলবায়ু এই দেশকে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে। ইহার এই কৃষি-সম্পদ, তথা অরণ্য-সম্পদ ও খনিজ-সম্পদ ভারতবাসীকে জীবনধারণের জন্য কঠোর সংগ্রাম করার হাত হইতে মুক্তি দিয়াছে। ফলে, ভারতবর্ষ ধর্ম, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সুযোগ পাইয়াছে। সমুদ্রের সান্নিধ্য হেতু ভারতবাসীর, বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীর, সমুদ্র-প্রবণতা তাহাদের সমুদ্রপথে বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিও দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। বৈদেশিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষ সমৃদ্ধতর হইয়াছে।

জাতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব

আবার, এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পর্যালোচনার শুরুতে এদেশের জনতত্ত্বের বিচিত্র প্রভাবের কথাও স্মরণ রাখা দরকার। এদেশের আদিম অধিবাসী নিগ্রিটো, প্রোটো অষ্ট্রেলয়েড, মোংগলয়েড প্রভৃতি জাতি ছাড়াও সুপ্রাচীনকালে আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপীয়দের অভ্যুদয় পর্যন্ত পারসিক, গ্রীক, শক, হূণ, তুর্কী, আফগান, মোগল প্রভৃতি বিচিত্র জন বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা এদেশে বহন করিয়া আনিয়াছে। একে একে ধীরে ধীরে তাহারা কোথায় কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির মাঝে বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহার সঠিক হিসাব নাই। বস্তুত, এই সব বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা মনন-কল্পনার সমন্বয়েই ভারতীয় সভ্যতা

জনতত্ত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতি

ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরিয়া সমৃদ্ধতর হইয়াছে। তাই এদেশের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য—সব কিছুতেই বৈচিত্র্যের ছাপ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতা

কিছুদিন আগেও অনেকে মনে করিতেন এদেশে আর্যদের আগমনের সংগেই ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের সূত্রপাত। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্নাংশে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সাম্প্রতিককালে মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, আর্যদের বহু আগেই ধাতু-প্রস্তর যুগে মানুষ পৃথিবীর বুকে যেসব সভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের অন্যতম পাদপীঠ ছিল এই ভারতবর্ষ। আজ হইতে আনুমানিক ছয় হাজার বৎসর আগে সিন্ধু নদের তীরে তীরে বর্তমান হরপ্পা, মহেঞ্জোদরো প্রভৃতি স্থানে যে সুপরিকল্পিত শহরাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এইসব
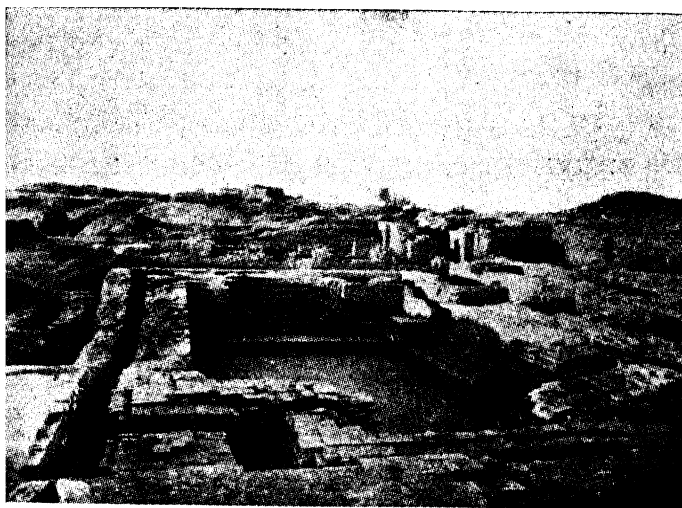
মহেঞ্জোদরোর স্নানাগার

শহরের রাস্তাগুলি ছিল চওড়া ও সোজা। এক বা একাধিক তলবিশিষ্ট ঘরবাড়ীগুলি ছিল পোড়া ইটে প্রস্তুত। রাস্তার দুই পাশ ধরিয়া ঘরবাড়ীর সারিবদ্ধ অবস্থান, প্রত্যেক বাড়ীতে স্নানাগার, কূপ, জলনিষ্কাশন প্রভৃতির ব্যবস্থা, শহরের সামগ্রিক পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া বোঝা যায়

যে, ঐগুলি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল এবং স্থাপত্যকলায় এইসব শহরের অধিবাসীরা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিল। মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত একটি বিরাট প্রাসাদ এবং তাহার পার্শ্ববর্তী একটি

মহেঞ্জোদরোর নটীমূর্তি

বিরাট স্নানাগার ও একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট বিরাট হলঘর বা হরপ্পার বিশাল শস্যভাণ্ডার প্রভৃতি একই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে ছয় হাজার বৎসর পূর্বেকার ঐসব শহর আমাদের আধুনিক শহর হইতে খুব নিম্নস্তরের ছিল না। বিভিন্ন নিদর্শনাদি হইতে মনে হয় এইসভ্যতার স্রষ্টাদের কৃষি ও পশুপালনই ছিল প্রধান জীবিকা। তবে মৃৎপাত্রনির্মাণশিল্প, ভাস্কর্য, বয়নশিল্প, ধাতুশিল্পাদিতেও যে তাহারা বিশেষ পারদশা ছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। মহেঞ্জোদরোতে ধাতুনির্মিত যে নটীমূর্তি, পাথরের মনুষ্য-মূর্তি বা হরপ্পাতে যে ভগ্ন পাথরের নৃত্যরত মনুষ্যমূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে

স্যার জন মার্শাল প্রমুখ পুরাতাত্ত্বিকদের মতে উহাদের বহুপরবর্তীকালের সুউন্নত গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শনাদির সহিত অনায়াসেই তুলনা করা চলে। এইসব শহরে যে অজস্র শিলমোহরজাতীয় জিনিস পাওয়া গিয়াছে তাহাদের উপর খোদাই করা বিভিন্ন পশুপক্ষী বা মনুষ্যমূর্তিও উন্নত ভাস্কর্য-কলারই
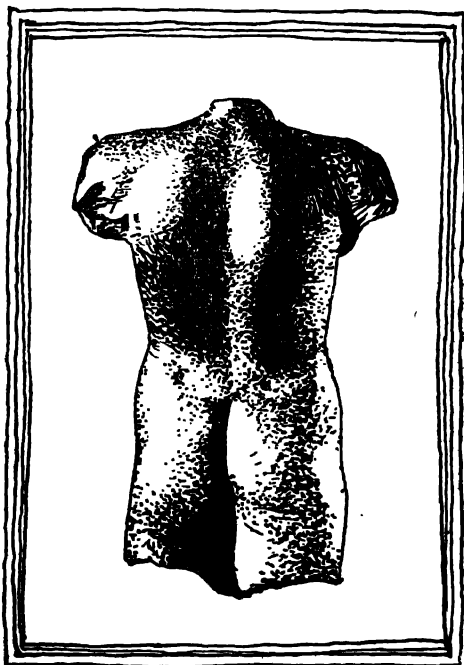
মহেঞ্জোদরোর পাথরের মনুষ্যমূর্তি

নিদর্শন। ঐসব শিলমোহরের গায়ে যে সব লিপি খোদাই করা রহিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় লিখিবার পদ্ধতিও সেই যুগের ভারতবাসী আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু এই লিপির পাঠোদ্ধার আজিও সম্ভবপর হয় নাই। এছাড়া ঐসব জায়গায় যে সব অলংকারাদি, প্রসাধন-সামগ্রী, দৈনন্দিন জীবনের ও গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও মনে হয় এই সভ্যতা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উন্নত স্তরে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিল। ঐতিহাসিকরা এই সভ্যতাকে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা আখ্যা দিয়াছেন, কারণ এই সভ্যতা সিন্ধুনদের উপত্যকায় গড়িয়া

উঠিয়াছিল। কোন্ জাতীয় লোকেরা এই সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

আর্যগণের আগমন

কি করিয়া এই সভ্যতার পতন হয় তাহা আজিও সঠিক জানা যায় নাই। তবে মার্টিমার হুইলার, ষ্টুয়ার্ট পিগট প্রমুখ পুরাতাত্ত্বিকরা সাম্প্রতিক-কালে যে সব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে তাঁহারা মনে করেন, বন্যা অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি নানাকারণে এই সভ্যতা দুর্বল হইয়া পড়িলেও ইহার ধ্বংস ঘটে বহিরাগত আর্যদের সহিত সংঘর্ষে। কবে, কোথা হইতে আর্যরা এদেশে আসে সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে ব্র্যাণ্ডেনষ্টিন প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল আরবসাগরের দক্ষিণ তীর। সেখান হইতে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ইহাদের এক শাখা পশ্চিমে য়ুরোপের দিকে এবং পূর্বে পারস্য ও ভারতের দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পারস্যের অন্তর্গত বোমাজকোই নামক জায়গায় এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে অনুমান করা হইয়া থাকে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্যরা এদেশে আসিয়াছিল। সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মতো প্রাচীন আর্যসভ্যতার কোনো বস্তু-নিদর্শন আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তবে, সে যুগে ভারতীয় আর্যরা যে সুবিপুল ধর্ম-সাহিত্য রচনা করিয়াছিল, তাহা হইতেই তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

বৈদিক সাহিত্য

আর্যদের রচিত সমগ্র সাহিত্য বৈদিক সাহিত্য নামে খ্যাত। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চারিটিকেই বলা হয় বেদ। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরবর্তী-কালে রচিত ছন্দ, শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প নামীয় ষড়্‌বেদাঙ্গ এবং সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা নামীয় ষড়্‌দর্শন-সমন্বিত সূত্রসাহিত্যও এই বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। চতুর্বেদের প্রতিটি আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—এই চারিটি ভাগে বিভক্ত। এইসব গ্রন্থাদি হইতে শুধুই যে প্রাচীন আর্যদের ধর্মচিন্তার কথা জানা যায় তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। আর্যদের আচার-আচরণ, সমাজ ও শাসন, সঙ্গীত-নাট্য, চারু ও কারুশিল্পাদি সম্বন্ধে তাহাদের প্রগাঢ় জ্ঞান ও মনীষার সাক্ষ্যও এইসব গ্রন্থাদিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

বৈদিক সাহিত্য হইতে জানা যায়, আর্যরা এদেশে আসিয়া প্রথমে শতদ্রু, বিপাশা, ঝিলাম, চিনাব ও রাভী—পাঞ্জাবের এই পঞ্চ নদী এবং সরস্বতী ও সিন্ধুবিধৌত "সপ্তসিন্ধব" নামক ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। পরে ধীরে ধীরে তাহারা পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এই কাজ সহজে সম্ভবপর হয় নাই। বহুদিন ধরিয়া এদেশের আদিম অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়াই আর্যরা নিজেদের বসতি বিস্তারে সক্ষম হয়। কিন্তু ইহারই ফলে আবার শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের কাজও শুরু হইয়া যায়। বস্তুত, আজিকার ভারতীয় সভ্যতা আর্য ও অনার্য এই দুই সংস্কৃতির সমন্বয়েরই ফল।

আর্যদের বসতিবিস্তার

বৈদিক সাহিত্য হইতে আরও জানা যায়, সেই যুগে বৃত্তির ভিত্তিতে আর্য ও অনার্যরা চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনের কাজ যাহারা করিত তাহারা হইল ব্রাহ্মণ। দেশরক্ষা ও শাসনাদি কার্য পরিচালনা করিত ক্ষত্রিয়রা। বাণিজ্য-কৃষি-পশুপালনাদি অর্থনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করিত বৈশ্যরা। আর এই তিন শ্রেণীর সেবাদি করিত শূদ্র জাতীয় লোকেরা। বলা বাহুল্য, শূদ্র শ্রেণীতে স্থান হইয়াছিল অনার্যদেরই। আর্যরা নিজেদের জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই যদিও ছিল কর্তা, তবুও মেয়েদের স্থানও ছিল উচ্চে। পুরুষদের মতো তাহারাও শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রাদি অনুশীলন করিত। গৃহস্থালী কাজের পরে সামাজিক ও ধর্মীয় সর্ব ব্যাপারেই মেয়েরা অংশ গ্রহণ করিত। ধর্মীয় ব্যাপারে আর্যরা ছিল বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। আকাশের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, আলোকের দেবতা সূর্য, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, উষা প্রভৃতি ছিল তাহাদের উপাস্য দেবদেবী। প্রথমে তাহাদের ধর্মীয় আচরণে যাগযজ্ঞাদিই ছিল প্রধান। মূর্তিপূজা বা বলিদান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কিন্তু পরে অনার্যদের প্রভাবে আর্য ধর্মাচরণে ইহারাও স্থান করিয়া লয়। শুধু তাহাই নহে, শিবপূজা এবং মাতৃমূর্তিপূজাও—সিন্ধু উপত্যকায় যাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—আর্যরা অনার্যদের কাছ হইতেই গ্রহণ করে।

আর্য সমাজ ও সভ্যতা

সেই সময়কার আর্যদের অর্থনৈতিক জীবনের মূলভিত্তি ছিল কৃষি ও পশুপালন। তবে বস্ত্রাদি, মাটির পাত্র, ধাতুদ্রব্য, কাষ্ঠদ্রব্য প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মাণসংক্রান্ত শিল্পও তাহাদের অজানা ছিল না। অবশ্য, কৃষিকার্য, ঘরবাড়ী নির্মাণের কৌশল, মৃৎশিল্প প্রভৃতি তাহারা শিখিয়াছিল অনার্যদের কাছ হইতে। পক্ষান্তরে, আবার অশ্ব ও রথের ব্যবহার, লোহার ব্যবহার, সেলাইকরা পোশাকের ব্যবহার প্রভৃতি তাহারাই এদেশে প্রচলন করে। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যদিও কিছুই জানা সম্ভব হয় নাই, আর্যদের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর বিবরণ রহিয়াছে। উহা হইতেই জানা যায়, আর্যরা এদেশে আসিয়া বিভিন্ন অংশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ঐসব রাজ্যে যদিও শাসন-ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা ছিল রাজা, কার্যত জন-প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সভা ও সমিতি নামক দুইটি পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই তাঁহাকে চলিতে হইত। রাজ্যের ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসনকার্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল গ্রামণীদের উপর। রাজ্যের শাসনকার্যাদি পরিচালনার জন্য রাজা সেনানী, পুরোহিত প্রমুখ রাজ-কর্মচারীদের নিয়োগ করিত। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। ফলে, ধীরে ধীরে দুর্বল রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, এবং বড়ো বড়ো রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এইসব রাজ্যের রাজারা দিগ্বিজয়ে সাফল্যলাভ করিয়া অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া সম্রাট, একরাট প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিত।

নূতন ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাব

বৈদিক যুগের শেষ দিকে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সাধারণের অবোধ্য কতগুলি জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের সমষ্টিতে পরিণত হয়। একদিকে যেমন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্যের সংগে সংগে ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, তেমনি অন্যদিকে জাতিভেদ প্রথাও কঠোরতর হইয়া দাঁড়ায়। এই অন্তঃসারহীন সংকীর্ণ আদর্শভ্রষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ধর্মের অনুশাসন স্বভাবতই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। আর ইহারই ফলে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে বহু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থাদি হইতে এবং বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে গ্রথিত রামায়ণ ও মহাভারত নামক মহাকাব্যদ্বয় হইতে জানা যায়,

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ষোড়শ মহাজনপদ

সমসাময়িক ভারতবর্ষে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে এদেশে কাশী, কোশল, অংগ, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদী, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অস্মক, অবন্তী, গন্ধার ও কম্বোজ নামে ষোলটি বড়ো বড়ো রাজ্য বা মহাজনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের বেশীর ভাগ রাজ্যেই যদিও ছিল রাজতন্ত্র, তবে কোথাও কোথাও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রেরও অস্তিত্ব ছিল। ষোড়শ মহাজনপদ ছাড়াও কপিলাবস্তুর শাক্যজাতি, পিপ্পলীবনের মৌর্যজাতি, ভর্গ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। (গৌতম বুদ্ধ ছিলেন শাক্যজাতির নায়ক শুদ্ধোদনের পুত্র।) এই ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ক্ষমতালাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যে মগধ রাজ্য সবচাইতে শক্তিশালী হইয়া উঠে। মগধের রাজা বিম্বিসার অংগ রাজ্য জয় করেন এবং কাশীরাজকন্যা কোশলদেবীকে বিবাহ করিয়া কাশীরাজ্যের একটি বড়ো গ্রাম যৌতুক লাভ করিয়া মগধ-

মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান

সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু পূর্বভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলিকে জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের সীমানা আরও দুইশত যোজন বিস্তৃত করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরদের দুর্বলতার ফলে শেষপর্যন্ত মন্ত্রী শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার আমলেই অবন্তী, বৎস ও কোশল রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার বংশধররাও ছিলেন দুর্বল। আর তাহারই ফলে মগধের সিংহাসন শেষ পর্যন্ত চলিয়া যায় নন্দবংশের অধিকারে। নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ মগধ সাম্রাজ্যকে যেমন বিশালতর করিয়া তোলেন, তেমনি তাহাকে অধিকতর সুগঠিত ও শক্তিশালীও করিয়া তোলেন। তাহার পর আরও আটজন নন্দবংশীয় নরপতি মগধ সাম্রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের শেষ নরপতি ধননন্দ

যখন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

ইতিপূর্বে পারস্য সম্রাট সাইরাস গন্ধার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র দারায়ুস গন্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা জয় করিয়া ঐ অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী-কালে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের হস্তে পারস্য-সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস পরাজিত হইলে এদেশে যদিও পারসিক আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবু ভারতীয় শিল্প ও শাসন-ব্যবস্থায় পারসিক প্রভাব অব্যাহত থাকে। পারস্য বিজয়ের পর আলেকজাণ্ডার

ভারতবর্ষে পারসিক ও গ্রীক অভিযান

দারায়ুস

আলেকজাণ্ডার

ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগে বিপাশা নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। তাঁহার সৈন্যরা আর পূর্বে অগ্রসর হইতে রাজী না থাকায় আলেকজাণ্ডার ঐ স্থান হইতেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং পথে ব্যাবিলনে মারা যান (খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ)।

তাঁহার মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই এদেশ হইতে গ্রীক অধিকার লোপ পাইলেও এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার এই আক্রমণের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এই আক্রমণের ফলে স্থলপথে ও জলপথে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির, বিশেষ করিয়া গ্রীস দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলেই এদেশে গ্রীক ও রোমান শিল্প-

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য
আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় পথ
নিয়ারকসের যাত্রাপথ
ম্যাসিডন
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
জগডিয়ানা
ব্যাকট্রিয়া
আর্মেনিয়া
গর্ডিয়াম
সার্ডিস
ফ্রিজিয়া
ইসাস
এন্টিয়োক
সাইপ্রাস
টায়ার
সাইডন
জেরুসালেম
গাজা
ভূমধ্যসাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
লিবিয়া
মেমফিস
মিশর
আফ্রিকা
লোহিত সাগর
আরব দেশ
নিনেভে
আরবেলা
ওপিস
ব্যাবিলন
একবাটানা
বেহিস্তান
সুসা
পার্সিপোলিস
পারস্য
পারস্য উপসাগর
আফগানিস্তান
তক্ষশীলা
গেড্রোসিয়া
পুরা
পট্টল
পঞ্জাব
ভারত
ভারত মহাসাগর
(প্রাচীন লোহিত সাগর)
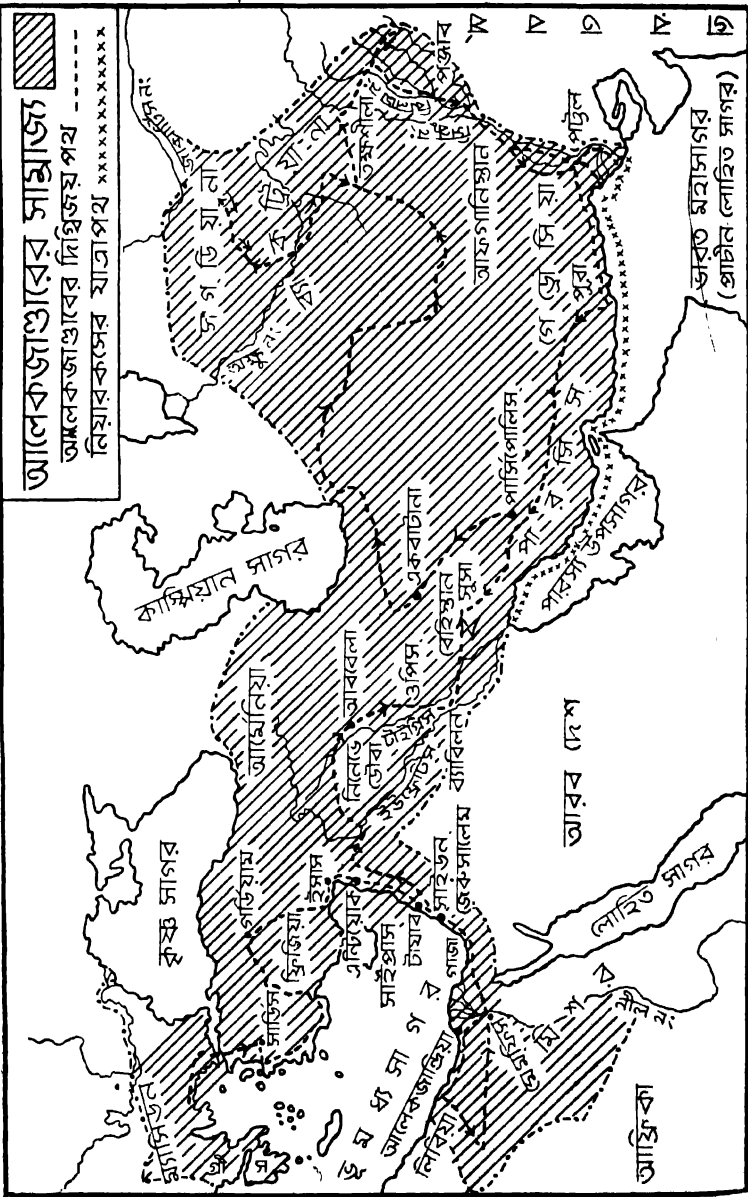
সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করে। ইহার অপূর্ব নিদর্শন গন্ধার শিল্পশৈলীর ভাস্কর্য-সমূহ। এদেশের মুদ্রানীতি, বিজ্ঞান, নাটক প্রভৃতি গ্রীকপ্রভাবে সমৃদ্ধতর হইয়া ওঠে। অপর দিকে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির উপরও পড়ে। খৃষ্ট ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কিছুটা প্রতিফলিত

গন্ধার শিল্প (মাতা ও পুত্র)

হইয়াছিল। ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্য

আলেকজাণ্ডার বিপাশার পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হইলেও ধননন্দের ভাগ্যে আর বেশীদিন রাজত্ব করা সম্ভব হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামক জনৈক যুবক ধননন্দকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন ও মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুসংবাদ এদেশে পৌঁছিলে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের গ্রীক শাসনকর্তাদের পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চলও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

করিয়া লন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিজিত ভারতবর্ষের এই অংশ ও সীরিয়ার অধিকার তাঁহার সেনাপতি সেলুকাসের উপর বর্তাইয়াছিল। এইবার তিনি হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট নামে চারিটি প্রান্তিক রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থেনিস নামে তিনি যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহার বিবরণ সমসাময়িক ভারতেতিহাসের এক অনবদ্য আকরগ্রন্থ। ঐতিহাসিক যুগে চন্দ্রগুপ্তই প্রথম প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ হইতে ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসারের সময়েও গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত ভারতের সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁহার পুত্র অশোক (খৃঃ পূঃ ২৭৬—২৩৬) রাজা হওয়ার তের বছর পরে কলিংগ রাজ্য জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্য আরও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য তাঁহার মনকে ব্যথিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। অবশেষে তিনি চিরকালের মতো দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া

অশোক

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, এবং প্রেম ও মৈত্রীর বাণী দ্বারা ধর্মবিজয়ের নীতি গ্রহণ করেন। রাজধর্মের এক নূতন আদর্শ তিনি জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। স্বদেশে কি জীব-জন্তু, কি প্রজাসাধারণের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণসাধনই যেমন তাঁহার রাজ্যশাসন নীতির মূল কথা ছিল, বিদেশের সমস্ত রাজাদের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনও ছিল তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। মানুষ এমন কি পশুর চিকিৎসার জন্যও তিনি

অশোকের সাম্রাজ্য
ম্যাসিডন
(অংতিকিনি)
কৃষ্ণ সাগর
এসিয়া মাইনর
রোম
কার্থেজ
সাইরিনি
(মগ)
সিরিয়া
আসীরিয়া
ব্যাবিলন
সুসা
আ র ব
পশ্চিম সাগর
পূর্ব্ব সাগর
তি ব্ব ত
চী ন দে শ
কাম্বোজ
গন্ধার
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
দিল্লী
মথুরা
কপিলাবস্তু
পাটলিপুত্র
কামরূপ
সারনাথ
সাঁচী
উজ্জয়িনী
বুদ্ধগয়া
বঙ্গ
সুবার্ট
ধৌলি
সিদ্ধপুর
তাম্রপর্ণি
সুবর্ণভূমি
অশোকের ধর্ম্মলিপি
ধর্ম্মের দ্বারা বিজিত রাজ্য
স্বকীয় রাজ্য

চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও অন্য ধর্মমতের প্রতিও তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল। তবে তাঁহারই আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুবর্ণভূমি, অর্থাৎ যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশসমূহে এবং সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ বিশেষ লোককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেশের মধ্যেও লোকেরা যাহাতে সৎপথে থাকে তাহার জন্য অশোক পর্বতগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে সর্বধর্ম অনু-

সারনাথের স্তম্ভশীর্ষ
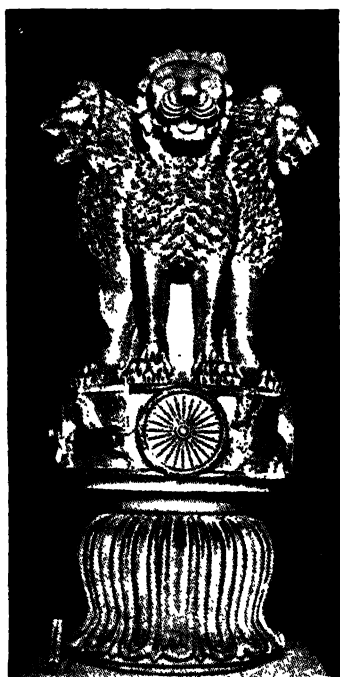
মোদিত উপদেশাবলী খোদাই করিয়া দিতেন। এইসব শিলালিপির অনেক-গুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পরবর্তী মৌর্য সম্রাটের পারিবারিক দ্বন্দ্ব, তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রাধান্য লাভের চেষ্টা প্রভৃতি কারণে তাঁহার মৃত্যুর অল্প পরেই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে শেষ মৌর্য সম্রাট

সময়-পঞ্জী

৫০০০ খৃঃ পূঃ—১ খৃষ্টাব্দ

৪০০০ খৃঃ পূঃ	সিন্ধু সভ্যতার পত্তন
৩০০০ খৃঃ পূঃ	
২০০০ খৃঃ পূঃ	সিন্ধু সভ্যতার পতন ও আর্যদের আগমন (১৫০০ খৃঃ পূঃ)
১০০০ খৃঃ পূঃ	
৫০০ খৃঃ পূঃ	বিম্বিসারের মগধের সিংহাসনে আরোহণ (৫৪৪)। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ (৩২৭)। চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৩২৪)। অশোকের রাজ্যাভিষেক (২৬৯)। শুংগ বংশ, কাণ্ব বংশ, মগধ সাম্রাজ্যের পতন
১ খৃঃ পূঃ	

বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুংগ মগধের সিংহাসনে শুংগবংশের অধিকার স্থাপন করেন।

মেগাস্থেনিসের বিবরণ ও সমকালীন অপর একখানি গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (কেহ কেহ মনে করেন উহা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী বা পরামর্শদাতা চাণক্য বা কৌটিল্যের রচনা) হইতে জানা যায়, সেই যুগে শাসন-ব্যবস্থা আজিকার মতোই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রে মন্ত্রীপরিষদ নামে একটি কেন্দ্রীয় সভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা রাজ্যশাসন করিতেন। দেশের সর্বত্র কি ঘটিতেছে তাহার গোপন তথ্য রাজাকে সরবরাহের জন্য ছিল অসংখ্য গুপ্তচর। রাজা স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন এবং দণ্ডবিধি ছিল কঠোর। বিচার ব্যাপারে সকলকেই সমান চোখে দেখা হইত এবং শাসন-ব্যবস্থার মূল আদর্শই ছিল প্রজাদের সর্বাংগীণ মংগলসাধন। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থাও যে অনেকটা আধুনিক কালের মতোই পরিচালিত, হইত তাহার প্রমাণ আমরা পাই চন্দ্রগুপ্তের সময়ে রাজধানী পাটলীপুত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার বিবরণ হইতে। ত্রিশজন সদস্য লইয়া একটি নগর-পরিষদ ইহার কার্য পরিচালনা করিত। এই নগর-পরিষদ আবার শিল্পোৎপাদন, বিদেশীদের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্যের জন্য ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক বোর্ডে ছিল পাঁচজন সদস্য। একই নীতিতে সৈন্য বাহিনীর কার্যও পরিচালিত হইত। প্রত্যেক বোর্ডের পৃথক দায়িত্ব ছিল।

সেই সময় জনসাধারণের জীবন ছিল শান্তিপূর্ণ। কৃষি ছিল তাহাদের প্রধান জীবিকা। চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি ছিল অজ্ঞাত। মিতব্যয়িতা ও শ্রমপরায়ণতা ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

মৌর্যযুগে এদেশে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলারও বিশেষ উন্নতি ঘটে এবং তাহাদের উপর পারসিক ও গ্রীক শিল্পশৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে বরাবর পাহাড়ে নির্মিত বিভিন্ন গুহাচৈত্যের বা পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের স্থাপত্য কলা এবং বিভিন্ন স্তম্ভশীর্ষের পশুমূর্তিগুলি উন্নত শিল্পকলারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

পুষ্যমিত্রের পর আরও নয়জন শুংগবংশীয় রাজা মগধের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ছিল দুর্বল। ফলে শেষ শুংগ রাজা দেবভূতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহারই মন্ত্রী বসুদেব মগধের সিংহাসনে কাণ্ব-

বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ৩০ খৃঃ পূর্বাব্দে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজাদের হস্তে কাণ্ববংশের পতন ঘটিলে মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

অশোকের পরবর্তী মৌর্যসম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে সেই সময়ই বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণ, পহ্লব দেশের পহ্লবগণ, শকস্তানের শকগণ এবং উত্তরাঞ্চল হইতে আগত কুষাণগণ একে একে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। এইসব বৈদেশিক নরপতিদের মধ্যে ব্যাকৃট্রিয় নৃপতি মিনাণ্ডার, শক নৃপতি নহপান ও রুদ্রদামন, পহ্লব নৃপতি গণ্ডোফার্ণিস প্রভৃতির নাম

বৈদেশিক রাজবংশ

কণিষ্ক

উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে কুষাণ নরপতিগণই এদেশে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া ওঠে। কুষাণ-রাজ কণিষ্ক তাঁহার রাজ্যের পরিধি পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার খোটান ও খোরসান হইতে শুরু করিয়া পূর্বে বিহার ও কোংকন উপকূল পর্যন্ত বিস্তার করেন। তিনি শুধু দিগ্বিজয়ী নৃপতি হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন নাই। অশোকের পদাংক অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায়, অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচারে, ধর্মমতের উদারতায়, শিল্প ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার আমলেই বৌদ্ধ মহাযান মতের

কুষাণ সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি

বিকাশ ঘটে। পূর্বে বুদ্ধকে দেবতারূপে পূজা করা হইত না। মহাযান মতের বিকাশের ফলে তিনি দেবতারূপে পূজা পাইতে লাগিলেন। নানারূপ বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হইতে লাগিল এবং দেবমন্দিরে সেগুলি পূজা পাইতে লাগিল। ফলে, সাধারণ লোকের কাছে বৌদ্ধধর্মের আবেদন বৃদ্ধি পাইল এবং ভারতে ও বাহিরে ইহার প্রচার সহজ হইল। মহাযান মতের প্রসারের ফলে বৌদ্ধ ভাস্কর্যশিল্পও উৎসাহ পায়। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরুষপুরের চৈত্য নির্মিত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ চরক প্রভৃতির অবদান আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান শিল্পের অপূর্ব সমন্বয়ে গন্ধার-শিল্পশৈলীর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু কণিষ্কের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে কুষাণ রাজারা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কুষাণ রাজ্যের পরিধি সংকীর্ণতর হইয়া শেষ পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সীমিত হইয়া পড়ে।

মৌর্যোত্তর যুগে, বিশেষ করিয়া কুষাণদের রাজত্বকালে, বহির্বিশ্বের সহিত নানাভাবে ভারতের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। মধ্য এশিয়ার কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানের সহিত অশোক যে ধর্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে দৃঢ়তর হইল। ফলে, পরবর্তীকালে ঐসব অঞ্চলেও ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পারস্য, সীরিয়া হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার ভিতর দিয়া গ্রীস ও রোমের সহিত পূর্ব হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা এই সময়ে আরও বৃদ্ধি পাইল। কুষাণদের রাজত্বকালে চীনদেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে দুইজন বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক চীনে গিয়াছিলেন। ঐসব আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ফলেই কুষাণ সভ্যতা এত উন্নত হইয়াছিল।

কুষাণদের পর ভারতীয় রাজনৈতিক রংগমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে গুপ্ত বংশের। গুপ্তবংশের সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

গুপ্ত রাজবংশ

বস্তুত তিনিই ছিলেন এই রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা (৩২০ খৃষ্টাব্দ)। তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তর ভারত ও মধ্য ভারত জয় করিয়া নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দক্ষিণ

ভারতও তিনি জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অঞ্চলের রাজাদের পরাজিত করিয়া তাহাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াই তিনি তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দেন। এইভাবে আসমুদ্র হিমাচল সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু তিনি শুধুই দিগ্বিজয়ী রাজামাত্র ছিলেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তিনি বিখ্যাত হইয়া আছেন। নিজে হিন্দুধর্মের অনুরাগী হইলেও পরধর্মের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও সংস্কৃতির অনুশীলনের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত হইয়া আছেন। তাঁহার আমলে ফা-হিয়ান

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

নামে যে চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসেন, তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, গুপ্ত আমলের উদার শাসন-ব্যবস্থার ফলে সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা স্থাপিত হইয়াছিল। জনসাধারণ উন্নত, সচ্ছল ও সন্তোষপূর্ণ জীবন যাপন করিত। পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল সেই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পরবর্তী গুপ্তসম্রাটদের দুর্বলতা ও আত্মকলহের ফলে ভাংগিয়া পড়িতে শুরু করে। প্রাদেশিক শাসকরা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন শুরু করে। ফলে, হুণরা যখন এদেশ আক্রমণ করে তখন তাহাদের বাধা দিবার শক্তি গুপ্ত রাজাদের আর ছিল না। এইভাবেই বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্য
গন্ধার
কাবুল
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
কুষাণ রাজ্য
কর্তৃপুর
মদ্রক
যৌধেয়
দিল্লী
মিরাট
শ্রাবস্তী
নেপাল
ললিতাপুর
কপিলবস্তু
কামরূপ
আশ্রিত রাজ্য
মথুরা
বৈরাট
অযোধ্যা
কোশল
বৈশালী
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র
যমুনা
প্রয়াগ
কাশী
শকরাজ্য
সাঁচী
শোণ
বুদ্ধগয়া
সমতট
মালব
বঙ্গ
উজ্জয়িনী
নর্মদা
মহাকোশল
তাম্রলিপ্তি
সৌরাষ্ট্র
গিরনার
ওড্র
তাপ্তী
ধৌলি
সুরাট
নাসিক
গোদাবরী
অন্ধ্র
অমরাবতী
বেঙ্গী
সিদ্ধপুর
কৃষ্ণা
পেনার
কাঞ্চী
পল্লব
কাবেরী
চোল
সিংহল
অশোকের শিলালিপি
মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা
গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা
সমুদ্রগুপ্তের অভিযানপথ
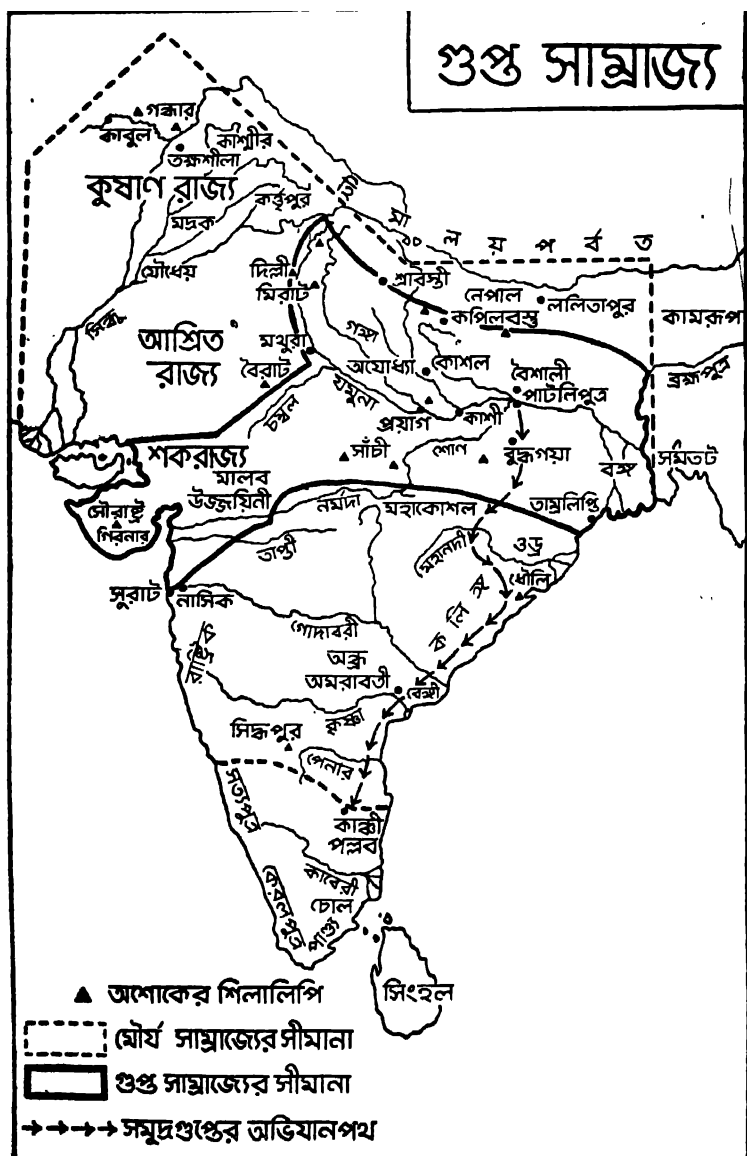
সময়-পঞ্জী

১—৫০০ খৃষ্টাব্দ

১ খৃষ্টাব্দ	খৃষ্টের জন্ম (৪) কণিষ্ক—শকাব্দ প্রচলন (৭৮)
১০০ ”	
২০০ ”	কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতন (২০০)
৩০০ ”	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সমুদ্রগুপ্ত (৩২০) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০) হূণ-আক্রমণ
৪০০ ”	গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন
৫০০ ”	

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ ভারত ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে বিখ্যাত। রাজনৈতিক শান্তির সংগে সংগে এই যুগে সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি সংস্কৃতির সকল পর্যায়ের যে অপূর্ব বিকাশ ঘটে তাহা অতুলনীয়। গুপ্ত যুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান

স্বর্ণ যুগ

নটরাজ (ইলোরা)

ঘটে। ঐ সময়ই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার পূজা প্রচলিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের কালও গুপ্ত যুগ। এই যুগেই

কালিদাস, বসুবন্ধু, শূদ্রক, বিশাখ দত্ত, হরিষেণ প্রমুখ সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের এবং বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট, জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহির

মা ও মেয়ে (অজন্তা)

প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-কলারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। দেওগড় ও ভিটারগাওর মন্দিরগুলি, ইলোরার স্থাপত্যকলা বা অজন্তার চিত্রকলা আজও আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

গুপ্তরাজবংশের পতনের পর যে সব প্রাদেশিক রাজ্য মাথা চাড়া দিয়া ওঠে তাহাদের মধ্যে কনৌজ, বল্লভী, গৌড়, কামরূপ, থানেশ্বর প্রভৃতি প্রধান। অবশেষে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধন পুনরায় প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়িয়া এক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন। তাঁহার আমলে হিউয়েন সাঙ নামে যে চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসেন, তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে শৈব এবং পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও অপরাপর ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে

হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন

তিনি সব সময়ই নজর রাখিতেন এবং স্বয়ং ছিলেন শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চে। তিনি নিজে যে শুধু সুসাহিত্যিক ছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার আমলে রাজস্বের এক বড়ো অংশ সাহিত্য ও শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। এই সময়ই বাণভট্ট প্রমুখ কবি এবং শীলভদ্র প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌দের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর আবার উত্তর ভারতের এই বিশাল সাম্রাজ্য ভাংগিয়া পড়ে এবং তাহার স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।

এই সময় ধীরে ধীরে পূর্ব প্রান্তের গৌড় রাজ্য শক্তিশালী হইয়া ওঠে। হর্ষবর্ধনের আমলেই গৌড়রাজ শশাংক বিশেষ শক্তিশালী হইয়া

উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর গৌড়ে মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়। তখন বাংলার নেতৃবর্গ গোপাল নামে জনৈক ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। দেশের দুর্দিনে এই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অতুলনীয় ঘটনা। গোপাল প্রতিষ্ঠিত পাল রাজবংশের ধর্মপাল, দেবপাল প্রমুখ নরপতিদের আমলে পুনরায় আসাম হইতে কাশ্মীরের সীমা, হিমালয়

বাংলাদেশের পাল-রাজবংশ
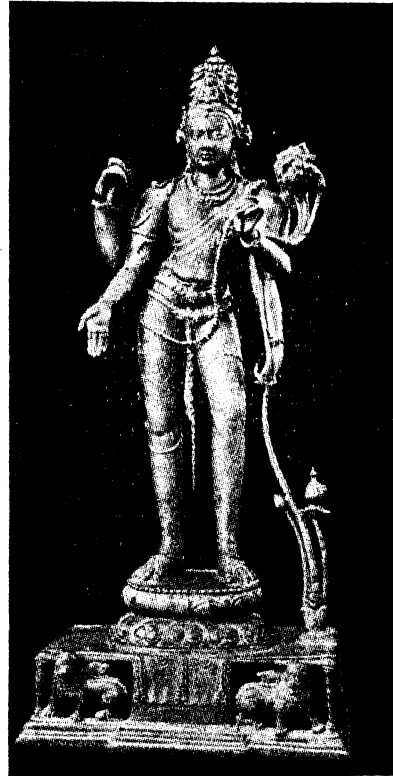
সেনযুগের ভাস্কর্য—সূর্য

পালযুগের ভাস্কর্য—পদ্মপাণি

হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত এলাকা জুড়িয়া আর এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগে বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, সোমপুরী মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়; নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময়ই অতীশ দীপংকর বিক্রমশীলা বিহার হইতে তিব্বতে গমন করেন। এই যুগেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ চক্রপানি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রমুখের আবির্ভাব ঘটে। আদি বাংলা রচনা চর্যাপদের রচনাকালও এই যুগেই। এই সময়কার ভাস্কর্যকলার যে সকল নিদর্শন পাহাড়পুর প্রভৃতি জায়গা হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহা অনবদ্য। বিখ্যাত ভাস্কর বীতপাল ও ধীমান এই যুগেরই লোক।

সেন রাজবংশ

কিন্তু কালক্রমে পাল রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে বিজয় সেন বাংলার সিংহাসনে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজা বিজয় সেন ও বল্লাল সেন দেশের শান্তি ও শৃংখলা ফিরাইয়া আনেন।

সময়-পঞ্জী

খৃঃ ৬০০	হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ (৬০৬); হর্ষবর্ধনের মৃত্যু (৬২৫)
৭০০	
	গোপাল কর্তৃক পালবংশের প্রতিষ্ঠা (৭৫০)
	গোপালের মৃত্যু ও দেবপালের সিংহাসন লাভ (৭৭০)
৮০০	ধর্মপালের মৃত্যু ও দেবপালের সিংহাসন লাভ (৮১০)
	দেবপালের মৃত্যু (৮৫০)
৯০০	
১০০০	বিজয় সেন কর্তৃক সেন বংশের প্রতিষ্ঠা (১০২৫)
১১০০	
	বল্লাল সেনের সিংহাসন লাভ (১১৫৮)
	বল্লালের মৃত্যু ও লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন লাভ (১১৭৯)
১২০০	সেন বংশের পতন ও মুসলমান রাজ্য স্থাপন (১২০৫)

এই বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন বিদেশী মুসলমানদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন নাই। পাল নরপতিদের মতো সেন রাজারাও শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষার অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গুণবিষ্ণু, ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ, ঈশান, উমাপতি ধর প্রমুখ ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক। সেনরাজারা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময়েই হিন্দুসমাজ বর্তমান রূপ ধারণ করে। বস্তুত এই সময়েই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, গন্ধবণিক, মোদক, তন্তুবায় প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণীর সূচনা হয়, এবং বর্তমান কৌলিন্যপ্রথাও চালু হয়।

দক্ষিণ ভারতের রাজবৃত্ত

উত্তর ভারতে যখন এইসব বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটিতেছিল, দক্ষিণ ভারতেও তখন বিভিন্ন রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিল।
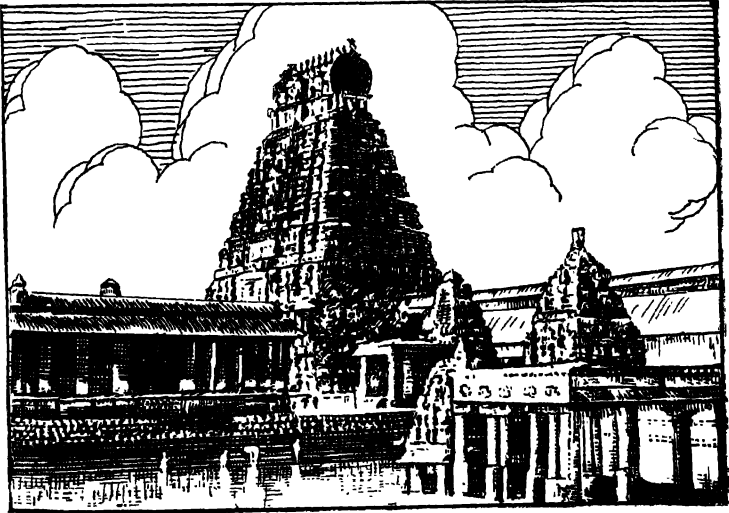
কাঞ্চীভরমের মন্দির

ইহাদের মধ্যে কাণ্ববংশ ধ্বংসকারী সাতবাহনদের কথা তোমরা জান। পরবর্তীকালে সাতবাহন বংশের পতনের পর তাহাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বাকাটক, আভীর, কদম্ব, পল্লব প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করিতে থাকে। ইহাদের অনেকেই গুপ্ত সম্রাট

সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে যেসব রাজবংশ প্রাধান্য অর্জন করে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, পল্লব প্রভৃতি এবং সুদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য, চের প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব রাজবংশের আমলে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে উত্তর ভারতের বা বৈদেশিক শিল্পশৈলীর প্রভাবমুক্ত যে সব শিল্পরীতি গড়িয়া উঠে, তাহার অপূর্ব নিদর্শন আজিও মহাবলীপুরম ও কাশীপুরমে (পল্লব-শিল্প), ইলোরার পর্বতগাত্রে (রাষ্ট্রকূট-শিল্প), সঙ্গমেশ্বর ও বিরূপাক্ষের মন্দিরে, এলিফ্যাণ্টা পর্বতগাত্রে (চালুক্য-শিল্প), তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর মন্দিরে এবং নটরাজ প্রভৃতির বিভিন্ন ধাতুমূর্তিতে (চোল-শিল্প) অম্লান হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারায় এই অঞ্চলেই শংকরাচার্য, রামানুজ প্রভৃতির নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়। এই রাজ্যগুলির সামান্য পৃথক আলোচনা নিচে করা যাইতেছে।

রাষ্ট্রকূটরাজগণ

দন্তিবর্মা রাষ্ট্রকূটরাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রাষ্ট্রকূটরাজ বংশ-পরম্পরায় গুর্জর প্রতিহারদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন। অমোঘবর্ষ এই বংশের রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে জীনসেন নামে একজন জৈন ভিক্ষু একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কয়েকখানা দর্শনগ্রন্থ এবং সার-সংগ্রহ নামে একখানা গণিত-শাস্ত্রের পুস্তকও রচিত হয়। আরব পর্যটক সুলেমান অমোঘবর্ষকে খুবই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

দশম শতকের শেষভাগে রাষ্ট্রকূটগণ কল্যাণীর চালুক্য বংশের হাতে পরাজিত হইয়া নিজেদের শক্তি হারান।

দাক্ষিণাত্যের অপরাপর রাজবংশের মতো রাষ্ট্রকূটগণও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের চেষ্টায় ইলোরার পর্বত-গাত্রে খোদিত কৈলাসনাথের মন্দিরটি স্থাপত্য ও আলংকারিক ভাস্কর্য-কৌশলের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত।

চালুক্যরাজগণ

চালুক্যরাজগণ নিজেদের রাজপুত জাতির লোক বলিয়া দাবী করিতেন। কিন্তু এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। যাহা হউক, চালুক্যগণ দক্ষিণ ভারতে বাতাপী ও কল্যাণী এই দুইটি অঞ্চলে দুইটি পৃথক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাতাপীর চালুক্যবংশ

বর্তমান বিজাপুর জেলায় বাতাপীতে চালুক্য বংশের রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানকার চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। কীর্তিবর্মা এই বংশের অন্যতম বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্যের সীমা চতুর্দিকে বর্ধিত করেন। উত্তরে বংগোপসাগর, পূর্বে সমুদ্র, দক্ষিণে তামিল রাজ্যগুলির শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বাতাপীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। হর্ষবর্ধনের নিকট হইতে তাঁহার উত্তরদেশ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত না হইলে, তিনি হয়তো উত্তর ভারতের সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইতেন। দ্বিতীয় পুলকেশী সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁহার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে তিনিই ছিলেন দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালেই দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্য পল্লবদের সহিত চালুক্যদের বিবাদ আরম্ভ হয়। অনেকদিন পর্যন্ত এই বিবাদ চলে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে রাষ্ট্রকূটদের উপর চালুক্যপ্রাধান্যের অবসান ঘটে।

কল্যাণীর চালুক্য বংশ

বাতাপী চালুক্য বংশের একজন দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ লইয়া কল্যাণীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি নিজে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং বিচার, রাজনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

চালুক্যদের রাজত্বকালে এলিফ্যান্টা গুহার কতকগুলি চিত্র অংকিত হয়। চালুক্য রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত সংগমেশ্বর এবং বিরূপাক্ষের মন্দির চালুক্য-স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন।

পল্লবরাজগণ

ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে পল্লব ইতিহাস ভাল করিয়া জানা যায় না। শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবাহু, পল্লব রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। তিনি সুদূর দক্ষিণে চোলরাজ্য, এমন কি সিংহল পর্যন্ত জয় করেন। বাতাপীর চালুক্যদের সহিত দাক্ষিণাত্যের প্রাধান্য লইয়া পল্লবদের যে দীর্ঘদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়াছিল একথা তোমাদের পূর্বে বলা হইয়াছে। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মার রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ্ পল্লবরাজ্যে আসিয়াছিলেন। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নরসিংহ বর্মার পর হইতে ধীরে ধীরে পল্লব রাজ্যের পতন ঘটে। পল্লবদের রাজত্বকালে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি হয়। পল্লব-রাজগণ সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তখনকার দিনে কাঞ্চী ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ। সংস্কৃত কবি ভারবী এবং সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডিন্ পল্লব রাজাদের বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন।

পল্লব রাজত্বকাল স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের উন্নতির জন্য বিখ্যাত। কুষাণদের সময় অমরাবতী ও কৃষ্ণানদীর অববাহিকা অঞ্চলে যে উন্নত ধরনের শিল্প এবং স্থাপত্য-কৌশল গড়িয়া উঠিয়াছিল, পল্লবগণ সেই শিল্প-রীতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পল্লবশিল্প-রীতি গড়িয়া তোলে। কাঞ্চী ও মহাবলীপুরমে পল্লব শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। পল্লব শিল্পীগণ বড়ো বড়ো পাথর কাটিয়া, অপূর্ব দক্ষতার সহিত মন্দিরের কারুকার্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কাঞ্চীর ত্রিপুরান্তকেশ্বর মন্দির, ঐরাবতেশ্বর মন্দির এবং মহাবলীপুরমের মুক্তেশ্বর ও কৈলাস মন্দির বিশেষ বিখ্যাত।

চোলরাজগণ

চোলরাজ্য সুদূর দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হয়তো এই রাজবংশ রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। এক সময় চোলরাজ্য যে পল্লবগণ জয় করিয়াছিলেন সে কথা তোমাদের বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতকের প্রথমভাগে চোলরাজারা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করেন।

চোলরাজগণের মধ্যে রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র চোলদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজরাজ, চের ও পাণ্ড্যরাজ্য এবং দক্ষিণ ভারতের আরও
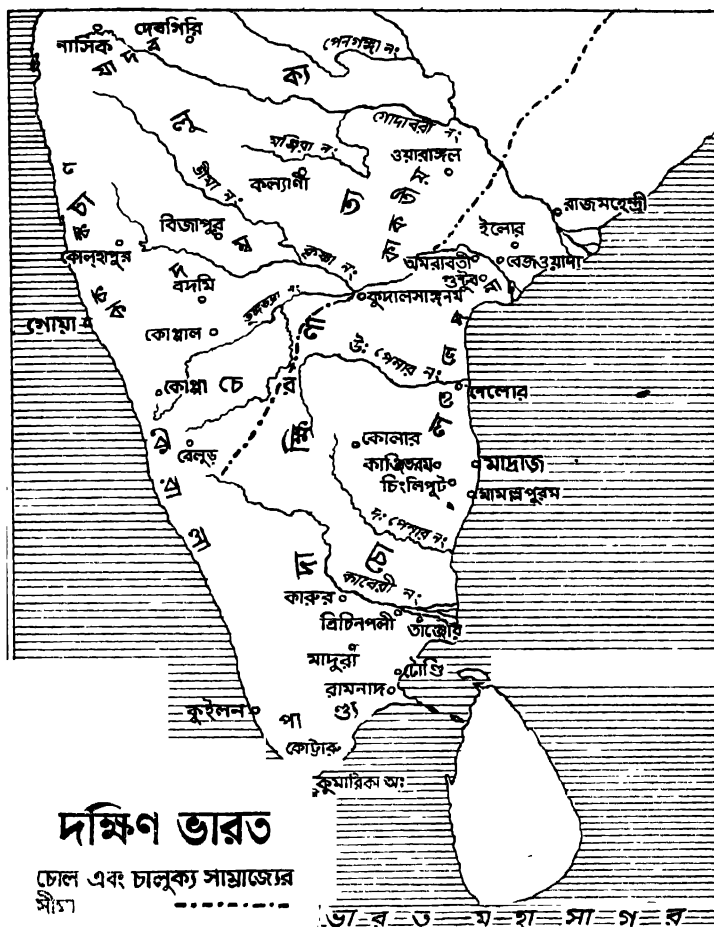
কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া চোলরাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোলদেব উত্তর ভারতেও অভিযান প্রেরণ করেন। বাংলার পাল বংশীয় রাজা মহীপাল তাঁহার নিকট পরাজিত হন। চোলদের বিরাট নৌ-বাহিনী ছিল। ইহার সাহায্যে রাজেন্দ্র চোলদেব পেগু এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর চোলরাজ্য জয় করেন।

শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষের জন্য চোলদের নাম ভারত ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চোলদের সমগ্র রাজ্য কয়েকটি "কট্টম" বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কট্টুমের পর জেলা ("নাড়ু") এবং জেলার পর গ্রাম ("কুররম"), শাসনকার্যের জন্য রাজ্যের এইরূপ বিভাগ ছিল। চোলদের গ্রামের স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েৎ থাকিত। গ্রামের শাসন এই পঞ্চায়েৎ সভাই পরিচালনা করিত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে বিভক্ত ছিল। তোমরা জান যে বর্তমান ভারতেও গ্রাম-পঞ্চায়েৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিল্পকার্যেও চোলগণ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। চোল-শিল্পের রীতি পল্লব-শিল্পের রীতি হইতে পৃথক ছিল। তাঞ্জোরের রাজ-রাজেশ্বর শিবমন্দির চোল-শিল্পকলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি স্তর আছে এবং সকলের উপরে এক বিরাট পাথর বৃত্তাকারে কাটিয়া বসানো হইয়াছে। চোল-শিল্পিগণ ধাতুমূর্তি-নির্মাণেও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

পাণ্ড্যরাজগণ

পাণ্ড্যরাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমরা জানি না। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে পাণ্ড্যরাজ্য পল্লবদের অধীনে ছিল। চোলরাজগণ শক্তিশালী হইয়া পড়িলে এই রাজ্য চোলদের অধীনে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজ্য স্বাধীন এবং প্রতিপত্তিশীল হইয়া ওঠে। পাণ্ড্যরাজ্যের কায়েল সেইযুগে নাম করা বন্দর ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ পাণ্ড্যরাজ্য জয় করে।

দক্ষিণ ভারতের এইসব রাজ্যের ভারতীয় শিল্পে বিশেষ অবদান আছে। উত্তর ভারত বা বৈদেশিক শিল্প-শৈলীর প্রভাবমুক্ত হইয়া এইসব রাজ্য নিজস্ব শিল্প-শৈলী গড়িয়া তোলে।

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণেরও সম্মুখীন হয় প্রথম সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে সেই অঞ্চলের হিন্দুরাজা দাহির আরব সম্রাট হজ্জাজের সেনাপতি কাশিমের নিকট পরাজিত হইলে ঐ অঞ্চল আরবদের

মাদুরায় বৃহৎ মন্দিরের গোপুরম্

অধিকারভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতকে গজনীর মুসলমান রাজাদের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহী রাজাদের বিরোধ শুরু হয়। গজনীর রাজা সবুক্তগীন ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়া কাবুল ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চল দখল করেন। তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ যদিও ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন নাই, কিন্তু মোট সতের বার ভারত আক্রমণ করিয়া তিনি শাহীরাজ্য, মুলতান, কাংড়া, থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ, সোমনাথ প্রভৃতি জায়গা লুণ্ঠন করিয়া অজস্র ধনরত্ন স্বদেশে লইয়া যান। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ

সুলতান মামুদের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ' বছর পরে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন গজনীর পার্শ্ববর্তী ঘুর রাজ্যের শাসক মহম্মদ ঘুরী। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দুরাজাদের পরাজিত করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ জয় করেন এবং নববিজিত রাজ্যগুলির শাসনভার কুতুবউদ্দীন নামক জনৈক ক্রীতদাসের হস্তে অর্পণ করেন (১২০৬ খৃষ্টাব্দ)। কুতুবউদ্দীন স্বয়ং দিল্লী, গোয়ালিয়র কনৌজ প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন, এবং তাঁহার জনৈক সহকর্মী ইখতিয়ার-উদ্দীন-বিন-বখতিয়ার খিলজী বাংলা ও বিহার দেশ জয় করেন। ইহারই হাতে বাংলার শেষ সেনবংশীয় নৃপতি লক্ষ্মণ সেন পরাজিত হন। এইভাবে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের সূচনা হয়।

দাস বংশ

কুতুবউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে দাস বংশ নামে খ্যাত। কারণ, কুতুবউদ্দীন ছাড়াও এই বংশের ইলতুৎমিস, গিয়াসউদ্দীন প্রমুখ আরও কয়েকজন সুলতানও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। দাসবংশে রাজিয়া নামে এক মহিলাও কিছুদিন রাজত্ব করেন। গিয়াসউদ্দীন বলবন ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

খিলজী বংশ

দাসবংশের শেষ সুলতান কাইকোবাদের অকর্মণ্যতার সুযোগ লইয়া ১২৯০ খৃষ্টাব্দে খিলজী বংশীয় জালাল-উদ্দীন ফিরোজ খিলজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খিলজী এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, পাণ্ডু, ধার, চন্দেরী, বরংগল, হোয়সল, মাদুরা জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যসীমা দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কিন্তু শুধু বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। সামরিক শক্তিকে দৃঢ় করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তিনি দেশের শাসন-ব্যবস্থাকেও সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন এক বিশাল সৈন্য বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। এই বাহিনী যাহাতে জিনিসপত্র সস্তায় পায় তাহার জন্য তিনি জিনিসপত্রের দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার হিন্দু প্রজাদের পৃথক দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাহাদের উপর জিজিয়া কর

আলাউদ্দীন খিলজী

স্থাপন করেন এবং আরও নানাভাবে তাহাদের আর্থিক সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করেন।
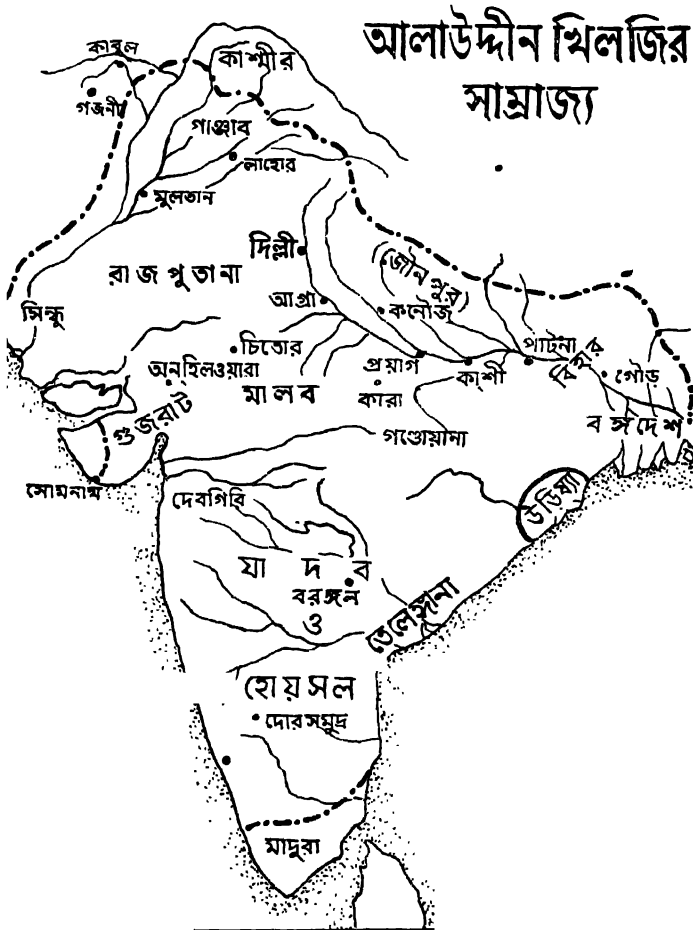
১৩১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর খিলজী বংশের পরবর্তী সুলতানদের অকর্মণ্যতার ফলে আমীর ওমরাহগণ বিরূপ হইয়া ওঠেন এবং তাঁহাদের সমর্থনে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দীন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসন

অধিকার করিয়া তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গিয়াস-উদ্দীনের পুত্র মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্রের শাসক। শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যেমন ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা, তেমনি অন্যদিকে অনভিজ্ঞতা, বাস্তবজ্ঞানের অভাব এবং যুগ অপেক্ষা অগ্রবর্তী চিন্তাধারার ফলে, তিনি শাসক হিসাবে ছিলেন একেবারেই ব্যর্থ। সুলতানের অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে দেশের সর্বত্র বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতৃব্য ফিরোজ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার কয়েকটি কার্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি কয়েকটি সেচ খাল খনন করিয়া দিয়াছিলেন। বেকারদের কর্মসংস্থান করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি কয়েকটি "নিয়োগ পরিষদ" স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে বহু শহর, প্রাসাদ, মসজিদ্, বিদ্যালয় ও উদ্যান স্থাপিত হইয়াছিল। অসহায়দের ভিক্ষাদানের নিমিত্ত এবং পীড়িত ব্যক্তিদের চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি দুইটি বিশেষ সংস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহম্মদ তুঘলকের আমলে সাম্রাজ্যে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়, তাহা দূর হইল না। ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পর তুঘলক সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে, ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন তৈমুরলং এদেশ আক্রমণ করেন তখন তুঘলক বংশের সুলতান মামুদ শাহ তাঁহাকে প্রতিহত করিতে পারেন নাই। তৈমুর সমরকন্দ, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেন। দিল্লী প্রবেশ করিয়া তিনি তিন মাস ধরিয়া অবাধ লুণ্ঠন এবং হত্যাকাণ্ড চালান এবং প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। তিনি দিল্লী ত্যাগের পরেই সে অঞ্চলে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়।

তুঘলক বংশ

তৈমুর ফিরিয়া গেলে মামুদ শাহ আরও কিছুকাল রাজত্ব করেন বটে কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই তুঘলক বংশের অবসান ঘটাইয়া দৌলত খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪১৩ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু অচিরেই মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। তাঁহার বংশীয়রা যদিও প্রায় ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যসীমা প্রায় দিল্লীর চারিদিকেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইঁহারা নিজেদের হজরৎ মহম্মদের

সৈয়দ ও লোদী বংশ

বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন ; সেইজন্য এই সুলতান বংশ সৈয়দ বংশ নামে খ্যাত। সৈয়দ সুলতানের পরে দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করেন লোদী বংশীয় সুলতানরা। লোদী সুলতান সিকান্দারের আমলে শান্তি-শৃংখলা বহুলাংশে ফিরিয়া আসিলেও তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদীর অকর্মণ্যতার ফলে আমীর-ওমরাহরা পুনরায় বিরক্ত হইয়া ওঠেন। ফলে তাঁহাদের আমন্ত্রণে ও সহযোগিতায় মোগল বংশীয় বাবর অতি সহজেই পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খৃষ্টাব্দ) তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। এইভাবে ভারতবর্ষে সুলতানদের শাসন শেষ হইয়া মোগল শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

সময়-পঞ্জী

ভারতে সুলতানী রাজত্ব

১২০০ খৃঃ	দাস বংশের প্রতিষ্ঠা (১২০৬)
	দাস বংশের অবসান ও খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা (১২৯০)
১৩০০ ,,	খিলজী বংশের অবসান ও তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা ১৩২০)
১৪০০ ,,	তুঘলক বংশের অবসান ও সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা (১৪১৩)
	সৈযদ বংশের অবসান ও লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা (১৪৫১)
১৫০০ ,,	লোদী বংশের অবসান (১৫২৬)
১৬০০	

ইতিপূর্বে যে সব বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল ভারতীয় সংস্কৃতি তাহাদের সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। সুলতানী আমলে মুসলমান সংস্কৃতি একদিকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে অটল রহিল তেমনি অন্যদিকে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি নানাবিধ রক্ষণশীলতার আড়ালে নিজেকে আলাদা করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই এই পরস্পরবিরোধী মনোভাব হ্রাস পাইতে থাকিল এবং ক্রমেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফল প্রথম দেখা দেয় ধর্মের ক্ষেত্রে। সত্যপীরের পূজার উদ্ভব ঘটে। নানক, কবীর, চৈতন্য, রামানন্দ, নামদেব প্রভৃতি মহাপুরুষেরা হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের সমন্বয়-সাধনায় ব্রতী হন। শুধু তাই নয়। এই সময় হিন্দুধর্মে যে ভক্তিবাদ বা মুসলমান ধর্মে যে সুফীবাদের উদ্ভব হয় তাহাও হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের পরস্পর প্রভাবেরই ফল।

সুলতানী আমলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

এই সময় ভারতবর্ষে একদিকে যেমন আরবী ও ফারসী ভাষার উন্নতি ঘটে, তেমনি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। আমীর খসরু, জিয়াউদ্দীন বরণী, মিনহাজ-উস-সিরাজ (ফারসী ভাষায়), চাঁদ বরদৈ, রামানন্দ, কবীর, গোরখনাথ (হিন্দী ভাষায়), বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, শ্রীকর নন্দী (বাংলা ভাষায়) প্রভৃতি ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

শিল্পের ক্ষেত্রে সুলতানীযুগের দান উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর কুতুব মিনার, আলাই দরওয়াজা, ফিরোজ শাহের সমাধি প্রভৃতি, জৌনপুরের অতাল মসজিদ, গুজরাটের মাফিজ মসজিদ, বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল প্রভৃতি সেই যুগের হিন্দু ও মুসলিম শিল্প-শৈলীর সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন।

বাবর ভারতবর্ষে যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন খুব বেশীদিন তিনি তাহার ভিত্তি দৃঢ় করিবার অবকাশ পান নাই। মাত্র চারিবৎসর রাজত্ব করার পর তাঁহার মৃত্যু হইলে দিল্লীর সিংহাসনে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন যখন আরোহণ করেন তখনই পূর্ব-ভারতের আফগান দলপতিরা মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করেন।

মোগল সাম্রাজ্য

বিহারের আফগান নেতা শেরশাহ ক্রমেই শক্তিবৃদ্ধি শুরু করিলে হুমায়ুন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু শেরশাহের চতুরতায় তিনি
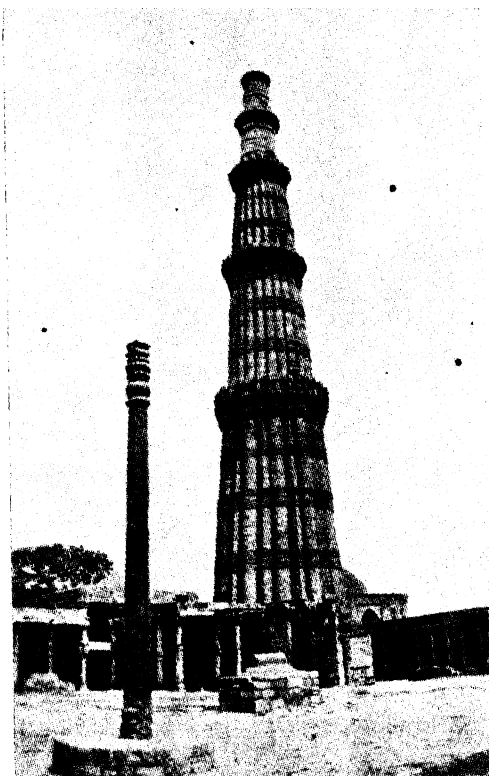
কুতুব মিনার

পর পর চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া পারস্যে চলিয়া যান। ফলে, সাময়িকভাবে মোগল সাম্রাজ্য শেরশাহের হাতে চলিয়া যায়। শেরশাহ সিন্ধুদেশ, মুলতান, বাংলাদেশ, গোয়ালিয়র, মালব ও মেবার জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে বিস্ফোরণের ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দুর্বল বংশধরদের পক্ষে এত বড়ো সাম্রাজ্যশাসন বেশীদিন

সম্ভব হইল না। শূর বংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া হুমায়ুন পুনরায় ভারত আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

হুমায়ুন

শের শাহ

ইহার মাত্র এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হইলে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র আকবর। আকবরই এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁহার আমলেই যেমন মালব, গণ্ডোয়ানা, অম্বর, চিতোর, রণথম্ভোর, কালিঞ্জর, বিকানীর, চিতোর, বাংলা, উড়িষ্যা, কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, আহম্মদনগর, বেরার, অসীরগড়, খান্দেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি তাঁহার উদার ধর্মনীতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সম্রাটের প্রতি অনুগত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষের সম্রাটকে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়দের জাতীয় সম্রাট হইতে হইবে এই কথা আকবর যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে এক শের শাহ

আকবর

ভিন্ন অপর কেহ তেমন উপলব্ধি করেন নাই। আকবরের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন জাহাংগীর। তাঁহার আমলে মেবার ও আহম্মদনগরের অবিজিত অংশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহার আমলেই ইংরেজ বণিকেরা এদেশে প্রথম বাণিজ্য করিতে আসে।

জাহাংগীরের পর তাঁহার পুত্র শাহজাহান দাক্ষিণাত্যের অবিজিত গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য জয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেন।

জাহাংগীর

শাহজাহান

কিন্তু তাঁহার পুত্র ঔরংগজেব তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহাকে বন্দী করিয়া এবং ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া লন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও সমরকুশল সেনাপতি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও সংযমী। কিন্তু সম্রাট আকবর যে উদার ও সর্বধর্মসহিষ্ণু মতবাদের দ্বারা ভারতবাসীকে একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন তাহা অনুসরণ করা ঔরংগজেবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার এই অদূরদর্শী ধর্মান্ধনীতির ফলে শীঘ্রই জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী সম্প্রদায়, শিখ, মারাঠা ও রাজপুতরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি ইহাদের দমনে প্রয়াস পাইলেও শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সার্থককাম হন নাই। ফলে, ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরই মোগল সাম্রাজ্য ভাংগিয়া পড়িতে শুরু করে। বাংলাদেশ, অযোধ্যা,

মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য
কাবুল
কাবুল নদী
কা শ্মী র
লাহোর
মুলতান
পানিপথ
দিল্লী
হি মা ল য়
রাজপুতানা
সিন্ধু নদ
সি ন্ধু
আজমীড়
সিক্রি
আগ্রা
অ যো ধ্যা
চিতোর
মালব
এলাহাবাদ
বারাণসী
চুনার
গৌড়
পদ্মা
শোন
বঙ্গদেশ
বিন্ধ্য পর্বত
আমেদাবাদ
গুজরাট
নর্মদা
খান্দেশ
তাপ্তী
মহানদী
বে রা র
গণ্ডোয়ানা
গোদাবরী
আহম্মদনগর
গোলকোণ্ডা
মারাঠারাজ্য
কৃষ্ণা
বিজাপুর
কাবেরী
তাঞ্জোর
মাদুরা
ভা র ত ম হা সা গ র
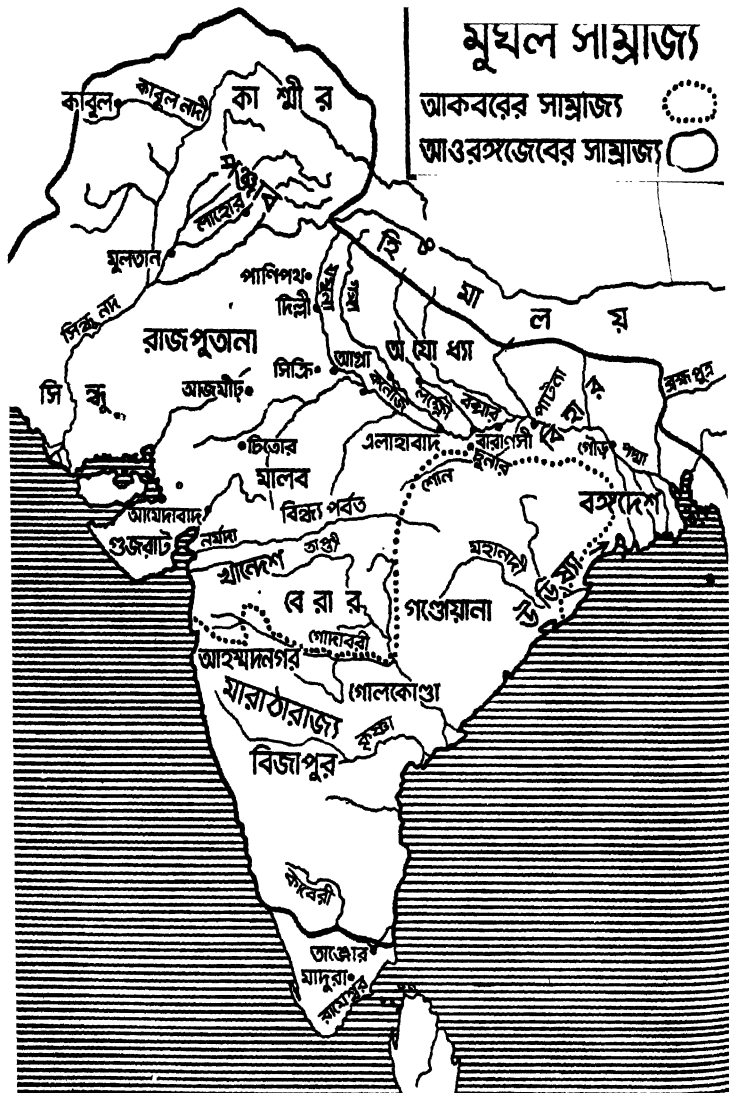
এমন কি আগ্রার নিকটবর্তী জাঠরা, রোহিলখণ্ডের আফগানরা, দাক্ষিণাত্যের মারাঠারা, রাজপুতরা স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তোলে। মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের আমলে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি একেবারেই ভাংগিয়া পড়ে (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ)। অবশ্য ইহার পরেও কয়েকজন মোগল সম্রাট নামেমাত্র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সর্বশেষ বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ কর্তৃক রেংগুনে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মারা যান।

ঔরংগজেব

মোগল যুগকে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ঐতিহ্য মিলিত হইয়া এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক জীবনের সৃষ্টি লাভ ঘটিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনে এক বিরাট জাতি এবং সংস্কৃতি গঠনের কল্পনা আকবরের রাজত্বকালে বিশেষভাবে রূপ গ্রহণ করে। হিন্দু মুসলমানের মিলনের সেতু হিসাবে তিনি দীন ইলাহি নামে সর্বধর্ম ও জাতি লইয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন।

মোগল যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি
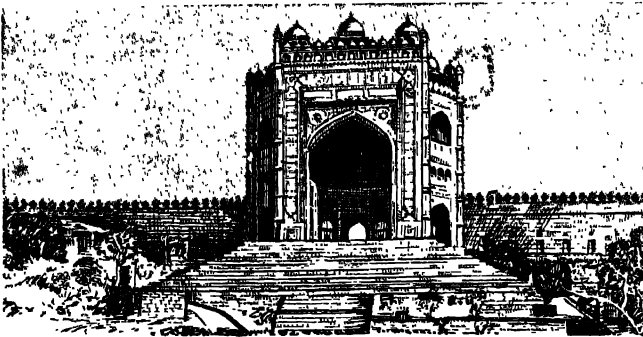
বুলন্দ দরওয়াজা

শিল্পকলার বিকাশে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলনের ফল বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। মোগল সম্রাটদের মধ্যে এক ঔরংগজেব ছাড়া

অন্য সকলেই ছিলেন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। এইযুগে নির্মিত ফতেপুর সিক্রীর বুলন্দ দরওয়াজা, সেলিম চিস্তির কবর, পাঁচমহল, সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধ, আগ্রার ইতমদ্‌উদ্দৌলার সমাধিসৌধ, দিল্লীর দুর্গস্থ দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, আগ্রার তাজমহল মোগল স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন।

এই যুগে গ্রীক, ইরানী, চীনদেশীয় ও প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পশৈলীর সমন্বয়ে এক নূতন চিত্রশিল্পরীতি গড়িয়া ওঠে। এই রীতির অনুসরণে আঁকা বহু চিত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ই রাজপুতনায় ও পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলে রাজপুত-শিল্পশৈলী ও কাংড়া-শিল্পশৈলী হিসাবে পরিচিত দুইটি বিশিষ্ট শিল্পধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল।
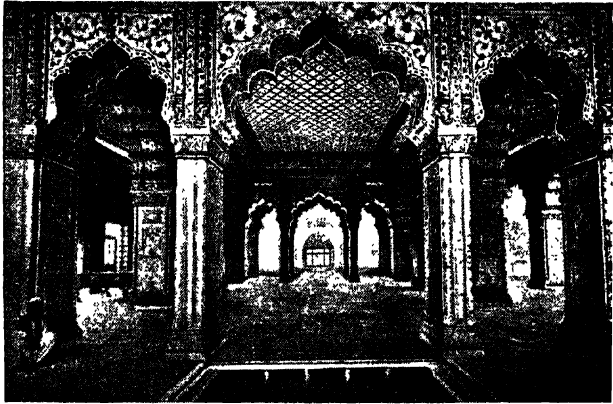
দেওয়ান-ই-আম

সংগীতানুশীলনেও মোগল সম্রাটদের (ঔরংগজেব ছাড়া) পৃষ্ঠপোষকতা ছিল যথেষ্ট। এই সময়ই উচ্চাংগ সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি হয়। আকবরের অন্যতম সভাসদ তানসেনের নাম ভারতীয় সংগীতচর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছে। খেয়াল প্রভৃতি দরবারী সংগীতের বিকাশ এই সময়ই হয়।

শুধু শিল্প-সংগীতেই নহে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগ অপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মোগল সম্রাটদের অনেকেই অনবদ্য ভাষায় নিজেদের

উদ্যানে মহিলা (রাজপুত)

আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া, আবুল ফজল, ফৈজী, বদাউনী, আবদুল হামিদ লাহোরী, কাফি খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিক সাহিত্যিকদের রচনায়ও এই যুগের সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ। এই যুগেই হিন্দী, বাংলা, মারাঠা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে।

মোগল আমলে নানাধরনের শিল্পেরও উন্নতি হয় প্রচুর। যদিও কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা তথাপি সুতী বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বয়নশিল্পের প্রসারও ছিল প্রচুর। মোগল

ব্যথাতুরা (কাংড়া)

সম্রাটেরা ছিলেন বিলাসী। কাজেই জিনিসপত্র যাহা প্রস্তুত হইত তাহা কারুশিল্পের দিক হইতে খুব উন্নতস্তরের ছিল। আজও মোগল যুগের কারুশিল্পরীতির (রেশম-ব্রকেড ইত্যাদি) প্রচলন ভারতবর্ষে রহিয়াছে। শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কারখানারীতির প্রচলনও ছিল। সরকারের অধীনেই কতকগুলি কারখানা পরিচালিত হইত।

মোগল শাসন-ব্যবস্থা

সম্রাট আকবরই মোগল যুগের শাসন-ব্যবস্থার স্রষ্টা। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার সহিত আরবীয় ও পারসীক শাসন-ব্যবস্থার সংমিশ্রণ দেখা যায়। আকবর শের শাহের শাসন-ব্যবস্থারও কিছুটা অনুসরণ করেন।

শাসন-ব্যবস্থার সমগ্র কর্তৃত্ব সম্রাটের হাতেই ছিল। তিনি সদর-ই-সুদর (দাতব্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত), খান-ই-জামান (সম্রাটের পারিবারিক জীবনসংক্রান্ত কার্যাদির ভারপ্রাপ্ত), কাজী-উল-কাজত (প্রধান বিচারপতি), দেওয়ান (রাজস্ব আদায়, ব্যয় ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত) ইত্যাদি কয়েকজন প্রধান প্রধান কর্মচারীর সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। ইঁহারাই ছিলেন সম্রাটের মন্ত্রী। ইঁহাদের মধ্যে অনেক সময়ই দেওয়ানের ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িত। ঠিক কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার রীতিতেই প্রদেশিক শাসনকার্য পরিচালিত হইত। প্রদেশে সুবেদার সম্রাটের স্থান পূরণ করিতেন। প্রায় একই ধরনের কর্মচারী লইয়া তিনি রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। সামরিক শক্তিই ছিল শাসন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। ইহা পরিচালনায় আকবর মনসবদারী রীতির প্রচলন করিয়াছিলেন। সৈন্য বিভাগীয় কর্মচারীরা সকলেই এক একজন মনসবদার ছিলেন। প্রয়োজনে তাঁহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। ইহার জন্য তাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পাইতেন।

রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ভালো ছিল। দেশের সকল জমি জরিপ করিয়া উর্বরতা অনুসারে তাহাদের খাজনা নির্ধারিত হইত। উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ রাজকর হিসাবে ধার্য হইত।

সংক্ষেপে, মোগল শাসনের ব্যবস্থা নানাদিকে দুর্বল ছিল। ইহা সম্রাটের ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরেই অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল।

সময়-পঞ্জী

মোগল সাম্রাজ্য

সাল	ঘটনা
১৫০০ খৃঃ	বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৫২৬) বাবরের মৃত্যু ও হুমায়ুনের সিংহাসনারোহণ (১৫৩০) হুমায়ুনের পলায়ন ও শের শাহের সিংহাসনারোহণ (১৫৪০)
১৫৫০ খৃঃ	হুমায়ুন কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (১৫৫৫) হুমাঁয়ুনের মৃত্যু ; আকবরের সিংহাসনারোহণ; পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)
১৬০০ খৃঃ	আকবরের মৃত্যু ; জাহাংগীরের সিংহাসনারোহণ (১৬০৫)
১৬৫০ খৃঃ	জাহাঙ্গীরের মৃত্যু; শাহজাহানের সিংহাসনারোহণ (১৬২৭) ঔরংগজেবের সিংহাসনারোহণ (১৬৫৮)
১৭০০ খৃঃ	ঔরংগজেবের মৃত্যু (১৭০৫) নাদির শাহের ভারত আক্রমণ (১৭৩৯)
১৭৫০ খৃঃ	পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭)
১৮০০ খৃঃ	
১৮৫০ খৃঃ	শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের নির্বাসন (১৮৫৭)
১৯০০ খৃঃ	

সুলতানী আমলে দক্ষিণ ভারত

খিলজী সুলতানদের আমলে দক্ষিণ ভারত দিল্লীর অধীনে আসিলেও তুঘলক আমলে মুহম্মদ-বিন্-তুঘলকের শাসনকালে যখন দেশের সর্বত্র
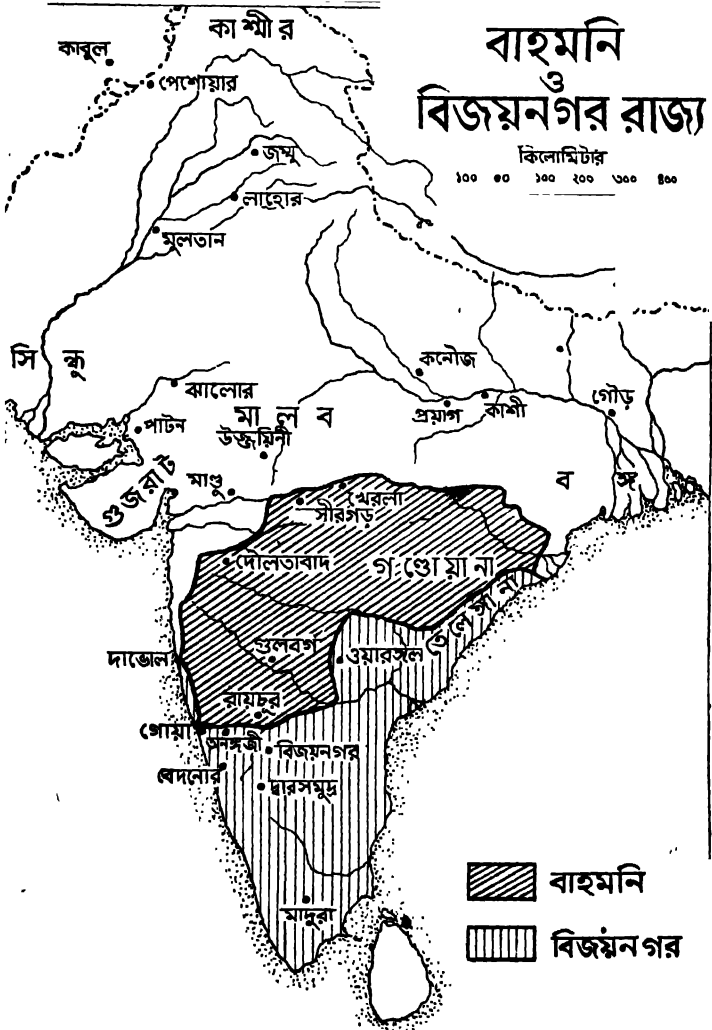
বিশৃংখলা দেখা দেয়, সেই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। দাক্ষিণাত্যের একদল অভিজাত ব্যক্তি দৌলতাবাদ অধিকার করিয়া ইসমাইল মুখ্‌ নামক তাঁহাদেরই একজনকে সিংহাসনে বসাইয়া যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহা বহ্‌মনী রাজ্য নামে খ্যাত। এই রাজ্যের নৃপতিদের মধ্যে আলাউদ্দীন বহ্‌মান শাহ, তাজউদ্দীন ফিরোজ শাহ, আহম্মদ শাহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলাউদ্দীন বহ্‌মান শাহের প্রচেষ্টায় এই রাজ্যের সীমা উত্তরে পেনগংগা, দক্ষিণে কৃষ্ণা, পশ্চিমে দেবগিরি হইতে ভংগীর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্বে অবস্থিত তেলিংগানা ও দক্ষিণে অবস্থিত বিজয়নগর রাজ্যের সহিত ইহার বিরোধ লাগিয়াই ছিল। এই রাজ্যের সুলতান তৃতীয় মামুদের প্রধান মন্ত্রী মামুদ গাওয়ানের প্রচেষ্টায় বহ্‌মনী রাজ্যে শুধু শান্তি-শৃংখলাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও বিশেষ বিকাশ লাভ ঘটে। তিনি রাজধানী বিদরে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সমকালীন অন্যান্য আমীর-ওমরাহরা গাওয়ানের শক্তিবৃদ্ধিতে আশংকিত হইয়া ওঠেন। সুলতান তাঁহাদের প্ররোচনায় মামুদ গাওয়ানকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আলাউদ্দীন বহ্‌মান শাহ রাজকার্যের সুবিধার জন্য তাঁহার রাজ্যকে কয়েকটি তরফ বা প্রদেশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটিতে এক একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় বহ্‌মনী সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে এইসব শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে, বহ্‌মনী রাজ্য ভাংগিয়া বেরার, বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদর—এই পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।

বহ্‌মনী রাজ্য

বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিভেদ রহিয়াছে। তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে, সংগম নামক এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র আনুমানিক ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের মধ্যে বুক-এর রাজত্বকালেই বিজয়নগরের সমৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চীনদেশে স্বীয় দূত পাঠাইয়াছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায়। তাঁহার সময়ে ইতালীয় পরিব্রাজক নিকোলো কন্টি ও পারস্যের রাজদূত আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরে আসেন। তাঁহাদের বিবরণ হইতে জানা যায়, সে সময়কার

বিজয়নগর রাজ্য

নৃপতিরা ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। জনসাধারণের অবস্থা ছিল উন্নত। নরপতিরা নিজেরা যেমন ছিলেন বিদ্বান, তেমনি বিদ্বানের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। নিকোলো কন্টি দেবরায়কে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরেই সংগম বংশীয় নৃপতিরা দুর্বল হইয়া পড়েন। বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার করেন তুলভ বংশীয় নরসিংহদেব। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তুলভ বংশীয় নরপতিকে সরাইয়া দিয়া সেনাপতি নরসনায়কের পুত্র বীর নরসিংহ বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার করিয়া তুলভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কৃষ্ণদেব-রায় বিজয়নগর রাজ্যের সীমা উত্তরে উড়িষ্যা ও বিজাপুর হইতে দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁহার আমলে বিজয়নগরে আগত পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ ও নুনিজের বর্ণনা হইতে জানা যায়, সেই সময় বিজয়নগর ছিল হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ। আটজন খ্যাত-নামা কবি কৃষ্ণদেবরায়ের সভা অলংকৃত করিতেন। সম্রাট নিজেও 'আমুক্ত মাল্যাদা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশিষ্ট বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য ও মাধবাচার্য এই সময়কারই লোক। বিজয়নগর রাজাদের আনুকূল্যে বহু মন্দিরাদি নির্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে হাজার মন্দির ও বিঠলস্বামী মন্দির এখনও সেইযুগের স্থাপত্যকলা ও উৎকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ দণ্ডায়মান। সংগীত ও চিত্রশিল্প সেই যুগে বিশেষ উন্নতিলাভ করে। কৃষ্ণদেবরায় নিজেও ছিলেন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। কিন্তু কৃষ্ণদেবরায়ের পরেই বিজয়নগর রাজ্যের অবনতি দেখা দেয়। এই বংশের শেষ রাজা সদাশিবরায়ের মন্ত্রী রামরায়ের ভ্রাতা তিরুমল সদাশিব রায়কে সরাইয়া দিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আরবিড়ু বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি দ্বিতীয় বেংকটের মৃত্যুর পর বিজয়নগর রাজ্য কতকগুলি খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া যায়।

মোগল যুগে দক্ষিণ ভারত

মোগল যুগে মোগল সম্রাট আকবর পুনরায় দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তিনি বেরার এবং আহম্মদনগরের একাংশ মাত্র জয় করিতে সমর্থ হন। তাঁহার পুত্র জাহাংগীরের আমলে আহম্মদনগরের অবশিষ্টাংশ জয়ের চেষ্টা হইলেও সম্রাট শাহজাহানের আমলেই আহম্মদনগর বিজয় সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার সময়েই

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সম্রাট ঔরংগ-জেবের আমলে। তিনি তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লীর হিন্দুরাজ্য দুইটিও জয় করেন।

মারাঠা শক্তি

কিন্তু ঔরংগজেবের আমলেই দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি প্রবল হইয়া ওঠে। ঔরংগজেবের সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া শিবাজী এক সুবিশাল মারাঠা সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। শিবাজী যে শুধুই সমরকুশল সেনাপতি, দুর্ধর্ষ বীর ও অনন্যসাধারণ সংগঠক ছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার চরিত্রবল, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, মহান আদর্শ, পরধর্মসহিষ্ণুতা, এবং সর্বোপরি তাঁহার সুদক্ষ শাসন-ব্যবস্থা তাঁহাকে ভারত ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ নরপতির স্থান দিয়াছে। শিবাজীর মৃত্যুর পরে মারাঠা রাজশক্তিও ধীরে ধীরে আত্মকলহের ফলে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে তৎকালীন মারাঠারাজা শাহুর প্রধানমন্ত্রী বা পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পেশোয়া বাজীরাও শিবাজীর মতোই মারাঠাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া এক সুবিশাল মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন। শিবাজীপুত্র শম্ভুজী যখন মারা যান, তখন তৎপুত্র রাজারামের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠা সাম্রাজ্য গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলা এবং ধার ও বরার—এই কয়টি সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাজীরাও ইহাদের সংঘবদ্ধ করিয়াই মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তোলেন। কিন্তু বাজীরাওয়ের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই আহ্‌মদ শাহ দুরাণী যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন নানাকারণে মারাঠারা তাহার গতি প্রতিহত করিতে পারিল না। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহ্‌মদ শাহের হাতে মারাঠাশক্তি পরাজিত হইল। ইহার ফলে মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং

শিবাজী
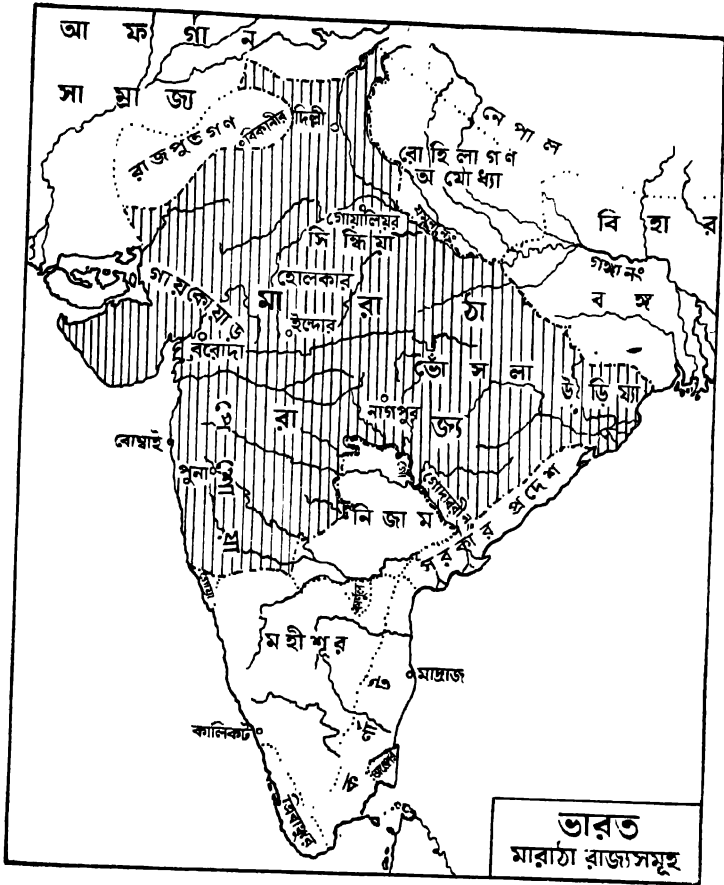
ইহা পরবর্তীকালে ইংরেজ শক্তির শক্তিবৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করিল। তাই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পাণিপথের এই যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধের পরিপূরক। পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির যে বীজ অংকুরিত হয়, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ তাহার মূলকে দৃঢ় করে।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপন এবং প্রসার। মোগল সাম্রাজ্য

যখন পতনোন্মুখ তখন ভারতবর্ষ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে মারাঠা, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও বাংলাই প্রধান ছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর কলহ লাগিয়াই ছিল। এই সুযোগে ইউরোপীয় বণিকগণ ধীরে ধীরে ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে।

তোমরা জান যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের সহিত পাশ্চাত্য দেশগুলির বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। সেইসময় পাশ্চাত্য দেশের বণিকগণ আরব দেশের মধ্য দিয়া, লোহিত সাগর ও আরব সাগর হইয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিত। মধ্যযুগে আরবগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে, ঐ পথে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে, তাঁহারা সমুদ্রপথে ভারতে আসিতে চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জলপথ দিয়া (আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল প্রদক্ষিণ করিয়া) পোর্তুগীজ বণিক ভাস্কো-ডা-গামা যেদিন কালিকট বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেইদিন ভারতের সহিত ইউরোপের এক নূতন সম্বন্ধের অধ্যায় আরম্ভ হইল। পোর্তুগীজগণ ভারতে আসিয়াই দেশীয় রাজাদের কলহ-বিবাদে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং ভারতে কুঠি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারা গোয়া, দমন, দিউ, সল্‌সেট, ব্যাসিন, বোম্বাই, হুগলী প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করিল। কিন্তু পোর্তুগীজগণ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল এবং জোর করিয়া ভারতীয়-দিগকে ধর্মান্তরিত করিত। ফলে, তাঁহাদের রাজ্যবিস্তার ভারতে আর অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু দীর্ঘদিন পোর্তুগীজগণ ভারতের বুকে রাজত্ব করে। এই সেদিন ভারত বলপূর্বক পোর্তুগীজদের এই দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পোর্তুগীজগণ

পোর্তুগীজদের পরেই হল্যাণ্ডের লোক বা ওলন্দাজগণও ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। গুজরাট, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা বাণিজ্যের জন্য কুঠি স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু পোর্তুগীজদের সহিত প্রতিযোগিতায় সুবিধা করিতে না পারিয়া ইহারা ভারত ত্যাগ করিয়া যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি স্থানে তাহাদের প্রাধান্য বিস্তার করে।

ওলন্দাজগণ

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফরাসী বণিকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। তারপর মুসলিপত্তম, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি স্থানে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হওয়ার ফলে ভারতে ফরাসী প্রভাব আর বৃদ্ধি পায় না।

ফরাসীগণ

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানী মোগল বাদশাহদের নিকট হইতে ইংরেজদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। সুরাট, আগ্রা, মাদ্রাজ, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়। পোর্তুগালের নিকট হইতে ইংরেজগণ বোম্বাই লাভ করে।

ইংরেজগণ

সাম্রাজ্যলিপ্সার জন্য ঔরংগজেবের সময় বৃটিশদের সহিত মোগলদের সংঘর্ষ হয়। সুবিধা করিতে না পারিয়া বৃটিশেরা পুনরায় ভালোমানুষ সাজিয়া মোগল সম্রাটদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া, ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতে, ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজাদের পরস্পর বিবাদে ইংরেজ এবং ফরাসীগণ পরস্পর বিপক্ষ পক্ষ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে ডুপ্লে ছিলেন ভারতে ফরাসী উপনিবেশগুলির গভর্ণর। তিনি অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের পক্ষে এই সময় রবার্ট ক্লাইভের আবির্ভাব হয়। তাঁহার নেতৃত্বে ফরাসী শক্তিকে বৃটিশ শক্তির নিকট হার মানিতে হয়।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীন নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা বাংলার মসনদে বসেন তখন ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্যের ফলে তাঁহার সহিত ইংরেজদের বিরোধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। প্রথম দিকে সিরাজ তাঁহার কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইলেও শেষ পর্যন্ত স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের কাছে পরাজিত হন (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ)। তখন হইতে বাংলার

নবাবের শক্তি ও প্রভুত্ব ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে অবশ্য নবাব মিরকাশিম ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি কাটোয়া, ঘেরিয়া, উদয়নালা ও বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হইলে

সিরাজউদ্দৌল্লা

ক্লাইভ

ইংরেজদের ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্লাইভকে বাংলা দেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ (এই দুইটি স্থান তিনি অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য করার বিনিময়ে লাভ করিয়াছিলেন) দান করেন। বিনিময়ে তিনি বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার নিকট হইতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। ইহার ফলে বাংলাদেশে কোম্পানীর অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক অধিকারের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। ক্লাইভের পর এদেশে গভর্ণর হইয়া আসেন ওয়ারেণ হেষ্টিংস। প্রথমেই তিনি কোম্পানীর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। ছলে-কৌশলে বারাণসীর রাজা চৈৎসিং ও অযোধ্যার বেগমদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ তিনি সংগ্রহ করেন। মিথ্যা অভিযোগে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যবস্থা করিয়া হেষ্টিংস তাঁহার ছলাকৌশলের বিরুদ্ধচারীদের জব্দ করেন। মোগল সম্রাটকে দেয় বার্ষিক করও তিনি বন্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কারা ও এলাহাবাদ কাড়িয়া লইয়া অযোধ্যার নবাবের কাছে পঞ্চাশ লক্ষ

ভারতে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠা

টাকায় বিক্রী করেন। তাঁহার সময়ই ক্রমবর্ধমান মারাঠা শক্তি ও মহীশূরের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ শুরু হয়। বহু পরে লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে মহীশূরের এবং লর্ড ময়রার আমলে মারাঠা শক্তির পতন ঘটে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস

লর্ড ওয়েলেসলী

হেষ্টিংসের সময়ই কোম্পানীর রাজস্ব-ব্যবস্থার ও বিচারসংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রথম সংস্কার সাধিত হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়মে সুপ্রীম কোর্ট নামক আদালত স্থাপিত হয়। হেষ্টিংস সম্বন্ধে কি এদেশে কি তাহার স্বদেশে প্রচুর বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিট তাঁহার ভারত-আইনে এদেশে কোম্পানীর শাসনাদি কার্যকলাপে বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করেন।
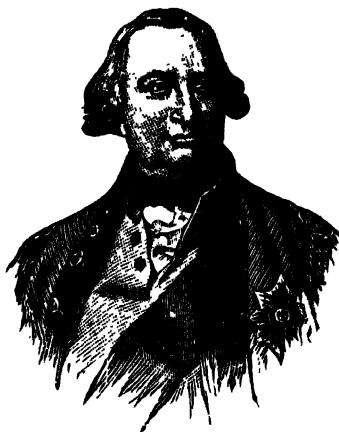
লর্ড কর্ণওয়ালিস

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গভর্ণর হইয়া আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। তিনি এদেশে কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থাকে অনেকটা উন্নততর করিয়া তোলেন। তিনি দণ্ডবিধির কঠোরতা অনেকাংশে

হ্রাস করেন, এবং পুলিশী ব্যবস্থারও সংস্কার করেন। তাঁহার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার অবশ্য বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জমিদারগণ নির্দিষ্ট করদানের বিনিময়ে নিজ নিজ জমিদারী চিরস্থায়ীভাবে পাইলেন। ইতিপূর্বে হেষ্টিংসের আমলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর জমিদারী নিলাম করা হইত। এইভাবে বৃটিশ ভারতে জমিদারী প্রথার উদ্ভব ঘটে। মাত্র সেদিন স্বাধীন ভারত সরকার এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। কৃষকগণ জমির মালিকানা ফেরত পাইয়াছে।

কর্ণওয়ালিসের পরবর্তী গভর্ণর স্যার জন শোর দেশীয় নৃপতিদের ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিলেও, তাঁহার পরবর্তী গভর্ণর লর্ড ওয়েলেসলী পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ শুরু করেন। তিনি অধীনতামূলক মিত্রতার প্রবর্তন করেন। এই নীতি অনুসারে যে সব রাজ্য কোম্পানীর সহিত মিত্রতা করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের অধীনে চলিয়া আসে। এই নীতির ভিত্তিতেই হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা, সুরাট, কর্ণাট প্রভৃতি রাজ্যের উপর ইংরেজ প্রাধান্য সুদৃঢ় হয়। ওয়েলেসলীর আমলেই মহীশূর রাজ্য ইংরেজদের করতলগত হয়। কিন্তু তিনি মারাঠা শক্তিকে দমন করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে গভর্ণর লর্ড ময়রার আমলে মারাঠাশক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।

লর্ড বেন্টিংক

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এদেশে গভর্ণর হইয়া আসেন লর্ড বেন্টিংক। তিনি একদিকে যেমন রাজস্ব ও শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন, তেমনি অন্যদিকে ঠগীদমন, সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি এদেশের সমাজ সংস্কার কার্যে ব্রতী হন। তিনিই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রভৃতি শিক্ষা-সংস্কারের জন্য এদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। লর্ড বেন্টিংকের পরে লর্ড অকল্যাণ্ডও শিক্ষার প্রসারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে

পাঞ্জাবের শিখদের ও ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজদের বিরোধ শুরু হইয়াছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী এদেশে গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের একাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে সাতারা, ঝাঁসি, সম্বলপুর, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যের শাসকেরা সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে ঐ সব রাজ্য ইংরেজ শাসনের অধীন হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, অরাজকতার অজুহাতে তিনি অযোধ্যা ও বেরারও দখল করিয়া লন। এই ভাবে ভারতের এক বিশাল অংশ জুড়িয়া ইংরেজ অধিকার তাঁহার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড ডালহৌসী

কিন্তু তাঁহার এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে ভারতবাসীদের মনে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া ওঠে তাহারই ফলে পরবর্তী গভর্ণর লর্ড ক্যানিংএর আমলে শুরু হয় সিপাহী সংগ্রাম। ইংরেজরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামে জয়ী হয়। কিন্তু এই সংগ্রামের সবচাইতে বড়ো ফল হয় ভারতবর্ষের শাসনাধিকার চলিয়া যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে সরাসরি বৃটিশ সরকারের হাতে। ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেল ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর প্রতিভূ বা ভাইসরয় হিসাবে এদেশে শাসন করা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে পর্যন্ত এই ভাবেই ভারতবর্ষ ইংরেজ ভাইসরয়দের দ্বারা শাসিত হইয়াছে।

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

ইংরেজদের শোষণ, শাসনের ফলে ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশে পরিণত হইয়াছে। বিদেশী বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহার কুটির-শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, কৃষির উপর ইহার নির্ভরশীলতা বাড়িয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের সমাজ-জীবনের বহু কুসংস্কার প্রভৃতি

দূরীভূত হইয়াছে। ইহাছাড়া এদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার পুনঃ-প্রচলন হইয়াছে, ভারতের আধুনিক আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সমৃদ্ধ হইয়াছে, সাহিত্যকলায় পাশ্চাত্যের প্রভাবে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হইয়াছে।

চিত্রশিল্প, বিজ্ঞান, সংগীত প্রভৃতি সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভার বিকাশলাভ ঘটিয়াছে। গত প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা আন্দোলন আজিকার স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছে, তাহাও ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শেরই পরোক্ষ ফল। সেই কাহিনী পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে।

ভারতবর্ষ
১৮৫৭ খৃঃ
ইংরেজী মাইল
০ ৫০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০
ইংরেজ রাজ্য
হিন্দু রাজ্য
মুসলমান রাজ্য
কাবুল
জালালাবাদ
আফগানিস্থান
গজনী
কাশ্মীর
শ্রীনগর
রাওলপিণ্ডি
পাঞ্জাব
লাহোর
মুলতান
কালাত
তিব্বত
নেপাল
দার্জিলিং
ভুটান
রাজপুতানা
আজমীর
জয়পুর
যোধপুর
দিল্লী
মিরাট
আগ্রা
লক্ষ্নৌ
কানপুর
গোরখপুর
আরা
কুচবিহার
আসাম
সিন্ধুদেশ
হায়দরাবাদ
করাচী
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
দিনাপুর
পাটনা
ঢাকা
ত্রিপুরা
বিহার
বঙ্গদেশ
চন্দননগর
কলিকাতা
চট্টগ্রাম
মালব
ইন্দোর
ভুপাল
গুজরাট
কাঠিয়াবার
সুরাট
দিউ
দমন
নাগপুর
সম্বলপুর
কটক
বেরার
আহম্মদনগর
বোম্বাই
পুনা
সাতারা
নিজাম
হায়দরাবাদ
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
গোয়া
বেলারি
মছলিপত্তন
কুদ্দাপা
মহীশূর
কুর্গ
বাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
তেলিচেরী
পণ্ডিচেরী
কালিকট
কারিকল
ত্রিচিনোপলি
তাঞ্জোর
কোচিন
দিন্দিগাল
ত্রিঙ্কোমালি
সিংহল
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
মালদ্বীপপুঞ্জ
স্বাধীন ব্রহ্ম
মান্দালয়
অমরপুর
আকিয়াব
নিম্ন ব্রহ্ম
রেঙ্গুন
মৌলমিন
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write an essay on the Indus Valley Civilisation.

2. Write an essay on Vedic Civilisation.

3. Describe the contacts of India with the outside world during the Maurya and the Kushan periods, indicating the influence of such contacts on Indian civilisation and culture.

4. Discuss why the Gupta period is called the golden period of Indian culture.

5. Write an essay on the history of Bengal during the Pala and the Sena periods.

6. Write an essay on the civilisation and culture of India, during the period of the Sultanate of Delhi and that of Mughal rule.

7. Write an essay on the growth and downfall of the Mughal Empire in India.

8. Write an essay on the growth of British power in India from the battle of Plassey (1757) to the Sepoy War (1857).

B. Answer the following questions in not more than 80 words :—

1. Describe the efforts of Asoka for the good of the people.

2. Write what you know of Harshavardhan.

3. Write what you know of Firoze Tughlugh.

4. Write what you know of Sher Shah.

5. Write what you know of the Maurya administrative system.

6. Write what you know of the Mughal administrative system.

C. 1. Find in the left hand column below the names of certain dynasties of rulers. Write the letter "N" or "S" respectively inside the bracket on the right hand side of each to indicate whether it belongs to Northern or Southern India. On the right-hand column below find certain names or phrases. Put the number at the left of the dynasty within the bracket at the right of the name or the phrase to which it is related.

Names of Dynasties	Names and phrases related to the dynasties
1. Maurya (2. Rastrakuta (3. Chola (4. Kushana (5. Pallava (6. Palas (7. Chalukyas (8. Kanvas (9. Senas (	Architecture in Mahavalipuram ( ) Frescoes in Elora ( ) Jayadeva, Udanda Puri ( ) Temple of Rajrajeswari ( ) Gunavishnu ( ) Statue of Nataraja ( ) Temple of Sangameswara ( ) Origin of Mahayanism ( ) Atisa Dipankara ( ) Temple of Birupaksha ( ) Origin of Kulinism ( ) Kautilya ( ) Charaka ( ) Megasthenes ( )

2. Names of some of the dynasties of the Sultanate of Delhi are given in the column on the left, while certain names and phrases related to the dynasties are given in the column on the right. Put the number at the left of the dynasty within the bracket at the right of the name or the phrase to which it is related.

Names of Dynasties	Names and phrases related to the dynasties
(1) Slave dynasty (2) Khalji dynasty (3) Tughlugh dynasty (4) Lodi dynasty.	তৈমুর লং ( ) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ( ) সেচখাল-খনন ( ) অব্যবস্থিত-চিত্ত সুলতান ( ) সুলতানা রাজিয়া ( ) চিতোর জয় (কাইকোবাদ ( ) ফিরোজ শাহ ( ) মামুদ শাহ ( ) বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন।

D. The following is for your scrap-book :

1. Draw the following time-lines :—

   (a) From Indus Valley Civilisation to the fall of the Magadhan Empire.

   (b) From 1 A. D. to the fall of the Gupta Empire.

   (c) From Harshavardhan to the Muslim occupation of Bengal.

(d) Period of the Sultanate of Delhi.
(e) Mughal rule in India.
(f) From the battle of Plassey to the Sepoy War.

2. Draw or collect the following maps :—
(a) Maurya Empire, (b) Kushan Empire, (c) Gupta Empire, (d) Alauddin's Empire (c) Growth of Mughal Empire, (f) British Empire in 1857.

3. Collect as many pictures of Sculpture, Architecture, Painting etc. during the different periods of Indian history.

E. The following projects may be undertaken :—

1. A wall-newspaper on the civilisation and culture during Ancient, Muslim and British period.

2. Presentation of Indian history, through time-lines, using pictures to embellish them.

আমাদের ধর্ম

আমাদের দেশের সকল জিনিসের মূলেই রহিয়াছে ধর্ম। যুগ যুগ ধরিয়া ধর্মই এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাহাদের ধ্যান-ধারণা সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় বিশ্বাসেরই দ্বারা হইয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের ধারা বহন করিয়া এদেশে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাদের সমন্বয় সাধনের কাজ চলিয়াছে, কখনো বা পাশাপাশি সমান গতিতে তাহাদের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। এই উদারতাই ভারতীয় ধর্মীয় ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধর্মসমন্বয়ই ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য

ধর্মই মানুষের জীবনের প্রধান অবলম্বন। বাঁচিয়া থাকিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষ ধর্মের ভিতর দিয়া অনুসন্ধানের ফলেই বুঝিতে পারে। এখনও পৃথিবীর প্রায় সকল লোকই কোনো-না-কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে ধর্ম যে উচ্চ আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষের স্বকীয় দুর্বলতার জন্য উহা অনেক সময় ঐ উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে—অনেক বিকৃত আচার এবং কুসংস্কার ধর্মের মধ্যে আসিয়া জড় হইতে থাকে। ধর্মের আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া মানুষ অনেকটা যন্ত্রের মতো আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া নিজেকে ধার্মিক বলিয়া মনে করে। ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, মানুষ মানুষের সহিত যুদ্ধ করে। পৃথিবীর অনেক দেশেই ধর্ম লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল বড়ো বড়ো ধর্মের অনুসরণকারী লোকই ভারতবর্ষে আছে। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু—সকল সম্প্রদায়ের লোকই ভারতের তীর্থক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে ধর্ম লইয়া বিরোধ হয় নাই। ভারতবাসী চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে, যত মত তত পথ। ভগবানের কাছে মস্তক নত করিলেই হইল, সে তুমি যে ভাবেই কর। তারপর ভারতে যেটি প্রধান ধর্ম, অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম, উহা অপর ধর্ম হইতে নিজ ধর্মে লোককে ধর্মান্তরিত করায় বিশ্বাস করে না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে

ধর্মের অবনতি ও ধর্ম-দ্বন্দ্ব

ভাবের আদান-প্রদানের কোনো বাধা নাই। উদার মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সকল ধর্মের মধ্যেই মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। হিন্দু, ইসলাম এবং খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে ভারতে চিরদিনই ভাবের আদান-প্রদান হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা ধর্ম ভুলিয়া, সব কিছুর সঙ্গে রাজনীতি মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের পূর্বের ধারণা ছিল যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জিনিস। কিন্তু অধুনা ইহার দলগতরূপ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে এবং ইহাকে মানুষের সাংসারিক দলগত স্বার্থলাভের জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। ফলে, ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে, যাহার বীভৎস রূপ আমরা দেখিয়াছি স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বের দাংগায়। ধর্মের পার্থক্যের অজুহাতে আমাদের মাতৃভূমিকে বিভক্ত করার দুঃখ আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই। তাই আমাদের রাষ্ট্রকে ধর্মপ্রভাবহীন (secular) রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা যে শিল্প-সভ্যতার যুগের ভিতর দিয়া যাইতেছি তাহাও মানুষের ধর্মবিশ্বাসের অনুকূল নহে। শিল্প-সভ্যতা আমাদিগকে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পূজারী করিতে শিক্ষা দিতেছে। আমরা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধিকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। জীবনের মান (standard of living) বৃদ্ধি করার চেষ্টাই নাকি মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' সে যেপ্রকারেই হউক,—আমাদের জীবনের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার সময় আমাদের নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অনেকেই আমরা ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। অনেকে হয়তো গৌরব করিয়া বলে যে তাহারা ধর্মে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বর্তমান ধর্মহীন সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবন হইতে প্রকৃত শান্তি-তৃপ্তি যেন দিন দিনই দূরে চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করা অর্থ জীবনের বৃহৎ আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করা। শুধু খাওয়া-পরা লইয়া আজীবন ব্যস্ত থাকা মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অল্প-বিস্তর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি। উহা মনুষ্য জীবনের সর্বাপেক্ষা বড়ো আদর্শ। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভারতবর্ষ সভ্যতা এবং কৃষ্টির মহান শীর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সে যেন আজ ধর্মহীন না হইয়া

পড়ে। আমাদের রাষ্ট্র ধর্মপ্রভাবমুক্ত হউক, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু আমাদের জীবন যেন ধর্মপ্রভাবমুক্ত না হয়।

তোমরা জান, এদেশের প্রধান ধর্ম হিন্দুধর্ম। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই এই হিন্দুধর্মের ধারা এক অখণ্ড অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মনীষীরা বৈদিক ধর্মের শাশ্বত ভিত্তিকে অক্ষুন্ন রাখিয়া সময়োপযোগী পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হিন্দুধর্মকে সজীব ও সবলই করিয়াছে। বৈদিক যুগের আদি পর্বে হিন্দুধর্মের ভিত্তি ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির আরাধনা। প্রকৃতির যাহা কিছুই আর্যদের মুগ্ধ বা ভীত বা বিস্মিত করিত তাহাকেই তাহারা দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিত। ইহাদের মধ্যে আকাশের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, পৃথিবীর দেবতা পৃথ্বী, সূর্যের দেবতা মিত্র, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, বাতাসের দেবতা বাত, বিদ্যুতের দেবতা রুদ্র, বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য প্রভৃতি প্রধান। তাহারা স্তবস্তুতির দ্বারাই ইহাদের সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। ক্রমে তাহারা স্তবস্তুতির সংগে সংগে দেবতাদের প্রীতির জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও শুরু করে। অগ্নি জীবনের প্রতীক। তাই তাহার মাধ্যমেই দেবতাকে প্রদত্ত উপঢৌকন দেবতার নিকট পৌঁছান সম্ভব, এই বিশ্বাসে তাহারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্তবস্তুতির সংগে সংগে সেই অগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি নানা উপকরণ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া শুরু করে। ইহারই নাম যজ্ঞ। ক্রমে ক্রমে যজ্ঞে পশুবলির প্রথাও প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই যজ্ঞ ছিল অন্তরের ক্রিয়ার প্রতীকমাত্র। এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে নিজের অন্তরে দেবতাকে উপলব্ধি করাই ছিল আর্যদের সকলপ্রকার ধর্মাচরণের মূলকথা। এই ধর্মকে ঘিরিয়া আর্যগণ খুব উচ্চস্তরের দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া তুলিল। উপনিষদে আমরা তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই। প্রত্যেক ধর্মকার্যের ভিত্তি ছিল গূঢ় অনুভূতি এবং গভীর তত্ত্ব। আজিও হিন্দুধর্মে যাগযজ্ঞ একটি বিরাট অংশ জুড়িয়া আছে। বৈদিক হিন্দুধর্মের এই প্রথম পর্যায়ে, বলাবাহুল্য, মূর্তিপূজার কোনো বিধান ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রাক্-আর্য বা অনার্য ধর্মকর্মসাধনার সহিত আর্য ধর্মকর্মসাধনার সংঘর্ষ ও পরে সমন্বয়ের ফলে এই মূর্তিপূজার বিধান

হিন্দুধর্ম

হিন্দুধর্মের অংগীভূত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় দেবদেবীর উপাসনার প্রমাণ রহিয়াছে। খুব সম্ভবত পশুবলি প্রথাও প্রাক্-আর্য ধর্মকর্মসাধনা হইতেই হিন্দুধর্মে আসিয়াছে।

বেদই আজও হিন্দুদের সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেদে উপাস্য বিভিন্ন দেবদেবীরা যে একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশমাত্র সেই ধারণার উপর জোর দেওয়া হয়। ফলে, ব্রহ্ম ও আত্মোপলব্ধি হিন্দুধর্মাচরণের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু স্বভাবতই এই জাতীয় তত্ত্বচিন্তা সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ ছিল না। তাছাড়া, প্রাক্-আর্য সভ্যতার সহিত ক্রমাগত ভাবের আদানপ্রদানের ফলে তাহাদের ধর্মচিন্তাও সাধারণ মানুষের উপর ধীরে ধীরে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। তাই দেখা যায়, পরবর্তীকালে নূতন নূতন দেবদেবীর চিন্তাকল্পনার উদ্ভব ঘটিয়াছে। দ্যৌঃ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবদেবীর বদলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবতা হিসাবে প্রধান হইয়া ওঠেন। গুপ্তযুগ হইতেই এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সব নূতন দেবদেবীর পূজা সমর্থন করিয়া এবং তাঁহাদের পূজার পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া নূতন ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। উহাদিগকে পুরাণ বলা হয়। পুরাণের সংগে বেদের তত্ত্বগত কোনো বিরোধ নাই। জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া বেদের তত্ত্বকথা এবং অনুষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। কালক্রমে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকেরা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল। বিষ্ণু এবং শিবকে উপাস্য দেবতা করিয়া হিন্দুদের মধ্যেই এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শৈব নামে দুইটি আলাদা সম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে। কোনো বৈদিক ধর্মগ্রন্থে একাধিপত্যসম্পন্ন কোনো মহিলা দেবতার নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সময় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে ভগবানকে শক্তি বা জগন্মাতারূপে আরাধনার আয়োজনও দেখা যায়; এবং ইহার ফলেই শক্তি সম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটে। কালী, দুর্গা বা জগন্মাতার অন্য কোনো রূপকে ইহারা উপাস্য দেবী বলিয়া গ্রহণ করেন। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বৈদিক যুগের প্রথম অবস্থায় ধর্মসাধনা যেমন ছিল যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্মপ্রধান, উপনিষদের যুগে যেমন ছিল জ্ঞানপ্রধান, এই সময় তেমনি সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মসাধনা হইয়া দাঁড়ায় প্রধানত ভক্তিপ্রধান। ভক্তিভরে

আরাধ্য দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণই ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ পথ—এই যুগের হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ছিল প্রধান বিশ্বাস। কেহ কেহ মনে করেন, এই ভক্তিবাদও অনার্য ধর্মকর্মসাধনারই অবদান।

আজিকার হিন্দুধর্ম উপরিউক্ত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগেরই এক অপূর্ব সমন্বায়িত ফল।

বৌদ্ধধর্ম

বৈদিক যুগের শেষদিকে হিন্দুধর্ম সাধারণের অবোধ্য কতগুলি জটিল ক্রিয়াকাণ্ড ও আন্তরিকতাহীন যাগযজ্ঞের বাহ্যিক অনুষ্ঠানমাত্রে পরিণত হয়। জাতিভেদপ্রথা কঠোরতর হইয়া সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এই আন্তরিকতাহীন, আচারানুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্মের পরিবর্তে এক সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মপন্থার প্রয়োজন অনুভব করা শুরু করেন। ইহার ফলেই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এদেশে বহু ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছেন গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম নামে খ্যাত। আজিও বৌদ্ধধর্ম এদেশের একটি প্রধান ধর্মমত।

গৌতম বুদ্ধ সারনাথে তাঁহার প্রথম ধর্মমত ব্যক্ত করেন। তাঁহার সারনাথ উপদেশের মূল কথা হইতেছে (১) জন্ম দুঃখের; রোগ, জরা, মৃত্যু দুঃখের। (২) আসক্তি বা তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। (৩) তাই তৃষ্ণার বা দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করিতে হইবে। (৪) দুঃখের নিবৃত্তির আটটি পথ আছে—(ক) সম্যক বিশ্বাস, (খ) সম্যক সংকল্প, (গ) সম্যক বাক্য, (ঘ) সম্যক কর্ম, (ঙ) সম্যক জীবনযাত্রা, (চ) সম্যক চেষ্টা, (ছ) সম্যক স্মৃতি, ও (জ) সম্যক সমাধি বা ধ্যান। বুদ্ধদেব পাঁচ প্রকারের

বুদ্ধদেব

ধ্যান বা ভাবনার নির্দেশ দিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবনার অর্থ সর্বজীবে

মৈত্রী বা প্রেম, জীবের দুঃখে করুণা বা দয়া, অন্যের আনন্দে আনন্দ, দেহ অপবিত্র এরূপ চিন্তা, এবং লোকের ভালোবাসা বা ঘৃণা উভয় সম্বন্ধেই ঔদাসীন্য। উপরিউক্ত অষ্টাংগিক মার্গ বা আটটি পন্থা বৌদ্ধধর্মের সার কথা।

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মমত মুখে মুখে শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যরা রাজগৃহে এক বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করিয়া তাহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া ত্রিপিটক নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। পিটক তিনটি হইতেছে বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। প্রথমটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মসমূহ, দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধদেবের ধর্মমত ও তৃতীয়টিতে ধর্মমতের দার্শনিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সুত্ত পিটকের পাঁচটি ভাগ আছে। তাহাদের অন্যতম ক্ষুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত ধম্মপদ বুদ্ধদেবের অতি মহান উপদেশাবলীতে পূর্ণ।

ত্রিপিটক পাঠে জানা যায়, বুদ্ধদেব ছিলেন ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারেই নির্বাক। তিনি সৎকর্মের উপরেই জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ যদি অষ্টাংগিক মার্গ অনুযায়ী কর্ম করিয়া যায়, তাহা হইলে নিজ কর্মবলেই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি, অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করিতে পারে। আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিলেও বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মতোই কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তর হইতে মুক্তিই হইতেছে নির্বাণ, এবং ইহা জীবমাত্রেরই কাম্য। আগেই বলা হইয়াছে, বৈদিক প্রাণহীন যাগযজ্ঞাদির প্রতিবাদেই এই সময়কার ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলি শুরু হয়। বৌদ্ধধর্মও ছিল যাগযজ্ঞাদির বিরোধী। বুদ্ধদেব একদিকে যেমন ভোগবিলাসের বিরোধী ছিলেন, তেমনি অপরদিকে অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনকেও পছন্দ করিতেন না। বৌদ্ধধর্ম হইতেছে মধ্যপথাবলম্বী। তাই দেখা যায় অহিংসাকে ধর্মের মূল হিসাবে স্থান দিলেও বুদ্ধের শিষ্যরা অনেকে তাঁহার সম্মতিক্রমে মাংসও খাইতেন।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে হীনযান ও মহাযান এই দুইটিই প্রধান। হীনযান মতে শুধু সন্ন্যাসজীবন যাপন করিয়াই নির্বাণলাভ সম্ভব; কিন্তু মহাযান মতে সর্বজীবে প্রেম ও করুণা এবং পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া বুদ্ধের পূজার মধ্য দিয়া এমন কি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়াও নির্বাণলাভ সম্ভব। হীনযানীরা ছিলেন বুদ্ধের মূর্তিপূজার বিরোধী, কিন্তু মহাযানীরা বুদ্ধের মূর্তিপূজা শুরু করেন। বৈশালীতে বুদ্ধের

মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে যে বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেই বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে এই মতভেদ শুরু হয়। আরও অনেক পরে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে, কণিষ্কের আমলে যে বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ই মহাযান ও হীনযান এই দুইভাগে বৌদ্ধধর্ম সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। মহাযান মতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ সদ্ধর্মপুণ্ডরীক।

হীনযান মত প্রতিষ্ঠার ফলে বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের নিকট আদরণীয় হইয়া ওঠে। মৌর্য ও কুষাণ সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্ম শুধু এই দেশের অভ্যন্তরেই নহে, ভারতের বাহিরেও ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সুবর্ণভূমি, সীরিয়া, মিশর, ম্যাসিডনিয়া, কাইরিনি, ইপিরাস, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, মংগোলিয়া, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশগুলিতেও বিস্তারলাভ করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িল, তেমনি অন্যদিকে শংকরাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রমুখ হিন্দু সংস্কারকেরা তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভাবলে বুদ্ধ-প্রবর্তিত বহু সংস্কার এমনভাবে হিন্দুধর্মের মধ্যে স্থান করিয়া দিলেন, যাহার ফলে বৌদ্ধধর্মের আলাদা অস্তিত্বের প্রয়োজন আর রহিল না। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম এদেশে পুনরায় হিন্দুধর্মের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। বুদ্ধের স্থান হইল বিষ্ণুর অন্যতম অবতার হিসাবে। কিন্তু ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি প্রাচ্যদেশগুলিতে এখনও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান। স্বাধীনতালাভের পরবর্তী যুগে ভারতেও বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রচার হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

জৈনধর্ম

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে আরো একজন চিন্তাশীল নায়ক হিন্দুধর্মের সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন মহাবীর। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম জৈনধর্ম নামে খ্যাত। অবশ্য, জৈন প্রবাদমতে মহাবীরই এই ধর্মের প্রবর্তক নহেন। তাঁহার পূর্বে আরও তেইশ জন মহাপুরুষ বা তীর্থংকর এই ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন—মহাবীর শেষ তীর্থংকর। এই মত কতটা সত্য বলা না গেলেও প্রথম তীর্থংকর ঋষভ এবং মহাবীরের পূর্ববর্তী পার্শ্বনাথ খুব সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সে যাহাই হউক, মহাবীরই যে এই ধর্মের উন্নতিসাধন ও সাধারণে বহুল প্রচার করেন, সে কথা অনস্বীকার্য।

জৈন মতেও আত্মার চরম শান্তি বা নির্বাণলাভই মূল লক্ষ্য। ইহাকে তাঁহারা বলেন কৈবল্য। যোগ কৈবল্যলাভের উপায়স্বরূপ। যোগের তিনটি অংগ—(১) জ্ঞান বা বাস্তবের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করা, (২) বিশ্বাস রাখা বা জিনদের উপদেশে আস্থা, এবং (৩) চরিত্র বা সমস্ত অসৎ আচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকা। চরিত্র বলিতে জৈনরা অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য বোঝেন। ইহাদের মধ্যে সত্যবাদিতা, চুরি না করা, হিংসা না করা এবং লোভ সংবরণ করা—এই চারিটি খুব সম্ভবত পার্শ্বনাথই প্রচার করেন। মহাবীর ইহার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করার সূত্রটি যোগ করেন। বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনমতেও ভগবানের অস্তিত্ব বা জাতিভেদ প্রথা স্বীকৃত নহে, কিন্তু কর্মফল বা জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেব ধর্মের অংগ হিসাবে কৃচ্ছ্রসাধনকে স্বীকার না করিলেও জৈনমতে কৃচ্ছ্রসাধন কৈবল্যলাভের একটি অপরিহার্য অংগ। তাঁহারা শুধু পশুবলির বিরোধিতাই করেন না, তাঁহারা অজৈব পদার্থেও প্রাণ আছে বলিয়া মনে করেন, এবং সেই কারণেই কৃষিকার্যে প্রাণের বেদনা সঞ্চার হইবে ধারণায় কৃষিকার্য পর্যন্ত করেন না।

মহাবীর

জৈনধর্মমত যেসব গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত বা আগম। মূল জৈন ধর্মমত চৌদ্দটি পর্বে বা খণ্ডে সংকলিত ছিল। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় বিহারে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহু জৈন জৈনসংঘের নেতা ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। এই সময় জৈনসংঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্থূলভদ্র। তিনি পাটলীপুত্রে এক জৈন সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে চৌদ্দটি

পর্ব বারোটি অংগে লিপিবদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে গুজরাটে আহূত অপর এক জৈন ধর্মসভায় জৈনধর্ম সাহিত্যে অংগ, উপাংগ, মূল ও সূত্র—এই চারিটি ভাগে সংকলিত হয়।

ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে যেসব জৈনরা দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান তাঁহারা যখন পুনরায় মগধে ফিরিয়া আসেন, তখন দেখিতে পান স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে মগধের জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান শুরু করিয়াছেন। মহাবীর পার্থিব কোনো কিছুর প্রতিই আসক্তি থাকা কৈবল্যলাভের অন্তরায় মনে করিতেন। তাই এমন কি পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও যাহাতে কোনো আসক্তি না জন্মায় সেইজন্য তিনি দিগম্বরই থাকিতেন। তাঁহার শিষ্যরাও ছিল দিগম্বর। ভদ্রবাহুর ভক্তরা স্থূলভদ্রের শিষ্যদের এই শ্বেতবস্ত্র পরিধান অনুমোদন করিতে পারিলেন না। ফলে, জৈনরা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর—এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যান। পরবর্তীকালে, যদিও মুসলমান আমলে দিগম্বর জৈনদের সামান্য বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য করা হয়, তবুও আজ পর্যন্ত জৈনদের মধ্যে ঐ দুইটি সম্প্রদায় বিদ্যমান।

জৈনধর্ম কোনোদিনই বৌদ্ধধর্মের মতো রাজানুগ্রহপুষ্ট হয় নাই বলিয়া কি ভারতবর্ষে কি ভারতের বাহিরে প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু সেইকারণেই হিন্দুধর্মের সহিত প্রত্যক্ষ বিরোধও তাহার তেমন হয় নাই। তাছাড়া হিন্দুধর্মের সহিত জৈনধর্ম নানাবিধ সামঞ্জস্যও বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। ফলে, আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম যেমন পরবর্তীকালে এদেশ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জৈনধর্ম তেমন হয় নাই। এখনও গুজরাট প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলে বহু ভারতবাসী জৈনধর্মাবলম্বী।

ইসলাম ধর্ম

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আরবের শাসনকর্তা হজ্জাজের সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাসিমের সিন্ধুদেশ বিজয়ের মধ্যদিয়া এদেশে প্রথম ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমান রাজাদের তৎপরতায় তাহাদের হিন্দুধর্মবিদ্বেষী অভিযানের ফলে বা সাধারণ মানুষের রাজানুকূল্য লাভের আশায় বহু লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তৎকালীন হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার কঠোরতাও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে ভারতবর্ষের এক বিরাট জনসংখ্যা মুসলমান।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ। এই ধর্মমত যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সেই কোরাণ সম্পূর্ণ তাঁহারই রচনা। ঐশ্লামিক মতে কোরাণের বাণী স্বয়ং ভগবানের। দেবদূত গেব্রিয়েলের নিকট হইতে মহম্মদ তাহা লাভ করেন। কোরাণ ব্যতীত ইসলাম ধর্মের অপর দুইটি ধর্মগ্রন্থ হইতেছে সুন্না ও হাদিথ। প্রথমটিতে মহম্মদের জীবনী ও দ্বিতীয়টিতে তাঁহার বাণী সংকলিত রহিয়াছে।

ইসলাম ধর্মমতে ভগবান বা আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন, সবকিছু ইচ্ছা করেন—তিনি সর্বশক্তিমান। এই কারণেই মূর্তিপূজা ইসলামধর্মে নিষিদ্ধ; আল্লাহ্ কখনই কোনো মূর্তিরূপ বা অবতাররূপ গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ্-তে বিশ্বাস রাখিতে হইবে—বিশ্বাস রাখিতে হইবে তাঁহার প্রচারক মহম্মদে এবং ঐশ্লামিক ধর্মগ্রন্থ কোরাণে। এই মত অনুযায়ী পৃথিবীর শেষ ধ্বংসের দিনে সমস্ত মানুষের বিচার করিবেন আল্লাহ্ এবং আমাদের কর্ম অনুযায়ী হয় সপ্তনরকে বা স্বর্গে আমাদের স্থান হইবে। এই ধর্মমতানুযায়ী এই পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ঘটে না, ঘটে আল্লাহ্-এর ইচ্ছা অনুসারে। যাহাতে নরকে যাইতে না হয় তাহার জন্য কোরাণে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পাঁচটি অবশ্যপালনীয় কর্মের বিধান রহিয়াছে—(১) আল্লাহ্-তে বিশ্বাস, (২) প্রতিদিন পাঁচবার ভগবানের আরাধনা, (৩) দরিদ্রের প্রতি দয়া ও ভিক্ষাদান, (৪) রমজান মাসে (যে মাসে কোরাণ মহম্মদের নিকট দেবদূত কর্তৃক বিবৃত হয়) উপবাস পালন, এবং (৫) জীবনে অন্তত একবার মক্কায় তীর্থযাত্রা (যদি কোনো কারণে কাহারও পক্ষে যাওয়া একান্তই অসম্ভব হয়, সেইক্ষেত্রে সে অন্যকে তাহার প্রতিনিধি হিসাবেও পাঠাইতে পারে)।

অন্যান্য ধর্মমতের মতো ইসলাম মতাবলম্বীরাও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নী প্রধান। সুন্নীরা আদি ইসলামমতে বিশ্বাসী এবং মহম্মদের পরে অন্য কোনো প্রচারকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু শিয়ারা করিয়া থাকেন।

বর্তমান ভারতবর্ষের আরেকটি প্রধান ধর্মমত খৃষ্টান ধর্ম। যীশুখৃষ্ট কর্তৃক খৃষ্টানধর্ম প্রচারের অব্যবহিত পরেই যদিও এদেশে দুই একজন

খৃষ্টান ধর্মযাজক উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্যত এইদেশে এই ধর্মমত প্রচারিত হয় অনেক পরে য়ুরোপীয় বণিকদের এদেশে আগমনের পরোক্ষ ফল হিসাবে। য়ুরোপীয় বণিকদের সংগে সংগে যে সব ধর্মযাজক এদেশে আসেন প্রধানত তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় এদেশে বহু লোক খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়।

খৃষ্টান ধর্ম

যীশুখৃষ্টের বাণী বাইবেল নামক ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বাইবেল পাঠে জানা যায় যীশুখৃষ্ট যে ধর্মমত প্রচার করেন তাহার মূল কথাও ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। এ জগতে তাহারাই ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করে যাহারা ন্যায়পথে থাকে, যাহাদের অন্তর পবিত্র, যাহারা অহিংস ও শান্তিকামী। ভগবানের প্রীতিলাভের একমাত্র উপায় মানুষকে ভালোবাসা। শত্রু-তার দ্বারা শত্রুতাকে জয় করা যায় না, জয় করা যায় ভালো-বাসার দ্বারা। তাই যীশুখৃষ্ট শত্রুকেও ভালোবাসার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। আদি খৃষ্টধর্মেও পৌত্তলিকতার স্থান নাই।

যীশুখৃষ্ট

যীশুখৃষ্ট প্রবর্তিত খৃষ্টধর্ম ছিল অত্যন্ত সহজ সরল জীবনাচরণের কতকগুলি নীতি। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য ধর্মমতের মতো খৃষ্টধর্মযাজকরাও রাজানুকুল্যে পুষ্ট হইয়া মূল ন্যায়নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। যীশুখৃষ্টের মূর্তিপূজাও ধর্মাচরণের অংগীভূত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতকে ইহার প্রতিবাদে খৃষ্টধর্মাবলম্বী চিন্তাশীল নায়কেরা এক আন্দোলন শুরু করেন। ফলে, খৃষ্টানরাও রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যাহারা উপরিউক্ত প্রতিবাদী আন্দোলনের সমর্থক তাহারাই প্রোটেষ্টাণ্ট নামে খ্যাত।

ধর্ম ও আধুনিক যুগের ধর্ম-সংস্কারকগণ

তোমাদের ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, সুলতানী আমলে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বহুদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান-দের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, ক্রমে তাহা হ্রাস পায় এবং ক্রমেই হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীরদের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহারই ফলে সুলতানী আমলের শেষ দিকে নানক, কবীর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকের উদ্ভব ঘটিল। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই মূল বাণী হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, হিন্দুধর্ম বা ইসলামধর্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরকে পাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ বা মার্গ মাত্র।

ইসলাম ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের প্রথম সংঘাত হয় দক্ষিণ ভারতে—অষ্টম-নবম শতকে আরব ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে আসিয়া। ফলে, শংকরাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব প্রভৃতি ধর্মসংস্কারকদের আবির্ভাব হয়।

শংকরাচার্য ছিলেন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ। মালাবার উপকূলের এক গ্রামে অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্ত অল্পবয়সেই তাঁহার ধারণা জন্মায় যে সংসার মিথ্যা। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মান্বেষণে ব্যাপৃত হন। গুরু গোবিন্দ যোগীর নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং কঠোর তপশ্চর্যার ফলে পরম-হংসত্ব বা সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর সারা ভারত ঘুরিয়া তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি পণ্ডিতদের সভায় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতাদের পরাস্ত করেন। ইহাকে শংকরাচার্যের দিগ্বিজয় বলে। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি সত্য সত্য দিগ্বিজয়ই করিয়াছিলেন। আজিও শংকরাচার্যের নাম আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে একবাক্যে পরিচিত। শংকর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। সংসারে এক ছাড়া তিনি দুই মানিতেন না। শংকরের মতে সংসারে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব তিনি একেবারেই স্বীকার করিতেন না। কাজেই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের দিক দিয়া যাঁহারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাকে ধর্ম-সাধনায় একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে শংকর বিদ্রোহী। কিন্তু তিনি শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যেই তাঁহার মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ভারতের নানাস্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শংকরাচার্য

শংকরাচার্য

তাঁহার শিষ্যদের মাধ্যমে তাঁহার মত প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতের প্রায় প্রতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রেই (কাশী, পুরী ইত্যাদি) শংকরাচার্যের আশ্রম আজও বিদ্যমান। শংকরাচার্যকে হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করা হয়।

১০১৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকট তিরুপটিগ্রামে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত। শংকরের ধর্মমতে জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একতা উপলব্ধি করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাহাদের নিকট শংকরের ধর্মমত নীরস ও অবোধ্য ছিল। রামানুজও শংকরের মতো অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্মমতের সহিত পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া উহাকে জনসাধারণের অধিকতর নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের লোক এখনও ভারতে অনেক আছেন।

রামানুজ

নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য রামানুজেরই সমসাময়িক। নিম্বার্ক ভক্তিভাবের উপর আরও জোর দেন। মাধ্ব (১১৯৯-১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) রামানুজ ও নিম্বার্ক উভয়েরই ধর্মমত সংস্কার করিয়া উহা আরও সাধারণগ্রাহ্য করিয়া তোলেন।

রামানন্দ দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ। রাম-সীতার উপাসনার ভিতর দিয়া তিনি ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করেন। তিনি ও তাঁহার প্রধান শিষ্য মুসলমান ধর্মাবলম্বী কবীর (চতুর্দশ শতকে) প্রচার করেন হিন্দুদের রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন। ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিতে হয়, ভজন করিতে হয়। জাতিভেদপ্রথা তাঁহারা মানিতেন না। মুচি, মেথর, হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকল জাতির ও শ্রেণীর লোকদেরই রামানন্দ ও কবীর শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ অপেক্ষা কবীরই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি দোঁহা নামে ছোটো ছোটো দুই লাইনের কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার উপদেশগুলি প্রচার করেন। তাঁহার একটি দোঁহা নিচে দেওয়া গেল—

রামানন্দ ও কবীর

"আল্লা-রাম ভ্রম মুচ গিয়া মেরী।
সবই দেখৌ দর্শন তেরী॥"

এই সময় পাঞ্জাবে গুরু নানকও (জন্ম ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত শিখধর্ম নামে খ্যাত। শিখ অর্থ শিষ্য। নানকও জাতিধর্মনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলকেই শিষ্য হিসাবেই গ্রহণ করিতেন। সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শিখ ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকও নিতান্ত কম নহে। শিখেরা গুরুদ্বার (আমাদের মন্দিরের মতো) স্থাপন করিয়া, তাহার মাধ্যমে ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির শিখদের প্রধান গুরুদ্বার। বর্তমানে পাঞ্জাবে শিখ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অনেক। শিখধর্মের অনুসরণকারীরা ধর্মীয় দল হিসাবে খুবই সংঘবদ্ধ। মুসলমান যুগে, সুলতান এবং সম্রাটদের অত্যাচারের ফলে, শিখরা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেও বাধ্য হন।

নানক

নানক

নানকের প্রায় সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে অপর এক মহাপুরুষ তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচার করেন। তিনি হইতেছেন চৈতন্যদেব। ভগবানকে ভক্তি করা এবং প্রিয়জন হিসাবে ভালোবাসা, সর্বজীবে দয়া ও ভালোবাসা, সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা এই ছিল চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ধর্মমতের মূল বাণী। কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের ভজনা করা চৈতন্যদেব বিশেষভাবে প্রচার করেন। তিনিও জাতিভেদ মানিতেন না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতেন। চৈতন্যদেব যে ভাবধারার প্রচার করেন তাহার অনুসরণকারী ভারতের সর্বত্র এখনও অনেক আছেন।

চৈতন্য

এই সময়ই মারাঠা দেশে ভক্তিবাদের আরেক অন্যতম সাধক নামদেব তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। মূর্তিপূজা, আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ বা হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য তিনিও

নামদেব

মানিতেন না। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তাঁহার ধর্মমতের মূল নির্দেশ।

কিন্তু এই সব ধর্মগুরুদের প্রচার সত্ত্বেও পরবর্তী মুসলমান নরপতিদের অনেকের সংকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতির ফলে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সম্পূর্ণ মিশিবার সুযোগ পায় নাই। ফলে, পরবর্তীকালে যখন এদেশে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হইল, তখন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন ধর্মমতই নিজ নিজ স্থান করিয়া লইবার জন্য প্রয়াস পাইল। দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি।* নবজাগরণের পটভূমিকায় দেখা দিল এই তিন ধর্মমতের সমন্বয়সাধনের ঐতিহাসিক প্রয়োজন। ইহারই প্রকাশ রামমোহন, রাণাডে, দয়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার পথপ্রদর্শক ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ)। ইস্‌লাম ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের সংঘাতকালে দক্ষিণ ভারতে শংকরাচার্য ও রামানুজ এবং উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্য যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, খৃষ্টধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সংঘাতকালে রামমোহন প্রায় অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্ম-সমন্বয়ই ছিল তাঁহার ধর্মসংস্কারের অন্তর্নিহিত কথা। পাদ্রীরা তখন রাজানুকূল্য লাভ করিয়া সোৎসাহে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। অপর-দিকে হিন্দুধর্মের মধ্যে নানাপ্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছিল। ধর্মাচরণের ভিতর যে গূঢ় সত্য বা জীবনদর্শন নিহিত আছে তাহা না বুঝিয়া হিন্দুরা যন্ত্রের মতো ধর্মাচরণ করিয়া চলিয়াছিল। ঐসব আচরণ দেখিয়া স্বভাবতই অপরে তাহাকে অর্থহীন কুসংস্কার বলিয়া মনে করিত। পাদ্রীরা ঐসব ধর্মাচরণের প্রকাশ্য নিন্দা ও সমালোচনা করিয়া হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত অনেক হিন্দু যুবকও তাহাদের প্রচারে আকৃষ্ট হইতেছিল। এই ধর্মসংকটের সময় রামমোহনের আবির্ভাব হয়। আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় রামমোহনের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। নিজের চেষ্টায় পরে তিনি ইংরেজীও শিখিয়াছিলেন। ইস্‌লাম এবং খৃষ্টান ধর্মের সারগ্রন্থগুলি তিনি গভীরভাবে পড়িয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের বেদ-উপনিষদ রামমোহনই ভাষ্যসহ প্রথম অনুবাদ করেন। যাহাতে সংস্কৃত না

জানা লোকও বেদান্ত-উপনিষদের কথা পড়িয়া বুঝিতে পারে এবং হিন্দু আচারের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহন ঐ গ্রন্থগুলিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদগুলি রামমোহন বিনামূল্যে পর্যন্ত বিতরণ করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আত্মীয়-সভা' নামে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য এক সভা স্থাপন করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ব্রহ্মকে একমাত্র সত্যরূপে মনে করিয়া তাঁহার উপাসনার জন্য এক সভা স্থাপন করেন। এই সভাই 'ব্রাহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্ম-সমাজ'রূপে খ্যাতি অর্জন করে।

রামমোহন প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের মূল কথা, সকল ধর্ম মূলত একই ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকে। উপনিষদে প্রচারিত একেশ্বরবাদই ইহার মূল কথা। ব্রাহ্মেরা মূর্তিপূজার সম্পূর্ণ বিরোধী। অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় গোঁড়ামি বা বাধানিষেধের কোনো প্রকৃত মূল্য নাই। জাতিভেদ অর্থহীন। সকল জাতির লোকের সহিত একত্রে বসিয়া আহারাদি করা বা ভগবানের উপাসনা করায় কোনো দোষ নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ সেই বোধই জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। নিরাকার ব্রহ্মো-পাসনার উপরই রামমোহন জোর দিয়াছিলেন।

নামদেব, তুকারাম প্রমুখ মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রচারকদের মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই রাণাডে তাঁহার প্রার্থনা সমাজ গড়িয়া তোলেন। বাংলার ব্রাহ্ম-সমাজদ্বারা মহারাষ্ট্রও প্রভাবান্বিত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাবে মহারাষ্ট্রে প্রথম 'পরমহংস সভা' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ)। এই সভা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। তারপর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাই গেলে তাঁহার উৎসাহে এবং রাণাডের প্রচেষ্টায় 'প্রার্থনা-সমাজ' স্থাপিত হয়। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতিই ছিল রাণাডের মূল আদর্শ। ধর্মসংস্কার অপেক্ষা সমাজসংস্কারের কার্যে প্রার্থনা-সমাজ অধিকতর অগ্রণী হয়।

রাণাডে

হিন্দুধর্ম ও সমাজকে সমস্ত কুসংস্কার হইতে মুক্ত করা এবং বৈদিক হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রবর্তনই ছিল দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের মূল লক্ষ্য। দয়ানন্দ ধর্মবিষয়ে উদারনীতির অনুসরণকারী ছিলেন, এবং শুদ্ধির মাধ্যমে অহিন্দুকেও হিন্দুসমাজে গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) নিজে গুজরাটী ছিলেন। বিশুদ্ধ আর্যধর্মের (বৈদিক ধর্ম) উপর তিনি হিন্দুধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ পৌরাণিক আমলে যেসব দেবদেবীর পূজা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি জাতিভেদ এবং বহু দেব-দেবীর পূজার বিরোধী ছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর কর্মকেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব। পাঞ্জাবেই এখনও তাঁহার অনুগামী লোকের সংখ্যা অনেক।

দয়ানন্দ

দয়ানন্দ সরস্বতী

একান্তভাবে হিন্দুধর্মের অনুসরণকারী ও পৌত্তলিকতার পূজারী হইয়াও উদার মানবতার অধিকারী কি করিয়া হওয়া যায় ও সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়াস

পাওয়া যায় তাহার মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৫-১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) বিশেষ লেখাপড়া জানিতেন না। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে কঠোর তপস্যার দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ধর্মের সহিত ধর্মের, ঈশ্বরের সহিত ঈশ্বরের বা মানুষের সহিত মানুষের

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

বিভিন্নতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাস করিতেন না। সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য আছে, একথা তিনি সাধনাদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও ইস্‌লাম এবং খৃষ্টধর্মের সাধনা পর্যন্ত অভ্যাস করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও, ব্রাহ্ম-সমাজের কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নীরস বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুদ্ধি এবং হৃদয়-আবেগের সমন্বয় ঘটান। 'মায়ের' প্রতি ভক্তিরসে তাঁহার ধর্ম জনসাধারণের নিকট সরস হইয়া ওঠে। তিনি ও তাঁহার

স্বামী বিবেকানন্দ

সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ অনাবিল ভক্তি দ্বারা একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের মূল অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশিত ও প্রচারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকল ধর্মের প্রতি সম-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু-ধর্মমতকে সংকীর্ণতার আবিলতা হইতেও মুক্তি দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড়ে ইহার প্রধান কেন্দ্র হয়। মানবকল্যাণ এবং জনসেবায় এই মিশন বিশেষ-ভাবে উৎসর্গীকৃত। ভারতের সর্বত্র, এমন কি ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক স্থানেও, আজ রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write what you know of Hinduism as a religion.
2. Write what you know of Islam as a religion.
3. Write what you know of the religious reformers in India in the 14th century.
4. Write what you know of the religious reform movements of India during the British rule.

B. Answer the following questions in not more than 60 words:—

1. Write what you know about Buddhist religious literature.
2. Write what you know of Mahayanism.
3. Explain why Buddhism did not survive as a religion in India.
4. State very briefly the main tenets of Buddhism.
5. State very briefly the main tenets of Jainism.
6. Write what you know of Jaina religious literature.
7. Write what you know of Svetambara Jainas.
8. State briefly the main tenets of Christianity.

C.

1. Below are given the names of religious books and some tenets of Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam and Christianity. Write H, B, J, I and C respectively under them to indicate the religion with which it is associated. If a tenet is associated with more than one religion, more than one letter may be written under it.

Books and Tenets

Tripitaka. Worship of 'Brahma' through Gods and Goddesses. Upanishad. Belief in the learned (Jin) Agam. Does not believe in the caste system. Men can attain salvation through his own work. Worship of God five times every day. Belief in one and one God only. Love for others is the best virtue. Alms to be given to the poor. Bible. Performance of Yajna. There is life also in the "non-living".

2. Write below the eight ways of attaining Nirvana as stated by Buddha.

D. The following are for your scrap-book :—

Collect at least two sayings from each of the principal religions described in the chapter.

E. The following projects may be undertaken :—

Followers of every religion should write at least two points in which his religion agrees with other religions. These points may be collected and edited for the wall-newspaper.

আমাদের ভাষা

সুবিশাল আমাদের এই দেশে যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন প্রকার জাতির লোক তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের ভাষা লইয়া মিলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে এই বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করিয়া কোনো সমস্যা দেখা দেয় নাই। কারণ, বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরা যদিও দৈনন্দিন কাজকর্ম স্থানীয় কথ্যভাষাতেই চালাইয়াছে, রাজকার্য বা সমাজের উচ্চকোটির লোকদের ভাব ও প্রয়োজনের আদান-প্রদান হিন্দু আমলে সংস্কৃত ও মুসলমান যুগে ফারসী ভাষার মাধ্যমেই চলিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের ধর্মগুরু ও চিন্তানায়কেরা যখন ভারতের বিভিন্নাংশে স্থানীয় প্রান্তিক ভাষার মাধ্যমে তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার শুরু করেন, তখন হইতেই এই স্থানীয় ভাষাগুলি পুষ্টিলাভ শুরু করে। স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি রচনার ফলে, ভারতের বিভিন্নস্থানে ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। বিবাহাদিও এক ভাষাভাষীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতে থাকে। যেদিন এই ভাষাগুলির সৃষ্টি হয় সেদিন হয়তো এইসব স্থানীয় ভাষার বিকাশ ও পুষ্টি এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী শাসকদের কূট ভেদনীতির ফলে আজিকার ভারতবর্ষে এই ভাষার বিভিন্নতা এক সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথক জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। ফলে ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরোধ তাহা জাতীয় ঐক্যমূলে ফাটল ধরাইবার প্রয়াস পাইতেছে। আমরা নিজেদের ভারতীয় বলিয়া না ভাবিয়া বাংগালী, অসমীয়া, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাবিতে শিখিতেছি। ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি প্রত্যেক রাজ্যেই অপর ভাষাভাষী লোক রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নাই। সংখ্যাগুরু ভাষাভাষীদের খানিকটা গোঁড়ামি এখনো রহিয়া গিয়াছে। তাই সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের মনে একটা অনিশ্চয়তাবোধ বর্তমান। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটা সর্বভারতীয় মনোভাব গড়িয়া তোলার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।

আমাদের ভাষাসমস্যা

অথচ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে এই সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে যতটা জটিল মনে হইতেছে কার্যত ততটা নহে। গ্রিয়ারসন সাহেব ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাসমূহের পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, এদেশে মোট ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষা রহিয়াছে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট হইতেও জানা যায়, এদেশে মোট ৮৪৫টি ভাষা রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সংখ্যা ভীতিপ্রদ মনে হইলেও ঐ রিপোর্ট হইতেই জানা যায় যে ইহার মধ্যে ৭২০টি ভাষার প্রত্যেকটিতে মাত্র ১ লক্ষেরও কম লোক কথা বলিয়া থাকে। তাছাড়া, আরও ৬৩টি হইতেছে আধুনিক কোনো বিদেশী ভাষা। এদেশে সেসব ভাষাভাষী লোকসংখ্যা অতি নগণ্য। প্রায় ১০ কোটি লোক, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোকই আমাদের শাসনতন্ত্রে যে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতি রহিয়াছে, সেই ভাষাগুলির কোনো-না-কোনোটাতে কথা বলিয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে, ইংরেজীসহ মাত্র ১৫টি শ্রেষ্ঠ ভাষাকেই আধুনিক ভারতবর্ষে স্বীকার করিয়া লওয়াতে কোনো ভুল হয় নাই।

আমাদের শাসনতন্ত্রে যে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহারা হইতেছে অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, উর্দু, কানাড়ী, কাশ্মীরী, মারাঠী, মালয়ালম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু। একটু পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, উপরিউক্ত ভাষাগুলির মধ্যেও উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে যেমন একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র বর্তমান আছে, তেমনি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিও, অর্থাৎ কানাড়ী, মালয়ালম, তামিল, তেলেগুও পরস্পরের সহিত খুবই নিকটভাবে সম্পর্কিত। আমাদের শাসনতন্ত্রের ৩৪৩ ধারায় দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দী ভাষাকে সরকারী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। হিন্দী ছাড়া ইংরেজীকেও শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর ১৫ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অবশ্য শাসনতন্ত্রের অপর এক ধারায় (৩৪৪ নং) হিন্দীভাষার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য রাষ্ট্রপতিকে কমিশন নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই কমিশনের মতামত প্রকাশিত হইলে তাহা পার্লামেণ্টের ৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইবে। তাঁহাদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্কে নির্দেশ

অষ্ট্রিক গোষ্ঠী

কোল বা
মুণ্ডা শ্রেণী

সাঁওতালী
মুণ্ডারী
হো
গদব
শবর

দক্ষিণী শ্রেণী

মারাঠী কোংকনী হলূবী ওড়িয়া বাং

মৈথিল

জানপদ হিন্দুস্থানী
খড়ীবোলী

হিন্দী
উর্দু
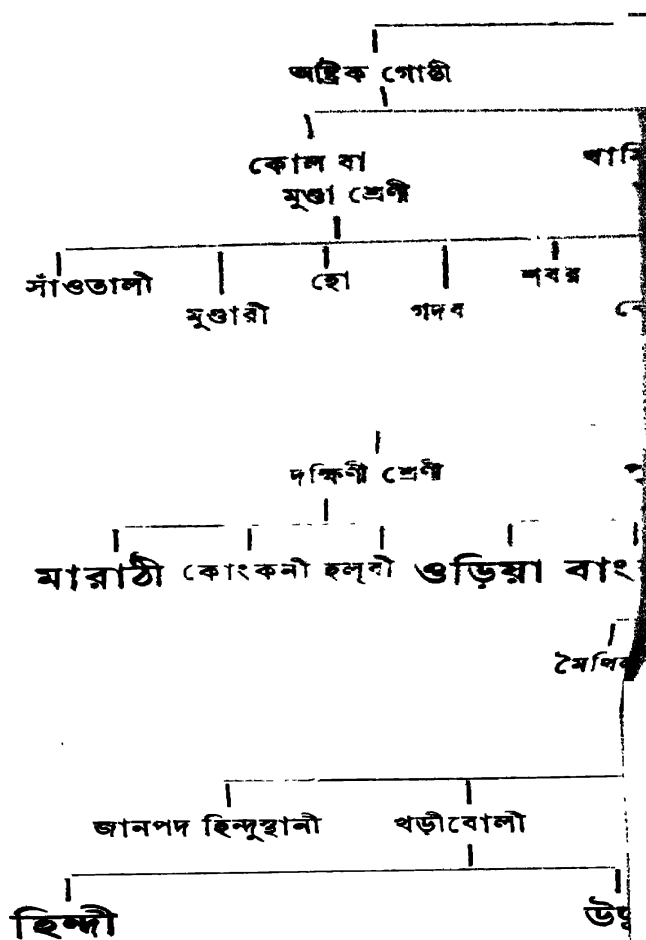
রী করিবেন। এই ধারা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে নিযুক্ত ভাষা কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরেজীর রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। পার্লামেন্টের সদস্যদের লইয়া গঠিত কমিটিও
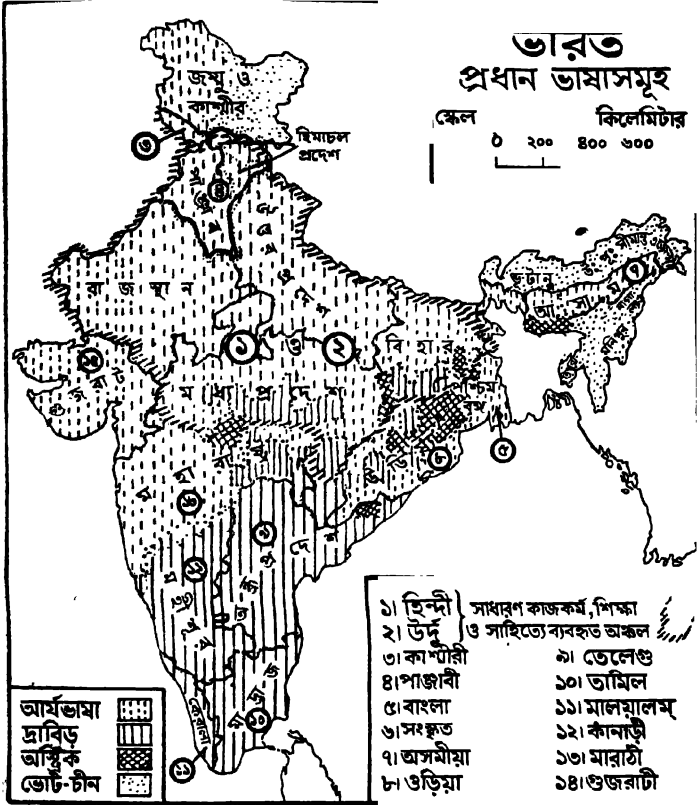
ভাষা কমিশনের এই অভিমত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত যদিও ইংরেজীই আমাদের প্রধান রাষ্ট্রভাষা এবং হিন্দী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা থাকিবে, কিন্তু ১৯৬৫ সালের পরে হিন্দীই প্রধান রাষ্ট্র-ভাষা হইবে এবং ইংরেজী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে চালু হইবে। এই

রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রপতি যে নির্দেশ জারী করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরেজী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপেই চালু থাকিবে।

আগেই বলা হইয়াছে আমাদের আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যে উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র বর্তমান। বস্তুত, শুধু এই ১৪টি ভাষাই বা বলি কেন, ভারতবর্ষের মোট ৮৪৫টি ভাষার কথাই যদি ধরা যায়, ঐতিহাসিক ভাষা-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাহাদের মাত্র চারিটি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা চলে। এই চারিটি ভাষাগোষ্ঠী হইতেছে—১। অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী ২। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, ৩। ভোট-চীন (Tibeto-Chinese) ভাষাগোষ্ঠী এবং ৪। আর্য ভাষাগোষ্ঠী।

ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদের মধ্যে নিগ্রো বা নিগ্রোবটু জাতির (Negro অথবা Negrito) প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড বা প্রাথমিক অস্ত্রালাকার (Proto-Australoid) লোকেদের বংশধররা আজও এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু ইহাদের ভাষা আর জীবিত নাই। পরবর্তী জাতিসমূহের আগমনে ইহাদের ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই আদিম যুগেই ইহাদের পরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে যাত্রা করিয়া মেসোপোটেমিয়া হইয়া অষ্ট্রিক জাতির (Austric) মানুষ এদেশে আগমন করে এবং ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণে ত্রিবাংকুর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, পরবর্তীকালে আর্যদের আগমনে তাহাদের অনেকে নদী-উপত্যকা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মধ্য ও পূর্বভারতের পাহাড় ও জংগলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। নদী-উপত্যকা অঞ্চলে ইহারা বিজেতা আর্যদের ভাষা গ্রহণ করে, এবং আর্য ভাষাতেও ইহাদের বহু শব্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়। কিন্তু পূর্ব বা মধ্য ভারতের অরণ্যঅঞ্চলে যে সমস্ত অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরা পলাইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা আজও টিকিয়া আছে। বর্তমান ভারতীয় অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলি প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে পড়ে; (১) কোল বা মুণ্ডা শ্রেণী—বিহারের সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম বংগ, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলের সাঁওতালীদের ভাষা

অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী

সাঁওতালী, রাঁচী অঞ্চলের মুণ্ডারী ভাষা, হো ভাষা ও গদব ভাষা, উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলের শবর ভাষা, দক্ষিণ রাজস্থান অঞ্চলের কোরকু ভাষা প্রভৃতি এই ভাষাশ্রেণীর অন্তর্গত। (২) খাসি বা খাসিয়া শ্রেণী—আসামের খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত। এবং (৩) নিকোবরী শ্রেণী—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই শ্রেণীর ভাষা প্রচলিত। সাম্প্রতিককালে সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া প্রভৃতি অষ্ট্রিক গোষ্ঠীয় লোকদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন ইহারা নিজেদের ভাষা ও তন্নিবদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অন্যদিকে ইহাদের বাস্তব প্রয়োজনেই বাংলা, বিহারী, ওডিয়া বা অসমীয়া—এই প্রতিবেশী ভাষাগুলিরও একটি-না-একটিকে জানিতে ও শিখিতেই হইতেছে। ফলে, তাহাদের নিজস্ব ভাষাও আর বিশুদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না। এমনি করিয়া আজ হইতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে অষ্ট্রিক ভাষার যে আর্যীকরণের পালা শুরু হইয়াছিল তাহা আজিও অব্যাহত চলিয়াছে।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী

অষ্ট্রিক জাতির পর যাহারা এদেশে আগমন করে এবং যাহাদের ভাষা আজও ভারতে টিকিয়া আছে, তাহারা হইতেছে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমধ্যসাগরীয় জাতি (Mediterranean) এবং পশ্চিমে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের আর্মেনয়েড জাতি (Armenoid)। ইহারাই সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহারা ছিল সমভাষিক এবং ইহাদের ভাষাই দ্রাবিড় ভাষা নামে খ্যাত। পরবর্তী আর্যদের সহিত সংঘর্ষে উত্তরাপথে যদিও অষ্ট্রিক ভাষার মতই এই ভাষাও প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণাপথে আজও এই ভাষা টিকিয়া রহিয়াছে। শুধু টিকিয়া আছেই বা বলি কেন, সেখানে দ্রাবিড় ভাষারই একচ্ছত্র আধিপত্য। বর্তমান দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে তেলেগু বা অন্ধ্র, কানাড়ী বা কর্ণাট, তামিল বা দ্রাবিড় এবং মালয়ালম বা কেরালা প্রধান। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে সুপ্রচলিত এই চারিটি প্রধান দ্রাবিড় ভাষা ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যত্র আরও কয়েকটি দ্রাবিড় ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কেরালার উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত তুলু, কুর্গ অঞ্চলে প্রচলিত কোডগু, নীলগিরি অঞ্চলে প্রচলিত কোতা ও তোদা, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত গোঁড় বা গোণ্ড,

উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত কন্ধ বা কুঁই, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের অঞ্চলবিশেষে আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত কুঁড়ুখ বা ওরাওঁ, এবং রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে প্রচলিত মাল্‌তো ভাষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সব ভাষায় কোনো সাহিত্য আজিও গড়িয়া ওঠে নাই বলিয়া এই সব ভাষা-ভাষীদেরও অষ্ট্রিকভাষীদের মতোই হয় উপরোক্ত চারিটি প্রধান দ্রাবিড় ভাষার অথবা হিন্দী বা মারাঠীর মতো কোনো ভাষার একটি না হয় অপরটিকে শিখিতে হইয়া থাকে।[৫] বস্তুত, এই কারণেই উপরিউক্ত চারিটি ভাষাই আমাদের শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা পাইয়াছে।

আর্যভাষাগোষ্ঠী

দ্রাবিড়দের পরে ভারতে আসে আর্যভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষী ইন্দো-য়ুরোপীয় জাতির (Indo-European) লোকেরা। এদেশে ইহাদের ভাষার আদিমতমরূপ ঋক্‌বেদের ভাষা। এই ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan) নামেও খ্যাত। পরবর্তীকালে এই আদি ঋক্‌বেদিক ভাষাই অর্বাচীনতার রূপ লাভ করে। তাহাই লৌকিক এবং আরও পরবর্তী-কালে সংস্কৃত নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধদেবের কিছু আগে মৌখিক আর্যভাষা পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পালি ও বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতে ইহার বিভিন্ন স্থানীয় রূপভেদের সূত্রপাত ঘটে। আরও পরে সুলতানী আমলে মধ্যযুগীয় ধর্মগুরুদের জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় ধর্মপ্রচারের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় যদিও এইসব রূপভেদকে ভিত্তি করিয়াই আর্যভাষার আধুনিক রূপগুলির উদ্ভব ঘটে, তবু ইহা মনে রাখিতে হইবে, ইহাদের প্রায় সব ভাষার পক্ষেই সংস্কৃত স্বাভাবিক পরিপোষকের কাজ করিয়া গিয়াছে। আধুনিক আর্যভাষাগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে—(১) দক্ষিণী—মহারাষ্ট্রে প্রচলিত মারাঠী, পশ্চিম উপকূলে প্রচলিত কোংকনী ও বোম্বাই-এর পূর্বাঞ্চলে কিয়দংশে প্রচলিত হল্‌বী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (২) পূর্বী—উড়িষ্যায় প্রচলিত ওড়িয়া, বাংলা দেশে প্রচলিত বাংলা, আসামে প্রচলিত অসমীয়া এবং বিহারের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত মৈথিলী (উত্তরে), মগহী (মধ্য ও দক্ষিণে), ভোজপুরী (পশ্চিমে) প্রভৃতি বিহারী ভাষাসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৩)

পূর্ব-মধ্য—উত্তর প্রদেশের ও মধ্য-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রচলিত যথাক্রমে অবধী, বাঘেলী ও ছত্রিশগড়ী এই তিনটি উপভাষা সমেত কোসলী বা পূর্বী হিন্দী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৪) মধ্য-দেশীয়—উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত জানপদ হিন্দুস্থানী, খড়ীবোলী (সাধু হিন্দী ও উর্দু ইহার দুইটি রূপমাত্র ; বস্তুত ইহারা দুইটি বিভিন্ন লিপির দ্বারাও হয় ; সংস্কৃত নয়, বিদেশী শব্দ দ্বারা সমৃদ্ধ এই ভাষার দুইটি বিভিন্ন আকার), বাংগ্রু, ব্রজভাষা, কনৌজী ও বুন্দেলী প্রভৃতি উপভাষা সমেত পশ্চিমা হিন্দী ভাষা ; পূর্ব পাঞ্জাবের ডোগরী সমেত পূর্ব পাঞ্জাবী ভাষা ; এবং গুজরাট ও রাজস্থানের মারবাড়ী, জয়পুরী, হাড়ৌতি, মেবাতী, অহীরবাটী, মালবী, তামিল দেশের সৌরাষ্ট্রী, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের গুজরী প্রভৃতি উপভাষা সমেত রাজস্থানী-গুজরাটী ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৫) উত্তরী বা পাহাড়ী—হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল ও সংলগ্ন অঞ্চলের পূর্বী পাহাড়ী, তাহার পশ্চিমে কুমায়ুন অঞ্চলে কুমাউনী, গঢ়বালী প্রভৃতি মধ্য পাহাড়ী ও আরও পশ্চিমে ভদ্রবাহী, পাডরী, চমেআলী, কুলুঈ, কিউঠালী, সিরমৌড়ী প্রভৃতি পশ্চিমী পাহাড়ী উপভাষাসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৬) দরদ—কাশ্মীরী ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এত ভাষা ও উপভাষার মধ্যে প্রধানত অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, উর্দু, কাশ্মীরী, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী ও সংস্কৃত—এই কয়টি ভাষাই মুখ্য। এগুলির সামনে অন্য ভাষা বা ভাষাগুলির বিশেষ কোনো মূল্য নাই, কারণ কেবল এই ভাষাগুলিতেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ বিকাশ সাধিত হইয়াছে। প্রধানত এই কারণেই পূর্বোক্ত চারিটি দ্রাবিড় ভাষা ছাড়া উপরোক্ত ভাষা কয়টিও আমাদের শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আবার উত্তর ভারতের এইসব আর্যগোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের মধ্যে হিন্দী একটি সহজ সূত্র হিসাবে বিদ্যমান থাকাতেই এই সব ভাষাভাষী লোকেদের পরস্পরের মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান ততটা অনুভূত হয় না। প্রায় বিনা আয়াসলব্ধ স্বল্প হিন্দীর জ্ঞান লইয়াই সমগ্র আর্যভাষাভাষী অঞ্চলে সাধারণভাবে ভাবের আদানপ্রদান সম্ভবপর। এই কারণেই রাষ্ট্রভাষা স্থিরীকরণের সময় হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

আর্যদের পরবর্তীকালে এদেশে আসে চীনদেশ হইতে আগত মোংগল জাতীয় লোকেরা। ইহাদের ভোট নামক উপজাতীয় শাখা হিমালয়ের পাদদেশে, তিব্বতে ও পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের ভাষা ভোট-চীন ভাষা (Sino-Tibetan বা Tibeto-Chinese) নামে খ্যাত।

ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠী

এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের বেশীর ভাগই পরবর্তীকালে ক্রমশই কোনো-না-কোনো পূর্ব অঞ্চলীয় ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, যদিও গারো পাহাড় অঞ্চলের গারো, মণিপুর অঞ্চলের মণিপুরী বা মেইতেই, লুসাই পাহাড় অঞ্চলের লুশেই এবং নাগা অঞ্চলের নাগা ভাষাভাষী আজিও তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

আমাদের দেশের এত বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা, এবং শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা ও দুইটি রাষ্ট্রভাষা। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আমাদের 'শিক্ষার বাহন' হইবে কোন ভাষা? প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ হইতেই রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্গণ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বারংবার বলিয়া আসিয়াছেন। বস্তুত, ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে কোনো কিছু আমরা যত সহজে বুঝিতে পারিব, অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে তাহা সম্ভবপর নহে। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশে এই নীতিই গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাকেই বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাদানের মাধ্যম করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও মাতৃভাষার বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের আয়োজন চলিয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ণ রূপায়ণে একটি বড়ো বাধা হইতেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিদেশী ভাষায় যত গ্রন্থ রহিয়াছে আমাদের বিভিন্ন ভাষায় সেগুলির সামগ্রিক অনুবাদ এখনও সম্ভবপর হয় নাই। তাছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আঞ্চলিক ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হয় তাহা হইলে এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক বা ছাত্রদের স্বাভাবিক গতায়াত বন্ধ হইয়া যাইবে। আঞ্চলিক শিক্ষক বা ছাত্রদের ঐ বিশেষ অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়েই পঠন-পাঠন করিতে হইবে। অথচ জাতীয় সংহতির স্বার্থে, জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজনে শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজেদের অঞ্চলের বাহিরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গতায়াত অত্যাবশ্যক। এইসব কারণেই কুঞ্জরু কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ত্বরান্বিত না করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। জাতীয় সংহতির পন্থা নির্ণয়ের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন (University Grants Commission) কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Discuss the language-problem in India and show how it is standing in the way of our National Integration.

2. Write an essay on the Dravidian language-group in India.

3. Write an essay on the Aryan language-group in India.

B. Answer the following questions in not more than 80 words.

1. Discuss what you know about the medium of education in India.

2. Write what you know about the problem of a National Language for India.

3. Write what you know of the Austric language-group in India.

4. Write what you know of the Bhot-China language-group in India.

C.

1. In the left-hand column below are given the names of certain areas, while in the right-hand column are given names of certain languages. Underline those languages which have been recognised in the Constitution and put a cross under others. Put the number at the left of an area inside the bracket at the right of the language to indicate that the language is spoken in that area. Also write the letters Au, Dr, Ar, and Bc respectively under the names of the languages to indicate whether they belong to Austric, Dravidian, Aryan or Bhot-China language-groups.

Names of areas	Language groups
(1) Santal Parganas (2) Andhra (3) Khasi Hills (4) Coorg (5) Ranchi (6) Southern regions of Orissa (7) Madras (8) Nicobar Islands (9) Mysore (10) Western Coast (11) Different parts of Bihar.	Mundari ( ) Telegu ( ) Santali ( ) Tamil ( ) Nicobari ( ) Kudgu ( ) Kanarese ( ) Konkani ( ) Maithili ( ) Khasi ( ) Sabar ( )

2. Name the 14 languages recognised by the Indian constitution.

D. The following suggestions are for your scrap-book :—

1. Collect the names of a few standard books and their authors in Hindi.

2. Make a list of languages whose scripts are in Devanagri.

3. Collect pictures of people of India living in different parts and write below the languages which they speak.

E. The following projects may be undertaken :—

1. Discussion in regard to steps to be taken to counteract linguistic fanaticism. Opinions of some of the leaders in the locality may be taken. Attempts may be made to draft a code of language ethics which may be hung up as a wall-newspaper.

2. Debate on whether English should be retained as an associate national language.

3. Discussion about what should be the medium of instruction in schools and colleges.

আমাদের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

শিল্পকলায় ও ভাস্কর্যে, সংগীতে ও নৃত্যে জাতির সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত যে এইসব ক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের চারুশিল্পের (ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা) ইতিহাস পর্যালোচনায় দুইটি ধারা আদিম কাল হইতে দেখিতে পাই। একটি কালধর্মী শিল্পধারা। সম্রাট এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের প্রসাদে উহা পুষ্ট হইয়াছিল। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন রাজবংশের আমলে, এই ধারা বার বার রূপ বদলাইয়াছে। ফলে, বিভিন্ন শিল্পশৈলীর উদ্ভব হইয়াছে। অপরটি হইতেছে, লোকায়ত শিল্পধারা। লোকমানসের সার্থক প্রতিফলন হিসাবে ইহা যুগ যুগ ধরিয়া টিকিয়া রহিয়াছে। আমাদের বিভিন্ন আল্পনায়, বাঁশ ও বেতের কাজে, কাঁথার উপরের বিচিত্র নক্সায়, পটচিত্রে, কাঁচা বা পোড়ামাটির অথবা শোলা বা কাঠের মূর্তিতে, পুতুলে ও খেলনায় ইহার প্রকাশ। ইহাতে শিল্পশৈলীর বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু আছে প্রাণের স্পর্শ। ইহাকে আমরা লোকশিল্প (Folk Art) বলিয়া থাকি।

কালধর্মী শিল্প ও শিল্পকলা

আমাদের দেশের আদিম শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার ধ্বংসাবশেষসমূহে। সেখানে পোড়ামাটির অসংখ্য মাতৃমূর্তি, খেলনা, খোদিত চিত্রসহ অসংখ্য শিলমোহরাদি, সুদৃশ্য অলংকরণযুক্ত মৃৎপাত্র এবং পশু, পাখী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদির চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহারাই আমাদের দেশের লোকশিল্পের আদিমতম নিদর্শন। মাতৃকামূর্তিগুলি হাতে টিপিয়া তৈরী। ইহাদের চক্ষু ও বক্ষঃস্থল আলাদা মৃত্তিকাপিণ্ড জুড়িয়া গঠিত। এইরূপ মূর্তি-নির্মাণ প্রথা আজও ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। উন্নততর কালধর্মী শিল্পের পরিচয়ও সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় পাওয়া যায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত পাথরের মস্তকহীন স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তি দুইটি, অষ্টধাতুর নৃত্যরতা নগ্নমূর্তি এবং মহেঞ্জোদরোয় প্রাপ্ত শ্মশ্রুযুক্ত পাথরের মূর্তি কালধর্মী

সিন্ধুসভ্যতার শিল্পকলা

মৃৎশিল্প (মহেঞ্জোদরো)

শিল্পের নিদর্শন। ইহাদের গঠনকুশলতা উন্নত শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দেয়। এইগুলি বহু পরবর্তীকালের গ্রীকভাস্কর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।
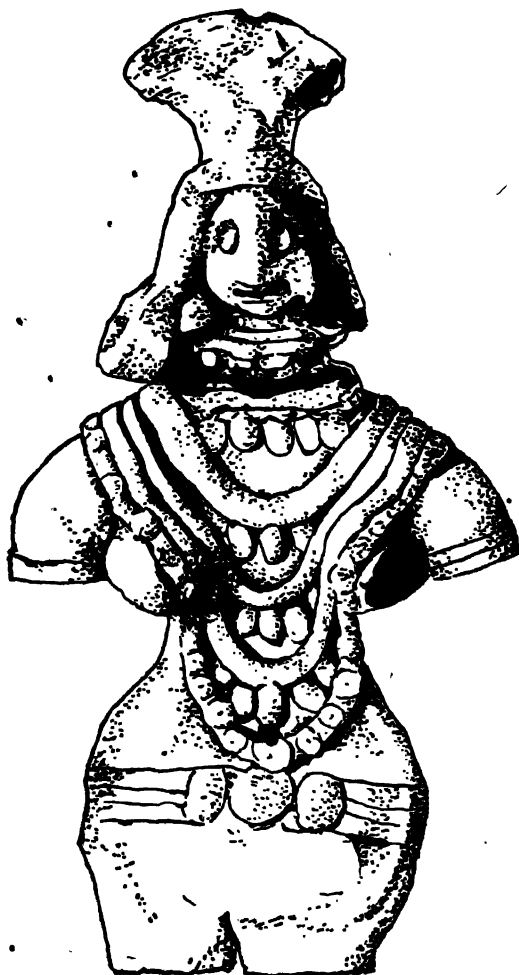
কাদামাটির তৈরী মূর্তি

সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার ধ্বংসের পর প্রায় দীর্ঘ দেড় হাজার বৎসরের ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। ইহার কারণ বোধ হয়, ঐ সময়কার ভাস্কর্যের নিদর্শনাদি কাঠ বা মাটি প্রভৃতি

মৃৎশিল্প (মহেঞ্জোদরো)
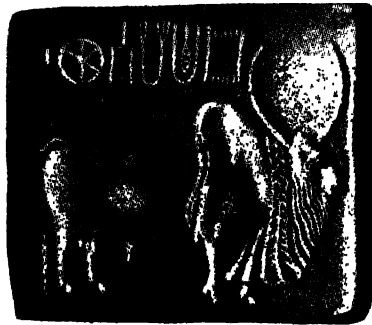
মহেঞ্জোদরোয় প্রাপ্ত শীলমোহর (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ)

অস্থায়ী উপকরণে নির্মিত হওয়ায় সহজেই কালের কবলে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তেমনি এই সময়কার চিত্রশিল্পেরও কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়

নাই। তবে বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি অংকন ও দর্শনের নিষেধাজ্ঞা হইতে অনুমান করা অসংগত নহে যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িককালে এদেশে চিত্রশিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল।

মৌর্যযুগে ভাস্কর্যশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এই সময়কার বা কিঞ্চিৎ পূর্বেকার যে এগারোটি যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বা অশোক-স্থাপিত বিভিন্ন স্তম্ভশীর্ষে যেসব পশুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের আকার ও আয়তন হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই যুগে বৃহদাকার মূর্তিনির্মাণের এক বিশেষ ঝোঁক ছিল। ইহাদের রূপায়ণে যে শিল্পশৈলীর প্রকাশ, তাহার মধ্যে দুইটি ধারা সহজেই চোখে পড়ে। সারনাথ সিংহ বা দিদারগঞ্জ যক্ষিণী প্রভৃতি

মৌর্যযুগের শিল্পকলা

চমর ব্যজনকারিণী (দিদারগঞ্জ)

তাহাদের গঠননৈপুণ্যে, বাস্তবানুগ সজীবতায় সরস ও সুকুমার সত্তায় সমৃদ্ধ। কিন্তু বেশনগরের নারীমূর্তি বা পাটনার যক্ষমূর্তিদ্বয় প্রভৃতি আকারে যদিও বিরাটকায়, সজীবতা ও গতিচাঞ্চল্যের অভাবে তাহারা নিছকই স্থূল ও নিষ্প্রাণ। এইসব মূর্তির প্রায় সবগুলিতেই যে সুচিক্কণ পালিশ ও মসৃণতা দেখা যায় তাহা মৌর্যশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেহ কেহ মৌর্য-শিল্পকলায় পারসীক বা গ্রীক প্রভাবের কথা বলিয়া থাকিলেও একথা অনস্বীকার্য যে, মূলত মৌর্যশিল্পকলা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতারই উত্তর-সাধক। মৌর্যযুগের এইসব মূর্তির সহিত হরপ্পার মূর্তিগুলির তুলনা করিলে এই সত্য স্পষ্টই প্রকট হইয়া ওঠে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর মৃৎপাত্রগুলির গায়ে অঙ্কিত চিত্রাদির কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষের চিত্রকলার প্রথম সার্থক নিদর্শনও মেলে এই যুগে। মধ্য প্রদেশের রামগড় পর্বতে যোগীমারা নামে যে গুহাটি রহিয়াছে, তাহার ছাদের

মৌর্য চিত্রশিল্প

নিচে একই বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে ভাগে ভাগে কতকগুলি ছবি আঁকা রহিয়াছে। এই সব ভাগের বা প্যানেলের মধ্যে মাত্র চারিটির ছবি স্পষ্ট বোঝা যায়, অন্যগুলি অস্পষ্ট। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সব ছবিই শাদা জমির উপর লাল অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালো রং দিয়া অঙ্কিত। সীমারেখায় কোনো কোনো সময় হলুদও ব্যবহৃত হইয়াছে। এইসব ছবি, কি মানুষের, কি জীবজন্তুর, বা কি লতা-পাতা-ফুল প্রভৃতির, রেখার বলিষ্ঠতার জন্য বিখ্যাত।

মৌর্যযুগে ভারতীয় শিল্পকলা যে উন্নতি লাভ করে পরবর্তীযুগের শিল্পীরা তার অগ্রগতি অব্যাহত রাখে। শুংগ ও কান্ব বা দক্ষিণের সাতবাহন সম্রাটরা

মৌর্যোত্তর যুগের শিল্পকলা

ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইলেও এইযুগে বৌদ্ধশিল্পকলা যে বিশেষ উন্নতিলাভ করে তাহা ভরহুত, সাঁচী, বোধগয়া, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের ভাস্কর্য নিদর্শনসমূহ সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ভরহুতের স্তূপ-প্রাকারে ও তোরণগাত্রে যক্ষ-যক্ষিণী, দেবতা মূর্তি, বিভিন্ন পশুপাখী, লতাপাতা ও ফলফুলের অসংখ্য ছবি ছাড়াও, বিভিন্ন জাতক কাহিনী ও বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে বহু ভাস্কর্য খোদিত রহিয়াছে। মনুষ্য-মূর্তিগুলি, তাহাদের দেহের চ্যাপ্টা ভাবের এবং ভাবলেশহীন মুখাকৃতির জন্য, আমাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে যে ধারণা তাহা হইতে যদিও পৃথক বুত তাহারা

এক অপূর্ব সৌষ্ঠব, সারল্য ও সজীবতার পরিচয় বহন করে। পশুপক্ষীবৃক্ষাদির চিত্রগুলি শিল্পের নিখুঁতত্বে, পুংখানুপুংখ পারিপাট্য ও সজীবতার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার কোনো কোনো মূর্তির বেশভূষায় ব্যাক্ট্রিয়-গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট। সমকালীন ভারতের সহিত পশ্চিম এশীয় বা ব্যাক্ট্রিয়গ্রীকদের যোগাযোগই ইহার কারণ।

যক্ষ (ভরহুত)

বোধগয়ার প্রাকারগাত্রে এবং সাঁচীর তোরণদ্বারগুলিতেও ভরহুতের অনুরূপ চিত্র খোদিত রহিয়াছে। তবে ভরহুতের চেয়ে বোধগয়ার ভাস্কর্য অনেক বেশী আড়ষ্টতামুক্ত ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। সাঁচীর ভাস্কর্যগুলি পূর্বেকার সম্পূর্ণ আড়ষ্টতা হইতে মুক্ত। এক সহজ সরল গতিচ্ছন্দ যে শুধু এখানকার সমস্ত খোদিত লতাপাতা, ফুলফল, আলংকারিক চিহ্নাদির মধ্যেই বিরাজমান তাহাই নহে, মনুষ্যমূর্তিগুলিও সরস স্বচ্ছন্দ গতিভংগীতে পরিপূর্ণ। দূরত্ব বর্ণনার যে কৌশলের (Perspective) অভাব ভরহুতে দেখা যায় সাঁচীর শিল্পীরা সেই কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে, দাক্ষিণাত্যে অমরাবতীর শাদা মার্বেলে তৈরী স্তূপপ্রাকারে এই আদি বৌদ্ধশিল্পকলাই তার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এখানকার মূর্তিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহাদের দেহাবয়বের লম্বা ধরনের গঠনভংগিমা। এই লম্বা গঠনভংগিমাই অমরাবতীর মূর্তিগুলিকে এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যখন আদি বৌদ্ধশিল্পের এই বিবর্তন চলিয়াছে, তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে গন্ধার অঞ্চলে শিল্পশৈলীর আরেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছিল। এখানকার বৈদেশিক শিল্পিগণ গ্রীক ও পারসীক শিল্পশৈলীর আদর্শে ভারতীয়
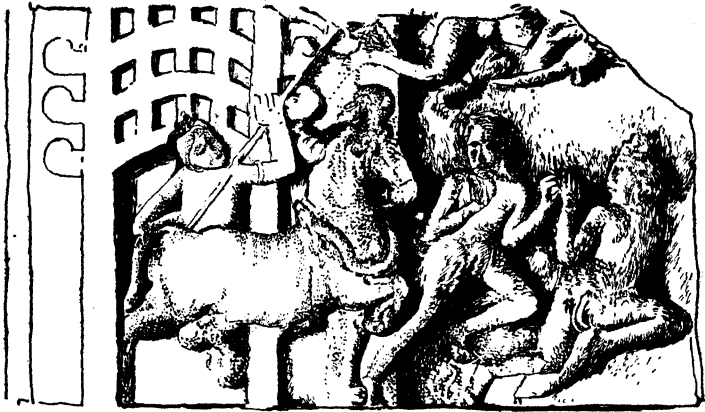
গন্ধার শিল্পকলা

মহাপ্রস্থান (অমরাবতী)
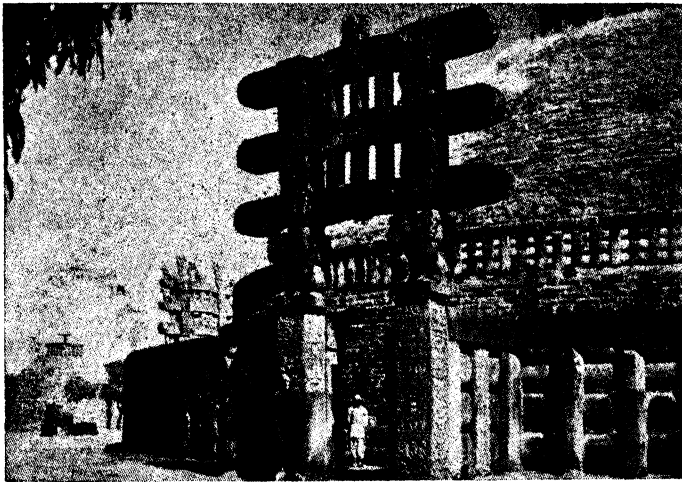
স্তূপ (সাঁচী)

ভাবধারাকে রূপায়িত করিতে গিয়া যে মিশ্র শিল্পরীতি গড়িয়া তোলেন তাহাই গন্ধার শিল্পশৈলী নামে খ্যাত। ইতিমধ্যে মহাযানমতের উদ্ভবের ফলে বুদ্ধের মূর্তিনির্মাণে আর কোনো বাধা ছিল না। ফলে, এই জায়গায় পাথরের বুকে শিল্পীরা যে অজস্র জাতক-কাহিনীকেই শুধু রূপায়িত করেন তাহাই নহে, তাঁহারা অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিও নির্মাণ করেন।

ষাঁড় (রামপুর)

এই সব মূর্তির বসনভূষণ, উত্তরীয়ের পরিপাটি ও নিখুঁত ভাঁজ, মাথার কুঞ্চিত কেশ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহগঠন, অলংকৃত মস্তকাভরণ ও উষ্ণীষ বা পায়ে গ্রীসীয় চপ্পল এই যুগের শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ বা হিন্দু দেবদেবীদের মাথার পিছনে যে প্রভামণ্ডল দেখা যায়, এই জায়গায় বৌদ্ধমূর্তিগুলিতেই তাহার প্রথম প্রকাশ।

গন্ধার বুদ্ধ

মথুরা বুদ্ধ

সমসাময়িক মথুরাতেও কুষাণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অজস্র বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্তি নির্মাণ শুরু হয়। লাল পাথরে তৈরী এই-সব মূর্তি তাহাদের মুণ্ডিত মস্তক, মাথার উপরের উষ্ণীষ, বৃষস্কন্ধ, স্থূল ও গুরুভার দেহাবয়ব এবং খোলা চোখের জন্য দেহের সুঠাম গঠন প্রকাশে সার্থক। কিন্তু এই সব মূর্তি বুদ্ধের সিদ্ধযোগীভাব প্রকাশে ব্যর্থ হইয়াছে। তবে মথুরাশিল্পে সামাজিক জীবনের যেসব দৃশ্যাবলী খোদিত

কুষাণ শিল্পকলা
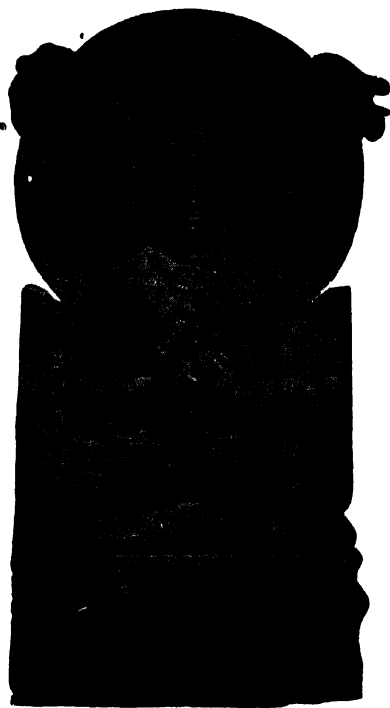
সারনাথ বুদ্ধ

হইয়াছে, তাহারা কিন্তু এক অনাবিল সরল মানবীয় ভংগীর অনবদ্য প্রকাশ। এই যুগের শিল্পকলার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই সময়ই মনুষ্য প্রতিকৃতির ভাস্কর্যে রূপায়ণ শুরু হয়। মথুরার মস্তকবিহীন কণিষ্কমূর্তি

বা মথুরার অনতিদূরবর্তী মট নামক স্থানে প্রাপ্ত কয়েকজন কুষাণ নরপতির মূর্তি ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

গুপ্তযুগের শিল্পকলা

মথুরার কুষাণ ভাস্কর্যকলার কালগত স্বাভাবিক পরিণতি গুপ্তযুগের ভাস্কর্যশৈলীতে। গুপ্ত শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সারনাথ। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বত্রই সারনাথ শিল্পের প্রভাব ও ঐতিহ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। বস্তুত, মথুরার ভারী, দৃঢ়, স্থূল, ও সূক্ষ্ম অনুভূতিবিহীন বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব মূর্তিই গুপ্তযুগের সূক্ষ্ম, মার্জিত, পেলব, ধ্যানগম্ভীর, যোগগর্ভ সারনাথ, মথুরা, সুলতানগঞ্জ, মানকুয়ারা, কার্লি কানহেরী ও অজন্তার বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্তিগুলিতে এবং উদয়গিরি, দেওগড়, ভুমারা, আইহোল, বাদামী মণিয়রি মঠ ও পাহাড়পুরের হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলিতে রূপান্তর লাভ করে। এইসব মূর্তিতে মথুরা শিল্পশৈলীর বিশেষত্ব। মানবিক দৈহিক শক্তির দ্যোতনা তত না থাকিলেও, ইহাদের মানবিক রূপ ও দেহভংগী ধ্যানযোগ ও স্বচ্ছ মননকল্পনার সংযোগে এক অতি সূক্ষ্ম সংবেদনময় অপরূপ অধ্যাত্মভাব ও কল্পনার দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল। মসৃণ, মার্জিত, রমণীয় ডৌল, সুকুমার অংগবিন্যাস ও সৌষ্ঠব, রেখাপ্রবাহের ধীরসংযত গতি ছাড়াও এক গভীর ধ্যানলব্ধ আনন্দের, চরম জ্ঞান ও উপলব্ধির, পরম পরিতৃপ্তির সহজ, সংযত মার্জিত প্রকাশে সমৃদ্ধ সারনাথ বুদ্ধ ভারতীয় ভাস্কর্যের এক অমূল্য সম্পদ।

যোগীমারার পরে ভারতীয় চিত্রশিল্পের আর বিশেষ কোনো নিদর্শন বহুদিন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু গুপ্তযুগের সমসাময়িক অজন্তা ও বাগের গুহাগুলির প্রাচীরগাত্রে এক অপূর্ব চিত্রশিল্পশৈলীর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। অজন্তার চিত্রাংকন যদিও খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে শুরু হয়, কিন্তু তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে গুপ্ত আমলেই। এইসব চিত্রের বিষয়বস্তু সাধারণত জাতক কাহিনী ও বুদ্ধজীবনী, বা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত। কিন্তু সমসাময়িক জীবনের রূপায়ণ, পশুপাখী-লতাপাতা বা আলংকারিক আলপনা এবং নক্সাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলিষ্ঠ ও সুললিত রেখাবিন্যাসে, চিত্রের বিষয়বস্তুর পারস্পরিক ভারসাম্যে (ইংরেজীতে যাকে বলে composition), সমন্বয়ে ও গভীরতায়, বলিষ্ঠ গতিভংগীতে, বর্ণনৈপুণ্যে ও সুললিত ছন্দে এই সকল চিত্র সমৃদ্ধ। অজন্তার মুমূর্ষু রাজকুমারী, কৃষ্ণ রাজকুমারী, বোধিসত্ত্ব

পদ্মপাণি বা যশোধরা ও রাহুল প্রভৃতি চিত্র ভাবদ্যোতনায় শুধু ভারতীয় শিল্পকলারই নহে, পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক অনবদ্য সৃষ্টি।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে মৌর্যযুগ হইতে শুরু করিয়া গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পসাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে একটি সর্বভারতীয় মৌলিক ঐক্য সুস্পষ্ট।

গুপ্তোত্তর যুগের শিল্পকলা

কিন্তু গুপ্তরাজবংশের অবনতির কাল হইতেই ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে যেমন আঞ্চলিক সামন্তাদর্শ মানুষের চেতনাকে ধীরে ধীরে অধিকার করিয়াছিল, তেমনি এই আঞ্চলিক রূপ ও রীতি শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুভূত হইতে দেরী হয় নাই।

বানর-পরিবার (মহাবলীপুরম)

এই সময় দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ও পল্লব এবং পরে রাষ্ট্রকূটরাজাদের আমলে যে দক্ষিণী শিল্পশৈলী গড়িয়া ওঠে তাহার অপূর্ব প্রকাশ মহাবলীপুরমে বানর-পরিবার, যমুনা দেবী, গংগাবতরণ প্রভৃতি ভাস্কর্যে; ইলোরায় রাবণের কৈলাস পর্বত ছুঁড়ে ফেলার প্রচেষ্টায়, শিব-পার্বতী, হিরণ্যকশিপুবধ প্রভৃতি ভাস্কর্যে,

এবং এলিফ্যান্টার শিবের বিবাহ, ত্রিমূর্তি প্রভৃতি ভাস্কর্যে। ইহাদের মধ্যে মহাবলীপুরমের শিল্পশৈলীতে যদিও মূর্তিগুলি ভাবের সূক্ষ্মব্যঞ্জনায় এবং

ত্রিমূর্তি (এলিফ্যাণ্টা)

দীর্ঘাকৃতি অংগ-প্রত্যংগে অমরাবতীর শিল্পশৈলীর ধারায় গঠিত, ইলোরা বা এলিফ্যান্টার মূর্তিগুলি কিন্তু স্থূল ও বিশালকায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে স্থূল হইলেও তাহারা অফুরন্ত তেজ ও শক্তিতে ভরপূর। ইহাদের পারস্পরিক ভারসাম্য ও আলোছায়ার কলাকৌশল অনবদ্য। পরবর্তীকালে চোল রাজাদের আমলের বৌদ্ধের মূর্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে শিবের নটরাজমূর্তি চোলযুগের শিল্পের শক্তিমত্তা, ভারসাম্য ও ভাবব্যঞ্জনার এক অপূর্ব নিদর্শন।

চালুক্য, পল্লব ও রাষ্ট্রকূট শিল্প

চোল-শিল্প

দাক্ষিণাত্যে যখন শিল্পশৈলীর এই বিবর্তন চলিয়াছে পূর্বাঞ্চলেও তখন শিল্পশৈলীর আঞ্চলিক রূপান্তর শুরু হইয়া গিয়াছিল। গুপ্তযুগ হইতে ভারতের মূর্তিসমূহে যে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশের প্রয়াস লক্ষণীয়, পাল ও সেনযুগের বিহার ও বাংলাদেশের শিল্পকলায় তাহারই এক অভিনব বিবর্তন চোখে পড়ে। এই যুগের মূর্তিগুলিতে আধ্যাত্মিক নৈর্ব্যক্তিকতা, দৈহিক সৌকুমার্য ও

বাংলাদেশে পাল ও সেন-শিল্প

সৌন্দর্য একই সংগে সমভাবে স্থান পাইয়াছে। মানবদেহের যে বিশেষ ধর্ম, তাহার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার যাহা ব্যঞ্জনা, তাহার সুষ্ঠু ও সুমিত প্রকাশই

যমুনা দেবী (ইলোরা)

দেখা যায় এই যুগের বিষ্ণু, শিব, সূর্য, বুদ্ধ বা শক্তি মূর্তিগুলির স্মিতহাস্যে বিকশিত মুখমণ্ডলে, বিশিষ্ট অংগভংগীতে। এইসকল মূর্তির বেশীর ভাগই কালো কষ্টিপাথরের। তবে, পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে পোড়া-

মাটির মূর্তিও প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া, বিহারের নালন্দার ধাতু-নির্মিত মূর্তিগুলিও এইপ্রসংগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধাতুনির্মিত মূর্তি নটরাজ

এইসময়কার বিভিন্ন বৌদ্ধ পুঁথির বুকে যে সমস্ত চিত্র অংকিত হইয়াছিল, তাহাই এই যুগের চিত্রশিল্পের একমাত্র নিদর্শন। ইহাদের উপর অজন্তার প্রভাবও সুস্পষ্ট।

উড়িষ্যা

সমসাময়িক উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোণার্কের মন্দিরগুলির গায়ে যেসব নাগনাগিনী, দেবদেবী, পশুপাখী, লতাপাতা ও ফলফুলের মূর্তি ও চিত্র খোদিত হইয়াছিল, তাহাদের সরস সাবলীল ছন্দগতি ও নিখুঁত কারুকার্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া এইসব মন্দিরগাত্রে রূপায়িত স্ত্রীমূর্তিগুলি তাহাদের লাস্যময় পেলব দেহভংগিমার লাবণ্যে চিরভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। উড়িষ্যা ছাড়া

খাজুরাহ্

মধ্য প্রদেশের খাজুরাহের হিন্দু ও জৈনমন্দিরগুলিতে যে অসংখ্য ফুললতাপাতা, দেবদেবী ও মনুষ্যমূর্তি খোদিত পাওয়া গিয়াছে, বা গুজরাটে আবুপাহাড়ের জৈনমন্দিরে যে অপূর্ব

কারুকার্যময় অলংকরণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাও ভারতীয় শিল্পের চরম সূক্ষ্মকার্যের নিদর্শন। বাংলাদেশের অনুরূপ গুজরাটের জৈনধর্ম পুঁথিগুলিতেও প্রচুর চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশেই জৈন কল্পলতা ও মহাবীরের জীবনচিত্র রূপায়িত। এইসব চিত্রের রেখাপ্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুজরাট
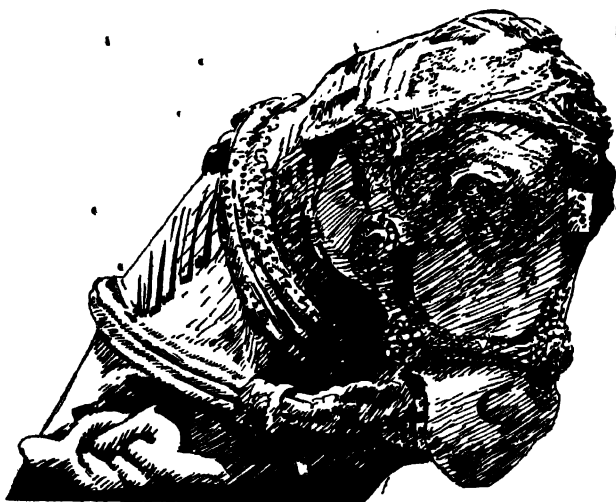
অশ্বমূর্তি (কোণার্ক)

ত্রয়োদশ হইতে শুরু করিয়া পঞ্চদশ শতকের মধ্যে খোদিত বা চিত্রিত উল্লেখযোগ্য কোনো ভারতীয় ভাস্কর্য বা চিত্রকলার নমুনা প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীকালে মোগলযুগে যদিও ভাস্কর্যের নমুনা খুবই কম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এই যুগে চিত্রকলার আরেকটি বিশেষ ধারা গড়িয়া ওঠে। তবে, ফতেপুর সিক্রী বা লাহোরের দেয়ালে আঁকা কতিপয় বৃহদাকার ছবি ছাড়া (ইহারাও ক্ষুদ্রাকার ছবিরই বৃহদাকার সংস্করণ) এই যুগের আর সব চিত্র-নিদর্শনই ছোটো আকারের (ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় miniature painting)। এই সব ক্ষুদ্রাকার ছবির প্রায় সবই তুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে ভরা। মোগল যুগের চিত্রকলার প্রথমদিকে যদিও তাহার উপর পারসীক প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু শীঘ্রই এই বিদেশী শিল্পশৈলী ভারতীয় ধারার সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক

মোগলযুগের চিত্রকলা

হইয়া গিয়াছিল। এই সব ছবিতে নীল, সোণালী প্রভৃতি বর্ণের বিন্যাসে অপূর্ব ঐক্য ও ঐশ্বর্য রহিয়াছে। ছবির জমি মুখ্য ছবির আশপাশে ছোটো ছোটো গৌণ ছবি দ্বারা ভরাট করা হইয়াছে। স্তর হইতে স্তরে ছবি

লিপিলিখনরতা (খাজুরাহ)

বিস্তার পাইয়াছে, এবং ইহার ফলে ছবিতে পশ্চাদ্‌পট প্রায় নাই বলিলেই চলে। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের সবগুলিই ভারতীয় রীতি। একটি বিদেশী রীতি যে এত সহজে ভারতীয় রীতির সহিত মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল তাহার মূলে ছিল আকবর, জাহাংগীর প্রমুখ সম্রাটদের শিল্পপ্রীতি, হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতের শিল্পীদের প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা। মোগল যুগের চিত্রকলার যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কতকগুলি হইতেছে

বিভিন্ন সম্রাটদের আত্মজীবনী বা অন্যান্য লেখকদের রচনার অলংকরণের উদ্দেশ্যে অংকিত পুঁথিচিত্র। কিন্তু ইহা ছাড়াও বিভিন্ন রাজারাজড়া বা ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীদের অংকিত অজস্র সংখ্যক আলাদা আলাদা নানা বিষয়বস্তুর ছবিও পাওয়া গিয়াছে। এইসব চিত্র আখ্যানধর্মী

মৃগ (এ্যান্টিলোপ) [মোগল চিত্রকলা, ষোড়শ শতাব্দী]

না হওয়ার ফলে তাহাদের বিশুদ্ধ চিত্রধর্মী হওয়ার কোনো বাধা ছিল না। ইহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জন্তুজানোয়ারের প্রতিকৃতি, অপূর্ব

রংগীন পাখীর ছবি, জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের ছবি, সাধুসন্তদের ছবি, শিকারের ছবি, দৈনন্দিন জীবনের নানা চিত্র প্রভৃতি রহিয়াছে। কিন্তু মোগল চিত্রকলার প্রধান বিষয়বস্তু বোধ হয় মানুষের প্রতিকৃতি অংকনে, জীবন্ত মানুষটির সমস্ত অবয়বের সার্থক প্রতিপ্রকাশে। ব্যক্তি চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট প্রতিফলনে মোগল শিল্পীরা যে অনবদ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। মোগল চিত্রকলার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এইসব চিত্রের প্রায় সবগুলিতেই মূল ছবির চারিধারে ফুললতাপাতা মণ্ডিত যে চওড়া পাড় রহিয়াছে তাহার ঔৎকর্ষ অনবদ্য। মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমল হইতেই চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ঔরংগজেবের উৎকট ধর্মান্ধতার ফলে মোগল দরবারে উহা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, পরবর্তীকালে এদেশের বিভিন্ন অংশে মোগল চিত্রকলার যেসব অপভ্রংশ গড়িয়া ওঠে, তাহাতে শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন যত না মেলে, রীতিপদ্ধতি বা কারিগরি নৈপুণ্যের সন্ধান পাওয়া যায় অনেক বেশী।

মোগল চিত্রকলার প্রায় সমসাময়িককালেই যদিও পশ্চিম ভারতে রাজপুত চিত্রশিল্পও গড়িয়া ওঠে, তবুও দুইয়ের মধ্যে ভাব বা রীতিতে কোনো সম্বন্ধই নাই। রাজপুত চিত্রকলার যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোঝা যায় তাহাদের সুকুমার কোমলতা অতুলনীয়। বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহা একান্তই ভারতীয়। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি লৌকিক ধর্মের বা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের এমন কিছু লোকপ্রসিদ্ধি নাই যাহার রূপায়ণ রাজপুতচিত্রে হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, দৈনন্দিন জীবনেরও কোনো বিষয় রাজপুত শিল্পীরা বাদ দেন নাই। তাছাড়া, মানুষের প্রতিকৃতি, ফুল-ফল, গাছ-পালা, পশু-পাখী প্রভৃতি তো আছেই। রাজপুত চিত্রকলার আরেকটি মূল্যবান সম্পদ তাহার রাগমালা চিত্রাবলী। ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রসম্মত রূপায়ণে এই চিত্রগুলির তুলনা মেলে না। ইহাদের অদম্য প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা রাজপুত শিল্পশৈলীর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাজপুত চিত্রকলা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে য়ুরোপীয় বণিকদের সংগে সংগে য়ুরোপীয় চিত্ররীতিও এদেশে আসে। মোগল শিল্পশৈলীর ভাংগন ইতিমধ্যেই শুরু

হইয়া গিয়াছিল। ফলে, দেশী শিল্পীরা কখনো স্বেচ্ছায় বিদেশী রীতির দিকে ঝুঁকিয়া ছবি আঁকা শুরু করেন, কখনো বা বিদেশী প্রভুর হুকুমে তাহাদের ইচ্ছামতো বিদেশী রীতিতে ছবি আঁকিতে থাকেন। পরবর্তীকালে এইসব শিল্পীদের মধ্যে উনবিংশ শতকের শেষ দিককার ত্রিবাংকুরের শিল্পী রাজা রবিবর্মার য়ুরোপীয় রীতিতে জলরংগে বা তেলরংগে আঁকা ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বলাই বাহুল্য, ইঁহারা বিদেশী শিল্পশৈলী ভালোভাবে আয়ত্ত করিলেও তাঁহাদের ছবিতে মননকল্পনার কোনো সাক্ষ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার যে প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, তাহার ঢেউ অনিবার্যভাবেই চিত্রকলার জগতেও আসিয়া লাগে।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা

সেই যুগে বর্তমান ভারতীয় চিত্রনীতির পথ যিনি সর্বপ্রথম খুলিয়া দেন তিনি হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিল্পরীতিতেই তাঁহার অপরিসীম দক্ষতা থাকায় তাঁহার হাতেই সর্বপ্রথম এই দুই রীতির সমন্বয়সাধনের কাজ শুরু হয়। শুধু তাহাই নহে, এদেশের লোকচিত্রের বিভিন্ন ধারাও তাঁহার শিল্পকর্মে স্থান খুঁজিয়া পায়। তাই তাঁহার রাধাকৃষ্ণ পর্যায়ের ছবিগুলিতে যেমন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মণ্ডনরূপের মিশ্রণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তেমনি তাঁহার ভারতমাতা বা ওমর খৈয়াম পর্যায়ের ছবিগুলিতে দেখা যায় মোগল ও রাজপুত শিল্পকলায় ভাবাশ্রিত সূক্ষ্ম কারুকার্য। ছায়া ও রংয়ের মনোমুগ্ধকর ব্যবহারের সংগে সংগে য়ুরোপীয় জলরংয়ের সাথে জাপানী 'ওয়াশ' প্রথার ব্যবহার অথবা 'কুটুম-কাটাম' লোকরীতির সার্থক প্রয়োগ তিনিই করিতে পারিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের পদাংক অনুসরণ করিয়া যাঁহারা আধুনিক ভারতীয় শিল্পকে মর্যাদালাভে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, অসিত হালদার, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে নন্দলাল বসুর ছবিতে যেমন ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের রেখা বা রূপই প্রধান, তেমনি আবার যামিনী রায়ের ছবিতে প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে লোকশিল্পের বলিষ্ঠ রেখা ও জোরালো, তীব্র গভীর রং; এইযুগের অপর দুইজন শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল

শিল্পকর্মকে অন্যদের সহিত তুলনা করা অসম্ভব। কিউবিষ্ট ধরনে আঁকা গগনেন্দ্রনাথের রহস্যময় রোমান্টিকবিষয়ক ছবিগুলি আধুনিক ভারতীয় শিল্পের এক বিরাট সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রং, রেখা আর ভাব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সব ছবিতে য়ুরোপীয় ধারা যেমন আসিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনি সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার রোমান্টিক ভাবালুতা বা লোকশিল্পের ধারারও সমস্ত চিহ্ন উপস্থিত।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন য়ুরোপীয় রীতি লইয়া এদেশে বহু শিল্পী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে সুধীর রঞ্জন খাস্তগীর, গোবর্ধন আঁশ, অমৃতা শেরগিল, রথীন মৈত্র, কে. কে. হেব্বর, নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, আমিনা আহ্‌মেদ, মকবুল ফেইদা হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বস্তুর স্বাভাবিক বাহ্যিক রূপকে অস্বীকার করিয়া ভাংগাচোরা বাহ্যরূপের মধ্য দিয়া বস্তুসত্তার অন্তর্নিহিত রূপকে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টাই ইহাদের শিল্পকর্মের প্রধান লক্ষণ।

সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পী

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ভাস্কর্যকলাও বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। আধুনিক ভাস্করদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রামকিংকর বেইজ, ধনরাজ ভকৎ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের শিল্পকর্মের সহিত আধুনিক য়ুরোপীয় ভাস্কর্যকলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write an essay on Indian sculpture and painting from ancient times to the Gupta period.

2. Write an essay on Mughal and Rajput paintings.

3. Write an essay on Indian painting during the modern period.

B. Answer the following questions in not more than 50 words :

1. Explain what you understand by Folk Art.

2. State what you know of Yogimara paintings.

3. State what you know of Gandhara sculpture.

4. State what you know of South Indian sculpture.

5. State what you know of sculpture in Bengal during the Pala and the Sena period.

6. Write what you know of the Ajanta and the Ellora paintings.

7. Write a note on Abanindranath as a painter.

C. Below are given names of pieces of sculptures, Schools of Sculpture or of places where sculptures of high quality are found. Write 1, 2, 3, 4 or 5 inside the bracket on the right hand of each to indicate its relation with Indus Valley Civilisation, Maurya period, Sunga and Kanva period, Kushan period or Gupta period respectively as the case may be :—

Gandhara School (   ) Bharhut, Kanishka statue (   ) Sultanganj, Amaravati, Bronze dancing woman figure (   ) Stone headless male figure (   ) Sarnath Lion (   ) Didarganj Yakshini (   ) Sarnath Buddha (   ) Yogimara (   ) Ajanta Caves (   ) Mathura (   ).

D. In your scrap-book, collect pictures or photographs of sculptures of different periods systematically to illustrate the principal characteristics of each period. Edit them properly.

E. The following projects may be undertaken :—

1. Visit to a museum, if possible.

2. Organising an exhibition of Indian Sculpture and Painting with the help of collected pictures and photographs.

আমাদের স্থাপত্যকলা

ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মতো আমাদের স্থাপত্যকলারও আদিমতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে। ঐসব জায়গায়

সিন্ধু উপত্যকার স্থাপত্যকলা

যেসব বাসগৃহ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি পোড়ানো বা সূর্যপক্ক ইটের সহিত মাটির দ্বারা বা কোথাও কোথাও একরূপ পাকা মশলার দ্বারা গাঁথা। প্রতিটি গৃহেই ঘর-সংস্থান
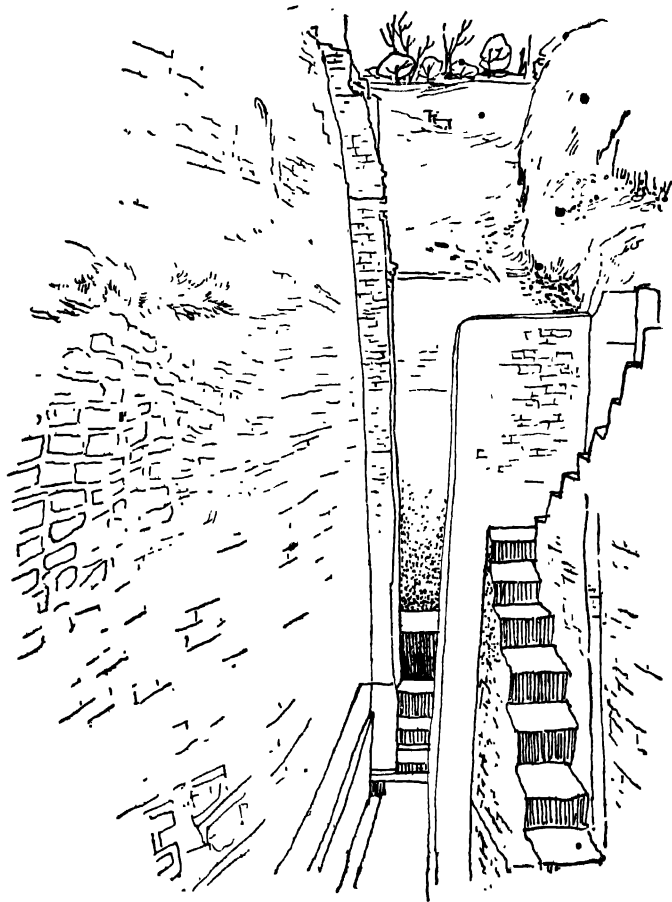
বাড়ীর অংশ (মহেঞ্জোদরো)

বা সংলগ্ন স্নানাগার ও ইট দিয়া ঢাকা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা উন্নত মানের পরিচয় বহন করিতেছে। সাধারণ মন্দিরজাতীয় কোনো কিছু

ঐসব জায়গায় আবিষ্কৃত হয় নাই, তবে মহেঞ্জোদরোর চতুর্দিকে বড়ো বড়ো গবাক্ষযুক্ত দরদালানসহ এবং প্রাচীরবেষ্টিত বৃহদাকার স্নানাগারটি এবং উহার সন্নিকটবর্তী বৃহদাকার সাধারণ দালানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহেঞ্জোদরোর বা হরপ্পার এই উন্নতস্তরের স্থাপত্যকলার নিদর্শনের পরে বহুকাল পর্যন্ত এদেশের স্থাপত্যশিল্পের আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণও বোধহয় এই যুগের সাধারণ গৃহাদির ন্যায় প্রাসাদ বা মন্দিরাদিও কাঠ, বাঁশ, মাটি প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী পদার্থদ্বারাই নির্মিত হইত। আর তাহারই ফলে, কালাবর্তে সহজেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বস্তুত, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের যে প্রাসাদের ধ্বংসাবেশেষ কুমড়াহারে মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে তাহাও কাষ্ঠ-নির্মিতই ছিল। কিন্তু কাষ্ঠনির্মিত হইলেও এইসময় স্থাপত্যকলা যে চরম উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ, মেগাস্থিনিস ঐ প্রাসাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, অলংকারপ্রাচুর্যে ও আকারে-প্রকারে উহা পারস্যের সুসা ও একবাটানার বিশাল রাজপ্রাসাদগুলিকেও হার মানাইত। একই জায়গায় প্রস্তরনির্মিত অশোকের রাজপ্রাসাদ দেখিয়া ফা-হিয়েন লিখিয়াছেন, উহা নির্মাণ করা এ জগতের কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। এই প্রাসাদেরও কয়েকটি ভাংগা স্তম্ভ মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

মৌর্যযুগের স্থাপত্যকলা

প্রাসাদ

মৌর্যযুগে নির্মিত চৈত্য বিহার ও স্তূপগুলিই প্রকৃতপক্ষে এই যুগের স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মৃতব্যক্তির স্মারক হিসাবে তাহার দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণপদ্ধতি বহু প্রাচীনকালের। এইযুগে বুদ্ধদেবের পুণ্যাস্থি প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যই এইসকল স্তূপ নির্মিত হয়। গঠনপ্রণালীর দিক হইতে স্তূপকে চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়—বেদিকা, অণ্ড, হর্মিকা ও ছত্র। ইটের তৈরী চতুষ্কোণ বেদিকার উপর গোলাকৃতি যে স্তূপ তৈরী করা হইত তাহাকেই বলা হইত অণ্ড। অণ্ডর কিঞ্চিৎ সমতল উপরিভাগে যে চতুষ্কোণ হর্মিকা বসানো হইত তাহারই অভ্যন্তরে পুণ্যাস্থি প্রভৃতি সংরক্ষিত হইত। হর্মিকার মধ্যভাগে প্রোথিত এক কাষ্ঠ বা ধাতুদণ্ডের উপর শোভা পাইত ছত্র। মৌর্যযুগের স্তূপাদির মধ্যে পিপরয়া, সাঁচী, ভরহুত প্রভৃতি স্থানের স্তূপাদি উল্লেখযোগ্য।

স্তূপ

চৈত্যগৃহগুলি নির্মিত হইত পাহাড়ের গায়ে, গুহার মধ্যে। প্রধানত সন্ন্যাসীদের বর্ষাকালের আবাস হিসাবেই এইগুলি ব্যবহৃত হইত। এই যুগের বরাবর পাহাড়ে আজীবীক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্য তৈরী চৈত্যগুলি বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে লোমশ ঋষি গুহার উপরিভাগে যে অপূর্ব কারুকার্য খোদিত রহিয়াছে তাহা

চৈত্য

লোমশ ঋষি গুহা

হইতে জানা যায়, কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্যরীতির অনুকরণেই উহা নির্মিত। পরবর্তীকালে অনুরূপ গুহা চৈত্য-স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায় কলিংগরাজ খরবেলের পৃষ্ঠপোষকতায় উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি নামক পর্বত-গাত্রে খোদিত হাতী, অনন্ত, রাণী ও গণেশগুম্ফা প্রভৃতি জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য নির্মিত গুহায়।

এই চৈত্যগৃহগুলিই পরে বিহারে রূপান্তরিত হয়। এইসব বিহার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল, শিক্ষাকেন্দ্র বা বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ডাজা, কার্লে, বেদশা, নালিক প্রভৃতি স্থানে চৈত্য ও বিহার পাশাপাশি পাওয়া গিয়াছে। লোমশ ঋষি গুহার মতো ইহারাও সম্ভবত কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। উহাদের প্রবেশপথে কাষ্ঠনির্মিত ঘরবাড়ীর কড়িবরগা প্রভৃতি অলংকরণ হিসাবেই খোদাই করিয়া দেখানো হইয়াছে। এইসব চৈত্যগৃহগুলি আকারে লম্বাধরনের ও একদিকে অর্ধগোলাকৃতি।

বিহার ও চৈত্য

অর্ধগোলাকৃতির দিকে অবস্থিত রহিয়াছে একটি স্তূপ। চৈত্যগৃহের অভ্যন্তরে দেওয়ালের সমান্তরালভাবে স্থাপিত সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ ও দেওয়ালের মধ্যবর্তী পথটি স্তূপের প্রদক্ষিণপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত।
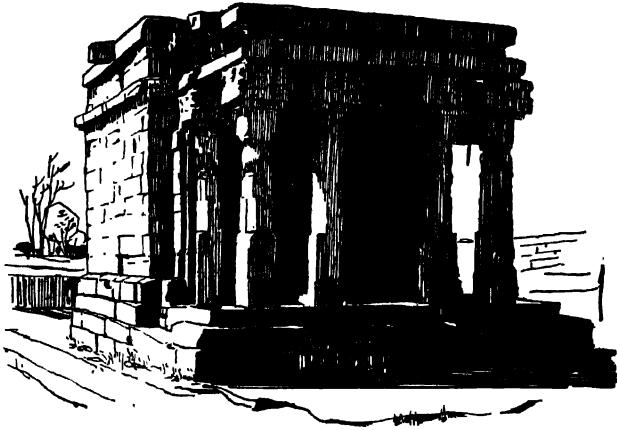
সাঁচীর হিন্দুমন্দির

চৈত্যের প্রবেশদ্বারের ঠিক উপরে অবস্থিত অশ্বত্থ-পত্রাকৃতি গবাক্ষটি চৈত্যের অভ্যন্তরে আলো-হাওয়া যাতায়াতের পথ হিসাবে তৈরী হইত। পরবর্তীকালে গুপ্তযুগে সারনাথের ধামেক স্তূপে বা অজন্তা-ইলোরার চৈত্যগুলিতে এই স্তূপ-চৈত্য-বিহার রচনার আদি বৌদ্ধ শিল্পরীতিই চরম পরিপূর্ণতা লাভ করে।

গুপ্তযুগের স্থাপত্যকলা

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সংগে সংগে এদেশে মন্দির স্থাপত্যেরও বিকাশ শুরু হয়। ইতিপূর্বে মন্দিরাদিও কাঠ প্রভৃতি ভংগুর জিনিস দ্বারা নির্মিত হইত বলিয়াই খুব সম্ভবত তাহার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। গুপ্তযুগে নির্মিত প্রাচীনতম হিন্দু মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সাঁচীতে। ঐ মন্দিরটি সমচতুষ্কোণী এবং উহার ছাদটি সমতলাকৃতি। গর্ভগৃহ (অর্থাৎ যে ঘরে বিগ্রহ থাকিত) ছাড়াও উহার সম্মুখে চারিটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান একটি মণ্ডপ রহিয়াছে। কিছু পরে নির্মিত তিগুয়া, ভূমারা ও নাচনাকুঠারও অনুরূপ সমতল ছাদের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু শীঘ্রই ভারতীয় স্থপতিরা

মন্দিরে শিখর সন্নিবেশের রীতি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকেই নাগর, দ্রাবিড় ও বেশর এই তিন প্রকারের শিখরের ব্যবহার পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত দুই জাতীয় মন্দিরে গর্ভগৃহের উপর হইতে শিখর উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু বেশর মন্দিরে ছাদ হইতেছে পূর্বযুগের চৈত্যগুহাগুলির অনুকরণে কুব্জপৃষ্ঠে। আবার, নাগর

মন্দির

লিঙ্গরাজ মন্দির—ভুবনেশ্বর

ভুবনেশ্বরের আরেকটি মন্দির

শিখর ক্রম-সংকুচিত রেখাবিশিষ্ট। এইজন্য ইহাদের রেখ দেউলও বলা হয়। উহার চূড়ায় একটি আমলকী ফলাকৃতি পাথর ও তদোপরি একটি কলস বসানো থাকে। কিন্তু দ্রাবিড় শিখরগুলির শীর্ষদেশ স্তূপাকারে গঠিত।

মন্দিরে শিখর ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ ভারতের ধারোয়ার বিজাপুর জেলা অন্তর্গত আইহোলে। এখানকার দুর্গা মন্দিরটি দ্রাবিড় রীতির প্রথম নিদর্শন। চালুক্য যুগে আইহোলে অপরাপর যেসব মন্দির তৈরী হয় তাহাদেরও বেশীর ভাগই অনুরূপ শিখরযুক্ত। ঐসময়ই পট্টডকলে নির্মিত বিরূপাক্ষ ও পাপনাথের মন্দির দুইটি কিন্তু উত্তরভারতীয় ধারায় নাগর শিখরযুক্ত। পল্লবযুগে মন্দিরশিল্পের আরেকটি ধারা লক্ষণীয়। মহাবলীপুরমে পর্বতপৃষ্ঠ খোদাই করিয়া দ্রৌপদী, গণেশ, অর্জুন, ধর্মরাজ ও সহদেব নামক যে রথগুলি নির্মিত হয় ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ইতিহাসে তাহা এক বিশেষ মূল্যবান সম্পদ।

দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্যশৈলী

ইহাদের শিখরগুলি একই আকৃতির নহে। দ্রৌপদী রথটি বাংলাদেশের কুড়েঘরের মতো। ভীম ও গণেশ রথ দুইটির শিখর বেশরাকৃতি, আর ধর্মরাজ
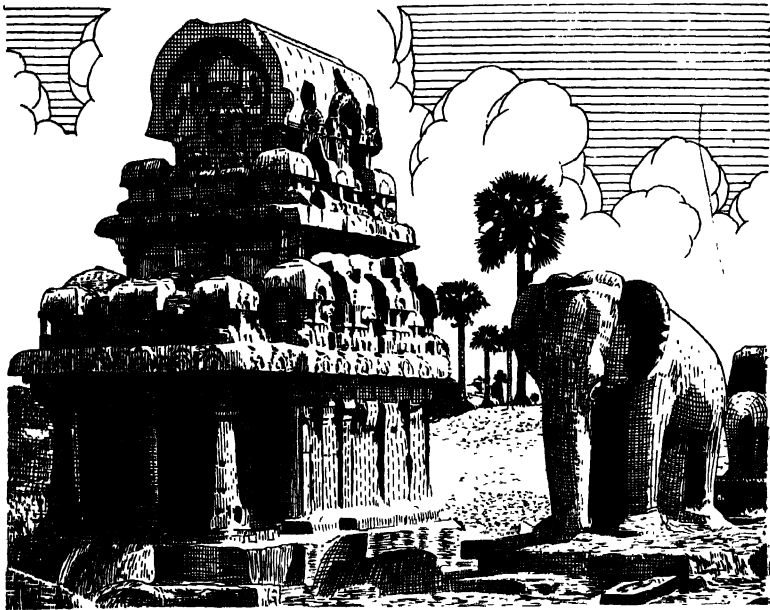
মহাবলীপুরমের রথ

রথটি ত্রিতলবিশিষ্ট এবং বৌদ্ধবিহারাকৃতি। পাহাড় খোদাই করিয়া মন্দির নির্মাণের এই ধারাটিই চরম পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্রকূট রাজাদের আমলে। এই সময় নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দিরটি অতুলনীয়। ইহার শিখর দ্রাবিড়াকৃতি, ছাদটি সমতল এবং ইহার সম্মুখের মণ্ডপটি ষোলটি স্তম্ভযুক্ত। অবশ্য স্তরে স্তরে পাথর সাজাইয়া তৈরী মন্দিরও পল্লবযুগে নির্মিত হইয়াছে। মহাবলীপুরমের সমুদ্রতটবর্তী মন্দিরটি ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। স্থাপত্যশিল্পের এই ধারাই চোল রাজাদের আমলে, তাঞ্জোরের শিবমন্দির প্রভৃতিতে পূর্ণ বিকাশলাভ করে। এই সময় শিখরগুলি যে শুধুই সাতিশয় উচ্চতা লাভ করে তাহাই নহে, মূল মন্দিরের চারিপাশে বিরাট অংগন এবং উহার চতুর্দিকে বিরাট প্রাচীরও দেখা দেয়। এই প্রাচীরের গায়ে প্রবেশ-পথগুলিতে দেখা দেয় বিরাট তোরণ। এইসব তোরণগুলি গোমুখের অনুকরণে

নির্মিত হইত বলিয়া গোপুরম্ নামে খ্যাত। এইসব মন্দিরে, মন্দিরের সম্মুখভাগে সুন্দর কারুকার্যখচিত স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
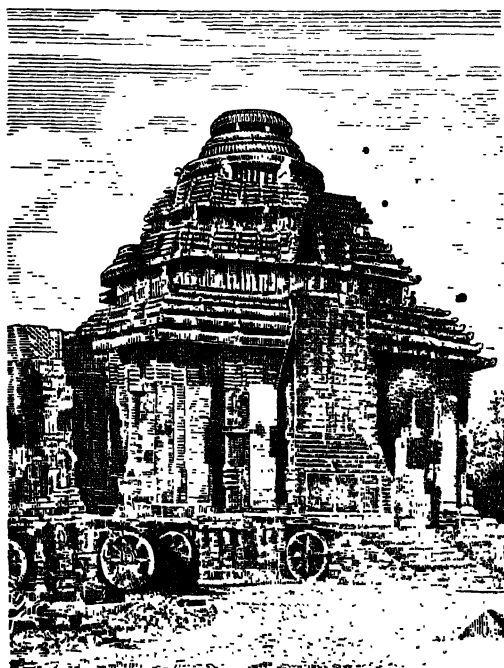
কোণার্কের সূর্য মন্দির

পরবর্তীকালে এই দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের চরম উন্নতি হয় মাদুরার নায়ক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এইসময় নির্মিত মাদুরার মন্দিরটি এই স্থাপত্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ নিদর্শন।

উড়িষ্যার স্থাপত্যশৈলী

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ী স্থাপত্যকলার যখন এই বিবর্তন চলিয়াছে, সেই সময় আর্যাবর্তেও নাগরী স্থাপত্য বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ লাভ করে। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর, লিংগরাজ, রাজারাণী, পুরীর জগন্নাথ, এবং কোণার্কের সূর্য মন্দির—এইগুলি এই রীতির ক্রমবিকাশের সুন্দর উদাহরণ। উড়িষ্যার মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে, এখানে মূল মন্দিরের (ইহাকে বলা হয় দেউল)

সংগে সংলগ্ন মণ্ডপ (জগমোহন), নাটমন্দির ও ভোগমন্দির রহিয়াছে। দেউলের শিখর নাগরাকৃতি, কিন্তু অন্যগুলির ছাদ পিরামিডের আকারে,
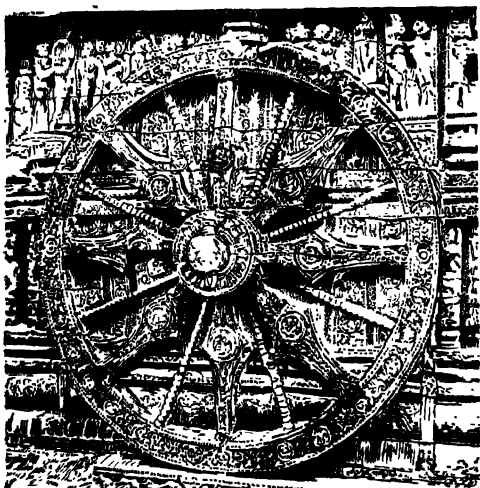
সূর্যদেবের রথচক্র (কোণার্ক)

স্তরে স্তরে সাজানো। ইহাদের বলা হয় পীড় দেউল। ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউল বেশর-স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

সমকালীন খাজুরাহে চান্দেল্য রাজাদের আনুকূল্যে তৈরী হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কনদারেও মহাদেবের মন্দিরটি। উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত বলিয়া এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য শিখর সংস্থাপিত রহিয়াছে বলিয়া উহা প্রকৃত উচ্চতা অপেক্ষাও অনেক বৃহদাকার বলিয়া মনে হয়। এই সময়ই গুজরাটের শোলাংকী রাজারা যেসব মন্দির তৈরী করেন তাহাও নাগরাকৃতি। তবে উহাদের অধিকাংশই মুসলমানদের আক্রমণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এইসব মন্দিরের মধ্যে সোমনাথের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা খ্যাত।

মধ্য ও পশ্চিম ভারতের স্থাপত্যশৈলী

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলাদেশে যেসব মন্দির তৈরী হয় তাহাদের বেশীর ভাগই ইটের তৈরী। আকৃতির দিক হইতে ইহারা বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠননৈপুণ্যের

বাংলাদেশের স্থাপত্যশৈলী

কোনো সাক্ষ্য বহন করে না। শিখরের আকৃতি অনুযায়ী ইহাদের পীড় দেউল, রেখ দেউল, স্তূপযুক্ত পীড় দেউল বা শিখরযুক্ত পীড় দেউল—এই কয় পর্যায়ে ভাগ করা চলে। পরবর্তীকালে বাসগৃহের অনুকরণে, চতুষ্কোণ নক্সার ভিত্তিতে ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা চালাঘরের আকারে যেসব ইটের তৈরী মন্দির নির্মিত হয়, তাহাদের আকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে বাংলা রীতি নামে খ্যাত।
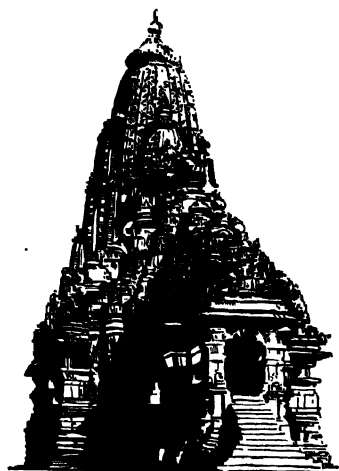
খাজুরাহের মন্দির

সুলতানী যুগে সমাজ ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের ধ্যান-ধারণার সমন্বয় স্থাপত্যশিল্পের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। এইযুগে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে যে নূতন স্থাপত্য শিল্পশৈলী গড়িয়া ওঠে তাহাই ইতিহাসে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যকলা (Indo-Islamic Architecture) নামে খ্যাত। এই সমন্বয়সাধন খুব সহজ ছিল না। কারণ, হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহ যেখানে ছোটো ও অন্ধকার, মুসলমানদের উপাসনাঘর সেক্ষেত্রে বড়ো ও খোলামেলা। হিন্দু স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য তাহার স্তম্ভ ও বিভিন্ন ধরনের শিখর। কিন্তু মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য তাহার বড়ো বড়ো গম্বুজ ও খিলান। তবু, দিল্লীতে আদি পর্যায়ের সুলতানী স্থাপত্যকলায় হিন্দুরীতির ছাপ সহজেই চোখে পড়ে। একমাত্র পিছনের দেয়ালের পাঁচটি মিহ্‌রাব ছাড়া কুতবুদ্দীন নির্মিত কোয়াতুল ইসলাম মসজিদের দেয়াল, স্তম্ভ, ছাদ প্রভৃতি প্রায় সবই হিন্দুরীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইলতুৎমিসের আমল হইতেই যদিও ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যকলা হিন্দুপ্রভাবমুক্ত হইবার প্রয়াস পায়, তবু ইলতুৎমিসের তৈরী সুলতানঘারীতে তাঁহার পুত্রের সমাধি বা কুতুবের পাশেই তাঁহার নিজস্ব সমাধিও হিন্দু প্রভাব হইতে মুক্ত নহে।

সুলতানী যুগে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সমন্বয়

দাস যুগ

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ইতিপূর্বে হিন্দু স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসাবে যেমন শুধু মন্দিরাদি পাওয়া গিয়াছে, মুসলমানদের আগমনের পরে ধর্মগৃহ ছাড়াও
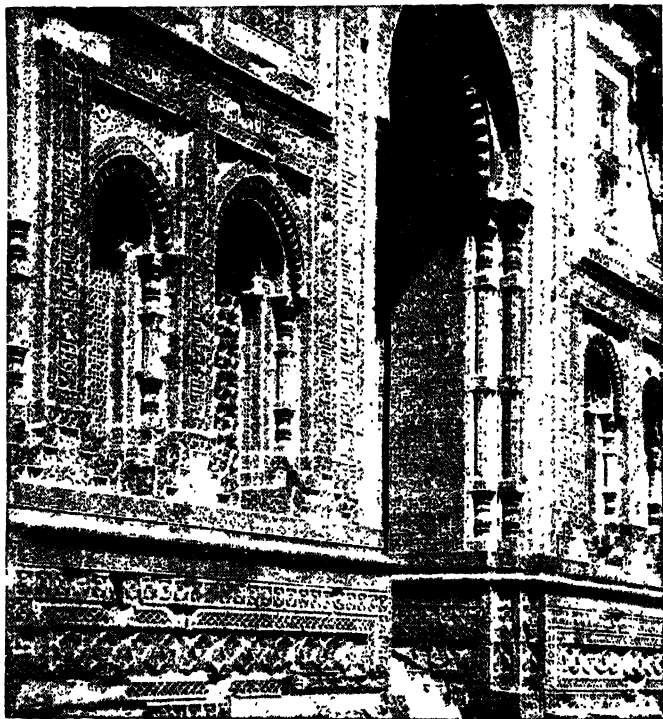
আলাই দরওয়াজা, দিল্লী

অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সমাধি, দুর্গ প্রভৃতি প্রধান। খিলজী যুগে তৈরী সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সমাধি, নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধিতে নির্মিত জমায়েৎখানা মসজিদ, বা আলাই দরওয়াজা প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্যশিল্পে ক্রমবর্ধমান মুসলমান প্রভাবের নিদর্শন।

খিলজী যুগ

আলাই দরওয়াজার অপূর্ব অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান, জাফরি-কাটা দেয়াল, পাশাপাশি লাল পাথর ও মার্বেলের সুন্দর ব্যবহার—ইহাকে এই যুগের স্থাপত্যশিল্পের একটি অমূল্য সম্পদে পরিণত করিয়াছে। তুঘলক যুগে অবশ্য স্থাপত্যকলায় এত ঐশ্বর্যের সন্ধান মেলে

না। কিন্তু এই সময়ে নির্মিত দিল্লীর তুঘলকাবাদের দুর্গ, আদিলাবাদের দুর্গ, ফিরোজশাহ কোটলা প্রভৃতি এই সময়কার স্থাপত্যকলার সহজ বলিষ্ঠতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সৈয়দ ও লোদী সুলতানদের আমলে স্থাপত্যকলায় পুনরায় পূর্বেকার অলংকরণ ও ঐশ্বর্য-

তুঘলক যুগ
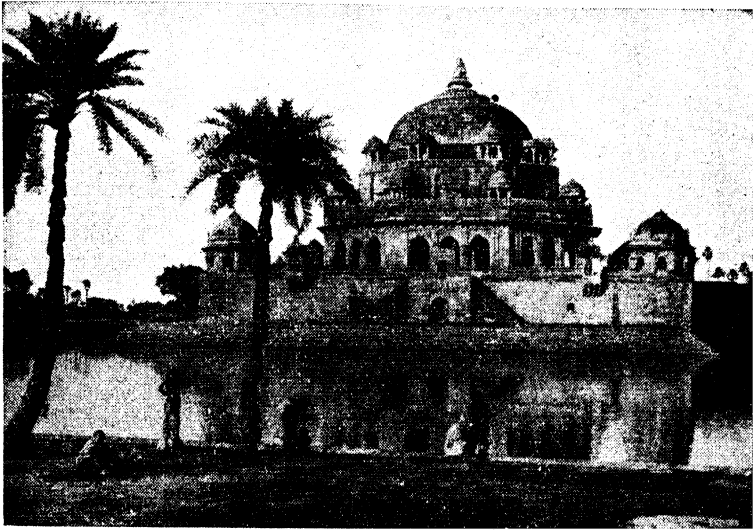
সাসারামে শের শাহের সমাধি

সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। এই সময় নির্মিত সৈয়দ বংশীয় সুলতান মুবারক শাহ বা মুহম্মদ শাহের কবরে বা লোদী সুলতান সিকন্দর শাহের কবরে শুধুই যে আবার চকচকে রং-বেরংএর টালি প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হয় তাহাই নহে, এই সময়ই মুসলমান স্থাপত্যশিল্পে হিন্দু স্থাপত্যকলার পদ্ম প্রভৃতি রূপকেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। এই যুগে দিল্লী ছাড়াও জৌনপুর, গুজরাট, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলেও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমন্বিত স্থাপত্যের উদ্ভব ঘটে। তন্মধ্যে জৌনপুরের প্রাসাদ, অতাল মসজিদ, গুজরাটের মাফিজ মসজিদ প্রভৃতি এইযুগের স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। ইহাদের উপর হিন্দু স্থাপত্যরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে বহু স্থানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরগুলিকে সামান্য পরিবর্তন করিয়া মসজিদে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। ফলে, তাহাদের মধ্যে স্বভাবতই হিন্দু ও

সৈয়দ ও লোদী যুগ

প্রাদেশিক স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য

মুসলমান কলাকৌশলের মিশ্রণ লক্ষণীয়। গৌড়ের বড়ো ও ছোটো সোনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ও ত্রিবেণীর মসজিদ প্রভৃতি এইজাতীয় মিশ্রণের অন্যতম উদাহরণ।

সুলতানী আমলের শেষে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন ভারতীয় স্থাপত্য-কলার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু মোগল স্থাপত্যকলার চরম বিকাশ ঘটে আকবরের আমল হইতে। তৎপূর্বেকার মোগল স্থাপত্যকলার বিশেষ কোনো নিদর্শন না পাওয়া গেলেও, শূর বংশীয় শের শাহের তৈরী দিল্লীর পুরাণ কেল্লার মসজিদ এবং বিহারের সাসারামে তাঁহার সমাধিটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এইসব স্থাপত্যকলাতেও হিন্দু প্রভাব লক্ষণীয়। উহার অষ্ট-কোণাকৃতি, সহজ ও বলিষ্ঠ গঠনভংগী, অপূর্ব সুন্দর কেন্দ্রীয় গম্বুজ, এবং অতুলনীয় পটভূমিকায় ইহার নির্মাণ—সাসারামের সমাধিটিকে এক মহিমময় সৌন্দর্যের অধিকারী করিয়াছে। আদি মোগল স্থাপত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হুমায়ুনের স্ত্রী হাজী বেগম কর্তৃক নির্মিত হুমায়ুনের সমাধি ভবনটি। এই সমাধিভবনের উপরকার গম্বুজ, ভিতরের বারান্দা ও ঘরসমূহের সংস্থান প্রভৃতি, বা সম্মুখভাগের অলংকরণাদি একান্তভাবে

মোগল ও শূরযুগের স্থাপত্যকলা

শের শাহ
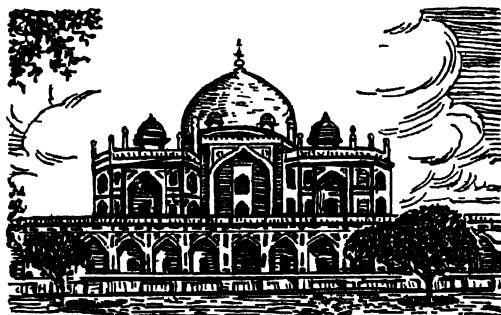
হুমায়ুন

হুমায়ুনের সমাধি

পারসীক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। পরবর্তীকালে, সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত তাঁহার স্ত্রী মমতাজের সমাধিটি এই সমাধি ভবনের অনুকরণেই নির্মিত। আকবরের স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তাঁহার

পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী প্রভৃতি জায়গায় অসংখ্য সমাধি-স্মৃতিসৌধ, দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে সিক্রীর জামি মসজিদ, সুবিশাল বুলন্দ দরওয়াজা, সেলিম চিস্তীর সমাধিসৌধ, যোধবাই মহল, দেওয়ান-ই-খাস, তুর্কী সুলতানার ভবন এবং বীরবল ভবন নির্মাণকৌশল ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পশ্চিম ভারতের, বিশেষ করিয়া গুজরাটের, মধ্যযুগীয় স্থাপত্যশিল্পের ধারা এইসব সৌধে সুপরিস্ফুট। তবে, মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সুন্দর নক্সা কাটা
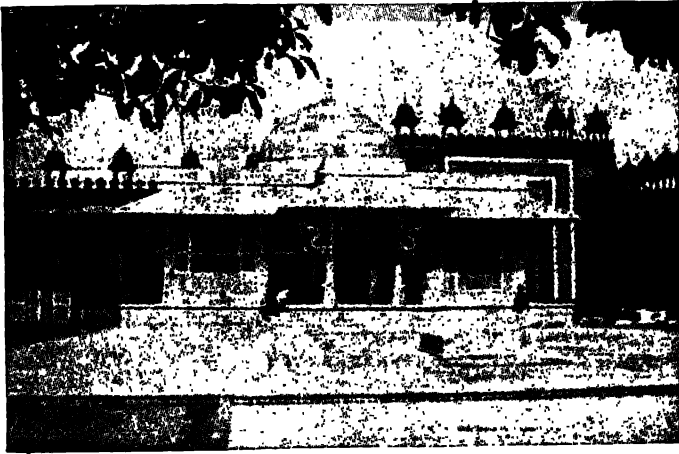
আকবর

সেলিম চিস্তীর সমাধি, ফতেপুর সিক্রী

জাফরী ও লাল পাথরের গায়ে শাদা মার্বেল বসাইয়া কারুকার্য প্রভৃতির ব্যবহারও এইসব সৌধে দেখা যায়। আকবর কর্তৃক নির্মিত আগ্রা দুর্গটি শুধু যে আদি মোগল সামরিক স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবেই উল্লেখযোগ্য, তাহাই নহে। এই সামরিক স্থাপত্যটিরও সর্বত্র স্রষ্টার অপরিসীম সৌন্দর্য ও রুচিবোধের সন্ধান পাওয়া যায়। আকবর পুত্র জাহাংগীরের আমলেও স্থাপত্যশিল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁহার নির্মিত আগ্রার ইতমাদ্উদ্দৌলার সমাধিসৌধ ও সেকেন্দ্রার আকবরের ত্রিতল সমাধিসৌধ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করিতেছে। আকবরের সমাধিসৌধটির বা মিনারের গঠন সেইযুগের প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। মনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের

জাহাংগীর

গঠনপদ্ধতির প্রভাবে এই সমাধিটি নির্মিত হইয়াছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য আকবর বা জাহাংগীরের নির্মিত প্রায় সব স্থাপত্য-নিদর্শনই লাল পাথরে তৈরী। তাহাদের গায়ে শাদা-মার্বেল পাথর বসাইয়া নক্সার কাজ করা হইত
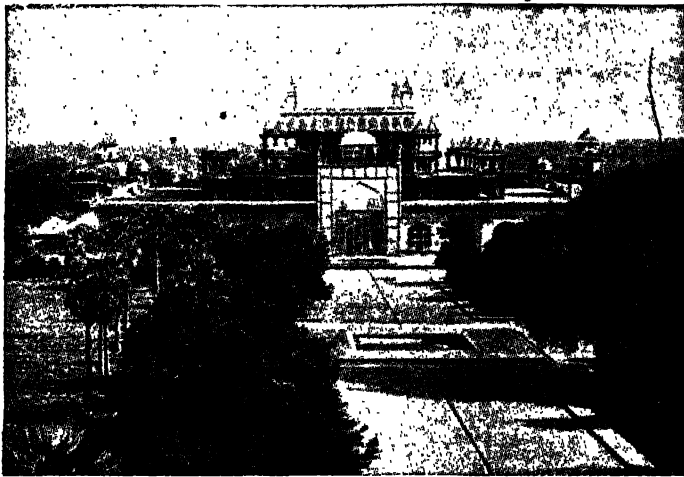
আকবরের সমাধি

(শুধু সেলিম চিস্তীর কবর ও ইতমাদ্‌উদ্দৌলার কবর ইহার ব্যতিক্রম; এইগুলি সম্পূর্ণই শাদা মার্বেল পাথরে তৈরী)। এই সব সমাধিভবন সাধারণত উচ্চ মঞ্চের উপর স্থাপিত এবং চতুর্দিকে বিরাট বাগান-বেষ্টিত।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে স্থাপত্যকলার আর এক পর্যায় শুরু হয়। আকবর বা জাহাংগীরের আমলে তৈরী সৌধগুলির বলিষ্ঠ ব্যাপ্তির বদলে এই সময়কার সৌধগুলিতে দেখা দেয় পেলব কোমলতা। শাহজাহানের নির্মিত সৌধগুলি প্রায় সবই শাদা মার্বেলে তৈরী বলিয়াই তাহাদের মধ্যে বলিষ্ঠতার পরিবর্তে এই সৌকুমার্য চোখে পড়ে। আগ্রা দুর্গে শাহজাহান নির্মিত খাসমহল, মোতি মসজিদ, দিল্লীর দুর্গ ও তাহার ভিতরকার দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ প্রভৃতি শাহজাহানের আমলের স্থাপত্যশিল্প-নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পত্নী মমতাজমহলের দেহাবশেষের উপর নির্মিত তাজমহলই তাঁহার আমলের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন। পৃথিবীর সেরা শিল্পকীর্তিসমূহের মধ্যে উহা

শাহজাহান

অন্যতম। আগাগোড়া মার্বেল পাথরে তৈরী এই সমাধিসৌধের কেন্দ্রীয় গম্বুজটির উপর পারসিক প্রভাব যদিও সুস্পষ্ট, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলি একান্তই ভারতীয়। ইহার দেয়ালের অপূর্ব সুন্দর জাফরীগুলি অতুলনীয়। ইহার শাদা মার্বেলের বুকে মূল্যবান মণিরত্ন বসাইয়া যে সকল অপূর্ব
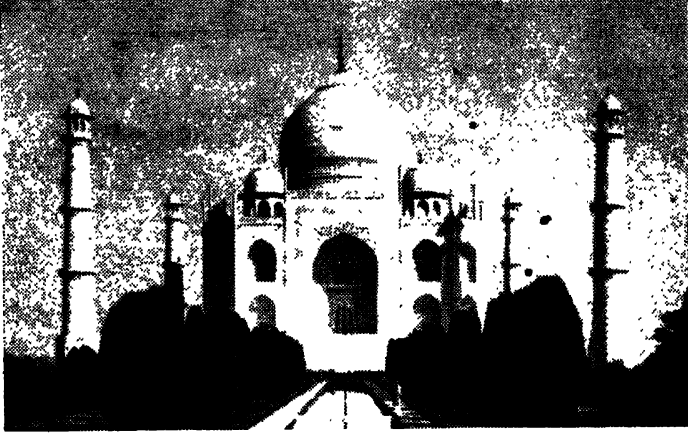
তাজমহল

নক্সা খোদাই করা হইয়াছে, তাহা এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শাহজাহানের আমলে মোগল স্থাপত্যকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও তাঁহার পুত্র ঔরংগজেবের উৎকট ধর্মান্ধতার ফলে ইহার অনুশীলন বন্ধ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে মোগল স্থাপত্যকলা ঐ যুগের অন্য শিল্পকলার মতোই অবনতির পথে আগাইয়া যায়।

ইংরেজ আগমনের ফলে এদেশের স্থাপত্যকলার উপর ভিক্টোরীয়-যুগের ইংরেজ স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব যেমন আসিয়া পড়ে, তেমনি সুপ্রাচীন গ্রীক ও রোমান স্থাপত্যধারার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এইযুগের বিভিন্ন গীর্জাগুলিতে প্রথম ধারার এবং কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলিতে (ইহাদের মধ্যে কলিকাতা সেনেট ভবনটি ভাংগিয়া ফেলা হইয়াছে) দ্বিতীয় ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু আধুনিককালে ভারতীয় স্থাপত্য এক পাঁচমিশালী অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জাতীয় স্থাপত্যশৈলীর

আদি বৃটিশ যুগে স্থাপত্যকলা

উদ্ভবের তাগিদে স্থপতিরা হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধস্তূপ, মুসলিম মসজিদ, ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজ স্থাপত্যকলার বা আধুনিক পাশ্চাত্য স্থাপত্যকলার সমন্বয়ের এক প্রাণান্তকর প্রয়াস করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা সমন্বয়সাধনের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পরিণত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লীর বিড়লা মন্দির, লক্ষ্ণৌ ও জয়পুরের রেলওয়ে স্টেশন, কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, দিল্লীর সুপ্রীম কোর্ট প্রভৃতি ভবনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে স্থপতিরা আধুনিক যুগে যেসব গৃহাদি নির্মাণ করিতেছেন, তাহা একান্তই প্রয়োজন মিটাইবার কাজে (functional)। তাঁহারা মনে করেন, কোনো গৃহনির্মাণের

আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্যকলা
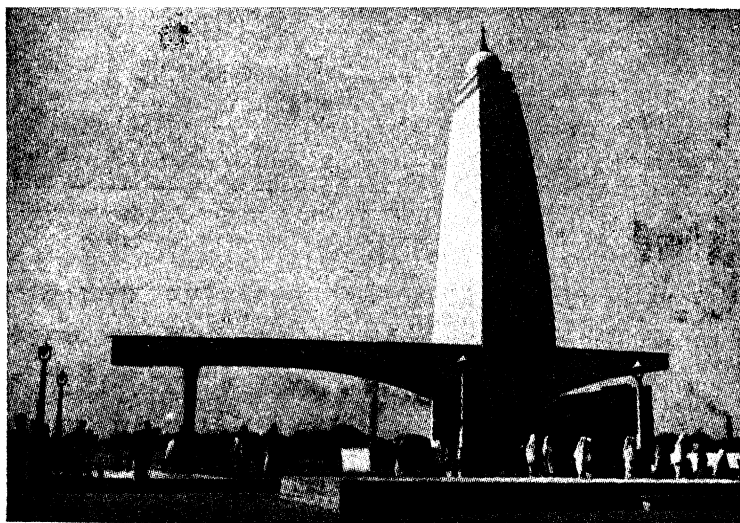
গান্ধীঘাট, ব্যারাকপুর

পরিকল্পনা করার সময় মনে রাখা প্রয়োজন ঐ গৃহ কোন কাজে ব্যবহৃত হইবে। তাঁহারা ঐসব গৃহের গায়ে নক্সা খোদাই করিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে চান না। সৌধের বিভিন্ন অংশের সংস্থাপনের দ্বারা সার্থক সমন্বয়বিধানের মধ্যেই তাঁহারা সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াসী। সাম্প্রতিককালে, ভারতবর্ষে এইজাতীয় পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলীর সার্থক প্রয়োগে যেসব গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চণ্ডীগড়ের গৃহগুলি, দিল্লীর চাণক্যপুরী,

বোম্বাইর স্যার জাহাংগীর গ্যালারী অব আর্টস, কলিকাতায় ব্যারাকপুরস্থ গান্ধীঘাট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়ো বড়ো শহরগুলিতে পাশ্চাত্য স্থাপত্যকলার অনুকরণে গগনচুম্বী গৃহনির্মাণ আধুনিক ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম বিশেষত্ব।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write an essay on North Indian architectnre during the ancient period.

2. Write an essay on South Indian architecture during the ancient period.

3. Write an essay on architecture during the period of the Sultanate of Delhi indicating the blending of Indian and Islamic architecture wherever it took place.

4. Write an essay on architecture during the Mughal period indicating the blending of Indian and Islamic architecture where it took place.

B. Answer the following questions in not more than 80 words:—

1. Write what you know of the structure of the Stupas.

2. Write what you know of Chaitya architecture in ancient India.

3. Write what you kuow of the architecture of the Maurya palaces.

4. Write a note on Orissa Sculpture in ancient India.

5. Write a note on Sculpture in Bengal during the Pala and Sena periods.

6. Contrast the style of Hindu architecture to that of Islamic architecture.

7. Write what you know of architecture during the modern period.

C. Find below the names of some pieces of Architecture. Write 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively inside the bracket at the right hand of each to indicate whether they were built by the (1) Slave, (2) Khalji, (3) Tughlugh, (4) Lodi, (5) Sur, or (6) Mughal rulers. Write (A) under the names of those pieces in which there have been blending of Indian and Islamic styles.

Names of Pieces of Architecture

Alaidarwaja (   ) Tomb of Sikandar Shah (   ) Quwwatul Mosque (   ) Tomb of Salim Chisti (   ) Sher Shah's Tomb at Sasaram (   ) Firozshah Kotla (   ) Tomb of Nizamuddin Aulia (   ) Tomb of Itmududdaulla (   ) Moti Masjid, Delhi (   ).

D. Collections of photographs and pictures of pieces of architecture should be made period-wise.

E. The following projects may be undertaken :—

1. An exhibition on Indian architecture with the help of collected photographs and pictures properly edited.

2. Visit to any museum, if possible.

আমাদের সংগীতকলা

চিন্তায়, জ্ঞানে, কর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে গৌরবময় পরিচয় পাওয়া যায়, সংগীতের ক্ষেত্রেও তাহার পরিচয় কম নহে। আমাদের শাস্ত্রমতে সৃষ্টির মধ্যেই সংগীতের সুর নিহিত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে গান শুনে সেটারই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তে অনুভব করি।" বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি যে বিভিন্ন সুরে আবৃত্তি করা হইত বা সামবেদের স্তোত্রগুলি যে বিভিন্ন সুরে গীত হইত, সেই উদাত্ত মধুর সুর-ভংগিমাই আমাদের সংগীতের আদি প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের লক্ষ্য

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সুর কি ছিল আজ সঠিক বলিবার উপায় নাই। কারণ যদিও সেই যুগের বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে এমন সব উক্তি রহিয়াছে যাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, সেই সময়ে সংগীতের সমধিক প্রচলন তো ছিলই, সংগীতচিন্তা এবং প্রয়োগপদ্ধতিও এক বিশেষ পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তবুও সেই সব সুর ও প্রয়োগ প্রাচীনেরা গোপন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয়, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যদিও সংগীতের সাধারণ উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধন, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশেষ পারলৌকিক মংগলসাধন। তাই দেবতার পুজায় বা বিভিন্ন আভিচারিক কাজে সংগীতের প্রয়োগ ছিল। সেইজন্যই অনধিকারী ব্যক্তিরা যাহাতে তাহার অনুশীলন করিতে না পারে সেইজন্য তাঁহারা সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন।

বস্তুত, প্রাচীন ভারতের সংগীত সম্পর্কে আমাদের যেটুকু জ্ঞান তার প্রধান ভিত্তি পরবর্তী যুগের সংগীত-গ্রন্থাদি। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে ভরত প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র'। ইহার সঠিক রচনাকাল নির্দিষ্ট করা

সংগীত-গ্রন্থাদি

না গেলেও পণ্ডিতেরা মনে করেন উহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রচিত। পরবর্তী কালের রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে নারদের 'সংগীত-মকরন্দ' ও মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে শেষ ও উৎকৃষ্টতম গ্রন্থ শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত রত্নাকর' খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ

শতকের প্রথমার্ধে রচিত। এইসব গ্রন্থাদি পাঠে প্রাচীন সংগীতের প্রয়োগ-পদ্ধতি জানা না গেলেও, বিভিন্ন সুরলয়ের নাম পাওয়া যায়। জানা যায়, বহু পূর্ব হইতেই আমাদের দেশে বিভিন্ন স্বর ও রাগরাগিণী এবং কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় প্রকার সংগীতেরই প্রচলন ছিল।

স্বর বলিতে ভারতীয় প্রাচীনেরা সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সপ্তস্বরকে বুঝিতেন (অবশ্য, বৈদিক সাহিত্যের আদি পর্বে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ—এই তিনটি মাত্র স্বরের সন্ধান পাওয়া যায়)। কথিত আছে, চতুর্বেদ হইতেই এই সপ্তস্বর উদ্ভূত—ঋক্ হইতে ষড়জ (সা) ও ঋষভ (রে), সাম হইতে গান্ধার (গা) ও পঞ্চম (পা), যজুঃ হইতে মধ্যম (মা) ধৈবত (ধা) এবং অথর্ব হইতে নিষাদ (নি)। অপর এক মত অনুযায়ী মহাদেব পাঁচটি স্বর এবং পার্বতী অপর দুইটি স্বর আবিষ্কার করেন। এই সপ্তস্বর সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সাতটি জীবের কণ্ঠস্বর হইতে নাকি এই সপ্তস্বর গৃহীত হইয়াছিল—যথা, ময়ুর হইতে সা, বৃষ হইতে রে, ছাগল হইতে গা, বক হইতে মা, কোকিল হইতে পা, ঘোড়া হইতে ধা, এবং হাতী হইতে নি। কিন্তু এইসব কাহিনী যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করিয়া আধুনিককালে পণ্ডিতেরা শুধু এইটুকুই বলিয়া থাকেন যে মৌর্যযুগের পূর্বেই এদেশে সপ্তস্বরের প্রকৃতি ও পদ্ধতি স্থির হইয়া গিয়াছিল।

সপ্তস্বর

ভারতীয় গানের সুরমাত্রই এই সপ্তস্বরের সমষ্টি। কিন্তু সেই স্বরগুলির সাজাইবার বিভিন্ন পদ্ধতিকেই বলা হয় রাগ ও রাগিণী। প্রাচীনদের মতে স্বরগুলির সম্বন্ধভেদে সৃষ্ট রাগ হইতেছে ছয়টি ও ছত্রিশ রাগিণী তাহাদের স্ত্রীস্বরূপা। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাগ বা রাগিণী গাহিবার বিধান ছিল—যথা, সকালে ভৈরবী, দুপুরে সারংগ, বিকালে মূলতান, সন্ধ্যায় পূরবী, রাত্রিতে বেহাগ ইত্যাদি। সপ্তস্বরের মতো ইহাদের সৃষ্টি সম্বন্ধেও নানা কাহিনী প্রচলিত; যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মহাদেবের অঘোর নামক মুখ হইতে ভৈরব, সন্থ নামক মুখ হইতে শ্রী, বাম হইতে বসন্তক, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম, ঈশান হইতে মেঘ এবং পার্বতীর মুখ হইতে নটনারায়ণ—এই ছয়টি রাগের সৃষ্টি হয় বলিয়া কথিত আছে। সপ্তস্বরের মতো এই রাগ-রাগিণীর

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী

উৎপত্তি সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনীও যাহাই হউক না কেন, পূর্বোক্ত বিভিন্ন সংগীত গ্রন্থাদি পড়িলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে রাগ-রাগিণী সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ চিন্তাও খৃষ্টপূর্ব যুগেই এদেশে হইয়া গিয়াছিল।

ধর্মসাধন ব্যতীত কেবলমাত্র আনন্দলাভের জন্য সংগীতের চর্চা যে আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, ভারতীয় সংগীতকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর সংগীত আছে, যাহাতে দখল পাইতে হইলে—আনন্দ পাইতে হইলে, অন্তত কিছুটা শিক্ষা, সাধনা ও ধর্মের প্রয়োজন। আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতগুলি ঐ ধরনের সংগীত। কিন্তু আরেক শ্রেণীর সংগীত আছে, যাহা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়া উঠিয়াছে —অন্তরের আবেগে যাহা স্বতঃপ্রকাশিত। এই ধরনের সংগীতে দখল পাইতে খুব একটা শাস্ত্রানুগ অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের সংগীতকেই লোকসংগীত বলে। ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রে কোনো দিনই লোকসংগীতকে খুব উচ্চাসন দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, আজ যেটি লোকসংগীত, সেইটিই হয়তো কালক্রমে উচ্চাংগ বা শাস্ত্রীয় সংগীতের আসন দখল করিয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সংগীতের কোনোরূপ শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া, সাধক সম্প্রদায় যে ভজন গানের সৃষ্টি করেন, লোকসংগীত হিসাবেই তাহা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বর্তমানে উহা উচ্চাংগ সংগীতের কৌলীন্য দাবী করিতেছে। আরও বলা যাইতে পারে যে, একদিন 'টপ্পা' গান ছিল পথেঘাটে গাহিয়া দরিদ্রের অন্নসংস্থানের উপায়, কিন্তু আজ উহাই হইতেছে উচ্চাংগ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, একথা বলিলে খুব অত্যুক্তি হইবে না যে লোক-সংগীতের মধ্যে বর্তমান ভারতীয় সংগীতের গোড়ার কথার সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা গানের গোড়ার কথা জানিতে হইলে, আমাদের আসিয়া পৌঁছিতে হইবে সমাজের তথাকথিত নিচের স্তরে। খুব সহজ সুর আর সোজা কথার ভিতর দিয়া গভীর দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশ বাংলা দেশের লোকসংগীতে অতুলনীয়। প্রাচীনকাল হইতেই নানারূপ ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে এবং শহরের জীবনের কৃত্রিমতার দরুন আমাদের

লোকসংগীত

দেশের সংগীত সম্পদ শহর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ভারতের যাহা আদর্শ, যাহা সংস্কার, সংগীতের মধ্যে তাহা ফিরিয়া পাইতে হইলে পল্লীর দরবারে আমাদের যাইতে হইবে। তাই, নিতান্ত সাধারণ হইলেও লোকসংগীতের মূল্য আমাদের কাছে অপরিসীম। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে।

শাস্ত্রীয় সংগীতকে (যে সংগীতের বিধিবদ্ধভাবে চর্চা করিতে হয়) আমাদের দেশে বর্তমানে মার্গ সংগীত বলা হয়। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রীয় সংগীতের আলোচনা ভারতে বর্তমানে নাই বলিলেই চলে। এখন যাহাকে মার্গ সংগীত বলা হয়, তাহার উদ্ভব হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে। মুসলমানরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের সংগে ইরাণের গজল, কাওয়ালী ইত্যাদি গানের সুর লইয়া আসেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া মুসলমান গায়কেরা এবং তাহাদের মুসলমান পৃষ্ঠপোষকেরাও প্রাচীন যুগ হইতে উপলব্ধ ভারতের রাগ-রাগিণীমূলক সংগীতের রীতির দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। বস্তুত, আধুনিক কালে মার্গ সংগীত (classical music) বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সৃষ্টি হয় এইভাবেই হিন্দু-মুসলমান সঙ্গীত ধারার সংমিশ্রণে (অবশ্য প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে মার্গ সংগীত বলিতে বুঝাইত পূর্বোক্ত ধর্মীয় ও আভিচারিক সংগীতকেই)।

মার্গ সংগীত

দক্ষিণ ভারতে এই হিন্দু-মুসলিম সংগীত রীতি-সমন্বয়ের ধারাটি গিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়াই বোধ হয় সেখানে আজিও মুসলমান-পূর্ব যুগের শুদ্ধ প্রাচীন সংগীতের রূপটি বেশী করিয়া সংরক্ষিত হইয়া আছে—কর্ণাটী সংগীতে উত্তর ভারতের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, তেলেনা, গজল প্রভৃতির মতো প্রাচীনের নবীনতর রূপভেদ দেখা দেয় নাই।

কর্ণাটী সংগীত

ধ্রুপদ বর্তমানে প্রচলিত সংগীতের আদি রূপ। এদেশে ধ্রুপদ বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও ধ্রুপদের গীত রূপের উল্লেখ আছে। তবে বর্তমানে আমরা ধ্রুপদের যে রূপ পাই তাহার সূচনা খিলজী সুলতানদের আমলে। গোপাল নায়ক, আমীর খসরু, বৈজুবাওরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদাংগ সংগীতের

ধ্রুপদ

রচয়িতা ও গায়কেরা সকলেই সেই যুগের। পরবর্তীকালে মোগল যুগের তানসেন, ছুঁদি খাঁ ও সুরদাস ভালো ধ্রুপদ-রচয়িতা ও গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধ্রুপদের সুরে শাস্ত্রকথিত বিধিনিষেধ অলংঘনীয়; তানবৈচিত্র্য বা তানকর্তব এই গানে নিষিদ্ধ। এই গানে চারিটি কলি (Stanza) বা 'তুক' থাকে—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। ধ্রুপদ গায়ক প্রথমে কতকগুলি অর্থহীন শব্দের (তা, না, নানা প্রভৃতি) সাহায্যে রাগরূপ ফুটাইয়া তোলেন (আলাপ), পরে শুরু হয় গান। আস্থায়ী অর্থাৎ প্রধান তুকটিকে অন্য তুকগুলি গাওয়ার পর বারবার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। সব রাগেই ধ্রুপদ গাওয়া চলে।

মোগল যুগে ধ্রুপদের চাইতে খেয়ালের প্রচলন হয় বেশী। কথিত আছে, খিলজী বংশের আমলেই আমীর খসরু খেয়াল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে একথা সত্য যে, সেই যুগের ওস্তাদসমাজ খেয়ালকে একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখিতেন। মোগল যুগে, বিশেষ করিয়া আকবরের আমল হইতেই খেয়ালের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। খেয়াল ধ্রুপদ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত এবং দুই কলিতেই—আস্থায়ী ও অন্তরা—সম্পূর্ণ। ইহার চাইতে বেশী কলি খেয়ালে থাকিতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহাদের সুর অন্তরারই মতো। খেয়ালে সুরবিকাশের স্বাধীনতা অবারিত। গায়ক রাগের সীমা স্বীকার করিয়া লইয়া সুরকে ইচ্ছামতো লীলায়িত করিতে পারেন, ছন্দবৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন। এই বৈচিত্র্যের জন্যই বোধহয় খেয়াল মোগলযুগে বিলাসব্যসনে এত সমাদৃত হইয়াছিল। পরবর্তীকালের মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহ্ রংগীলার সভাগায়ক সদারংগ ও অদারংগের চেষ্টাতেই খেয়াল বর্তমান সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

খেয়াল

খেয়ালের মতো তেলেনার স্রষ্টাও আমীর খসরু। তোম, তা, না, দের দানি, দ্রিম প্রভৃতি অর্থহীন শব্দের দ্বারা একটি রাগিণীর রূপ ফুটাইয়া তোলাই তেলেনার কাজ। ইহার বাণী অত্যন্ত দ্রুত উচ্চারণ করা যায়, কাজেই কোনো রাগের দ্রুত প্রকাশিত রূপ দেখাইতে হইলেও সাধারণত তেলেনা গাওয়া হইয়া থাকে।

তেলেনা

ঠুংরী খেয়াল গানের চাইতেও অপেক্ষাকৃত হাল্কা, এবং সাধারণত এই গানে সুকৌশলে একাধিক রাগিণী এবং রীতি মিশাইয়া সুরের ও

তালের বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়। তবে ঠুংরীগানে আবেগই প্রধান বলিয়া এই গানের পক্ষে হাল্কা রাগ-রাগিণীই প্রশস্ত। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্-র প্রচেষ্টায় ঠুংরী গানের জনসমাদর হয়। বর্তমানে ইহার মিষ্টত্বের জন্যই ঠুংরী বিশেষ জনপ্রিয়।

ঠুংরী

লক্ষ্ণৌর নবাব আসাফ-উদ্-দৌল্লার আমলে টপ্পা গানের উদ্ভব ঘটে। টপ্পা খেয়ালের চাইতে আরো সংক্ষিপ্ত, আরো হাল্কা এবং তানপ্রধান। বস্তুত, ইহাতে কথার ভাগ এ কম, তালের অংশই বেশী। ইহাদের বিষয়বস্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেম-বিষয়ক বলিয়া, ইহারা সাধারণত ঠুংরী গানের মতো হাল্কা রাগ-রাগিণীতেই রচিত হইয়া থাকে।

টপ্পা

টপ্পার মতো গজল গানও প্রেমবিষয়ক। মোগল যুগের সুপ্রচলিত কাওয়ালীর অপভ্রংশ বলা যাইতে পারে গজলকে। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, ইহার অনুপ্রেরণা আসে ইরাণ হইতেই। গজল গানে কথাই প্রধান, সুর কথার বাহনমাত্র। অন্যান্য মার্গসংগীতের সহিত এইখানেই ইহার প্রধান পার্থক্য।

গজল

শিল্পকলার আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, কালধর্মী শিল্পশৈলী-সমূহের পাশাপাশি একটি কালাতীত লোকশিল্পের ধারা আবহমান কাল হইতেই আমাদের দেশে বহিয়া চলিয়াছে। ঠিক তেমনি মার্গ সংগীতের পাশাপাশি আর একজাতীয় সংগীতও বহুকাল হইতেই আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে, যাহাকে বলা হইয়া থাকে দেশী সংগীত। যেসব প্রাচীন সংগীতগ্রন্থের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইসব গ্রন্থেও দেশী সংগীতের উল্লেখ আছে। দেশী সংগীত শাস্ত্র-কঠোর নিয়মে বদ্ধ নহে। দেশগত কালগত রুচির বশে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি।—দেশী সংগীতের রূপ কি ছিল, প্রাচীন মার্গ সংগীতের প্রয়োগপদ্ধতির মতো তাহাও জানিবার আজ কোনো উপায় নাই। শাস্ত্রগ্রন্থ যাহাই বলুক না কেন, পর্যালোচনা করিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করিয়া থাকেন, অন্তত কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী বিভিন্ন দেশী সুরের আধারেই তৈরী

দেশী সংগীত

হইয়াছিল ; যথা—গুর্জরী, মনহেলবী, বংগালী, গৌড়, মালব-কৌশিক, গন্ধার, কানাড়া প্রভৃতি।

বর্তমানকালে দেশী সংগীতের যেসকল রূপ আমাদের জানা আছে, তাহাদের উৎপত্তিও মধ্যযুগেই। সেই সময় আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আঞ্চলিক স্বাজাত্যবোধের যে ঢেউ জাগে (আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভবে যাহার অন্যতম প্রকাশ), সেই ঢেউয়ের দোলায়ই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই সব বিভিন্ন দেশী সংগীত বা লোকসংগীত স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় উৎসারিত হয়। সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ এই সব লোকসংগীতের বিশেষ বিশেষ সুরকে আশ্রয় করিয়াই নিজেকে সবচাইতে বেশী ছড়াইয়া দেয়। এই কারণেই সমস্ত উচ্চকোটির সংস্কৃতির চাপ তুচ্ছ করিয়াও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাটে-ঘাটে-মাঠে-বাটে সহস্র সহস্র কণ্ঠে লোকসংগীতের সুরের নিত্য উৎসার। পাঞ্জাবের ভাংগরা, হীর, মীর্জা, উত্তর প্রদেশের কাওয়ালী, গুজরাটের মাঁঢ়, বিহারের দেহাতী গানগুলি, ভারতের বিভিন্ন দেশের লোকসংগীতের সুরের দৃষ্টান্ত। বাংলা দেশের ভাটিয়ালী, কীর্তন, বাউল ইহাদের পদের অন্তর্নিহিত সহজ খাঁটি ভাব এবং সুরের অলংকারহীন সরল মাধুর্যের জন্য ইহাদের আকর্ষণ রসিকচিত্তের উপর দুর্নিবার।

বাংলার লোকসংগীত

বাংলার লোকসংগীতের অসংখ্য বৈচিত্র্য। ভৌগোলিক পটভূমি ও অন্যান্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যভেদে বাংলাদেশের এক এক জায়গায় এক এক ধারার লোকসংগীতের উদ্ভব ঘটিয়াছে। পশ্চিম বংগে মন উদাস করা গেরুয়া রংয়ের রিক্ত প্রান্তরে যে বাউল সাধকদের জন্ম, তাহাদের গানেও যেন এই উদাস রিক্ততার ছায়া পড়িয়াছে। বাউলদের সাধনা দরদীয়া মনের মানুষের সাধনা। মনের

বাউল

মানুষ বা পরম পুরুষের সংগে মিলনের পথের সমস্ত বাধা —সংস্কার, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, আচারাদি—হইতে তাহারা মুক্ত। গানেই ইহাদের প্রাণ ; গানের মধ্য দিয়াই তাহাদের পরম পুরুষের সহিত মিলনের চেষ্টা। বাউল গানের একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হইবে—

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥

তাই তাহাদের গানেও সুরের কোনো জটিলতা নাই, তাহা একান্তই আভরণরিক্ত। এই বাউল গানেরই রূপভেদ দেখা যায় দেহতত্ত্ব গানে, মুর্শিদ্যাগানে। আবার পূর্ব বংগে নদী বেশী। সেই কারণেই বোধহয় সেখানে নদীপথের গান ভাটিয়ালীর এত প্রচলন। ভাটির টানের মতো ভাটিয়ালীর সুরও খুব টানা টানা, তাহার গতি বিলম্বিত। ভাটিয়ালী গানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে, ইহা বাউল গানের মতো কোনো তত্ত্বপ্রধান হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু ইহার ভাবে, ইহার সুরে, এক বিষাদের কারুণ্য মিশিয়া আছে। এই বিষাদের সুর দেশবিদেশের সমস্ত লোকসংগীতের সুরের মধ্যেই বোধহয় কাণ পাতিলে শোনা যায়।

ভাটিয়ালী

নিচে ভাটিয়ালী গানের একটি নমুনা দেওয়া গেল—

বিদেশেতে রইল বন্ধু রে।
বিধি যদি পাখা দিত, পাখী হয়ে উড়ে যাইত।
ও মোর উড়ে যাইয়ে পরতাম বন্ধুর গায়ে রে ॥
বন্ধু আমার তিলেক চাঁদ, তিল কাটিয়ে বুনে ধান।
ওরে সেও ধান হয়ে গেল উড়ি রে ॥

ভাটিয়ালী গানেরই আর এক রূপভেদ সারি গান। ভাটিয়ালী একের সুর, কিন্তু সারির রূপ যৌথ জীবনের। আর সেই কারণেই বোধহয় সারির লয়ও ভাটিয়ালীর অপেক্ষা দ্রুত।

কীর্তনকে অবশ্য অনেকে লোকসংগীত মনে করেন না, কারণ কীর্তনের সুর-তান-লয় মার্গসংগীতের মতোই জটিল এবং অনুশীলনসাপেক্ষ। কিন্তু বহিরংগের কথা বাদ দিলে, কীর্তনগানে যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বড়ো হইয়া দেখা দেয় তাহা বাংগালী লোক-মানসেরই অভিব্যক্তি। এই দিক দিয়া ভাটিয়ালী-বাউলের মতো কীর্তনও বাংলার লোকসংগীতের এক অমূল্য সম্পদ।

কীর্তন

কিন্তু কি মার্গসংগীত, কি লোকসংগীত—উভয়েই রাগ বা সুরের কাঠামোই মোটামুটি সংগীতের বাণীকে নিয়ন্ত্রিত করে। আধুনিক যুগের

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সংগীত রচয়িতার পক্ষে ইহা এক বড়ো বাধা হইয়া দেখা দিল। ফলে আধুনিকরা কেউ কেউ পাশ্চাত্য সুরের দিকেও ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কারণ পাশ্চাত্য সংগীতে সংগীতরচয়িতার স্বাধীনতা অনেক বেশী। এদেশের সংগীতজগতে এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। প্রথম জীবনে অবশ্য তিনি সচেতনভাবে প্রাচীন মার্গসংগীতেরই অনুসরণ করিলেন। তাঁহার সেই যুগের ধ্রুপদভংগিম একরাগভিত্তিক ব্রহ্মসংগীতগুলি ইহার প্রমাণ। কিন্তু মধ্যযুগের শেষদিকে মার্গসংগীতের গায়কেরা যেখানে সুর ও সুরবিস্তারের প্রাধান্য দিতে গিয়া গানের বাণীকে প্রায় কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাণীকে আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বাণীর মাধুর্য, ধ্বনিলালিত্য ও উচ্চ ভাবসমৃদ্ধিই তাঁহার গানগুলিকে অতুলনীয় করিয়াছে। অবশ্য এখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভা শুব্ধ হইল না। তিনি বুঝিলেন, বাণীকে সুরানুসারী করিতে হইলে অনিবার্যভাবেই বাণীর স্বাচ্ছন্দ্য খণ্ডিত হয়। বাণী ও সুরের সুসমঞ্জস মিলনে গানের যে পরিপূর্ণতা তাহা এই একরাগভিত্তিক সংগীতে সম্ভব নহে। রবীন্দ্রসংগীতের নূতন পর্যায় শুরু হইল। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় বিধান অস্বীকার করিয়া তাঁহার গানে সচেতনভাবে সুরমিশ্রণ শুরু করিলেন। এই সুরমিশ্রণের অব্যাহত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই রবীন্দ্রসংগীতের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। একবার যখন এই সুরমিশ্রণ পর্ব শুরু হইল তখন আর বাধা মানিল না। শুধু শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাইয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইলেন না। প্রচলিত রাগ-রাগিণীগুলির মধ্যে তিনি দরাজ হাতে বাংলার তথা ভারতের অন্যান্য প্রান্তের প্রিয় লৌকিক সুরগুলির খোঁচও মিশাইয়া দিলেন (তবে, একথা অনস্বীকার্য যে লৌকিক সুরগুলির মধ্যে বাউলের সুরই কবিকে বেশী প্রভাবান্বিত করিয়াছে)। আমাদের দেশে য়ুরোপের মতো হার্মনি-সংগীত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে এই য়ুরোপীয় সংগীতের হার্মনি (Harmony), অর্থাৎ বিবাদের মধ্যে সংবাদ আনারও চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রসংগীতে এই সুরের অনবদ্য মিশ্রণ এবং বাণীর অনবদ্য ভাবসমৃদ্ধি ও ধ্বনিলালিত্যই ইহাকে ভারতবর্ষের সংগীতের ইতিহাসে একটি নিজস্ব স্থান করিয়া দিয়াছে।

রবীন্দ্রসংগীত

রবীন্দ্রনাথ প্রায় ৬১ বৎসর ধরিয়া সংগীত রচনা করিয়াছেন। সবশুদ্ধ তাঁহার রচিত সংগীতের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। রবীন্দ্র প্রতিভার মতো রবীন্দ্রসংগীতও বহুমুখী। অনুশীলন করিলে ইহার মধ্যে নাকি ১৭টি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ১৭টি ধারাকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে—সুরধর্মী ও কাব্যধর্মী সংগীত। সুরধর্মী সংগীত রচনায় সুরই প্রাধান্য পাইয়াছে, গানের কথাগুলিকে সুরের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। কাব্যধর্মী রচনায় ঠিক তার উল্টাটি ঘটিয়াছে। কাব্যের প্রয়োজনে সুরকে ব্যবহার করা হইয়াছে। এখানে গানে কথারই প্রাধান্য। তাই, এই ধরনের রবীন্দ্রসংগীত গাহিবার সময় গানের কথাকে বিশুদ্ধ এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার রীতি। রবীন্দ্রনাথের রচিত রাগসংগীত, ধ্রুপদ, লোক-সংগীত ইত্যাদিকে সুরধর্মী সংগীতের পর্যায়ে ফেলা চলে। প্রেম সংগীত, ঋতুসংগীত, আনুষ্ঠানিক সংগীত (বিশেষ অনুষ্ঠানে গাহিবার জন্য রচিত) হাস্যরসাত্মক সংগীত ইত্যাদি কাব্যধর্মী সংগীতের পর্যায়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধরনের সংগীত সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা হইতেছে। 'ভানুসিংহ' এই ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে তাঁহার 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন। এই গানগুলি তাঁহার ষোল হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রচিত। রবীন্দ্রনাথ রচিত লোকসংগীতও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। এই গানগুলিতে আমরা পাই বাউল-দরবেশের গূঢ় দার্শনিকতা এবং কবীর-নানক প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধক-দের ভাবধারা। তিনি বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বাংলা দেশে প্রচলিত প্রায় সকল ধরনের লোকসংগীতই রচনা করিয়াছেন। স্বদেশী সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী সংগীত প্রচুর উদ্দীপনা যোগাইয়াছে। তোমরা জান যে, আমাদের জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথের রচনা। অনেকগুলি আনুষ্ঠানিক সংগীত রচনা করিয়া (যেমন জন্মদিনের, নববর্ষের, গৃহপ্রবেশের ইত্যাদি) কবি আমাদের সামাজিক জীবনে গানের বহুল প্রচলনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের কথাও ভোলেন নাই। তাহারা যাহাতে আনন্দ পাইতে পারে সেইজন্য প্রায় একশতের উপর শিশু-সংগীত তিনি রচনা করিয়াছেন। তারপর রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ রচিত ধর্ম সংগীত,

প্রেম সংগীত, উদ্দীপনা সংগীত ইত্যাদি। সামান্য পরিধিতে রবীন্দ্রসংগীতের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল ভাণ্ডার। সংগীতরসিক এই বিপুল ভাণ্ডার হইতে নিজের প্রয়োজনমতো যে-কোনো ধরনের সংগীত বাছিয়া লইতে পারেন।

অতুলপ্রসাদ বাংলা দেশে আর একটি সংগীতধারার প্রবর্তক। নজরুলের রচিত গানকেও একটি বিশিষ্ট রীতির গান মনে করা হয় এবং ইহাকে নজরুল গীতি আখ্যা দেওয়া হয়। অধ্যায় শেষে, পাশ্চাত্য সংগীতের সহিত ভারতীয় সংগীতের সামান্য তুলনা অপ্রাসংগিক হইবে না। পাশ্চাত্য কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয় সংগীতেই 'হার্মনি'র বা ঐকতানের প্রাধান্য। অনেকগুলি কণ্ঠ বা যন্ত্রের সংমিশ্রণে ঐকতান সৃষ্টি করাই পাশ্চাত্য সংগীতের বৈশিষ্ট্য। একক কণ্ঠ বা যন্ত্র সংগীতে পাশ্চাত্যের উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু আমাদের সংগীতের বিকাশ বিপরীত পথে। আমরা কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই একক সংগীতে অধিকতর অভ্যস্ত। তাল-লয়ের বিস্তারেই আমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্য।

অতুলপ্রসাদ ও নজরুল

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write a short essay on the folk songs of Bengal.

2. Write a short essay on Rabindra Sangeet.

B. Answer the following questions in not more than 80 words.

1. Write what you know of music during the Vedic Period.

2. Write what you know of Pauranic stories about the origin of the seven musical notes.

3. Write what you know about 'Ragas' and 'Raginis', according to our ancient traditions.

4. Distinguish between 'Marga' and 'Karnathi' music.

5. Distinguish between the traditions of Western and Indian music.

6. Write what you know of Dhrupad as a school of music.

C. 1. In the left-hand column are given the names of certain writers who wrote books on music in ancient India. In the right-hand column are given the names of their books,

arranged disorderly. Write the number at the left of the author to the right of the book which he might have written.

Names of the authors — Names of the books

(1) Bharat (2) Matanga (3) Sarngadeva — Brihaddesi ( ) Sangit-Makaranda ( ) Natya-Sastra ( )

2. In the left column are names of places and in the right column are names of some folk songs sung in them. Write the number at the left of the name of a place to the right of the name of the song to indicate mutual connection.

Names of places — Names of songs

(1) Punjab (2) Bengal (3) Bihar (4) Gujarat (5) U. P. — Bhangra ( ) Kirtan ( ) Dehati ( ) Kawali ( ) Marh ( ) Bhatiali ( ) Mirza ( ) Hir ( ) Baul ( )

3. In the left column are names of certain types of music, while in the right are certain names and phrases to indicate their characteristics. Write the number at the left of the name of the type of music to the right of the name of the characteristic with which it is associated. More than one number may be written if required.

Names of types of Music — Their characteristics

(1) Kheyal (2) Telena (3) Thungri (4) Tappa (5) Gazal — Words are meaningless ( ) Emotion is at its centre ( ) Wazed-Ali ( ) Words are very few ( ) Amir Khasru ( ) Love is the principal theme ( ) Words are more important than music ( ) Special favourite of Mughal rulers ( ) Words are uttered very quickly ( ) Prestige increased specially from the time of Akbar ( )

D. Collect the pictures of as many musicians of India as you can for your book.

E. The following projects may be organised :—

(a) Demonstration of different types of songs. Outsiders may be invited and students may also participate.

আমাদের নৃত্যকলা

সংগীতের ন্যায় নৃত্যেরও আদিমতম শাস্ত্রীয় বিধানের সন্ধান পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। বস্তুত, ভরত আমাদের অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সংগীত বলিতে গীত, বাদ্য এবং নৃত্ত—এই তিনটিকেই বুঝিতেন। নৃত্ত শব্দের মূলধাতু নৃতি, যার অর্থ গা-হাত-পা নাড়া। অর্থাৎ ছন্দোময়, সুদৃশ্য, নিয়ন্ত্রিত অংগ সঞ্চালনকেই তাঁহারা বলিতেন নৃত্ত। এই নৃত্ত যদি অনুকরণাত্মক হয়, যেমন অভিনয়ের ক্ষেত্রে, তাহা হইলে তাহাকে তাঁহারা বলিয়াছেন অভিনয়-নৃত্ত বা নাট্য। আর মনের বিভিন্ন ভাবকে সংগীতের উদ্দেশ্যে উপযোগী করিয়া গীতকে অভিব্যক্ত করার জন্য যদি পরিকল্পিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাঁহারা বলিয়াছেন ভাব-নৃত্ত বা নৃত্য। শাস্ত্রকারদের মনে গীত, বাদ্য ও নৃত্ত—একে অন্যের পরিপূরক।

নৃত্য শব্দের অর্থ

সুতরাং, অনুমান করা অসংগত নহে যে নৃত্যকলাও আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল এবং বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বস্তুত, মৌর্যযুগ হইতে শুরু করিয়া মধ্যযুগ পর্যন্ত এদেশের সর্বত্র বিভিন্ন দেব-দেউলের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্যপর ও নৃত্যপরা অসংখ্য দেবদেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব-নারী, মন্দির-নর্তকী প্রভৃতির নৃত্যের গতিতে ও ভংগিমায় এইরূপ অনুমানের সমর্থন মেলে। গীতের ন্যায় নৃত্যেরও তখন একান্ত লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতিলাভ। কিন্তু কালক্রমে নৃত্যের সমাদর থাকিলেও নর্তক-নর্তকীদের স্থান সমাজে যে ধীরে ধীরে হেয় হইয়া যায় পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে তাহার ইংগিত পাওয়া যায়। ফলে, গীতের মতোই নৃত্যের শাস্ত্রীয়ধারাও অবহেলাভরে প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। মধ্যযুগে শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক ক্ষীণ ধারা বিভিন্ন দেবমন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্য বাঁচিয়া রহিল। কিন্তু যেসব নর্তকীরা ইহার অনুশীলন করিতেন তাঁহাদের স্থানও ছিল সমাজে অত্যন্ত নিচে। আধুনিককালে আমরা ভারতীয় নৃত্য বলিতে যাহা বুঝি তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগে প্রত্যক্ষ সংযোগে আসার ফলে।

প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা

বর্তমানে ভারতবর্ষে চারি প্রকার শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার অনুশীলন দেখা যায়—ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী। ইহাদের মধ্যে ভরত-নাট্যমেই সর্বাপেক্ষা বেশী শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ স্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমানকালে এই নৃত্যকলাধারার পুনঃ-প্রচারের প্রথম উদ্যোক্তা হইতেছেন মাদ্রাজের ই. কৃষ্ণ আয়ার। ১৯২৬ সালে

ভরতনাট্যম্

ভরতনাট্যম্

কোনো মেয়েকে ভরতনাট্যম্ নাচিতে সম্মত করাইতে অপারগ হইয়া (নৃত্যের প্রতি সমকালীন সমাজমানসের অভিব্যক্তির ইহাই বড়ো প্রমাণ) শেষপর্যন্ত তিনি নিজেই স্ত্রীলোকের বেশে ভরতনাট্যম্ নাচিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার ছাত্রী বালাসরস্বতী এবং তাঞ্জোরের গুরু মিনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য রামগোপাল ও রুক্মিণী দেবী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ভরতনাট্যম্ যথার্থ স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তামিলনাদ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে আজ ভরতনাট্যম্ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভরতনাট্যমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার গতি এবং সুললিত অংগ-ভংগী। এই অংগভংগী যে শুধুই লালিত্যময় ও মনোরঞ্জক তাহাই নহে,

ইহা গভীর অর্থদ্যোতকও বটে। ভরতনাট্যমে শির, চক্ষু, গ্রীবা, হস্ত, জংঘা, কটী, পদ প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন অংশ ও অংগসঞ্চালনের যে বিপুল বৈচিত্র্যময় বিধান রহিয়াছে, তাহাদের প্রয়োগ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুদ্রার কথা। এক বা দুই হস্তের প্রয়োগ অনুযায়ী মুদ্রা দুই জাতীয়—অসংযুত ও সংযুত। অসংযুত অর্থাৎ এক হাতে আবার অন্তত চব্বিশ রকমের মুদ্রা হইতে পারে, যথা—পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, শিখর, কপিত্থ প্রভৃতি। পতাক মুদ্রায় হাতের অংগুষ্ঠ হয় কুঞ্চিত, আর অন্য সব অংগুলি থাকে প্রসারিত ও পরস্পরসংলগ্ন। প্রহার, প্রতাপ, প্রেরণাদান প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে এই মুদ্রার ব্যবহার। অথবা, হস্তের অনামিকা বক্র হইলেই তাহাকে বলা হয় ত্রিপতাক। আবাহন, অবতরণ, বারণ, প্রবেশ প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে ইহার ব্যবহার।

ভরতনাট্যম্ প্রদর্শনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ইহা সাতটি বিভিন্ন নৃত্যাংশের সামগ্রিক রূপ। এই সাতটি নৃত্যাংশ হইতেছে—যথাক্রমে, আলারিপ্পু, যতিশ্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্ (অথবা স্বরযাতি), পদম্, তিল্লানা এবং শ্লোক (বা অষ্টপদী)। সাম্প্রতিককালে বিশিষ্ট ভরতনাট্যম্ শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও কুমারী জয়ম্, জাভেরী ভগ্নীদ্বয়, পশ্চিম বংগের তারা চৌধুরী প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঞ্জোরকে কেন্দ্র করিয়া যেমন ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারা শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার ধারা বহন করিয়া চলিয়াছিল, তেমনি শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার আরেকটি রূপ দক্ষিণ ভারতে কেরালায় বহুদিন ধরিয়া টিকিয়া ছিল। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে আয়ারের প্রচেষ্টায় যখন ভরতনাট্যমের পুনর্জন্ম হয়, প্রায় সেই সময়ই ভল্লাথোল, গুরু কুঞ্জরু, কুরুপ, গুরু মাধব মেনন, গুরু শংকরণ নাম্বুদ্রি প্রমুখের প্রচেষ্টায় এই ধারাটিও পুনরুজ্জীবিত হয়। এই ধারাই কথাকলি নৃত্য নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে কথাকলি হইতেছে মূক নৃত্যনাট্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনীকে রূপায়িত করাই ইহার লক্ষ্য। তাই ভরতনাট্যম্ যেমন প্রধানত একক-নৃত্য, কথাকলি সেক্ষেত্রে একান্তই সমবেত নৃত্য। একই কারণে কথাকলি নৃত্যে সাজপোশাক ও অংগসজ্জার বাহুল্যের প্রয়োজনীয়তাও অনেক বেশী। মুদ্রার সংখ্যাও ভরতনাট্যমের চাইতে কথাকলিতে

কথাকলি

বেশী, যদিও শাস্ত্রীয় মুদ্রাগুলির সহিত তাহাদের অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আরও এক ব্যাপারে ভরতনাট্যমের সহিত কথাকলির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেখানে ভরতনাট্যমে কমনীয় লালিত্যময় রসের প্রাবল্য, সেক্ষেত্রে কথাকলিতে বীর বা রুদ্র রসের আধিক্যই বেশী। ভরতনাট্যমের মতো ইহাতেও কয়েকটি বিভিন্ন ক্রম রহিয়াছে। ইহারা

কথাকলি

হইতেছে, যথাক্রমে—তোডায়ম্, পুর্প্পড়ু, থিরনোট্টম্, কুম্মী প্রভৃতি। সাম্প্রতিককালে কথাকলি শিল্পীদের মধ্যে গুরু গোপীনাথ, শান্তা রাও, কেলু নায়ার, মৃণালিনী সারাভাই, পদ্মিনী প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে মুসলমান সম্রাটদের আমলে নৃত্যের শাস্ত্রীয় বা আভ্যুদয়িক প্রয়োজন প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। একটি ক্ষীণ ধারা শুধু দেবদাসীদের নৃত্যে বাঁচিয়া থাকে, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু

কথক

এই সময়ই ঐ মুসলমান সম্রাট বা সামন্তশ্রেণীর পৃষ্ঠ-পোষকতায় তাহাদের মনোরঞ্জনার্থে নাচের বহুল প্রচলনও হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যের কিছুটা আংগিক এইসব নাচের মধ্যে বর্তমান থাকিলেও, এই নাচে

কথক নৃত্য

পারসীক বা ইরাণী প্রভাবই বেশী। কথক নৃত্যশিল্পীর বেশভূষায়ও এই প্রভাব লক্ষণীয়। এই মিশ্র দরবারী নাচের পদ্ধতিই কথক নামে পরিচিত। কথকে হস্ত-মুদ্রার প্রয়োগ প্রায় নাই-ই; পদের ব্যঞ্জনামূলক ব্যবহারও দেখা যায় না। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখের ও মুখের চটুল অভিব্যক্তি এবং

দেহব্যঞ্জনা। ঐ অভিব্যক্তি ও চটুল ব্যঞ্জনার সাহায্যেই কথক নৃত্যশিল্পীরা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের মনোরঞ্জন করিতেন। কথক নৃত্যের আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য চক্র বা দ্রুত ঘূর্ণন এবং আকস্মিক স্তব্ধতা। কথক শিল্পীকে একাধারে রুদ্ররস ও শৃংগার রস—তাণ্ডব ও লাস্য—উভয়কেই অনুশীলন করিতে হয়। পরবর্তীকালে কথক নৃত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান করিয়া লয়। কথকের বিভিন্ন ক্রম হইতেছে, যথাক্রমে—আমদ, পরাণ ও গথ। সাম্প্রতিক কথক শিল্পীদের মধ্যে লাচ্চু মহারাজ, আচান মহারাজ, সিতারা, কুমুদিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরী নৃত্য

মণিপুরী নৃত্য বলিতে বর্তমানে আমরা এক বিশেষ নৃত্যপদ্ধতিকে বুঝিলেও প্রকৃতপক্ষে মণিপুরী নৃত্য এক নহে, বহু। বস্তুত, মণিপুর নৃত্যেরই দেশ। মণিপুরবাসীদের পুরাণ-কাহিনীতে পাওয়া যায়, হর-পার্বতী কৃষ্ণ ও গোপীদের রাসলীলার অনুসরণে নিজেদের রাসনৃত্যের জন্যই এই মণিপুর দেশটি সৃষ্টি করেন। কিন্তু পুরাণ

মণিপুরী

কাহিনী যাহাই হউক, মণিপুরের বহু বিচিত্র নৃত্যপদ্ধতি দেখিয়া মণিপুরকে নৃত্যের রাজ্য বলিয়াই মনে হয়। এই সব বিভিন্ন নৃত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লাই হরওবা (মণিপুর পুরাণোক্ত হর-পার্বতীর নকল রাস-লীলা)। বর্ষাসমাগমে কৃষির কাজ শুরুর পূর্বে এই নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা একান্তভাবেই ধর্মভিত্তিক। পরবর্তীকালে কৃষ্ণের রাসলীলা এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জীবনীকে কেন্দ্র করিয়াও বিশিষ্ট মণিপুরী নৃত্যধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। এইসব নৃত্যের পোশাকের ও অংগসজ্জার বর্ণঔজ্জ্বল্য এবং ঘটা সহজেই চোখে পড়ে। ইহারা একান্তভাবেই যৌথ,নৃত্য। নর্তক-নর্তকীদের সংস্থান সর্বত্রই বৃত্তাকারে। এই বৃত্তাকৃতিই মণিপুরী নৃত্যে দেহভংগিমারও প্রধান বৈশিষ্ট্য। মণিপুরী নৃত্যে পায়ের কাজ বা মুখের অভিব্যক্তি প্রায় নাই-ই। সুললিত হস্ত সঞ্চালনই ইহার প্রধান সম্পদ। মণিপুরে নর্তকদের বাদ্যযন্ত্রসহ নৃত্যও এক অপূর্ব সৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢোল নৃত্য, তফর নৃত্য, পাংনৃত্য বা কর্তাল নৃত্য। সাম্প্রতিককালে মণিপুরী নৃত্য-ভংগীতে যেসব শিল্পী নিজেদের বিশেষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গুরু অমুবি সিং, ব্রজবাসী সিং, রাধুবী সিং, থম্বলা দেবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

গানের ক্ষেত্রে তোমরা দেখিয়াছ, মার্গসংগীতের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকগীতির ধারাও বহুদিন ধরিয়াই এদেশে অব্যাহত রহিয়াছে।

লোকনৃত্য

ঠিক তেমনই উপরিউক্ত চারিটি নৃত্যশৈলী ছাড়াও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিভিন্ন লোকনৃত্যের ধারাও উচ্চ-কোটির সংস্কৃতির অবহেলা অস্বীকার করিয়াও বাঁচিয়া আছে। এই দেশের সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যেই তাহাদের নিজস্ব নৃত্যধারা দেখা যায়। প্রায় সবক্ষেত্রেই ইহাদের নৃত্য ভারতীয় অন্যান্য লোকনৃত্যের মতোই যৌথ নৃত্য। তাহাদের নৃত্যভংগিমার মধ্যে সুপ্রাচীন বিভিন্ন কৌম বিশ্বাসপূর্ণ নৃত্যভংগিমার ধারাই বহমান। আঞ্চলিক নৃত্যরীতিগুলির প্রয়োগ সাধারণত ধর্মীয় আচরণের অংগ হিসাবে অথবা বিভিন্ন সমাজোৎসবে। ইহাদের মধ্যে উপরিউক্ত চারিটি নৃত্যপদ্ধতির আংগিকের জটিলতা নাই, নাই শাস্ত্রীয় বিধানলংঘনের প্রতিপদে আশংকা। সহজ সাবলীল গতিভংগীতে লোকমানসের সহজ সরল প্রকাশে ইহারা সমৃদ্ধ। এইসব হাজারো লোকনৃত্যের মধ্যে, পাঞ্জাবের

ভাংগরা, রাজস্থানের কাজরী, গুজরাটের গরবা, বাংলাদেশের রায়বেঁশে, দক্ষিণ ভারতের বাঘনৃত্য, মিথিলার জাতা-জাতিন নৃত্য, কাশ্মীরের নাজুন, দাক্ষিণাত্যের কোল্লাট্টম (একজাতীয় কাঠি-নৃত্য; ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও কাঠিনৃত্যের রূপভেদ দেখা যায়), তামিলনাদের কুরুভঞ্জী, কর্ণাটক অঞ্চলের যক্ষগণ (বা বায়লতা), মালাবারের ওথনথুল্লল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রায় সকল আদিবাসীদের মধ্যেই নিজস্ব নৃত্যধারা রহিয়াছে। নৃত্যই তাহাদের সমাজ-জীবনের অবলম্বন। প্রতিবৎসর গণ-তন্ত্র দিবস উপলক্ষে (২৬শে জানুয়ারী) আদিবাসীরা দিল্লীতে নানাধরনের নৃত্য দেখাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে নাগা নৃত্যের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। আমাদের বাংলা দেশে সাঁওতালদের নৃত্যও রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ।

ভারতীয় নৃত্যকলা, বিশেষত ভরতনাট্যমের পুনরুজ্জীবনের জন্য কৃষ্ণ আয়ারের দানের কথা ইতিপূর্বেই তোমাদের বলা হইয়াছে। কিন্তু আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নৃত্যসম্বন্ধে ভদ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব তিনি দূর করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই প্রযাসকে পূর্ণ ও সার্থক রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষে ভদ্রসমাজে তিনিই নৃত্যকলার আধুনিক প্রবর্তক। তিনি যদি শান্তিনিকেতনে নৃত্যকলাকে প্রথম উৎসাহিত না করিতেন তাহা হইলে আজ যেসব বড়ো বড়ো নৃত্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের দেখা পাওয়া যাইত না। নৃত্যশিল্পীরা যে সামাজিক সম্মান আজ পাইতেছেন তাহাও বোধহয় তাঁহারা পাইতেন না। সংগীতের মতো নৃত্যেও রবীন্দ্রনাথ খাঁটি ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় নিয়মে, নৃত্যের পদবিক্ষেপ বাঁধা নিয়মে, নির্দিষ্ট প্রথায় পরিচালিত হয় বলিয়া অনেক সময় আড়ষ্ট ভাব আসিয়া নৃত্যবিদ্‌কে আড়ষ্ট করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক প্রভাব হইতে নর্তক-নর্তকীকে মুক্তি দেন। শুধু তাহাই নহে। সংগীতের মতো নৃত্যেও যে এক বিরাট সমন্বয়-সাধনের আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন তাহা অভিনব। তাঁহার বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে ভরতনাট্যম্, কথাকলি, মণিপুরী বা কথক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যপদ্ধতিকে যেমন তিনি কাজে লাগাইয়াছেন, তেমনি আবার প্রয়োজনবোধে এদেশীয় গরবা প্রভৃতি লোকনৃত্য, জাভা, বলি, চীন বা জাপানের নৃত্যপদ্ধতি, কিংবা রুশ, হাংগারীয় প্রভৃতি

আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলা

য়ুরোপীয় নৃত্যধারাকেও প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও নৃত্যকেই তিনি মুখ্য হইয়া উঠিবার অবকাশ দেন নাই। সুর ও ভাবকে প্রকাশের জন্য যেখানে যে পদ্ধতি বৈচিত্র্যদানে সহায়তা করিয়াছে, সেখানেই তাহাকে অনায়াসে স্থান দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। কবিতা আবৃত্তির সহিত নৃত্যের যে রীতি তিনি পরিকল্পনা ও প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। শুধু গান নয়, তাঁহার অনেক কবিতাকেও তাই নৃত্যরূপ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যেসব নৃত্যশিল্পী জগৎসভায় ভারতীয় নৃত্যকে স্থান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শান্তিদেব ঘোষ ও উদয়শংকরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃত্যকলায় তাঁহাদের সর্বতোমুখী প্রতিভা তাঁহাদিগকে আধুনিক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃত্যবিদের সম্মান দিয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write an essay on dances in modern India.

B. Answer the following questions in not more than 80 words :—

1. Explain what the Ancient Indians understood by the term dancing.

2. Discuss the contributions of Rabindranath Tagore to modern Indian dancing.

C. Below are given certain phrases related to (1) Bharatnatyam, (2) Kathakali, (3) Katthak and (4) Manipuri schools of dancing. Write 1, 2, 3 or 4 respectively inside the bracket at the right of each phrase to indicate its relationships to one or other school of dancing.

Developed under the patronage of Muslims ( ) Uses masks ( ) Themes are mostly taken from the Ramayana and the Mahabharata. Movement of eyes and facial expressions plays important part ( ) Love between Krishna and Radha accepted later as the theme ( ) Dance with musical instrument is

popular ( ) Most in line with our ancient Sastric literature ( ) Subtle body movement plays an important part ( ) Mainly based on religion ( ) Specially a group dance ( ).

D. The following are for your scrap-book : –

1. Collect pictures of as many types of Indian dancing and dancers as you can.

2. Collect also a few pictures of Western dancing.

E. The following projects may be undertaken :—

1. An exhibition of Indian dancing through pictures and photographs.

2. If possible, a lecture on Indian dancing may be arranged through demonstration.

3. Pupils (particularly of girls' schools) may give a demonstration of Indian schools of dancing followed by background commentary.

আমাদের জাতীয় সরকার

স্বাধীন ভারত, স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের শাসনতন্ত্র

স্বাধীন ভারত

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। আজ আমরা স্বাধীন। ইংরেজরা আমাদের হাতে দেশের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিল। দীর্ঘদিনের দাসত্বশৃঙ্খল হইতে আমরা মুক্ত হইলাম। আমাদের দেশকে আমরা নিজ ঐতিহ্য এবং আশা-আকাংখা অনুসারে গড়িয়া তুলিতে পারিব। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুযারী আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতালাভের পর ঐদিন আমাদের নূতন শাসন-ব্যবস্থা বলবৎ হইল। ভারত-রাষ্ট্র একটি সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইল। প্রতি বৎসর আমরা এই দিনদুইটি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকি। ১৫ই আগষ্ট এবং ২৬শে জানুয়ারী আমাদের জাতীয় ছুটির দিন। আমরা বাড়ীতে বাড়ীতে স্বাধীন ভারতের পতাকা ওড়াই। একত্র সমবেত হইয়া জাতীয় সংগীতে যোগ দিই এবং ভারতের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করি—তাহাকে উন্নততর সমৃদ্ধতর করিয়া গড়িয়া তুলিবার সংকল্প গ্রহণ করি। নানারূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের মনের আনন্দ প্রকাশ করি এবং দেশের সংস্কৃতি এবং সমস্যার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। দিল্লীতে, প্রতি রাজ্যের রাজধানীতে এবং আমাদের বৈদেশিক দূতাবাসগুলিতে এই দুই দিবস জাতীয় উৎসব দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তোমাদের বিদ্যালয়েও নিশ্চয়ই এই দুই দিবস তোমরা পালন করিয়া থাক।

ভারতের স্বাধীনতা

স্বাধীনতালাভ আনন্দের বটে। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে—রাষ্ট্রের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু দাবী করিতে পারি। রাষ্ট্রের পরিচালনা সম্বন্ধে আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিতে পারি। রাষ্ট্র পরিচালনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনে সাবালক হইলেই আমাদের সকলের ভোট দিবার অধিকার রহিয়াছে। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার (এমন কি প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত হইবার) আশাও প্রত্যেকে পোষণ করিতে পারি। দেশবিদেশে, যেখানেই আমরা থাকি না কেন, আমাদের রাষ্ট্র

স্বাধীন ভারতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা

আমাদের স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবে, এ আশা আমরা করিতে পারি। কোনো দেশের নাগরিক অপেক্ষা আমাদের অধিকার হীন নহে। জাতি, ধর্ম, উচ্চ-নীচ, উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে আমাদের সকলেরই নিজ নিজ মাতৃভাষার চর্চা, ধর্মের আচরণ এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের সমান অধিকার আছে। রাষ্ট্রের নিকট হইতে আমরা নিজ প্রবণতা অনুসারে শিক্ষা, ক্ষমতানুযায়ী কর্ম, প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য এবং চিকিৎসা লাভের সুযোগের দাবীও করিতে পারি। এককথায়, স্বাধীনতালাভের পর আমাদের জীবন সমৃদ্ধ এবং সুখ-শান্তিতে পূর্ণ হইবে এই আশা করিতেছি। কেহ আমাদিগকে আর নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য শোষণ করিতে পারিবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রের নিকট আমাদের যে এতসব দাবী তাহা পূর্ণ করিবে কে? আমাদের লইয়াই তো রাষ্ট্র। আমরাই তো রাষ্ট্রের পরিচালক। আমাদের ভোটেই তো রাষ্ট্রের বিধানসভা গঠিত হয়। আমাদের প্রতিনিধিরাই তো মন্ত্রী হন। আমরা যদি রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য করি তবেই রাষ্ট্র আমাদের আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা দিতে সক্ষম হইবে। প্রথমেই রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আনুগত্য থাকিতে হইবে। তাহার আইন-কানুন আমাদিগকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে। রাষ্ট্র তাহার পরিচালনার জন্য যেসব কর ধার্য করিয়াছে, তাহা দিতে হইবে। রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব যখন আমাদের উপর আসিয়া পড়ে, আপ্রাণ সে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। ভোটদানের সময়ই হউক, আর জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরেই হউক, সর্বদা জনসাধারণের কল্যাণের কথা মনে রাখিয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে। আমরা ব্যবসাই করি বা চাকুরীই করি, সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে আমরা জনসাধারণের সেবক। কাজে ফাঁকি দেওয়া, অসাধুতা, উৎকোচ গ্রহণ বা প্রদান প্রভৃতির দ্বারা আমরা দেশের লোকের প্রতি, নিজেদের প্রতি, বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছি—একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা সকলে প্রাণপণ করিয়া যদি স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারি তবেই আমাদের আশা-আকাংখা পূর্ণ হইবে। না হইলে, শুধু স্বাধীনতালাভের ফলে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি কিছুই বৃদ্ধি পাইবে না।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক-কর্তব্য

স্বাধীনতালাভের সংগে সংগে স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের সমস্যাগুলি জটিলতররূপে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দীর্ঘদিন দাসত্বের ফলে আমাদের মধ্যে অনেক গলদ ঢুকিয়াছে। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা সম্বন্ধে সংকীর্ণতা, পরস্পর দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি আমাদের সমাজ-জীবনকে পংগু করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তারপর, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে ধনবৈষম্যও আছে প্রচুর। সমাজের অধিকাংশ লোকই অর্থনৈতিক দাসত্ব করিতেছে বলা যাইতে পারে। আমাদের অধিকাংশ প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই আমরা পরমুখাপেক্ষী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের মান নিম্নতম শ্রেণীর। উপরিউক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করিতে না পারিলে, স্বাধীনতালাভ করিয়াই বা আমাদের কি হইবে? যে স্বাধীনতা লাভ করিলাম, তাহাও দীর্ঘদিন রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

স্বাধীনতালাভের পর আমাদের সমস্যা

এত সব সমস্যা লইয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন ভারতের যাত্রাপথ সমস্যাকণ্টকাকীর্ণ হইলেও, ভবিষ্যতে আমাদের আশা আছে। আমাদের দেশ অতি প্রাচীন। ভারতের সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা পৃথিবীর প্রথম সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম। দর্শনে, সাহিত্যে এমন কি বিজ্ঞানেও আমাদের দেশের কীর্তির কাছে আজও পৃথিবী মস্তক নত করে। আমাদের চারুকলা, আমাদের সংগীত ইত্যাদি আমাদের বিশেষ গৌরবের বস্তু। আমাদের জাতি যে অতি উচ্চস্তরের ধীশক্তিসম্পন্ন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। দৃঢ়তার সহিত সংঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হইলে আমরা সকল সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিব তাহা নিশ্চিত। আবার ভারতবর্ষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সমৃদ্ধিতে পৃথিবীর জাতিসমূহের অগ্রণী হইবে

নিজ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আমাদের আস্থা

স্বাধীনতালাভের পর আমাদের সর্বপ্রথম সমস্যা হইল দেশের জন্য একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গঠন করা। এই দুরূহ কার্যেও একদিক দিয়া দেশের ঐতিহ্য আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। গণতান্ত্রিক আদর্শে জীবনযাপন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারা। জাতি,

ধর্ম, অর্থ, বুদ্ধি ইত্যাদির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল মানুষই যে একই ভগবানের অংশ ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই দিক দিয়া সকল মানুষই সমান। আমাদের ঋষিরা, আমাদের দর্শন, সবসময়েই সাম্যের বাণী প্রচারে উদ্বুদ্ধ। পরমতসহিষ্ণুতাও আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। মানুষে মানুষে বিভিন্নতার কারণ, মানুষ ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাই, স্বাভাবিক নিয়মেই, মানুষে মানুষে মতে এবং কর্মে পার্থক্য থাকিবে। যত মত, তত পথ—ইহা আমাদের প্রবাদবাক্যগুলির অন্যতম। তাই, ভারত ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ধর্ম এবং সংস্কৃতি লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম এবং সংস্কৃতি লইয়া ভারতের সংগে তাহাদের কোনো দ্বন্দ্ব হয় নাই। প্রত্যেক মানুষই সমান, এই চিন্তাধারা এবং পরমতসহিষ্ণুতা, গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই হয়তো নানা বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে গণতন্ত্র সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। ভারতের সংগে একই সময় স্বাধীনতা লাভ করিয়া পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনে অপারগ হইয়া, স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতেছে।

ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য

আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা আজ সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইলেও প্রথমে ইহা গঠন করা কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ ছিল। ভারতের অসংখ্য ধরনের বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ছিল গণতন্ত্র রচনার প্রধান সমস্যা। প্রথম প্রথম ভয় ছিল যে ভারতবর্ষ হয়তো আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ভারতবর্ষকে খণ্ডিত রাখার জন্যই বৃটিশেরা পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিল। দেশীয় রাজ্যগুলিও ভারতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত না হইয়া হয়তো স্বাধীন থাকিতে চেষ্টা করিবে, সে আশংকাও ছিল। তারপর ভারতের জনগণের মধ্যেও নানা ধরনের যেসব বিভিন্নতা আছে তাহাও একরাষ্ট্রগঠনে বাধার সৃষ্টি করিবে, সে ভয়ও ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ভারত এত বিশাল যে তাহাকে একটি দেশ না বলিয়া একটি উপমহাদেশ বলাই হয়তো সংগত।

ভারতের বিভিন্নতা

১৯৬১ সালের লোকগণনার যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতের লোকসংখ্যা (পাকিস্তান বাদ দিয়াই) ৪৪ কোটির উপর। এই বিশাল জনসংখ্যা আবার নিগ্রিটো, প্রোটো-অষ্ট্রোলয়েড, মোংগলয়েড, মেডিটেরানিয়ান্, ওয়েষ্টার্ণ ব্র্যাকিসিফেলাস এবং নর্ডিক এই ছয়টি মানব-গোষ্ঠীর লোকদ্বারা গঠিত। এই ছয়টি জাতির মধ্যে আবার পরস্পর সংমিশ্রণও হইয়াছে। ভারতের জনসমষ্টির মধ্যে যেরূপ বিভিন্নতা তাহার ভাষার মধ্যেও সেইরূপ বিভিন্নতা রহিয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম প্রভৃতি ১৪টি ভাষাকে সরকারীভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইসব ভাষার প্রায় প্রত্যেকটিরই উচ্চমানের সাহিত্য রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেক কথ্য ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে। ফলে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক একে অপরের ভাষা পড়িতে বা বুঝিতে পারে না।

ধর্মের দিক দিয়াও ভারতের বিভিন্নতার অন্ত নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসিক, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মাবলম্বী লোকই ভারতবর্ষে রহিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ধর্মেরই আবার অনেক শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে।

এইসব বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে আচার-ব্যবহারের পার্থক্যও কম নহে। বিভিন্ন যুগে আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূণ, পাঠান, মোগল, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি নিজ নিজ সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার অধিবাসীদের মধ্যে আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্যাভ্যাস, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বহুবিষয়ে বিভিন্নতা রহিয়াছে। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদিও ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে।

ভৌগোলিক দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও ভারত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। একদিকে আমাদের দেশে যেমন শস্যশ্যামল প্রান্তর দেখা যায়, অপর দিকে তেমনি উষর মরুভূমি ও দৃষ্টিগোচর হয়। সমতলভূমির সংগে উচ্চতম

পর্বতেরও অভাব এদেশে নাই। ভারতবর্ষের কোথাও বা প্রচুর ঠাণ্ডা, কোথাও বা প্রচুর গরম, কোথাও বৃষ্টিপাতের জন্য অতিষ্ঠ হইতে হয়, কোথাও বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প।

এইসব নানাধরনের বৈষম্য ভারতের রাজনৈতিক জীবনেও বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই ভারতের ইতিহাসে ভারতকে আমরা বার বার বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইতে দেখি। ইহার রাজনৈতিক বিভিন্নতা এবং ঝগড়া-ঝাঁটির সুযোগ লইয়া বৈদেশিকরা বার বার ইহাকে পদানত করিয়াছে। স্বাধীন ভারতেও এই ভয় যে সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে এমন নহে।

কিন্তু নানারূপ বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, ভারতবাসীর অন্তরে একটা একত্ববোধও চিরদিনই রহিয়াছে। ভারতসভ্যতার মূল কথাই হইল বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। সকল ভারতবাসীরই জীবনের দৃষ্টিভংগী প্রায় একই রূপ। আমরা সকলেই এখনও ধর্মকে জীবনে প্রাধান্য দিয়া থাকি। পারিবারিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ আমাদের সকলেরই প্রায় সম পরিমাণ। আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের প্রতি আমাদের ঝোঁক অপেক্ষাকৃত অল্প। সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি আকর্ষণও আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। তাই ভারতীয় বলিতে, সকল বৈষম্য সত্ত্বেও, এক বিশিষ্ট ধরনের জীবনযাপনকারী লোকগোষ্ঠীর কথা আমাদের মনে হয়। আমাদের দেশের একটা ভৌগোলিক একত্বও আছে। ভারতবর্ষ বলিতে আমাদের মনে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপ্ত এক বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা জন্মে। প্রাচীনকাল হইতে এই সমগ্র ভূখণ্ডের উপর একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা বার বার হইয়াছে। ইংরেজদের শাসনকালেও এই দেশ দীর্ঘদিনের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করিয়াছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমরা এক ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপেই সংগ্রাম করিয়াছি। আজ স্বাধীনতালাভের পর, আমাদের সর্বাপেক্ষা বড়ো সমস্যা, কি করিয়া আমরা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও একজাতিরূপে আমাদের সংঘবদ্ধতা রক্ষা করিব। আমাদের শাসনতন্ত্র এমনভাবে করা প্রয়োজন যাহাতে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষিত হয়, অথচ দেশের প্রত্যেকটি স্থানের লোকই নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যরক্ষণে এবং পুষ্টিবর্ধনে সক্ষম হয়।

ভারতের মূলগত ঐক্য

একান্ত কামনা; আজ আমরা আমাদের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া স্বাধীন ভারতের গঠনে অগ্রসর হই।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Describe our privileges and responsibilities as citizens of free India.

2. Describe the difficulties which we have to face in building our country after gaining independence.

3. Discuss how India offers Unity in Diversity.

B. Answer in not more than 70 words :—

1. Describe how we celebrate the 15th of August.

2. Show in what manner India may be said to have possessed a strong democratic tradition.

3. Describe what are the special problems created for us by the British when they left India.

C. Make the following additions in your scrap-book :—

1. A good picture of the National Flag.

2. Our National Song.

3. Collect as many pictures as you can on the following :—

(a) Celebration on 15th August and 26th January.

(b) Different races living in India.

D. The following projects may be undertaken :—

1. Active participation in the school celebrations of 15th August and 26th January.

2. A discussion on the chief problems on the way to rebuilding India.

স্বাধীনতা সংগ্রাম

আমাদের দেশের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় স্বাধীনতালাভের ইতিহাস। কোনো জাতিই বেশী দিন পরাধানতার শৃংখল সহ্য করিতে পারে না। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে। শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে একদিন-না-একদিন শাসিত বিদ্রোহ করিয়া বসে, সে মরিয়া হইয়া ওঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ব্যতীত তাহার জীবনের প্রায় কোনো প্রয়োজনই মিটিতে পারে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলকথা

পরপদানত জীবন লাঞ্ছিতের জীবন—এ বিষয়ে একদিন-না-একদিন সে নিঃসংশয় হয়। একত্র মিলিত হইয়া শাসককে বিতাড়িত করার জন্য শাসিতেরা বদ্ধপরিকর হয়। তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত হয়। দাসত্বকে জাতীয় অপমান বলিয়া মনে করিয়া তাহাকে তাহারা ঘৃণা করিতে শেখে। জীবন পণ করিয়া এই অপমান হইতে তাহারা মুক্ত হইবার চেষ্টা করে। ইহাই তাহাদের জীবনের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। শাসিতের মনে যখন দৃঢ়সংকল্পের সৃষ্টি হয়, তখন শাসকের আসন টলিয়া ওঠে, তা সে যত শক্তিশালীই হউক। সকল পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকেই মোটামুটি উপরিউক্ত সত্যকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়।

ভারতের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে, ইংরেজ ভারতে তাহার সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে। প্রথম হইতেই ইংরেজরা তাহাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারত শাসন করে। ফলে, দেশের উৎপাদনশক্তি দিন দিনই হ্রাস পাইতে থাকে। ভারতবাসী দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়ে। অপর দিকে ভারতের অর্থে ইংল্যাণ্ড সমৃদ্ধ হইতে থাকে। এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ রূপ নেয় ভারতের

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে, ইংরেজ শাসন আরম্ভের প্রায় ১০০ বৎসর পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজ লিখিত ইতিহাসে ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিদ্রোহ শব্দটি খুব সম্মানসূচক নহে। সরকারের ক্ষমতা অপহরণের নিমিত্ত যখন দেশবাসীর কোনো অংশ সংঘবদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করে, তাহাকে বলা হয় বিদ্রোহ। কিন্তু কেহ যদি কোনো দেশকে সৈন্যশক্তির সাহায্যে

পদানত করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন করিতে থাকে এবং দেশবাসী যদি প্রত্যক্ষভাবে শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাহা সংগ্রাম আখ্যা পাইবার যোগ্য।

ইংরেজ শাসন প্রায় একশত বৎসর চলার পরে নানা কারণে প্রায় সকল শ্রেণীর দেশবাসীর মনেই এই শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইংরেজদের সাম্রাজ্যলোলুপতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা ছলে-বলে-কৌশলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলী অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি উদ্ভাবন করেন। অনেক দেশীয় রাজাকেই তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। ডালহৌসী দত্তক পুত্রগ্রহণের বিরুদ্ধে যে নীতি প্রবর্তন করেন তাহার ফলেও অনেক দেশীয় রাজ্য ইংরেজ কবলিত হয়। ফলে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তাঁহাদের মনে ধারণা জন্মায় যে, অল্প দিনের মধ্যেই দেশীয় রাজ্যের আর কোনো অস্তিত্বই থাকিবে না। তাই তাঁহারা ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। যেসব দত্তক পুত্রের মুখের গ্রাস ডালহৌসী কাড়িয়া লইয়াছিলেন (যেমন, পেশোয়ার দত্তক পুত্র নানাসাহেব) তাঁহারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন।

কারণ

দেশীয় রাজারা ব্যতীত জমিদারগণও ইংরেজদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। রাজস্ববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংরেজরা এক বছর, পাঁচ বছর বা দশ বছর পর পর জমি নিলামের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যিনি ইংরেজ সরকারে সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব জমা দিতে স্বীকৃত হইতেন তিনিই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমির মালিকানা লাভ করিতেন। ফলে, পুরাতন জমিদার বংশের উচ্ছেদ ঘটিতে থাকে এবং নূতন বিত্তবান লোকেরা জমিদার হইতে আরম্ভ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অবশ্য অল্পদিন পর পর জমি নিলামের প্রথা রহিত হয়, কিন্তু পুরাতন জমিদার বংশের তাহাতে কোনো লাভ হয় না। তাঁহারা বেকারে পরিণত হইয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বৃদ্ধি করার কার্যে যোগ দেন। এদিকে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দরিদ্র কৃষকসাধারণের কষ্ট

কম ছিল না। বার বার জমিদার পরিবর্তন এবং তাঁহাদের শোষণ এবং পীড়ন নীতি গ্রহণের ফলে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। নিজেদের স্বার্থে ইংরেজরা দেশের শিল্পসম্পদ পূর্বেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বিলাতী পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পজাত দ্রব্য টিকিতে পারে নাই। ইংরেজরা এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে সোনারূপাও নিজেদের দেশে চালান দিতেছিল। ফলে, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আর্থিক অসন্তোষ চরমে পৌঁছিল। সামাজিক এবং ধর্মগত কারণেও দেশবাসীর মনে ইংরেজ সরকারের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হইল। ইংরেজ সাম্রাজ্যস্থাপনের পথপ্রদর্শক ছিলেন খৃষ্টান পাদ্রীরা। ইঁহারা এদেশবাসীকে নানাভাবে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই কার্যে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেছিলেন। অপরদিকে কিছুটা উদারনৈতিক মনোভাবের জন্য এবং কিছুটা শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু, দেশের সাধারণ মানুষের সন্দেহ হইল যে এইসব সমাজ সংস্কারের ভিতর দিয়া ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের ধর্মনাশের চেষ্টা করিতেছে। দেশের গোঁড়া পণ্ডিত এবং মৌলবীরা প্রাণপণে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন।

সিপাহীরাই এই সংগ্রামে অগ্রণী হয়। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের অসন্তুষ্ট হইবার নানা কারণ ছিল। ইংরেজ রাজত্ব প্রসারের নিমিত্ত ভারতীয় সিপাহীরা প্রাণ দিয়াছে। কিন্তু তাহারা দেখিতে পাইল যে তাহারা এদেশীয় বলিয়া, নিতান্ত অনভিজ্ঞ ইংরেজ সৈন্যরা তাহাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, একই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ইংরেজ এবং ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বেতন, ভাতা ইত্যাদির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তারপর, সাগর পারে গেলে তাহাদের জাতি নষ্ট হয়, হিন্দু সৈন্যদের মধ্যে এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও, ইংরেজ সরকার ইহা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাদের সাগর পারে ব্রহ্ম যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করেন। মোট কথা, ভারতীয় সিপাহীদের উপর নানারূপ দুর্ব্যবহার হইতেছিল। ইতিমধ্যে 'এন্‌ফিল্ড' রাইফেল নামে এক রকম নূতন বন্দুক সৈন্যবাহিনীতে চালু

করা হয়। এই বন্দুকের টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে ভরিতে হইত। সত্যাসত্য জানা না থাকিলেও, রটিয়া গেল যে ঐ বন্দুকের টোটায় গোরু এবং শুয়ারের চর্বি আছে—হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সিপাহীদের জাতি নষ্ট করার জন্যই না কি এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই 'এন্‌ফিল্ড' বন্দুক হইতেই সিপাহী সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। প্রথমে, ১৮৫৭ সালে, বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে ভারতীয় সিপাহীরা 'এন্‌ফিল্ড' টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। ঐ বৎসরই মে মাসে মীরাটে সিপাহীরা ইংরেজদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিল। তারপর, বিভিন্ন সৈন্য-শিবির হইতে সিপাহীরা আসিয়া দিল্লীতে মিলিত হইল এবং শেষ মোগল বংশধর বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল ভারত হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করাই হইল সিপাহীদের উদ্দেশ্য। ইংরেজদের সহিত সিপাহীদের সশস্ত্র সংগ্রাম কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মধ্য ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। পেশোয়ার দত্তক পুত্র নানাসাহেব সিপাহীদের সহিত যোগ দিলেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈও সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুরুষের পোশাকে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আজিও আমাদের দেশে উদাহরণস্বরূপ হইয়া আছে।

সিপাহীদের সংগ্রাম

এই সংগ্রামে ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের সমর্থন থাকিলেও, ইহাকে ঠিক জাতীয় সংগ্রাম বলা চলে না। প্রথমত, দেশের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ তখনও তেমনভাবে জন্মে নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছিল। সিপাহীরা এবং কয়েকজন সিংহাসনচ্যুত দেশীয় রাজা ভিন্ন আর কেহ এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হয় নাই। সিপাহীদের মধ্যেও এক অংশ মাত্র বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। সংগ্রামে লিপ্ত সিপাহীরা যাহা করিতেছিল তাহা আবেগের বশেই করিতেছিল। তাহাদের কোনো সুপরিকল্পিত নীতি ছিল না; সুযোগ্য সর্বজনমান্য নেতারও তাহাদের মধ্যে বিশেষ অভাব ছিল।

সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ

ফলে, এক বৎসরের মধ্যে সিপাহীরা পরাজিত হইল। ইংরেজরা দিল্লী অধিকার করিল। বাহাদুর শাহের পুত্রদের হত্যা করা হইল এবং তিনি নিজে বর্মায় নির্বাসিত হইলেন।

সংগ্রামের অবসান

সংগ্রামের নেতাদের মধ্যে কেহ বা প্রাণ দিলেন, কেহ বা পলায়ন করিলেন এবং কাহারও বা ফাঁসি হইল। অসংখ্য সিপাহী প্রাণ হারাইল। সিপাহী সংগ্রামের অবসান হইল।

কিন্তু জাতীয় সংগ্রামের দিক হইতে সিপাহীদের এই সংগ্রাম যে ব্যর্থ হইল তাহা বলা চলে না। এই সিপাহীরাই আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রথম শহীদ। হাজার হাজার শহীদ, হাজার হাজার সিপাহীর রক্তে আমাদের মধ্যে জাতীয়ভাবের উন্মেষ ঘটিল। ইংরেজদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস আমাদের বৃদ্ধি পাইল। এদিকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজীর মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয়। ইংল্যাণ্ড তথা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তখন জাতীয়ভাবের প্রাবল্য চলিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এই ভাবধারা ভারতীয়দের মনেও বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়। দেশমাতৃকার প্রতি অনুরক্তি এবং আনুগত্য ভারতীয়দের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দাসত্বের গ্লানি এবং জাতির অপমান সম্পর্কে তাহারা বিশেষ ভাবে সচেতন হইয়া ওঠে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেশীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে দেশ ইংরেজ শাসনের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করে এবং তাহার স্বাধীনতালাভের আকাংখা প্রকাশ করিতে থাকে।

জাতীয়ভাবের উন্মেষ

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবং বাল গংগাধর তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা ভারতে জাতীয়তাবাদ উন্মেষে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিক্ষিত ভারতবাসীরা অতি আগ্রহের সহিত ঐ সব পত্রিকা পড়িতেন। লর্ড লিটন যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল তখন তিনি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র দমনের আইন (Vernacular Press Act) পাশ করিয়া, ঐ পত্রিকাগুলির সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে সমালোচনার অধিকার কাড়িয়া লন। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয় চেতনা তখন এতখানি জাগরিত হইয়াছিল যে বাংলা 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এই আইন এড়াইবার জন্য রাতারাতি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। আজিও এই পত্রিকা ইংরেজীতেই প্রকাশিত

সংবাদপত্র দমন আইন

হইতেছে। এই ব্যাপারে দেশবাসীর উত্তেজনার পরিমাণ অনুভব করিয়া উদারনৈতিক গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্র দমনের আইন বাতিল করিয়া দেন।

এই সময় আর একটি ঘটনাও ভারতবাসীদের জাতীয় গৌরববোধে বিশেষভাবে আঘাত করে। এতদিন পর্যন্ত আইন ছিল, কোনো ভারতীয় বিচারক ইউরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। ইহা ভারতীয়দের নিকট অত্যন্ত অপমানকর বলিয়া মনে হইত। রিপণের শাসনকালে সার ইল্‌বার্ট এক আইনের খসড়ায় ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দেরও বিচার করিবার অধিকার দানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইউরোপীয়রা এই আইনের খসড়ার (ইল্‌বার্ট বিল) বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিল। ভারতীয়রাও প্রতিআন্দোলন হইতে নিবৃত্ত রহিল না। অবশেষে দুই পক্ষে একটা মিটমাট হয়। দেশীয় বিচারকেরা ইউরোপীয়দের বিচারের অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে ইউরোপীয়েরা অধিকাংশ ইউরোপীয় দ্বারা গঠিত জুরির সাহায্যে বিচারের দাবী করিতে পারে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

ইলবার্ট বিল

সিপাহী সংগ্রাম ব্যারাকপুরে আরম্ভ হইলেও, ইহার ঘটনাবলীর সহিত বাংগালীর বিশেষ সংশ্রব ছিল না। সিপাহীরা বাংগালী ছিল না। এমন কি শিক্ষিত বাংগালীরা এই সংগ্রামের বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয়তাবোধ জাগরণের সংগে সংগে বাংগালী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে বাংলাদেশেই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এবং বাংগালী জাতি এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। বাংলাদেশের নীল আন্দোলনও বাংগালীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইতে বিশেষ সাহায্য করে। ইংরেজ বণিকেরা বড়ো বড়ো কুঠি করিয়া ধান-চাষের জমি লইয়া বাংলাদেশে নীল (Indigo) চাষ করিতে আরম্ভ করে। এই সব কুঠিয়ালরা নিজ আর্থিক স্বার্থ আদায় এবং পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দরিদ্র, নিরীহ কৃষকদের উপর নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার করিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানাস্থানে কৃষকরা রুখিয়া দাঁড়ায়। শিক্ষিত

বাংগালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে আগমন

বাংগালীরা জাতীয় ভাবের প্রেরণায় কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ান। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা বিশেষভাবে দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ পাদ্রী লং সাহেবের নামে প্রকাশিত হয়। অপর দিকে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকুঠির মালিকদের সব অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করিতে থাকেন। ইংরেজ সরকার দমনমূলক নীতির সাহায্যে নীল আন্দোলন বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করার অপরাধে লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা এবং এক মাসের জেল হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় লং সাহেবের জরিমানার টাকা দিয়া দেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামেও মানহানিকর মামলা দায়ের করা হয়। মামলা চলা-কালে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। লং-এর কারাদণ্ড ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ফলে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয়া প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের লোক। ব্রাহ্মরাই বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের মতো লোকের নেতৃত্ব লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন এবং সমাজ-সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি তরুণ ব্রাহ্মদের প্রচেষ্টায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহা স্থাপনের অল্পকাল মধ্যেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক আন্দোলন চালাইবার সুযোগ আসিল। আই. সি. এস্. পরীক্ষায় ভারতীয়দিগকে অধিকতর সুযোগদানের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্রনাথ সুবক্তা ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া তিনি ভারতব্যাপী এক তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের এবং দেশীয় লোকদের অস্ত্র

সর্বভারতীয় আন্দোলন গঠন

রাখার বিরুদ্ধে আইন-এর প্রতিবাদেও অগ্রণী হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলনেও ইহা বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। এই সব আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সুরেন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া সর্বভারতীয় জনমত গঠন করিতে চেষ্টা করেন। এইভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র দেশের সংঘবদ্ধ হইবার সূত্রপাত হয়।

ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত

ইতিমধ্যে ছাত্ররাও স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়াইয়া পড়িতেছিল। ছাত্ররা স্বভাবতই আদর্শবাদী। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের এবং সমাজ-সংস্কারের আকাংখা প্রবলভাবে দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু আনন্দমোহন বসু স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন নামে ছাত্র সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

ন্যাশনাল কনফারেন্স

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে এক সর্বভারতীয় সভা আহ্বান করা হয়। এই বিরাট কনফারেন্সে ভারতের সকল অংশ হইতেই প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হন। তাঁহারা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার, সিভিল সার্ভিসের সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই কনফারেন্স জাতীয় আন্দোলন পরিচালনের নিমিত্ত একটি স্থায়ী সর্বভারতীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাবও গ্রহণ করেন।

ভারতের জনমত যে জাগ্রত হইয়াছে, একথা ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকারও অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। গণতান্ত্রিক দেশের লোক হিসাবে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছিলেন যে এই জনমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণাও হয়তো ছিল যে, এই জনমত ইংরেজী শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উহাদের হয়তো চাকুরী ইত্যাদি দিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস্. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের লক্ষ্য করিয়া একখানা খোলা চিঠি লেখেন। ইহাতে তিনি ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের পরামর্শ দেন। সম্ভবত হিউম সাহেব তখনকার গভর্ণর

জেনারেলের সহিত পরামর্শ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠিতে ব্যক্ত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে স্থানীয় নেতারা হিউম সাহেবের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুগামীদের 'রাজবিদ্রোহী' বলিয়া এই অধিবেশনে আহ্বান করা হয় নাই। এইভাবে ইংরেজ সরকারের পরোক্ষ সমর্থন লইয়া জাতীয় কংগ্রেস জন্মলাভ করে। সেদিন হয়তো ইংরেজ সরকার বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রধানত এই কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই ইংরেজদের একদিন ভারত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

যাহা হউক, এদিকে যখন বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল, কলিকাতায় তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন চলিতেছিল। পরবৎসর, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ইংরেজ সরকারের চাল ব্যর্থ হয়। জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাধান্য লাভ করেন। ফলে, 'রাজবিদ্রোহীদের' কংগ্রেস হইতে বাদ দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অধিবেশনে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং জাতীয় কংগ্রেস একত্র মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসভায় পরিণত হয়। এই মহাসভার নাম জাতীয় কংগ্রেসই থাকিয়া যায়। ইংরেজ সরকারের পক্ষপুষ্ট হইয়া জন্মলাভ করিলেও, ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেই কংগ্রেস ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাংখার ধারক এবং বাহক হইয়া ওঠে।

কংগ্রেস জাতীয়রূপ ধারণ করিলেও, প্রথম প্রথম ইহার কর্মপন্থা ছিল নরমপন্থী। ইংরেজ সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ কোনো সংঘর্ষের চিন্তাও করা হইত না। প্রতিবৎসর নেতারা কংগ্রেসের অধিবেশনে মিলিত হইয়া ইংরেজ সরকারের কাছে দেশের অভাব-অভিযোগের কথা জানাইতেন। আবেদন-নিবেদনই ছিল তাঁহাদের প্রধান সম্বল। ইংল্যাণ্ডে, প্রকৃত শাসকদের মন যাহাতে ভারতের অভাব-অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় সেই উদ্দেশ্যেও, কংগ্রেস চেষ্টা করিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডে 'ইণ্ডিয়া' নামক

নরমপন্থী নীতি

একখানা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে কিছু ফলও পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতের দাবীর প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হইয়া ওঠে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ ব্রাড্‌লক্ নামে বৃটিশ পার্লামেণ্টের একজন সদস্য কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে ভারতবর্ষে আসেন। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, বৃটিশ পার্লামেণ্টে কাউন্সিল এ্যাক্ট পাশ হয়। এই এ্যাক্ট-এর দ্বারা ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে মুসলমানেরা কিন্তু সাধারণত নিজেদের কংগ্রেস আন্দোলন হইতে বিযুক্ত করিয়াই রাখিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে কংগ্রেসের সহিত সংস্রব রক্ষা না করিলেই, ইংরেজ সরকার তাঁহাদের দলীয় স্বার্থের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। তাই স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের নেতৃত্বে মুসলমানেরা এই সময়ে মেহমেডান-এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড পেট্রিয়ট্স এ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি কয়েকটি দলীয় সংস্থা গঠন করেন। এইভাবে ভারতের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়।

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক নীতির সূত্রপাত

অপরদিকে জাতীয় কংগ্রেস বেশী দিন নরমপন্থী থাকিতে পারিল না। প্রথম প্রথম ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতি উচ্চবিত্ত লোকেরাই কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তেরা কংগ্রেসে স্থান করিয়া লইতে লাগিলেন। ইঁহারা কংগ্রেসে বামপন্থী চিন্তাধারা সংক্রামিত করিলেন। বামপন্থী চিন্তাধারার নায়কগণ কৃষক এবং শ্রমিকদেরও কংগ্রেসের ভিতর আনিয়া উহাকে প্রকৃত গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে এবং ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন পরিত্যাগ করিয়া স্বায়ত্বশাসনলাভের নিমিত্ত বিধিবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাইতে সংকল্প করেন। তখন বাংলাদেশেই বামপন্থীদের সংখ্যা বেশী ছিল। উহাদের মুখপাত্র ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ আসামের চা বাগানের কুলিদের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। একই সময়, অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশাল হইতে ৪৫,০০০ লোকের

কংগ্রেসে বামপন্থী চিন্তাধারার উদ্ভব

স্বাক্ষরসহ এক স্মারকলিপি কংগ্রেসের নিকট পেশ করেন। ইহাতেই কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দাবী লইয়া আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ করা হয়। অপরদিকে, মহারাষ্ট্রে তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে বামপন্থী আন্দোলন চালাইতেছিলেন। বৃটিশ সরকারের নিকট অনুরোধ-উপরোধের পালা শেষ করিয়া, তিনি কার্যকরীভাবে উহার বিরোধিতা করার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছিলেন।

বংগ ভংগ আন্দোলন

এই সময়, গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জনের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতে ইন্ধন যোগাইল। লর্ড কার্জন কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া বাংলার জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিলেন। লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া বাংলার জাতীয়তাবোধে সর্বাপেক্ষা বড়ো আঘাত দিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার নামে তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া, ১৯০৫ সালে, ইষ্টার্ণ বেংগল ও আসাম নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন। হয়তো, তাঁহার আশা ছিল যে, এইভাবে বিভক্ত করিয়া তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বাংগালীর সংগ্রামক্ষমতা হ্রাস করিবেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। বাংগালীদের জাতীয়তাবোধ সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইল। বংগমাতার অংগচ্ছেদ রোধ করিতে বাংগালী দৃঢ়সংকল্প হইল। বংগ ভংগ নিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিলেন। জাতীয়তাবাদী সকল ভারতবাসীরই এই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন ছিল।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নিল। বিলাত হইতে আগত সর্বপ্রকার জিনিস বর্জন এবং স্বদেশজাত জিনিস ব্যবহার করণের নিমিত্ত নেতারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম

এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজদের অর্থনৈতিক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বিপর্যস্ত করা যাইবে এই ভরসা ছিল। 'বংগদর্শন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এবং 'সঞ্জীবনী পত্রিকায়' কৃষ্ণকুমার মিত্রের অগ্নিবর্ষী লেখা বাংগালীকে এই

সংগ্রামে শক্তি যোগাইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বন্দেমাতরম্' হইল এই সময় জাতীয় সংগীত। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও আবেগের বশে এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নেতাদের পরিচালনায় শোভাযাত্রা করিয়া, বন্দেমাতরম্ সংগীত গাহিতে গাহিতে তাহারা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। চারিদিকের বাড়ীতে যেসব বিলাতী দ্রব্য ছিল বাড়ীর লোকেরা তাহা স্বেচ্ছায় আনিয়া তাহাদের নিকট জমা দিতে লাগিল। তারপর কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আরম্ভ হইল বিলাতী দ্রব্যের বহ্নি-উৎসব। দেশবাসীর মন আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিল। বাংগালীর নিকট বরেণ্য বিপিনচন্দ্র পাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি সকলেই এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। মুসলমান নেতাদের মধ্যে আব্দুল রসুল এবং লিয়াকৎ হুসেন গজনভী এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। এই আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করিয়া ছাত্রদের স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া। ইহার ফল হিসাবে, কলিকাতায় জাতীয় মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়।

সমগ্র ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তার

ইংরেজ সরকার আর একটি ভুল করিলেন। ভাবিলেন, গায়ের জোরে এই আন্দোলনকে দমন করা যাইবে। শোভাযাত্রাকারীদের উপর লাঠি চালানো হইল; বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে দলে দলে লোককে বন্দী করা হইল। কিন্তু অত্যাচার যত বাড়িতে লাগিল, আন্দোলনও তত শক্তিশালী হইতে লাগিল। শোভাযাত্রাকারীরা, কারাবদ্ধ বন্দীরা—জাতীয় বীরের সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। আন্দোলন শুধু বাংলা দেশে সীমাবদ্ধ রহিল না, উহা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রে তিলক, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়—ইঁহারা আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

এই আন্দোলনের মধ্যে ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে নরম এবং চরমপন্থীদের মধ্যে প্রবলভাবে মতের সংঘর্ষ ঘটে। চরমপন্থীদের

কংগ্রেসের মধ্যে পরাজয় ঘটিলেও, পত্রিকাদির মাধ্যমে (যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, নবশক্তি ইত্যাদি) তাঁহারা দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের মতবাদ ছড়াইতে লাগিলেন। ইংরেজ সরকার চরমপন্থীদের আন্দোলনের উপর দমননীতি চালাইলেন। বাংগলার যুব সম্প্রদায়ের তখন চরম উত্তেজনার মুহূর্ত। অহিংস আন্দোলনে ফল লাভ হইবে না ভাবিয়া তাহারা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাংলাদেশের অনেক স্থানে গুপ্তসমিতি স্থাপিত হইল। দেশের শত্রুদের ছলে-বলে বিনষ্ট করাই হইল এই গুপ্তসমিতিগুলির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আত্মবলিদান করিতে সর্বদাই তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। ইঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্তত প্রথম প্রথম খোলাখুলিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করা সম্ভব নহে। অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যার দ্বারা তাহাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করা ছিল তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯০৮ সালে বালক ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ভুল করিয়া কেনেডি নামে আর একজনকে হত্যা করেন। তাঁহারা ধরা পড়েন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। হাসিতে হাসিতে ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়ি গলায় পরিলেন। তাঁহার 'বীরত্বের' কাহিনী পল্লী-গীতিতে প্রচারিত হইয়া অজ পাড়াগাঁয়ের লোকদেরও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি আরও অনেক সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়িলেন। বিচারে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পাইলেন, কিন্তু বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের দ্বীপান্তর হইল। ইহাতেও সন্ত্রাসবাদের অবসান হইল না। সন্ত্রাসবাদের প্রসারের ফলে আমাদের শাসনকর্তারা বুঝিতে পারিলেন যে দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ কতখানি জাগিয়াছে। কেবলমাত্র দমননীতির দ্বারা বেশী ফল লাভ হইবে না। তাই, ১৯০৯ সালে মোরলে-মিণ্টো শাসনসংস্কারের প্রবর্তন করিলেন। ইহার দ্বারা আইন সভায় বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি হইল এবং দেশীয় লোকদের কিছু উচ্চপদে চাকুরীর ব্যবস্থা করা

চরমপন্থী মতবাদের প্রচার এবং বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি

মোরলে-মিণ্টো শাসন সংস্কার এবং বংগ ভংগ রদ

হইল। ১৯১১ সালে বংগ ভংগও রহিত হইল। কিন্তু, এই সব ব্যবস্থার ফলেও দেশবাসীর আশা-আকাংখার নিবৃত্তি হইল না।

এদিকে দেশবাসীর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়া সরকার ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯০৬ সালে আগা খাঁ লর্ড মিণ্টোর সহিত দেখা করিয়া, আইন সভায় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানান। এই অনুরোধের অর্থ এই যে, আইন সভায় মুসলমান সদস্যদের আসন নির্দিষ্ট থাকিবে এবং তাঁহারা শুধু মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ পাইয়া লর্ড মিণ্টো জানান যে, তিনি আগা খাঁর প্রস্তাব সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া, ঢাকার নবাব সালিম উল্লাহ্ মুস্লিম লীগের প্রতিষ্ঠা করিলেন। মিণ্টো সাহেব ইহাতে খুশী হইলেন, তিনি মত প্রকাশ করিলেন যে, মুসলিম লীগ একটি কংগ্রেস বিরোধী প্রতিষ্ঠান।

বিভেদনীতি এবং মুস্লিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১৯১৬ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার কালে, লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে এক চুক্তি হয়। তাহাতে কংগ্রেস মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন নীতি মানিয়া লয়। ইংরেজদের বিভেদ নীতি অকেজো করার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছিল। ফলে, কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগ যুগ্মভাবে শাসনসংস্কারের দাবী জানাইল। ১৯১৬ সালেই বাল গংগাধর তিলক হোম রুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী এ্যানি বেসান্তও অনুরূপ একটি লীগ স্থাপন করেন। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন চালানোই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৭ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের বামপন্থী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রভাবে কংগ্রেস আর অল্পস্বল্প শাসনসংস্কারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, পূর্ণ স্বরাজের দাবী করিল। ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে নরম-পন্থীদের পূর্ণ পরাজয় হইল এবং নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে আসিল। ফলে, শ্রমিক এবং কৃষকরা দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট চলিতে লাগিল।

পূর্ণ স্বরাজের দাবী

যুদ্ধ অবসানের পর ইংরেজ সরকারের নীতিতে ভারতবাসী খুবই নিরাশ হইয়াছিল। যুদ্ধে তাহারা ইংরেজদের সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিল এই আশায় যে যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীনতা পাইবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। অধিকন্তু খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ইত্যাদির জন্য তাহাদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাইল। ফলে, চারিদিকে নানারূপ আন্দোলন দেখা দিল। শ্রমিক আন্দোলন ইহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২০-২১ সালের মধ্যে মোট প্রায় ৬,০০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। এইসব আন্দোলন দমনের নিমিত্ত সরকার দমন নীতি প্রয়োগ করেন। ১৯১৯ সালে কুখ্যাত রাওলাট এ্যাক্ট পাশ হয়। সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা, যথেচ্ছভাবে রাজনৈতিক অপরাধীদের দণ্ডদান করা বা দেশবাসীকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা প্রভৃতি বিধান এই আইন-এ স্থান পাইয়াছিল।

রাওল্যাট এ্যাক্ট

এই সন্ধিক্ষণে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ দেশের বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন। রাওলাট এ্যাক্ট যখন বিধিবদ্ধ হইতেছিল, তখনই তিনি ইহার বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেল চেমস্‌ফোর্ডের নিকট প্রতিবাদ জানান। এই আইন পাশ হওয়ার পর, ইহা অমান্য করিবার নিমিত্ত সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান। সশস্ত্র শাসকের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র শাসিতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধীর এক বড়ো অবদান। মন হইতে বিদ্বেষ দূর করিয়া সাহসিকতার সহিত, শান্ত, নিরস্ত্রভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদকে মহাত্মা গান্ধী নামকরণ করেন সত্যাগ্রহ। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে রাওলাট আইন-এর বিরুদ্ধে নানাস্থানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইল। সরকার দমন নীতি তীব্রতর করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন। অমৃতসরে, জালিয়ানওয়ালাবাগে রাওলাট আইনের প্রতিবাদের নিমিত্ত আহূত এক নিরস্ত্র জনসভার উপর বৃটিশ জেনারেল ডায়ার সাহেবের আদেশে গুলি চালানো হয়। চারিশত নিরীহ নরনারী ইহাতে প্রাণ হারায়।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রপাত ও জালিয়ানওয়ালা-বাগ

জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদক্ষেত্রে পরিণত হয়। আজও প্রতি বৎসর ভারতের সর্বত্র জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস প্রতিপালিত হইয়া থাকে। জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো পৃথিবীবরেণ্য মহাপুরুষ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বৃটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট্' অর্থাৎ "স্যার" উপাধি ত্যাগ করেন।

দমনের সংগে সংগে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে কিছুটা তোষণেরও চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯১৯ সালে আর একটি শাসন সংস্কার আইন পাশ করা হয়। এই আইনের ফলে ভারতে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা (Diarchy) প্রবর্তিত হয়।

১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার

শাসনকার্যকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় শাসন-ব্যবস্থাতেই এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষা, বিচার, সেচ, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলি ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থ, দেশরক্ষা, পরিবহণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পূর্বেরই মতো গভর্ণর জেনারেল বা গভর্ণরের হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি কার্যনির্বাহক সভার সাহায্যে ঐসব বিষয়গুলির পরিচালনা করেন। এই আইনের বলে, কেন্দ্রীয় ও
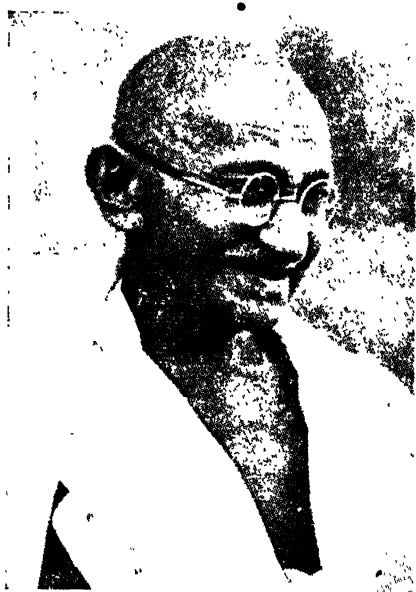
মহাত্মা গান্ধী

প্রাদেশিক আইন সভাগুলিকে দুই কক্ষযুক্ত আইন সভায় পরিণত করা হয়। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল বা গভর্ণরের হাতে আইনসভা কর্তৃক পাশ করা যে কোনো আইন বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকে। ১৯১৯ সালের শাসন-

সংস্কার দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। কারণ প্রকৃত ক্ষমতা বৃটিশদের হাতেই রাখিয়া দেওয়া হয়। তাই স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতে থাকে এবং সরকারকে রাওলাট এ্যাক্ট পাশ করিতে হয়। কিন্তু প্রবল আন্দোলনের ফলে দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই এ্যাক্টকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন

এই সময় ভারতীয় মুসলমানরাও বিশেষ কারণে বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, মুসলমানদের সর্বোচ্চ ধর্মযাজক (খলিফা) তুরস্কের সুলতানের সাম্রাজ্য বৃটিশরা অগ্রণী হইয়া খণ্ডিত করে। ভারতীয় মুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশের এই কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মহম্মদ আলি ও সওকত আলি, এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলন সংযুক্ত করিয়া ভারতে ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থা একেবারে অচল করিয়া দিতে চাহিলেন। ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসিল। ইহাতে মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র ভারতব্যাপী অসহযোগ পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। একই বৎসরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই পরিকল্পনা পুনরায় অনুমোদন লাভ করিল। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। আন্দোলনের মূল কথা হইল, সরকারের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জন করা। সরকারের চাকুরী, স্কুল, কলেজ, আদালত, আইনসভা সব কিছু বর্জন করিয়া শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করিয়া দিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানাইলেন।

দেশবাসী এই আন্দোলনে অভাবনীয়রূপে সাড়া দিয়াছিল। নূতন শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে যখন ১৯২০ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হইল, অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে পড়িয়া প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক ইহাতে ভোটদানে অংশ গ্রহণ করিল না। অনেক আইনজীবি আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। আইন-ব্যবসা পরিত্যাগকারীদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, বিলাতী কাপড় ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সর্বসমক্ষে তাহা পোড়াইয়া ফেলা এবং অহিংসভাবে

সরকারের আইন অমান্য করা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য লোক প্রতিদিন দলবদ্ধ হইয়া বিলাতী কাপড় পোড়াইতে লাগিল এবং সরকারের আইন ভংগ করিতে লাগিল। সরকার উহাদের ধরিয়া জেলে পাঠাইলেন। প্রায় ৩০,০০০ হাজার লোক কারাবরণ করিল। কারাগারের ভয় আর লোকের রহিল না। বরং কারাগারে যাওয়ার সময় এবং কারাগার হইতে মুক্তি পাওয়ার সময়, দেশবাসী সত্যাগ্রহীদের বিজয়ী বীরের সম্মান দিতে লাগিল।

১৯২১ সাল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে, সমবেত সদস্যগণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরও জোরের সহিত চালাইতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। স্থির হইল যে, মহাত্মা গান্ধীই হইবেন এই আন্দোলন-পরিচালনায় সর্বাধিনায়ক। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য জনসাধারণের উৎসাহ চরমে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলা সমীচীন মনে করিলেন। তিনি কেবলমাত্র বরদৌলি জেলায় সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু, ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। উত্তর প্রদেশে গোরক্ষপুরে আন্দোলনের উন্মাদনায়, সত্যাগ্রহীগণ সহিংস হইয়া পড়িল। তাহারা একটি থানায় আগুন লাগাইয়া দিল এবং ইহার ফলে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী প্রাণ হারাইল। হয়তো এই ধরনের ঘটনার আশঙ্কায়ই, মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন বরদৌলিতে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, সত্যাগ্রহ আন্দোলন হিংসার পথে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের একদল প্রভাবশালী নেতা, নূতন শাসন-সংস্কার আইন ধ্বংস করিবার নিমিত্ত, নূতন নীতি অবলম্বন করার প্রস্তাব করিলেন।

স্বরাজ্য পার্টি

তাঁহারা স্থির করিলেন যে পরবর্তী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া, বিধান সভার ভিতর হইতে, শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করিয়া তুলিবেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইঁহারা 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে এক নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের নীতি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সরকারের সহিত পূর্ণ

অসহযোগিতার নীতি হইতে পৃথক হইলেও ইহার উদ্দেশ্য একই ছিল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া স্বরাজ্য পার্টি বাংলাদেশ এবং উত্তর প্রদেশে জয়লাভ করিল। এই দলের লোকেরা আইন সভার ভিতরে তীব্র বিরোধিতা করিয়া সরকারকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

ইতিমধ্যে, লর্ড আরউইন যখন গভর্ণর জেনারেল, তখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট সাইমন কমিশন নামে এক কমিশন ভারতবর্ষে পাঠাইলেন (১৯২৭ সাল)। এই কমিশনের উপর নির্দেশ ছিল যে, ১৯২৯ সালের শাসনসংস্কার কতখানি কার্যকরী হইয়াছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীকে মিথ্যা প্রবোধ দেওয়াই এই কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল। এই কমিশনে একজনও ভারতীয় না থাকায় কংগ্রেস উহার সহিত সহযোগিতা করে না।

সাইমন কমিশন

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ের অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবার তিনি স্থির করেন যে, জনসাধারণের লবণ প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে সরকারের যে আইন আছে তাহা ভংগ করিয়া তিনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ৬ই এপ্রিল কয়েকজন অনুচরসহ তিনি পদব্রজে ডাণ্ডি অভিমুখে (প্রস্তাবিত লবণ আইন অমান্য করার স্থান) রওনা হন। রাস্তায় দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সংগে যোগ দেয়। সরকার মহাত্মা গান্ধীকে বন্দী করিলেন। ফলে, ভারতের সর্বত্র সরকার বিরোধী আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। বিলাতী দ্রব্য বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, সরকারী অফিসের সম্মুখে পিকেটিং ইত্যাদি সর্বত্র চলিতে থাকে। এবারকার আন্দোলনে মেয়েরাও দলে দলে যোগ দেন। কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও আন্দোলন চলিতে থাকে। সরকারের হিসাবমতোই, এই আন্দোলন দমনের চেষ্টায় ২৯টি স্থানে গুলি চালানো হয়, ১০৩ জন লোক প্রাণ হারায় এবং ৪২০ জন লোক আহত হয়। এক বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ষাট হাজার লোক কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহীদের উপর বেপরোয়া মারপিট চলে। মেয়েরাও বাদ যান নাই। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ফলে, ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে বৃটিশ সরকার বুঝিতে

অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

পারেন যে দমন নীতির সাহায্যে সুফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাই, তাঁহারা ভারতবাসীর সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার চেষ্টা স্থির করিলেন।

এদিকে সাইমন কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিল। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে, কি ধরনের শাসন-ব্যবস্থা চালু করিলে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে, এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনার নিমিত্ত ১৯৩০ সালে লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক সভা আহ্বান করা হয়। ইহা প্রথম গোল টেবিল বৈঠক নামে খ্যাত। কংগ্রেস তখন অসহযোগ আন্দোলন চালাইতেছে, তাই কংগ্রেস প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিল না। জনমতের চাপে পড়িয়া সরকার গান্ধীজিকে মুক্তি দিলেন এবং গভর্ণর জেনারেল আরউইনের সংগে তাঁহার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (গান্ধী-আরউইন চুক্তি)। গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে, কারাগার হইতে সকল অসহযোগ আন্দোলনকারীদের মুক্তি দেওয়া হইল। কংগ্রেস দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩১ সাল) যোগ দিতে স্বীকার করিল।

গোল টেবিল বৈঠক

কিন্তু ঐ বৈঠকের সাফল্যের পথে অনেক বাধা দেখা দিল। ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে এক সর্বভারতীয় মুসলিম কনফারেন্স আহ্বান করা হয় এবং ইহার আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া জিন্নাহ্ মুসলমানদের তরফ হইতে ১৪ দফা দাবীর তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার অধিকাংশ দাবীই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মুসলমান সমাজের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। গোল টেবিল বৈঠকেও জিন্নাহ্ সর্বভারতীয় নীতির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করিলেন।

জিন্নাহের ১৪ দফা দাবী

বৃটিশরা আলোচনা সভায় হিন্দু-মুসলমানের নীতিগত বিরোধের সুযোগ নিতে চেষ্টা করিল। তখন মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তিতে বৃটিশের নিকট হইতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আদায় করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের

মনোভাব সকলের নিকটই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইল। ১৯৩২ সালে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দিল না।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর দেশে ফিরিয়া মহাত্মা গান্ধী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবার বৃটিশ সরকারের দমন নীতি আরও চরমে পৌঁছিল। সত্যাগ্রহীদের উপর (স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে) লাঠি চালনা, গুলীবর্ষণ ইত্যাদি সব রকম জুলুমই চলিল। ভারতীয়দের ঐক্য নষ্ট করিবার নিমিত্ত, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রবর্তন করিলেন (১৯৩২ সাল)।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

ইহার দ্বারা শুধু মুসলমানদের নহে, অনুন্নত সংখ্যালঘু হিন্দুদেরও (তপশীল সম্প্রদায়—Scheduled class) পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং তাহাদিগকে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। বৃটিশের এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে, বিশেষ করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করানোর জন্য, মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রাণরক্ষার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ফলে, তপশীল সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর আম্বেদকারের সংগে পুনায় এক চুক্তি হইল। ডক্টর আম্বেদকার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ত্যাগ করিলেন। বিনিময়ে তপশীল সম্প্রদায়কে বাঁটোয়ারায় যে পরিমাণ প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেস তাহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দিতে রাজী হইল।

সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং গোল টেবিল বৈঠকদের আলাপ-আলোচনা ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ সালে ভারতে নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্তন করা হইল। ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federation of States) বলিয়া ঘোষিত হইল। বৃটিশের অধীনস্থ প্রদেশগুলি ইহাতে রাজ্য হিসাবে যোগ দিল। স্থির হইল, ইচ্ছা করিলে দেশীয় নরপতিশাসিত রাজ্যগুলিও ইহাতে যোগ দিতে পারে। মুসলমান এবং তপশীল শ্রেণীর হিন্দুদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। আইন সভাগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা সমর্থিত মন্ত্রি-

মণ্ডলী সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন, ইহাও স্থির হইল। পূর্বপ্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিল। কিন্তু ইচ্ছা করিলে গভর্ণর জেনারেল এবং গভর্ণরগণ মন্ত্রীদের সব রকম কাজেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী হইতে পারেন। গভর্ণর জেনারেল এবং গভর্ণরদের হাতে ঐরূপ ক্ষমতা দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র গ্রহণে অস্বীকার করিল। ইহাতে বিচলিত হইয়া তখনকার গভর্ণর জেনারেল লিন্‌লিথ্‌গো, প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি এবং গভর্ণরগণ মন্ত্রীসভার দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতির ফলে কংগ্রেস এখন শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশের আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল এবং ঐসব প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিল।

১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাবের দিন হইতে এত দিন পর্যন্ত কংগ্রেস প্রায় তাঁহার নির্দেশেই পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু এই সময় সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসে এক বামপন্থী দলের অভ্যুত্থান হইল। দীর্ঘদিন হইতে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। যুব সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। ১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বামপন্থী নীতি গান্ধীজি প্রভৃতি প্রবীণ নেতাদের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু, সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে প্রবীণ নেতাদের মনোনীত প্রার্থীকে অসংখ্য ভোটে পরাজিত করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে দক্ষিণপন্থীদের সহিত কাজ করা সম্ভব নয় দেখিয়া সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি সর্বভারতীয় দল গঠন করেন। স্বভাবতই বাংলাদেশে এই দলের প্রভাব বেশী হয়।

ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন

ইতিমধ্যে (১৯৩৯ সালে) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো নিজ দায়িত্বে ভারতকে যুদ্ধে জড়িত করায় ইহার প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। এই সুযোগে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব গঠন করে। কংগ্রেস তখন যুদ্ধে সহযোগিতার সর্ত হিসাবে, ভারতকে

যুদ্ধান্তে স্বাধীনতা দানে বৃটিশ সরকারকে রাজী করাইতে চেষ্টা করে। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে লিন্‌লিথ্‌গো এক ঘোষণায় জানান যে যুদ্ধান্তে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধান সভা আহ্বান করা হইবে। কিন্তু সংগে সংগে তিনি স্পষ্ট ভাবে জানান যে একা কংগ্রেসের হাতে তিনি কিছুতেই শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না। এই ঘোষণায় মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ খুবই উৎসাহিত হন। প্রকারান্তরে ইংরেজ সরকার মুসলীম লীগকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস হয়। উৎসাহিত হইয়া, সাম্প্রদায়িকতার শেষ বিষফল হিসাবে, তিনি তাঁহার 'দুইজাতি মতবাদ' প্রচার করিতে থাকেন। ইহার অর্থ, ভারতের হিন্দু-মুসলমান শুধু ধর্মেই পৃথক নহে, তাহারা জাতিতেও (nationality) পৃথক। কাজেই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিলে, জাতিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ দেওয়ার নীতি স্বীকৃত হইলে, মুসলমানদিগকে 'পাকিস্তান' গঠনের সুযোগ দিতে হইবে। প্রগতিশীল মুসলমানগণ জিন্নাহ্‌র এই মতবাদ সমর্থন না করিলেও, ইংরেজ সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে জিন্নাহ্‌ মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন। ১৯৪০ সালে মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান গঠনের দাবী পাশ হয়।

দুইজাতি মতবাদ : পাকিস্তান দাবী

ইতিমধ্যে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে ভারতের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত আপস-আলোচনা চালাইতে এদেশে আসেন। তিনি যুদ্ধান্তে শাসনসংস্কারের যে নূতন প্রস্তাব করিলেন, তাহাতেও গভর্ণর জেনারেল এবং গভর্ণরদের সর্বাত্মক ক্ষমতা হ্রাসের কোনো কথা না থাকায়, কংগ্রেস উহা গ্রহণযোগ্য মনে করিল না। পাকিস্তান গঠনের দাবী এই প্রস্তাবে স্বীকার না করায় মুসলিম লীগও উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

ষ্ট্যাফোর্ড দৌত্য

দেশে বৃটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব খুব তীব্র হইয়া ওঠে। ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস বৃটিশ সরকারকে ভারত ছাড়িয়া যাইবার জন্য (Quit India) অনুরোধ করিয়া

এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সংগে সংগে তীব্র আন্দোলনও আরম্ভ হইল।

কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হইলেন। এদিকে আন্দোলন কিছুটা হিংসার পথ ধরিল। আন্দোলনকারীরা সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, টেলিগ্রাফের তার, থানা প্রভৃতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অপর দিকে পুলিশের অত্যাচার, সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণ ইত্যাদির ফলে বহু ভারতবাসী প্রাণ হারাইল। নেতারা প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন।

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভার আওতায় এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যাভাবে মৃত লোকের দেহ পথে পথে পড়িয়া থাকে। খাদ্যের প্রয়োজনে পিতামাতা সন্তানকে বিক্রয় করে, স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ

বাংলায় দুর্ভিক্ষ

করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর, ভারতে এত বড়ো দুর্ভিক্ষ আর দেখা যায় নাই। দেশবাসীর ধারণা হইল যে মুসলীম লীগ সরকারের দেশপ্রেমের অভাবের সুযোগ লইয়া বৃটিশ সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই বৎসরই একটি প্রায় অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিল। বৃটিশ সরকারের চোখে ধূলা দিয়া, দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র কলিকাতার বন্দীদশা হইতে পলাইয়া, কাবুল হইয়া জার্মানী চলিয়া যান। তারপর তিনি সিংগাপুরে অসিয়া, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে জাপানী হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া,

নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ (I.N.A.) গঠন করেন। এই ফৌজে, হিন্দু-মুসলমান সকলে সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের উদ্দেশ্য হইল ভারতকে বৃটিশদের হাত হইতে মুক্ত করা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ সরকার নাম দিয়া সিংগাপুরেই স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তারপর নেতাজীর সৈন্যবাহিনী ভারতবর্ষের দিকে স্থলপথে অগ্রসর হইল। আসামে কোহিমা, বিষেণপুর প্রভৃতি স্থান দখল করা হইল। এই সময় জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সে যথোপযুক্ত সাহায্য দিতে পারিল না। ফলে, খাদ্যাভাবে সুভাষচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদ-পসরণ করিতে হইল এবং অবশেষে আত্মসমর্পণও করিতে হইল। সুভাষচন্দ্রের কিন্তু কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। ১৯৪৫ সালের ২৩শে

আগষ্ট এক বিমান দুর্ঘটনায় জাপানে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া নেতাজীর পরিবারের লোকেরা, এই ঘোষণায় আজও বিশ্বাস করেন না। ধৃত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবর্গের কয়েকজনের বিচার দিল্লীতে লাল কেল্লায় আরম্ভ হয়। কংগ্রেস তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করে। বিচারে তাঁহাদের মুক্তি হয়। সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেম এবং বীরত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

। বসু

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইল। তাহার পর যে নির্বাচন হইল তাহাতে বৃটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিকদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি তাঁহারা অধিকতর সহানুভূতিশীল। এদিকে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় সকল প্রদেশেই জয়যুক্ত হইল। বাংলাদেশ ও সিন্ধু ভিন্ন সকল প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। যুদ্ধে বৃটেনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল তাহাতে গায়ের জোরে ঐদেশ যে আর বেশী দিন ভারতবর্ষকে শাসন করিতে পারিবে এমন ভরসা ছিল না। এই সময়ে (১৯৪৮ সাল) বোম্বেতে রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীর ভারতীয় কর্মচারিগণের বিদ্রোহ এই বিশ্বাস বৃটেনের মনে আরও দৃঢ়মূল করে। ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভের আকাংখা দিন দিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদ দীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে এবং জনগণের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ইংরেজ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই অবস্থায় যদি তাহারা আপসে ভারত পরিত্যাগ করিয়া যায় তবেই প্রকৃত রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে লর্ড প্যাথিক লরেন্স, ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং আলেকজাণ্ডার নামে বৃটিশ মন্ত্রিসভার (ক্যাবিনেটের)

তিনজন মন্ত্রী দৌত্য করিবার নিমিত্ত ভারতে আসেন। এই দৌত্যকে 'ক্যাবিনেট মিশন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মুসলিম লীগের সহিত একমত হইতে না পারার দরুন কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের সামনে কোনো ঐক্যবদ্ধ দাবী উপস্থিত করিতে পারিল না। যাহা হউক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ক্যাবিনেট মিশন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন—১। ভারতে সর্বভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। ২।. হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি 'ক' শ্রেণীর, আর মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি 'খ' শ্রেণীর এবং বাংলাদেশ ও আসামকে 'গ' শ্রেণীর অঞ্চলে ভাগ করিয়া তিনটি অঞ্চলের সৃষ্টি করা হইবে। ৩। এই তিন অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সংবিধান সভা গঠিত হইবে। তিনটি অঞ্চল নিজ নিজ এলাকায় শাসনতন্ত্র গঠন করিবে। ৪। যতদিন সংবিধান রচিত না হইতেছে ততদিন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইবে।

ক্যাবিনেট মিশন

কংগ্রেস সংবিধান সভায় যোগ দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে রাজী হইল না। মুসলিম লীগ উভয় প্রস্তাবেই রাজী হইল। কিন্তু কংগ্রেস রাজী না হওয়ায় গভর্ণর জেনারেল ওয়াভেল অন্তর্বর্তী শাসন-ব্যবস্থা গঠনে রাজী হইলেন না। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মুসলিম লীগ সংবিধান সভায় যোগ দিতে অস্বীকার করিল এবং পাকিস্তান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন আরম্ভ করিবার হুমকি দিতে লাগিল। লীগ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্বেষ প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। বাংলাদেশে তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ আন্দোলনের নামে কলিকাতা শহরের বুকে মুসলমানরা ব্যাপক দাংগার সৃষ্টি করিল। অনেক হিন্দু প্রাণ হারাইল। কিন্তু ধীরে ধীরে হিন্দুরা আত্মরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করিল। সংঘবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে তাহারাও পাল্টা আক্রমণ চালাইল। কলিকাতার পথে পথে বহু মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। এই সাম্প্রদায়িক দাংগার অবসান এখানেই হইল না। বাংলাদেশের মুসলমান-প্রধান জেলা ঢাকা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে মুসলমান

সাম্প্রদায়িক দাংগা

গুণ্ডারা হিন্দু নরনারীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইল। হত্যা, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন সবই দিবালোকে চলিল। ইহার প্রতিক্রিয়া ভারতের হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতেও দেখা দিল। বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের প্রতিও অত্যাচার হইল। সমগ্র ভারত সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হইয়া উঠিল। প্রাচীনতম কাল হইতে ভারত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবাসভূমি। কিন্তু ইহার পূর্বে ভারতের মাটি কখনও সাম্প্রদায়িক দাংগায় কলংকিত হয় নাই। বৃটিশের ভেদনীতির বিষফল সাম্প্রদায়িক দাংগা ভারতের সুনামকে চিরতরে কলংকিত করিল।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করিল। লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় মুসলিম লীগও এই সরকারে যোগ দিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে চলিল না। অল্পকাল মধ্যেই দেখা গেল যে মুসলিম লীগের সভ্যগণ এবং লর্ড ওয়াভেল এক পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কংগ্রেসী সভ্যগণের সহিত তাঁহাদের মতের মিল হইতেছে না। ইতিমধ্যে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলি ঘোষণা করিলেন যে বৃটেন ভারতের শাসনভার আর নিজের হাতে রাখিবে না, ভারতের সংবিধান রচিত না হইলেও, ভারতীয়দের হাতে শাসনভার সমর্পণ করিয়া বৃটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিবেন। এই ঘোষণায় মুসলিম লীগের আতংক হইল, শাসনভার বুঝি কংগ্রেসের হাতে চলিয়া যায়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করাই মুসলিম লীগের একমাত্র অবলম্বন। ইহার প্ররোচনায়, পাঞ্জাবে মুসলমানরা হিন্দু এবং শিখদের উপর আক্রমণ চালাইল। প্রায় ৭৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নরনারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। এই অবস্থায়, পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি, মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি হইতে পৃথক হইবার দাবী তুলিল।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। ভারতে আসিয়াই তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ভারতের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি ইচ্ছা করিলে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলে পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি খণ্ডিত করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (যেখানে বিধান সভায়

কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল) এবং শ্রীহট্ট জেলায় (যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা সামান্য বেশী) গণভোট গ্রহণ করিয়া স্থির হইবে, তাহারা মুসলমান রাষ্ট্রে যোগ দিবে কি না।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের এই ঘোষণা, হিন্দু বা মুসলমান কাহাকেও পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। হিন্দুগণ ভারত বিভাগের নীতি স্বীকৃত হওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইলেন, আবার মুসলমানগণ যতটুকু পাইলেন তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তথাপি উভয় পক্ষই বুঝিতে পারিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাই, কিছুটা বাদানুবাদের পর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল। বৃটিশ সরকার স্যার সিরিল র‍্যাড্‌ক্লিফের সভাপতিত্বে পাঞ্জাব এবং বাংলা দেশকে বিভক্ত করার জন্য দুইটি কমিশন গঠন করিলেন। মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণা অনুসারে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে 'ভারত স্বাধীনতা বিল' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ধার্য হইল। সংগে সংগে দিল্লীতে ভারতীয় সংবিধান পরিষদের একটি বিশেষ বৈঠক বসিল। ইহা বৃটিশ ডোমিনিয়ন হিসাবে, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেলরূপে নির্বাচিত হইলেন। অপর দিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেলরূপে নির্বাচিত করা হইল এবং পাকিস্তান সংবিধান-পরিষদ গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসীরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে বলিয়া গণভোট দিল। তারপর বাকি থাকিল, ভারতের সংবিধান পরিষদ। ইহাই স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। দীর্ঘদিনের দাসত্ব শৃংখল হইতে ভারত মুক্ত হইল—স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান হইল। কিন্তু, নূতন ভারত গঠনের সমস্যা আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সময়-পঞ্জী

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন

১৮৫০ খৃঃ	সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭)
১৮৬০	বাংলাদেশে নীল আন্দোলন (১৮৬০)
১৮৭০	
১৮৮০	ইল্‌বার্ট বিল (১৮৮২) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)
১৮৯০	
১৯০০	বংগ ভংগ (১৯০৫) মর্লি-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯)
১৯১০	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ (১৯১৪) রাওলাট এ্যাক্ট ; জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯)
১৯২০	প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২০) সাইমন কমিশন (১৯২৭)
১৯৩০	প্রথম গোল টেবিল বৈঠক (১৯৩০) ভারত শাসন-সংস্কার আইন (১৯৩৫)
১৯৪০	ক্রীপস্‌ মিশন (১৯৪২) ; কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন (১৯৪২) স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম (১৯৪৭)
১৯৫০	

EXERCISES

A. Answer the following questious :—

1. Discuss the causes and the effects of the first Indian Battle for Independence (Sepoy Rebellion).

2. Write an essay on the awakening of National Consciousness in India and the movements for safeguarding national interests and honour from 1857 to 1885 A.D.

3. Write an essay on the Indian national movement for independence from 1886 to 1909 A.D.

4. Write an essay on the Indian movement for independence from 1909 to 1929 A.D.

5. Write an essay on the Indian movement for independence from 1930 to 1947 A.D.

B. 1. Explain the contributions of the following to our struggle for independence. Write not more than 60 words for each.

(a) Surendranath Banerjee, (b) Azad Hind Fauj, (c) Netaji Subhas Chandra, (d) Mahatma Gandhi, (e) Tilak.

2. Explain the significance of the following in our struggle for independence. Write not more than 60 words for each.

(a) Ilbert Bill (b) Vernacular Press Act (c) The Indigo Movement in Bengal (d) The Terrorist Movement (e) Rowlatt Act and Jalianwalabagh (f) The Muslim League (g) The Communal Riots (h) The Round Table conferences (i) The Cabinet Mission (j) The Quit India Resolution (k) The Swadeshi Movement (l) The Satyagraha Movement.

C. Below are given certain events related to our struggle for independence. Write 1, 2, 3, etc. inside the bracket at the right of each to indicate their sequence of happening. If you consider that certain movements happened in the same year, you may give the same number to them.

Events

Cabinet Mission ( ), Writing of Nildarpan ( ), Vernacular Press Act ( ), Publication of Amritabazar Patrika in English ( ), Establishment of Indian Association ( ), Jalianwalabagh ( ), Quit India Movement ( ), Establishment of National Congress ( ), Communal Riots ( ), Swadeshi

Movement ( ), Partition of Bengal ( ), Establishment of Forward Bloc ( ), The beginning of Satyagraha Movement ( ), Nehru Report ( ), Simon Commission ( ), The Communal Award ( ), Establishment of Indian National Conference ( ), Syed Ahmed and his communal organisations ( ), The Terrorist Movement ( ), Tagore, giving up his Knighthood title ( ), Establishment of Swarajya Party ( ).

D. The following are for your scrap-book :—

(a) Collect some statements of (i) Mahatma Gandhi, (ii) Netaji, (iii) Jawaharlal Nehru, (iv) Chittaranjan or any other national leader in our fight for independence.

(b) Collect some statements of Mahatma Gandhi on Satyagraha.

(c) Collect as may pictures as you can of national heroes who participated in the fight for independence.

E. The following projects may be taken :—

1. A local valiant fighter for national independence may be invited to talk to the pupils about his experiences. A brief issue of the wall-newspaper should be brought out on the dsscussion with him.

2. A pictorial time-line may be prepared, illustrating the principal events in the struggle for independence.

3. A wall-newspaper may be brought out on India's fight for independence, containing :—(i) Remembrances of actual fighters, (ii) Pictures and cartoons of Satyagraha movement and Swadeshi movement, (iii) Poems on any aspect of the movement, (iv) Articles on any aspect of the movement.

আমাদের শাসনতন্ত্র

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের দ্বারা ভারতীয়দের হাতে বৃটিশ সরকার শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। এই আইনের ফলেই আমাদের ভারতবর্ষ ভারত ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তান—এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উভয় রাষ্ট্রই তাহাদের নিজ নিজ শাসনতন্ত্র রচনার অধিকারও লাভ করে। সেই অনুযায়ী ভারতীয় গণপরিষদ (Constituent Assembly) এদেশের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ইহাই ভারতীয় সংবিধান নামে খ্যাত। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নূতন সংবিধান অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু বৃটেনের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে আমাদের সংবিধানে গ্রহণ করা হয় নাই। তৎপরিবর্তে কানাডার মতোই শাসন-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যেও পরিণত করা হইয়াছে। এমনিভাবে কানাডা ও আমেরিকার শাসনপদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও এই সংবিধানে ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব (One-citizenship) স্বীকৃত হইয়াছে এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই কতকগুলি মৌলিক অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে ; শুধু তাহাই নহে, বিচারালয়ের সাহায্যে এই সব অধিকার রক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, এই সংবিধানকে মোটামুটিভাবে অনমনীয় (rigid) বলা যাইতে পারে (যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মতো ইহা চূড়ান্তভাবে অনমনীয় নহে)। আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থায় এই সংবিধানের প্রাধান্যই চূড়ান্ত ; সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎসও এই সংবিধান।

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের শাসনতন্ত্রের প্রারম্ভেই, প্রস্তাবনায়

(Preamble) আমাদের রাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবনায়ই ভারতীয় জনগণের জন্য কতকগুলি উচ্চ আদর্শ ও অভীষ্টের কথাও বলা হইয়াছে। যথা, ভারতের সংবিধানের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে জনগণের মধ্যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী আনয়ন করা।

প্রস্তাবনা
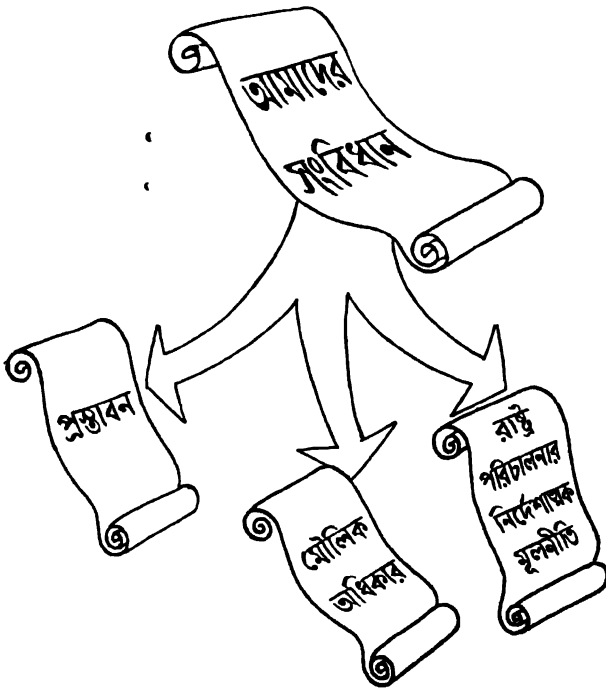
এই উদ্দেশ্যে সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি মৌলিক অধিকারের (Fundamental Rights) ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

মৌলিক অধিকার

(১) সাম্যের অধিকার (Rights of Equality) —জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সাধারণ আমোদ-প্রমোদের

স্থান, হোটেল, রাস্তা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিবে। সরকারী চাকুরীতে সকলেরই সমানাধিকার থাকিবে। অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)—ভারতের সকল নাগরিকই কথা বলার স্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা, দেশের সর্বত্র অবাধ ভ্রমণের ও বসবাস করার স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। তাহারা যে কোনো পেশা, বৃত্তি বা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবে। বে-আইনীভাবে কাহাকেও আটক রাখা চলিবে না। অবশ্য যদি কাহারও কোনো অধিকারের প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতিবিরোধী হয়, বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃংখলা ও জনস্বার্থ ব্যাহত করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র সেই নাগরিককে তাহার ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation)—জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ব্যতীত শ্রম আদায় করা যাইবে না। ১৪ বৎসরের কম বয়স্কদের কারখানা, খনি বা কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা চলিবে না।

(৪) ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Religion)—যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম গ্রহণ বা বর্জন এবং স্বীয় ধর্মমত অনুযায়ী ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। সরকারী বিদ্যালয়ে কোনো বিশেষ ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া চলিবে না।

(৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার (Educational and Cultural Rights)—এদেশে যে কোনো অঞ্চলের নাগরিকগণ স্বীয় বিশেষ ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতির অনুশীলন করিবার অধিকারী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামতো বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৬) সম্পত্তির অধিকারী (Right to Property)—আইনের অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তাহার নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না; এমন কি জনস্বার্থেও কোনো সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ না দিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। তবে ১৯৫১ সালে ও ১৯৫৫ সালে সংবিধানের প্রথম ও চতুর্থ সংশোধনের দ্বারা জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের হাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনার ব্যাপকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

(৭) অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে তাহার প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)—যদি কোনো কারণে কোনো নাগরিকের কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার দাবী জানাইয়া সে সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চতম আদালতে আবেদন জানাইতে পারিবে ; এবং বিচারপতি বিচার করিয়া যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিয়া তাহার অধিকার রক্ষা করিবেন। তবে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যে কোনো নাগরিককে তাহার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। এই অবস্থায় নাগরিক তাহার অধিকার রক্ষার জন্য বিচারালয়ে আবেদন করার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হইতে পারে।

মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়াও সংবিধানে শাসন-সংক্রান্ত কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) বর্ণিত হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের ন্যায় যদিও এইসব মূলনীতির প্রধান লক্ষ্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করা—ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিস্তার সাধন করা—কিন্তু মৌলিক অধিকার লংঘিত হইলে যেমন বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়া যায়, এই মূলনীতিগুলি শাসকবর্গ কর্তৃক উপেক্ষিত হইলে তাহার প্রতিবিধানের কোনো সুযোগ নাগরিকদের দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করা বা না করা একান্তভাবেই শাসকবর্গের ইচ্ছাধীন—

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক মূলনীতি

(১) নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন যাহাতে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সরকার এইরূপ একটি জনকল্যাণকর সমাজ-ব্যবস্থা গঠনে প্রয়াসী হইবেন। এই উদ্দেশ্যে কার্যক্ষম সকল নাগরিকের জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেওয়া, জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা, সমান কাজের জন্য স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমান পারিশ্রমিক দান, শ্রমিকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা, সকল নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক বালকবালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির সার্বিক উন্নতিসাধন, মাতৃমংগল, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষি ও পশুপালনের উন্নতি, গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠন প্রভৃতিও সরকারের অবশ্য কর্তব্য হইবে।

(৩) জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ও বিষয়সমূহ সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত করিতে সরকার প্রয়াস পাইবে।

(৫) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সংগত সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি স্বীকার করা, শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা প্রভৃতি সম্বন্ধে সরকার সচেষ্ট থাকিবে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো

আমাদের সংবিধানে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠন করা হইয়াছে। আদি সংবিধানে এদেশে 'ক', 'খ' ও 'গ'—এই তিন শ্রেণীর রাজ্য ও 'ঘ' শ্রেণীর কতকগুলি অঞ্চল ছিল। এই চার ধরনের রাজ্য বা অঞ্চলের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সংগঠন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে সম্বন্ধে তারতম্য ছিল। তাহার পর ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ করেন (শাসনতন্ত্রের সপ্তম সংশোধন) সেই অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ১৪টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত হয়। অধুনা নাগা পার্বত্য তুয়েনসাং অঞ্চল নামে একটি নূতন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং বোম্বাই রাজ্যকে ভাংগিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামে দুইটি রাজ্যের সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের সংখ্যা ১৬টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা ৭টি দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের কথা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে সমগ্র ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলেও ভাগ করা হইয়াছে—উত্তর, মধ্য, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আরও কতিপয় সদস্য লইয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক পরামর্শ সভা গঠন করা হইয়াছে। রাজ্যগুলির সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশ করাই পরামর্শ সভাগুলির কাজ।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা স্বাভাবিক নিয়মেই সৃষ্ট হয়। এই শাসনক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে

আমরা কোথাও কোথাও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কোথাও কোথাও কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের অনুসরণ করিয়াছি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-

ক্ষমতা বণ্টনের নিমিত্ত দুইটি তালিকা আছে, একটিতে কেন্দ্রীয়-ক্ষমতার উল্লেখ এবং অপরটিতে রাজ্য-ক্ষমতার উল্লেখ আছে। আমাদের সংবিধানে কিন্তু কানাডাকে অনুসরণ করিয়া শাসনক্ষমতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার উল্লেখ যে তালিকায় আছে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা (Federal list), রাজ্য সরকারের ক্ষমতার উল্লেখ যে তালিকায় আছে তাহাকে রাজ্য তালিকা (State list) এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম ক্ষমতার উল্লেখ যে তালিকায় আছে তাহাকে যুগ্ম তালিকা (Concurrent list) বলা হয়। ইহা ছাড়া, যেসব ক্ষমতার উল্লেখ উপরিউক্ত তিনটি তালিকার কোনোটিতেই নাই, তাহাদিগকে সংবিধানে অনুল্লিখিত বা অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary powers) বলা যাইতে পারে। এই অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় দেশরক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্মাণ, কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক, রেলপথ ও বন্দর পরিচালনা, ডাক, তার ও টেলিফোন, মুদ্রাব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, শিল্পনিয়ন্ত্রণ, মাদক দ্রব্যাদির উপর কর স্থাপন, বিচার বিভাগীয় গঠনতন্ত্র স্থিরীকরণ প্রভৃতি ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।
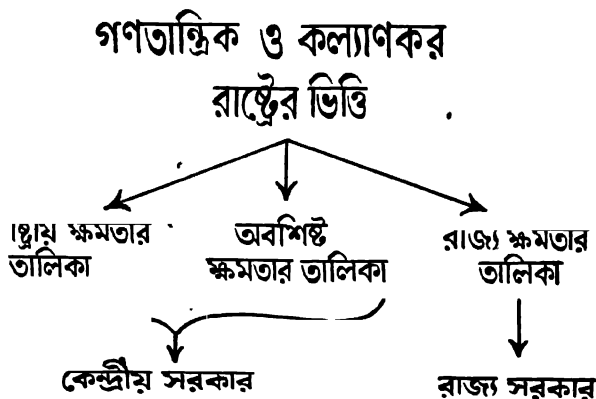
কেন্দ্রীয় রাজ্য ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন

রাজ্য তালিকায় রহিয়াছে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা, বনসম্পদ প্রভৃতি ৬৬টি বিষয়। আর যুগ্ম তালিকায় আছে ফৌজদারী আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর, শ্রমিক কল্যাণ, সংবাদ-পত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ৪৭টি বিষয়।

যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে, কিন্তু উভয় আইনে বিরোধ উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ থাকিবে। এছাড়াও সংবিধানে ব্যবস্থা রহিয়াছে, (১) এক বা একাধিক রাজ্য ইচ্ছা করিলে রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সমর্পণ করিতে পারে ; (২) কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে কোনো রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে তবে রাজ্যতালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে ; (৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে ; এবং (৪) কোনো রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়নের সমস্ত অধিকার নিজের হাতে লইতে পারে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের আইন প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। সংবিধানে বিধান রহিয়াছে যে, রাজ্যগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে তাহা কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতাকে ব্যাহত না করে বা তাহার বিরোধী না হয়। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে শাসন-সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে পারিবে এবং রাজ্য সরকারকে ঐ নির্দেশ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে। দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে নদীর জল বা নদী-উপত্যকা সংক্রান্ত বিরোধ-মীমাংসার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের। এইভাবে, যদিও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের (Distribution of Powers) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারকেই অধিকতর ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য

ক্ষমতা বণ্টনের ন্যায় ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের রাজস্ব বণ্টনের (Distribution of Revenue) ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—(১) আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ; (২) আয়কর ; (৩) আবগারী শুল্ক (চিনি, দেশলাই, কেরোসিন, রবার টায়ার, বনস্পতি ঘি, তামাক ও সুপারির উপর ধার্য কর ; (৪) রেলপথ ; (৫) ডাক ও তার ; (৬) মুদ্রা প্রচলন ; (৭) সম্পত্তি কর ; (৮) সম্পদ কর ও ব্যয় কর ; এবং (৯) সাধারণ দানের উপর কর। রাজ্য সরকারগুলির আয়ের উৎস হইতেছে—(১) ভূমি-রাজস্ব, (২) রাজ্য আবগারী শুল্ক (ঔষধ, মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের উপর ধার্য কর), (৩) ষ্ট্যাম্প, শুল্ক, মামলা-মোকদ্দমা, দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতির জন্য যে ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়, (৪) সেচ কর, (৫) বনজাত কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ, (৬) কৃষি আয় কর, (৭) বিক্রয় কর, (৮) প্রমোদ কর, (৯) বিদ্যুৎ কর প্রভৃতি সম্পত্তি করের কিয়দংশ।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ হিসাবেই সংবিধান অনুযায়ী এদেশে একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের মামলার বিরুদ্ধে আপীল শোনা ছাড়াও ইহার প্রধান কাজ হইতেছে : (১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে সংবিধানোক্ত কোনো অধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার করা, (২) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করা, এবং (৩) নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি অপরিহার্য অংগ লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র। অনমনীয় কথার অর্থ হইতেছে যে, শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন বা সংশোধন করা চলে না। তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের সংবিধানও লিখিত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো চূড়ান্তভাবে অনমনীয় না হইলেও ইহাকে অনমনীয় পর্যায়ভুক্তই করা চলে। সংবিধানের যে একেবারে কোনো সংশোধন করা চলে না এমন নহে। তবে সংবিধানের কোনো সংশোধন

লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র

করিতে হইলে উহা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে এবং সমগ্র সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ভোট গৃহীত হইয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত বিষয়ে সংবিধান সংশোধন আরও কঠিন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিধি, রাজ্য সরকারের ক্ষমতার পরিধি, শাসনতন্ত্রের সংশোধন ব্যবস্থা, সুপ্রীম কোর্ট সংক্রান্ত বিষয়, উচ্চ বিচারালয় সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বা ঐ ক্ষমতার বণ্টন, কেন্দ্রীয় আইনসভায় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সংশোধন প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেক কর্তৃকও গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। তবে, রাজ্যগঠন বা বর্তমান রাজ্য পুনর্গঠন, কোনো রাজ্যে উচ্চ পরিষদ গঠন করা বা বাতিল করা প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ বিষয় রহিয়াছে যেগুলি সম্পর্কে কোনো সংশোধন কেন্দ্রীয় আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই নিষ্পন্ন করিতে পারে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো

তোমরা জান, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলিয়া সংবিধানে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে, এদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো অঞ্চলের নাগরিকই শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিচিত। কেহ তাহার জন্মস্থান হিসাবে বাংলা, বিহার, আসাম ইত্যাদি বিশেষ কোনো রাজ্যের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে না। সংবিধান প্রবর্তনের কালে এদেশস্থ বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীকে নাগরিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে, ১৯৫৫ সালে, কেন্দ্রীয় আইনসভা যে নাগরিকত্ব আইন পাশ করে সেই আইন অনুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়—(১) জন্ম: ভারতে জন্ম হইলে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়। (২) বংশ: ভারতীয় পিতামাতার সন্তান প্রবাসী হইলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে। (৩) অর্জন: কোনো ব্যক্তি পাঁচ বৎসরাধিককাল এদেশে বসবাস করিলে সেও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। (৪) রেজেষ্ট্রী করা: যদি কোনো

ভারতীয় এক-নাগরিকত্ব

ব্যক্তির মাতাপিতা বা পিতামহ-পিতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং এইরূপ ব্যক্তি যদি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইর পূর্বে পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে, অথবা ঐ তারিখের পরে ভারতে আসিয়া কমপক্ষে ছয়মাস এদেশে বসবাস করিয়া নাগরিক অধিকার অর্জন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেজেষ্ট্রীভুক্ত হয় তাহা হইলে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। যেসকল ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পর ভারত ছাড়িয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে তাহারাও যদি ভারতীয় ছাড়পত্র লইয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তাঁহা হইলে উপরিউক্ত উপায়ে ভারতীয় নাগরিক হইতে পারিবে। সর্বশেষে, (৫) রাষ্ট্রভুক্তি: পরবর্তীকালে যেসব বৈদেশিক কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের ভারতভুক্তি হইয়াছে সেখানকার অধিবাসীরাও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিকদের প্রত্যেককেই সংবিধান কর্তৃক ভোটদানের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে জাতিধর্মনির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে প্রত্যেক নাগরিকই ভোট দান করিতে পারেন। ফলে, বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে যেখানে শতকরা মাত্র ১৪জন ভারতবাসীর ভোটদান ক্ষমতা ছিল, সেইক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই এই ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেককে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের জন্য প্রত্যেক ৫ লক্ষ লোকের জন্য একজন করিয়া এবং রাজ্যগুলির নিম্নকক্ষের জন্য প্রত্যেক ৭৫ হাজার লোকের জন্য একজন করিয়া সদস্য প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনসভাই আমাদের দেশের আইনপ্রণয়নের প্রকৃত অধিকারী।

কেন্দ্রীয় আইনসভা

কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্ট রাজ্যসভা ও লোকসভা নামক দুইটি আইন পরিষদ লইয়া গঠিত। রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা অনধিক ২৫০। রাষ্ট্রপতি তন্মধ্যে ১২ জনকে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত করেন। অন্যান্য সদস্যরা প্রত্যেক রাজ্যের নিম্নকক্ষের

সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সামানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সভা স্থায়ী পরিষদ। প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

লোকসভা বা নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যা অনধিক ৫০০। আগেই বলা হইয়াছে, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটদানের ভিত্তিতে এই সভার সদস্যরা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতি পাঁচ লক্ষ লোক একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। এই সভা সাধারণত পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইয়া থাকে, তবে জরুরী অবস্থায় এই স্থিতিকাল এক বৎসর বৃদ্ধি পাইতে পারে। আবার রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে পাঁচ বৎসরের পূর্বেও এই সভা ভাংগিয়া দিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা

ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে, এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, অথবা জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যেও যে পার্লামেণ্ট সভা রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপরও আইন প্রণয়ন করিতে পারে সেই কথা তোমাদের ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতাও পার্লামেণ্ট সভার হস্তেই ন্যস্ত। সাধারণত, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্য যে কোনো প্রস্তাব উভয় পরিষদের যে কোনো একটিতে উত্থাপিত হইতে পারে। উভয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের সম্মতিলাভের পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিলে ঐ প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়। যদি কোনও পরিষদ সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকে, এবং ছয় মাসের পরও যদি মতামত জ্ঞাপন না করে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিবেন, এবং ঐ অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলেই ঐ প্রস্তাব আইনে পরিণত হইবে। তবে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার সদস্যসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং উভয় কক্ষের মতবিরোধ ঘটিলে সাধারণত লোকসভার জয়ই সুনিশ্চিত। রাষ্ট্রপতি যদি প্রস্তাবটিতে সম্মতি না দেন তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার সুপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্ট সভায়

পাঠাইতে হইবে। পার্লামেণ্ট সভা পুনর্বিবেচনা করিয়া উহা যদি রাষ্ট্রপতিকে পুনরায় সম্মতির জন্য প্রেরণ করে, সেই ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার সম্মতি দিতেই হইবে। অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব শুধুমাত্র লোকসভায়ই উত্থাপন করা চলে। লোকসভা কর্তৃক ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে উহা রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়; কিন্তু রাজ্যসভা যদি ১৪ দিনের মধ্যে তাহার মতামত জ্ঞাপন না করে তাহা হইলে রাজ্যসভার মতামত ছাড়াই উহা আইনে পরিণত হইবে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদই আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে সমান ক্ষমতাশালী, প্রকৃতপক্ষে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত লোকসভাই ঐ ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যেও আইনপ্রণয়নের অধিকারী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠিত হয়। মাদ্রাজ, পশ্চিম বংগ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি যে সব রাজ্যে আইনসভায় দুটি কক্ষ রহিয়াছে—উচ্চ পরিষদ বা বিধান পরিষদ এবং নিম্ন পরিষদ বা বিধান সভা—সেখানেও প্রকৃত ক্ষমতা বিধান সভার হস্তেই ন্যস্ত। উচ্চ কক্ষ বা বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যার ¼ অংশের অধিক এবং ৪০এর কম হইতে পারিবে না। ইহাদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্যুন তিন বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্যূন তিন বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা, এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিম্ন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। রাজ্যসভার ন্যায় বিধান পরিষদও স্থায়ী, এবং প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর উহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিধান পরিষদের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটদ্বারা নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর দশ বৎসর পর্যন্ত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৯৫৯ সালের সংবিধানের অষ্টম সংশোধন দ্বারা ঐ সময় আরো

রাজ্য আইনসভা

দশ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকসভার ন্যায় ইহারও কার্যকাল পাঁচ বৎসর, তবে রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধে তৎপূর্বেও ইহাকে ভাংগিয়া দিতে পারেন।

রাজ্য তালিকাভুক্ত বা যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য আইনসভাগুলির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কোনো প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। তবে উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা এক্ষেত্রে সীমিত। উচ্চ পরিষদ যদি তিন মাস পর্যন্ত নিম্ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোনো প্রস্তাবে সম্মতি না দেয় তাহা হইলে নিম্ন পরিষদ পুনরায় ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। উচ্চ পরিষদ যদি এইবারও এক মাসের মধ্যে সম্মতি না দেয়, তাহা হইলে উচ্চ পরিষদের সম্মতি ব্যতীতই উহা আইনে পরিণত হইবে। অর্থসংক্রান্ত বিলেও উচ্চ পরিষদ ইহার মতামত জ্ঞাপন করিতে পারে, তবে তাহা গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা নিম্ন পরিষদের।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো

আমাদের সংবিধানে ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রকে একটি প্রজাতন্ত্র বলা হইয়াছে। এদেশের শাসন-ব্যবস্থায় রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতেছেন শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন উপরাষ্ট্রপতি আছেন। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিন করেন কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ। উপরাষ্ট্রপতি তাঁহার পদমর্যাদা বলে রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করেন মন্ত্রিপরিষদ।

রাষ্ট্রপতি

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ও রাজ্য-সমূহের নিম্ন কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি ভারতের শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়াই সংবিধানে জনগণকর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্র কর্তৃক তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতাগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :—
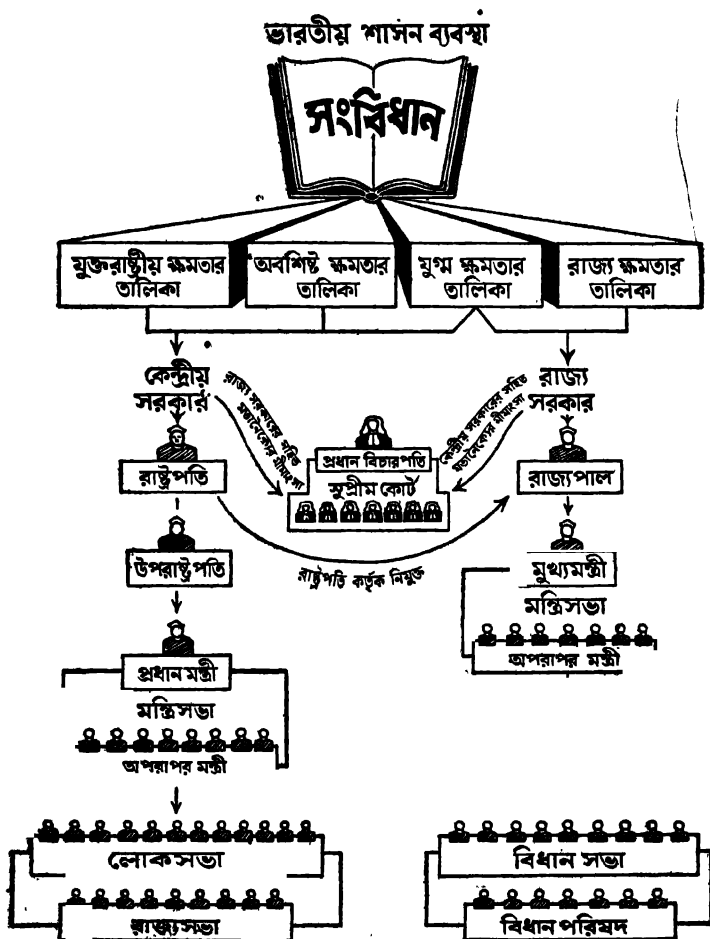
(১) শাসন পরিচালনার ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতির নামেই ভারতবর্ষের সমস্ত শাসন পরিচালিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, সুপ্রীম কোর্টের ও উচ্চ বিচারপতিদের, ভারতের অডিটার জেনারেল (পার্লামেণ্টে বা বিভিন্ন রাজ্যে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ যাহাতে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় হয় এবং বরাদ্দের অধিক যাহাতে ব্যয় না হয় ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই অডিটার

জেনারেলের প্রধান করণীয়), এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা; যুদ্ধঘোষণা বা সন্ধিস্থাপনের ক্ষমতাও একমাত্র তাঁহারই। জরুরী অবস্থায় বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে।

(২) আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা—আগেই বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত কোনো বিলই আইনে পরিণত হইতে পারে না (অবশ্য, তোমরা জান, তিনি একবার বিলটি প্রত্যাখ্যান করিলে পুনর্বিবেচনার পর যদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক উহা দ্বিতীয়বার তাঁহার কাছে প্রেরিত হয়, তবে তাঁহাকে উহাতে সম্মতি দিতেই হয়)। এছাড়াও, তিনি আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, উহা স্থগিত রাখিতে পারেন, এবং লোকসভা ভাংগিয়াও দিতে পারেন। রাজ্যসভার বারো জন সদস্য তিনি মনোনীত করেন। পার্লামেণ্টের অবকাশকালে তিনি জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিতে পারেন; তবে পার্লামেণ্ট সভার পরবর্তী অধিবেশনে ঐ অর্ডিন্যান্স উত্থাপন করিতে হইবে।

(৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতিরেকে অর্থমঞ্জুরীর কোনো দাবী পার্লামেণ্টে উত্থাপন করা যায় না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আদায়ীকৃত আয়কর প্রভৃতি বণ্টন করিয়া দেওয়ার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তেই ন্যস্ত।

(৪) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়সমূহের বিচারপতিদের নিয়োগ করা ছাড়াও তাঁহার হস্তে বিচারসংক্রান্ত আরও কতকগুলি ক্ষমতা রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডলাভের সময় বা দণ্ডভোগকালে মার্জনা করিতে পারেন, বা তাহাকে লঘুতর শাস্তি দিতে পারেন।

(৫) জরুরী ক্ষমতা—তাঁহাকে কতকগুলি জরুরী ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। যথা—(ক) কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ কোনো বিশৃংখলার জন্য দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন, তবে তাঁহার ঐ ঘোষণা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক সমর্থিত না হইলে দুই মাসের বেশী বলবৎ হইতে পারে না। এইরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এক কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ঐ সময় পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। এবং সেই ক্ষেত্রে তাহাদের বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়ারও কোনো সুযোগ থাকে না। (খ) যদি রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারেন যে কোনো রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংকট উপস্থিত হইয়া সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে তিনি শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা দ্বারা ঐ রাজ্যের সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন (সেই ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের আইন-প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত হয়)। ঐরূপ ঘোষণার মেয়াদকাল দুই মাস। কিন্তু পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক সমর্থিত হইলে উহাকে ছয়মাস কার্যকরী রাখা যায়। এইরূপে ছয়মাস ছয়মাস করিয়া তিন বৎসর পর্যন্ত পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমে এইরূপ ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব। (গ) প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হইবে। কিন্তু অপর দুইটির মতো এই ক্ষেত্রেও ঘোষণাটিকে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মতিলাভ করিতে হইবে। অন্যথায় উহা দুই মাসের বেশী বলবৎ থাকিবে না।

কিন্তু এইভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে জনপ্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। তাঁহার সব কাজই তিনি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের যে কোনো কক্ষ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে। সেই প্রস্তাব যদি সেই কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা এবং অন্য কক্ষেরও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যাইতে পারে। এই সব কারণেই আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুত, রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই ক্ষমতাই প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister) সহ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহাকে পরিচালন করিতে হয়। প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক

নির্বাচিত হন, এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের অবশ্যই পার্লামেণ্টের যে কোনো কক্ষের সদস্য হইতে হইবে। যদি নিয়োগকালে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য না হন, তাহা হইলে নিয়োগের ছয় মাস কালের মধ্যেই পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে। শাসনসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা রাখার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং এক একজন মন্ত্রী এক বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার দেওয়া হয় রাষ্ট্রমন্ত্রী নামক আরেক শ্রেণীর মন্ত্রীদের। এছাড়া মন্ত্রীদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের উপমন্ত্রীও নিয়োগ করা হইয়া থাকে।

মন্ত্রিপরিষদ

মন্ত্রিপরিষদও তাহাদের নীতি ও কার্যকলাপের জন্য পার্লামেণ্টের কাছে যৌথভাবে দায়ী। অর্থাৎ, কোনো একজন মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত সমর্থন না করিতে পারেন, মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে তাহার বিরোধিতাও করিতে পারেন, কিন্তু পার্লামেণ্টের নিকট বা জনগণের নিকট মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত পেশ করার সময় তিনি কখনই মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্টের সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদকে একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কাজ করিতে হইবে। যদি আইনসভা কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে, অথবা কোনো মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে ঐ একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকেই পদত্যাগ করিতে হইবে। তবে, সংবিধান কর্তৃক এইরূপ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলেও কার্যত মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্যই দেখা যায়। ইহার মূল কারণ দলীয় শাসন-ব্যবস্থা। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানগণই মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়া থাকেন। সুতরাং আইনসভায় তাহাদের সমর্থকদের সমর্থনলাভে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ সহজেই দলীয় সমর্থনপুষ্ট হইয়া অবাধে তাহাদের কার্যসূচীকে রূপদান করিতে পারেন।

আমাদের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা
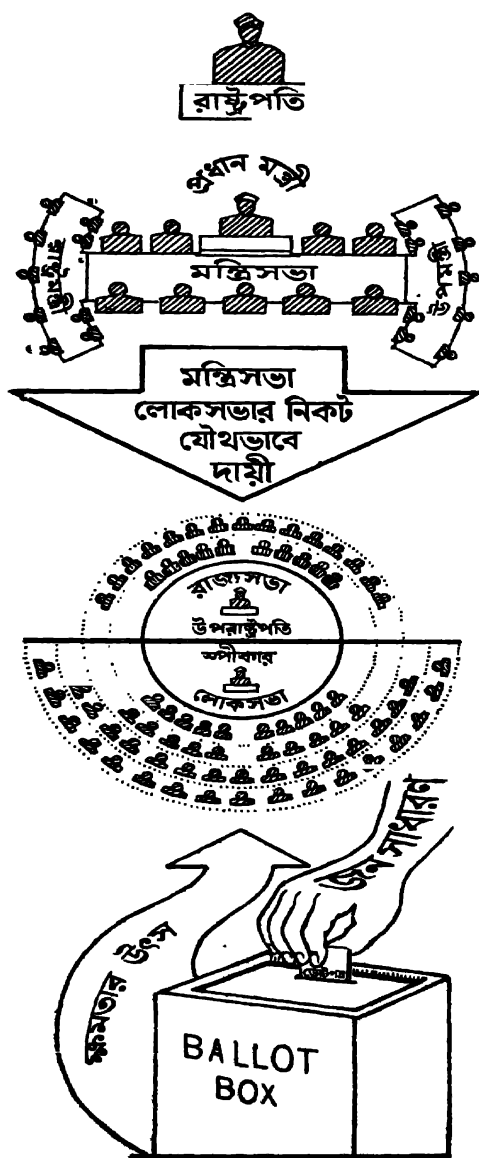
জম্মু ও কাশ্মীর এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ছাড়া অন্যান্য রাজ্যেও সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাসন-ব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যপাল নিয়োগ করিয়া থাকেন। এই রাজ্যপাল নিয়োগপদ্ধতির অবশ্য বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূলনীতি হইতেছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। সেইক্ষেত্রে রাজ্যের সর্বময় শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইলে তাঁহার স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে; তাঁহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। এই সমালোচনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। তবে রাজ্যপালদের হস্তে ন্যস্ত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাগুলি যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী পরি-চালিত হয়, সেইহেতু রাজ্যপালের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের ফলে দায়িত্বশীল রাজ্য সরকারের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা

রাজ্যপাল

প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত। তাঁহার ক্ষমতাগুলিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা মতো মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা—শাসনবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী রাজ্যপাল। তিনি নিজে বা অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা ঐ ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। যে সমস্ত রাজ্যে অনগ্রসর জাতির বা শ্রেণীর অধিবাসীরা আছে, সেই সব রাজ্যে উহাদের কল্যাণ সাধনের বিশেষ ভারও রাজ্যপালের উপরই ন্যস্ত।

(২) আইনবিষয়ক ক্ষমতা—যেসব রাজ্যে আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট, সেখানে রাজ্যপাল উচ্চকক্ষে কতিপয় সদস্য মনোনীত করেন। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনবোধে তিনি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য ঐ সম্প্রদায় হইতে কয়েকজন বিধানসভায় মনোনীত করিতে পারেন। তিনি আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন,

স্থগিত রাখিতে পারেন, প্রয়োজনবোধে নিম্ন কক্ষ ভাংগিয়া দিতে পারেন। তিনি সম্মতি না দিলে কোনো বিলই আইনে পরিণত হইতে পারে না। তবে প্রথমবার সম্মতি প্রত্যাহার করিলেও আইনসভা যদি দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট বিলটি প্রেরণ করে তাহা হইলে তাঁহাকে সম্মতি দিতেই হয়। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে তিনি জরুরী আইনও জারী করিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে পূর্বেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। আইনসভার অধিবেশন শুরু হইলেই অবশ্য ঐ জরুরী আইন সম্বন্ধে আইনসভার অনুমোদন লাভ করিতে হয়।

(৩) রাজস্ববিষয়ক ক্ষমতা—যে কোনো অর্থসংক্রান্ত বিষয় আইনসভায় পেশ করার পূর্বে রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন।

(৪) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—রাজ্যসরকারের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির ন্যায়, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে পারেন, দণ্ড হ্রাস করিতে পারেন, বা একজাতীয় শাস্তিকে অন্যজাতীয় শাস্তিতে পরিবর্তিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সহিত পরামর্শ করিয়া তিনিই রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে রাজ্যপালকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী মনে হইলে কার্যত তিনিও রাষ্ট্রপতির ন্যায় মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুযায়ীই তাঁহার সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন (শুধুমাত্র আসামের রাজ্যপালকে 'উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা' সম্পর্কে দুইটি বিষয়ে সংবিধানে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—যাহা তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াও নিজের বিবেচনামতো প্রয়োগ করিতে পারেন।)।

রাজ্য-মন্ত্রিপরিষদ

রাজ্যপাল আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister) নিযুক্ত করেন এবং পরে তাহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের অবশ্যই রাজ্য আইনসভার সদস্য হইতে হয়। যদি নিয়োগকালে কেহ সদস্য না থাকেন তাহা হইলে তাহাকে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার যে কোনো কক্ষের সদস্য নির্বাচিত হইতে হয়। কেন্দ্রের ন্যায়

রাজ্য-মন্ত্রিপরিষদও যৌথভাবে রাজ্য-আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী থাকেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের শাসন-ব্যবস্থা অন্যান্য রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা হইতে কিছুটা পৃথক। জম্মু ও কাশ্মীরে শাসক-প্রধানকে বলা হয় 'সদর-ই-রিয়াসৎ'। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন না। জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ তাঁহাকে নির্বাচিত করেন। রাষ্ট্রপতির জরুরী ঘোষণা ঐ রাজ্যেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পূর্বেই উক্ত রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন রহিয়াছে। তেমনি, ভারতীয় নাগরিকত্বের আইন-কানুন জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য হইলেও, সেখানকার রাজ্য সরকার প্রয়োজনবোধে ঐসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তনের অধিকারী।

জম্মু ও কাশ্মীর

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সংবিধানে কোনো গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থারই প্রবর্তন করা হয় নাই। ঐ অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসন-কর্তাদের দ্বারা শাসিত হয়। ঐসব অঞ্চলের জন্য আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্টের হস্তেই ন্যস্ত। তবে ১৯৫৬ সালের আইন অনুযায়ী হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং ত্রিপুরায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া স্থানীয় সভা (Territorial Council) গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সভাগুলিতে চারজন পর্যন্ত সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। এই সভাগুলির হস্তে স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল

তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে, কোনো আইন প্রণয়ন করিতে হইলে উভয় কক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। এই অনুমোদন লাভের জন্য বিলটিকে অর্থাৎ আইনের খসড়াটিকে কয়েকটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। প্রথমত, প্রস্তাবককে ঐ বিল আইনসভায় উত্থাপনের অনুমতি এক মাস পূর্বেই স্পীকারের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়। বিলটি উত্থাপনের অনুমতি পাইলে নির্দিষ্ট দিনে বিলটি উত্থাপন করিয়া প্রস্তাবক তিনটি প্রস্তাবের

আমাদের আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি

আইন পাশ হওয়ার পদ্ধতি
(কেন্দ্রীয় সরকার)
আইন
রাষ্ট্রপতি
রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর
রাজ্যসভা
রাজ্যসভার অনুমোদন লাভ
প্রস্তাব
প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি
প্রস্তাবের প্রথম পাঠ ও আলোচনা
লোকসভা
প্রস্তাব
তৃতীয় পাঠ, মৌলিক আলোচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদন
প্রস্তাব
বিশেষ বিবেচনার জন্য
দ্বিতীয় পাঠ ও ভোটদান
লোকসভায় পুনঃপ্রেরণ
সিলেক্ট কমিটি
প্রস্তাব
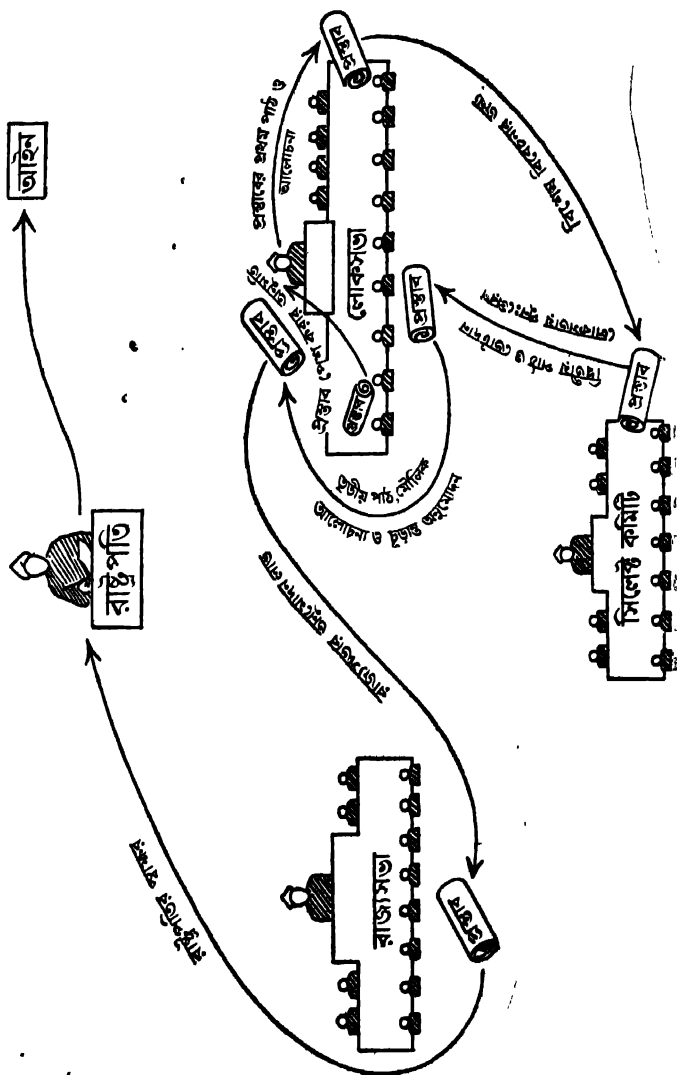
যে কোনো একটি করিতে পারেন :—(১) পরিষদে বিলটির বিচার করা হউক ; (২) বিলটিকে বিচার-বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হউক ; অথবা, (৩) বিলটি সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহের জন্য সরকারী গেজেটে উহা প্রচার করা হউক। অবশ্য কোনো মন্ত্রী কোনো বিল উত্থাপন করিলে তাহার জন্য পূর্বে অনুমতি লইবার প্রয়োজন হয় না। এই পর্যায় বিল উত্থাপন ও প্রথম পাঠ নামে পরিচিত। এই সময় বিলটির নীতিগত আলোচনা হইতে পারে কিন্তু বিশদ আলোচনার কোনো অবকাশ নাই। বিলটি পুরাপুরি পড়াও হয় না। জনমত সংগ্রহের সময় উত্তীর্ণ হইলে প্রস্তাবককে পুনরায় উহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করিতে হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে সিলেক্ট কমিটি বিলটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করে এবং তাহাদের সুপারিশসহ বিলটিকে আইন পরিষদে ফেরত পাঠানো হয়। এই পর্যায়কে বলা হয় কমিটি পর্যায়। ইহার পর প্রস্তাবককে বিলটির দ্বিতীয় পাঠে প্রস্তাব করিতে হয়। তখন বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। এই সময়ই সংসদ সদস্যরা ঐ বিল সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাবও আনিতে পারেন। অতঃপর বিলটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হয়। যদি ভোটে উহা গৃহীত হয় তাহা হইলে প্রস্তাবককে পুনরায় বিলটির তৃতীয় পাঠের জন্য প্রস্তাব করিতে হয়। এই পর্যায়ে মৌখিক সংশোধন ছাড়া অন্য কোনো সংশোধনী প্রস্তাব আনা চলে না। বিলটিকে হয় গ্রহণ করিতে হয় না হয় সামগ্রিক বিলটিকেই বর্জন করিতে হয়। এক পরিষদে যদি ঐ পর্যায়ে বিলটি গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহা অপর পরিষদের মতামতের জন্য প্রেরিত হয়। উভয় পরিষদের অনুমোদন লাভ করিলে উহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া তবেই আইনে পরিণত হয়।

অর্থসংক্রান্ত কোনো বিল কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ভিন্ন আইনসভায় আনয়ন করা যায় না। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিলে সাধারণত অর্থমন্ত্রী বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দের বিবরণী (budget) লোকসভায় পেশ করেন। ঐ ব্যয়বরাদ্দে রাষ্ট্রপতি, লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন প্রভৃতি কতকগুলি নির্দিষ্ট খাতের দাবী সম্পর্কে লোকসভায় আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু সে সম্পর্কে লোকসভার মঞ্জুর করা-না-করার কোনো অধিকার নাই। অন্যান্য খাতের

দাবীগুলি অবশ্য লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। ঐ দাবীগুলি লোকসভার এবং পরে রাজ্যসভার অনুমোদন লাভ করিলে আর একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষকে সঞ্চিত তহবিল হইতে ঐ অর্থ ব্যয় করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকে। করধার্যের জন্যও আলাদা আইন প্রণয়ন করিতে হয়। এইসব আইনের খসড়া রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিলে রাজস্ব বিলের (Finance Bill) আকারে লোকসভায় পেশ করিতে হয়।

শাসনকার্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্যগুলিকে কতকগুলি বিভাগে (Division) ভাগ করা হইয়াছে। বিভাগগুলিকে আবার কতকগুলি জেলায় (District) এবং জেলাগুলিকে কতকগুলি মহকুমায় (Subdivision) বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতি মহকুমায় কয়েকটি থানা (Police Station) এবং প্রতি থানার অধীনে কতকগুলি গ্রাম রহিয়াছে। এইসব বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

বিভাগীয় পর্যায়ে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকেন একজন বিভাগীয় কমিশনার। এতদ্ব্যতীত স্বীয় বিভাগের ভূমিরাজস্ব তদারক ও নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বও তাঁহার। জেলা পর্যায়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন জেলা-শাসক। জেলার শাসন পরিচালনা ছাড়াও তাঁহাকে জেলার ভূমি-রাজস্ব আদায় করিতে হয়, ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে হয় এবং জেলার কৃষি, চিকিৎসা, জল, সেচ, বন, শিক্ষা প্রভৃতি তদারক করিতে হয়। পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর নজর রাখাও তাঁহারই দায়িত্ব। সর্বোপরি জেলার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্বও তাঁহারই, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জেলার সুপারিশ বিভাগের কাজও নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। মহকুমার শাসনকার্য পরিচালনা করেন মহকুমা-শাসক। স্বীয় মহকুমায় তিনি সর্বময় শাসক হইলেও, জেলা-শাসক তাঁহার কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। প্রতি থানায় একজন করিয়া দারোগা বা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী স্থানীয় শৃংখলা বজায় রাখেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে গ্রামস্থ চৌকীদার ও দফাদার সাহায্য করিয়া থাকে।

স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ইংরেজ আমল হইতেই এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। আমাদের সংবিধানেও এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে কর্পোরেশন এবং অন্যান্য শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে প্রতি জেলায় জেলা বোর্ড, প্রত্যেক মহকুমায় লোকাল বোর্ড এবং এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির (কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি) সদস্যেরা শহরের করদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। কর্পোরেশনের সদস্যদের বলা হয় কাউন্সিলার। অন্যান্য পৌরপ্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বলে কমিশনার। ইঁহাদের কার্যকাল সাধারণত চারি বৎসর। কর্পোরেশনের সদস্যরা প্রতি বৎসর বাৎসরিক প্রথম অধিবেশনে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন। কিন্তু অন্যান্য পৌরপ্রতিষ্ঠানের সদস্যরা একবারই চার বৎসরের জন্য একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিয়া থাকেন। পৌর প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা বিভিন্ন কাজের জন্য কয়েকজন করিয়া সদস্য লইয়া এক একটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) গঠন করিতে পারে। এই সব কমিটির কাজ হইতেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কাজ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়া পৌরপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় পেশ করা। সমস্ত সদস্যরা মিলিত হইয়া যদি সংখ্যাধিক্যে ঐ সব প্রস্তাব গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে উহা কার্যকরী করার জন্য মুখ্য কার্যসচিব, এক বা একাধিক উপ-কার্যসচিব, মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার, মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকার প্রভৃতি স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

পৌরপ্রতিষ্ঠান

পৌরপ্রতিষ্ঠানকে বহুবিধ কাজ করিতে হয়। ঐসব কাজকে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) জনস্বাস্থ্য, (২) জননিরাপত্তা, (৩) জন-সুবিধা, ও (৪) জনশিক্ষা। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান শহরের রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে ও পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করে। শহরে জল ও আলো সরবরাহের দায়িত্বও পৌর-প্রতিষ্ঠানের। ইহা বাড়ী-ঘর নির্মাণব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। জনস্বাস্থ্য

রক্ষার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করা, বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা, প্রসূতি-সদন স্থাপন করা, শহরের ময়লা জল ও আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা, সংক্রামক ব্যাধির নিরোধকল্পে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা পৌরপ্রতিষ্ঠানের অবশ্যকরণীয় কাজ। জনশিক্ষাকল্পে প্রাথমিক শিক্ষার অবৈতনিক ব্যবস্থা করা, গ্রন্থাগারাদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করাও পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ। শহরের লোকের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব পৌরপ্রতিষ্ঠানই রাখিয়া থাকে।

উপরিউক্ত বিভিন্ন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে—(১) বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর ধার্য কর, (২) ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর কর, (৩) যানবাহনাদির উপর ধার্য কর, (৪) বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়, (৫) সরকারী অর্থসাহায্য, (৬) সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ প্রভৃতি। ভারতের কোনো কোনো রাজ্যে শহরে আনীত ও শহর হইতে রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির উপরও পৌর-প্রতিষ্ঠান কর (Octroi Duty) ধার্য করিয়া থাকে।

এস্থলে কলিকাতার পৌরশাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা অপ্রাসংগিক হইবে না। ১৯২৩ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হওয়ার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশন একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। স্বাধীনতা পাইবার পর ১৯৫১ সালে এই আইন সংশোধিত হয়। নূতন আইন অনুসারে কর্পোরেশনের কাজ-কর্ম পরিচালনার ভার থাকে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কয়েকটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এবং কমিশনারের উপর। ইহারা কলিকাতার জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (কাউন্সিলার) পরামর্শানুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন। ৮০টি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে ৮০জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। কলিকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান, পদমর্যাদা বলে একজন কাউন্সিলার হিসাবে গণ্য হন। এই ৮১ জন কাউন্সিলার ও ৫ জন অল্ডারম্যান চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। ইহারা (৮৬ জন) এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন।

কাউন্সিলার নির্বাচনে কিন্তু কলিকাতার প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীমাত্রেই

ভোট দিতে পারেন না। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে এবং নিম্নলিখিত গুণগুলির একটি থাকিলে তবে কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোট দেওয়া চলে—(১) কলিকাতা শহরে বাড়ী থাকিলে এবং কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দিলে ২। রাজ্য অঞ্চলে অন্তত ৪ টাকা মাসিক ভাড়া দিলে ৩। অন্য অঞ্চলে মাসিক অন্তত ৮টাকা ভাড়া দিলে ৪। অন্তত প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিলে। অধুনা প্রাপ্তবয়স্কমাত্রেরই ভোটাধিকার থাকিবে এইরূপ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

গণসংযোগ রক্ষা করার জন্য, অধুনা ৫টি করিয়া ওয়ার্ড (এক একটি কাউন্সিলার নির্বাচন কেন্দ্র) লইয়া একটি বরো কমিটি (Borough Committee) গঠন করা হইয়াছে। সব শুদ্ধ ১৬টি ঐ ধরনের কমিটি আছে। কাউন্সিলার ছাড়াও স্থানীয় লোকেরা বরো কমিটির সদস্য হইতে পারেন। এই কমিটি স্থানীয় সমস্যাগুলির দিকে কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে রাজ্যসরকার ৫ বৎসরের জন্য একজন কমিশনার নিয়োগ করেন। রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে কর্পোরেশনের কাজ-কর্ম তদারক করাই তাঁহার কর্তব্য। তিনি রাজ্যসরকার এবং কর্পোরেশনের মধ্যে সেতুস্বরূপ। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলির উপরই কর্পোরেশনের কার্য-পরিচালনার দায়িত্ব বিশেষভাবে ন্যস্ত। বর্তমানে কর্পোরেশনের নয়টি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে—১। নগর পরিকল্পনা ও উন্নতি কমিটি ২। ওয়ার্কস কমিটি ৩। বিল্ডিং কমিটি ৪। জনকল্যাণ ও বাজার কমিটি ৫। জলসরবরাহ কমিটি ৬। হিসাবরক্ষা কমিটি ৭। শিক্ষা কমিটি ৮। ফিনান্স কমিটি ও ৯। জনস্বাস্থ্য কমিটি। সাধারণত ১০ জন করিয়া সদস্য লইয়া এক একটি কমিটি গঠিত হয়।

সংবিধানে গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন : জেলাবোর্ড

অন্ততপক্ষে নয়জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলাবোর্ড গঠিত হয়। যেখানে স্থানীয় বোর্ড আছে সেখানে স্থানীয় বোর্ডের সদস্যরা জেলা সদস্যদের নির্বাচিত করেন; অন্যথায় ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাগণ কর্তৃক তাঁহারা নির্বাচিত হন। জেলার জনস্বাস্থ্য, জনসুবিধা, জন-নিরাপত্তা ও জনশিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব জেলাবোর্ডের হাতে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থ সংগ্রহ

করিতে পারেন—(১) ভূমিরাজস্বের সহিত আদায়ীকৃত টাকার অতিরিক্ত কর (cess), (২) হাট-বাজার, খেয়া বা গবাদিপশু আটক রাখার খোঁয়াড়, হইতে আয়, (৩) রাজ্য সরকার হইতে অর্থসাহায্য, এবং (৪) রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে ঋণগ্রহণ। স্থানীয় বোর্ডগুলির সদস্য-সংখ্যা কমপক্ষে ৬ জন; ইহাদের দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত ও এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত হন। ইহাদের নিজস্ব কোনো কাজ নাই, কোনো আয়ের উৎসও নাই। ইহারা সাধারণত জেলাবোর্ডগুলির নির্দেশমতো কাজ চালাইয়া যায়। পশ্চিম বংগ ও পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যে লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আসামে লোকাল বোর্ডই জেলা বোর্ডের জায়গায় কাজ করিয়া থাকে। প্রত্যেক

লোকাল বোর্ড

গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ইহার সদস্যসংখ্যা ৬এর কম বা ৯এর বেশী হইতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহারা ৬ আনা হারে চৌকীদারী ট্যাক্স বা ৮ আনা সেস্ দেন তাঁহারাই ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কিত নানাবিধ কাজ ইউনিয়ন বোর্ড নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। ছোটোখাটো ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারও অনেক সময় এই বোর্ডগুলি করিয়া থাকে। ইহার আয়ের প্রধান উৎস হইতেছে ইউনিয়ন রেট বা চৌকীদারী ট্যাক্স। এছাড়া, লাইসেন্স ফি, জরিমানা, খোঁয়াড় ও খেয়াঘাট হইতে আয় এবং সরকার ও জেলা বোর্ড হইতে অর্থসাহায্যও ইহার আয়ের উৎস।

ইউনিয়ন বোর্ড

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। উপরিউক্ত জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের জায়গায় উত্তর প্রদেশ, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, মহীশূর, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রায় প্রতি রাজ্যেই পঞ্চায়েত প্রথা চালু করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি গ্রামে থাকিবে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত। যে সকল ক্ষমতা বা কার্য পরিচালনা করা গ্রাম ভিত্তিতে সম্ভব নহে সেগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে প্রতি উন্নয়ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি; গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দ্বারা

পঞ্চায়েত

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া এই পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হইবে। পঞ্চায়েত সমিতি শুধু যে এই কার্যকলাপ পরিচালনা করিবে তাহাই নহে, তাহার বিভিন্ন কার্যাদির জন্য সে গ্রাম পঞ্চায়েতকেও কাজে লাগাইবে। জেলায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব থাকিবে জেলা পরিষদের হাতে। জেলা-ভিত্তিক সর্বপ্রকার জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যাদি জেলা পরিষদ পরিচালনা করিবে এবং নিয়মতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সাহায্য করিবে। পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি এবং জেলার আইন সভা ও পার্লামেণ্ট সভার সদস্যদের লইয়া এই জেলা পরিষদ গঠিত হইবে। অনুন্নত শ্রেণী ও তপশীলভুক্ত জাতি এবং মেয়েদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে আসন সংরক্ষিত আছে। বোম্বাই, মহীশূর ও রাজস্থানে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা দুই; কিন্তু অন্ধ্র, আসাম, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, কেরালা ও মধ্য প্রদেশে ঐ সংখ্যা মাত্র একটি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই পঞ্চায়েতগুলির উপর খুবই উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত উহারাই পরিকল্পনার সংগঠন, উন্নয়ন, কল্যাণসাধন, ভূমিসংস্কার, ভূমির ব্যবস্থাকরণ ও পল্লীর পর্যায়ে ঐসব কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য মৌলিক সংগঠনী হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইবে। এইভাবে আমাদের সংবিধানে যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার রূপায়ণের আয়োজন করা হইয়াছে। তবে, এই প্রসংগে একটা কথা মনে রাখা দরকার। এইসব পঞ্চায়েত কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্বেকার স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান নহে। তাহাদের কাজকর্ম আর পূর্বের ন্যায় শুধুই স্থানীয় পৌরসমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। উহাদের কাজকর্ম ও বিধিব্যবস্থা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং দপ্তর ও জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকগুলির কার্যক্রমের সহিত নিবিড়ভাবে ঘনসংবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাদের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস ভূমি-রাজস্বের একাংশ।

১৯৫৬ সালের একটি আইন দ্বারা পশ্চিম বংগেও পঞ্চায়েত প্রথা চালু করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে প্রতি গ্রামের বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অঞ্চলের ভোটদাতারা নিজেদের মধ্য হইতে ৯ হইতে ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত করিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করিবে। সরকার ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত করিতে পারেন, কিন্তু

তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ইউনিয়ন বোর্ডের অনুরূপ হইবে। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে নির্বাচিত এক জন করিয়া সদস্য লইয়া এক একটি অঞ্চল-পঞ্চায়েত গঠিত হইবে। ইহাদের করধার্যের ক্ষমতা থাকিবে এবং স্বীয় অঞ্চলে ইহারা শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করিবে। প্রত্যেক অঞ্চল-পঞ্চায়েত পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠন করিতে পারিবে।

ভারতে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু একমাত্র কংগ্রেস এবং ভারতীয় সাম্যবাদী দল ব্যতীত আর কোনো দলই সুগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত নহে। ভারতীয় সাম্যবাদী দলও নানাকারণে জনসাধারণের মন জয় করিতে পারিতেছে না। ফলে, ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য চলিতেছে।

ভারতবর্ষ কল্যাণকর রাষ্ট্র

তোমরা জান, আমাদের সংবিধানের প্রারম্ভেই যে প্রস্তাবনা যোগ করা হইয়াছে, তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী আনয়ন করা। এই ঘোষণার ফলে স্বভাবতই আমাদের রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি ব্যাপকতর রূপ লাভ করিয়াছে। অপরাধ নিবারণ করা বা দেশে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করাতেই রাষ্ট্রের কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। তাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) ধারণাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলেই সরকার শ্রমিক, দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখানা ও প্রজাসত্ব সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সুনাগরিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, নাগরিক জীবনের নৈতিক মান উন্নতির প্রয়াসে সমাজে অস্পৃশ্যতা, বাল্য-বিবাহ, মদ্য পান প্রভৃতি যে সকল প্রগতি-বিরোধী কুপ্রথা চালু ছিল, সেগুলি দূর করার জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিয়া নানাবিধ বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কার্যত সর্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ সবচাইতে বেশী অনুভব করা যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ইহার কারণ, মানুষের সর্বাংগীণ মংগলসাধন করিতে হইলে দেশের ধনোৎপাদন ব্যবস্থার যেমন উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন, তেমনি ধনবণ্টন ব্যবস্থারও এমন সুচারু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন যাহাতে দেশবাসী সকলেই তাহাতে উপকৃত হয়। সামগ্রিকভাবে দেশের ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রব্যতীত কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রকেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে ভারত সরকারও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের কাজে ব্রতী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইতেছে, ভারতরাষ্ট্রের সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হইতেছে সামাজিক ক্ষেত্রে সকলের জন্য কল্যাণসাধন। ব্যক্তিগতভাবে কোনো একজন বা একদল লোকের লাভের সুবিধা করিয়া দেওয়া নহে। ভারতরাষ্ট্র শুধুই রাষ্ট্রীয় আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে না, সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ যাহাতে সেই আয়বৃদ্ধিজাত সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে ভোগ করিতে পারে তাহার ক্ষেত্রও উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে, দেশের অর্থসম্পদ, রাষ্ট্রীয় আয় ও অর্থনৈতিক শক্তি এক জায়গায় একজনের হাতে সংহত না হইয়া যাহাতে বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে পারে, তাহাই হইতেছে আমাদের রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের চরম লক্ষ্য।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ

দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে আলোচনা করা যাইতে পারে :—

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ভূমিকা

(১) সরকার ও কৃষি—আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে ধনোৎপাদনের একটি প্রধান উপায় কৃষি। কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। অথচ এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর উপর ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক সামগ্রিক স্বার্থহানির বিশেষ সম্ভাবনা। তাই ভারত সরকার

কৃষির ক্ষেত্রে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার বহু নলকূপ বসাইয়াছেন, বড়ো বড়ো নদী-পরিকল্পনায় জলসেচ-ব্যবস্থাকেও অন্যতম স্থান দিয়াছেন। বহু অর্থব্যয়ে বড়ো বড়ো খাল কাটিয়াছেন, খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত জমিগুলিকে একত্রিত করিয়া চাষের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। কোনো কোনো রাজ্যে আইন পাশ করিয়া সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে সেই উদ্দেশ্যে ঋণদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট সার সরবরাহের জন্য ভারত সরকার সিন্ধ্রিতে সারের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। পশুচিকিৎসালয় স্থাপন, কৃষিগবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, মহাজনী ও জমিদারী প্রথা আইন করিয়া উচ্ছেদসাধন প্রভৃতির মধ্য দিয়া সরকার কৃষির উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে। কৃষিজাত ফসলগুলি যাহাতে ন্যায্যদরে বিক্রীত হয়, সরকার সে জন্য বিক্রয়-ব্যবস্থারও বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছেন।

(২) সরকার ও শিল্প—শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত সরকার সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। আণবিক শক্তি, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেলওয়ে প্রভৃতি সতেরোটি জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন শিল্পকে সরকারের একচেটিয়া অধিকারের অন্তর্গত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়-ভাগে প্রয়োজনীয় ঔষধ, মেসিন টুল, রবার প্রভৃতি বারোটি শিল্পে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বা সরকারের প্রচেষ্টার সহিত একযোগে বেসরকারী প্রচেষ্টাও চলিতে পারিবে। অন্যান্য শিল্পগুলি তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত; উহারা বেসরকারী উদ্যম ও প্রচেষ্টায় বিস্তারলাভ করিবে। এইভাবে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী ও ব্যক্তিগত মালিকানা পদ্ধতির পাশাপাশি প্রচেষ্টার সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বেসরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও সরকারের পক্ষ হইতে নানারকম সাহায্য দান করা হইবে।

(৩) সরকার ও শ্রমিক—শিল্পে শ্রমিকদের শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষা না হইলে বা শ্রমিক-মালিক বিরোধ হইলে অনিবার্যভাবেই শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই ভারত সরকার আইন করিয়া শিল্পে বিরোধ নিবারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে, শ্রমিক ও মালিকদের

প্রতিনিধি এবং সরকারের প্রতিনিধিকে লইয়া গঠিত ট্রাইবুন্যালে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে; শ্রমিকদের কাজের সময়, তাহাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরী, বীমা-ব্যবস্থা প্রভৃতিও আইন করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী ও শিশুশ্রমিকের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও নীতিগতভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

(৪) সরকার ও বৈদেশিক বাণিজ্য—দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে যুদ্ধোপকরণ শিল্প, মূল শিল্প, এবং ইহাদের সহায়ক শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য ভারত সরকার সংরক্ষণ নীতি অর্থাৎ বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র সংকুচিত করার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাছাড়া প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বন্ধের জন্যও আমদানি নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হইয়াছে।

(৫) সরকার ও বেকার-সমস্যা—ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে সরকার বিভিন্ন রাজ্যে একদিকে যেমন সরকারী পরিচালনাধীন বড়ো বড়ো শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে তাহার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারের উপরও জোর দিয়াছেন। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেচ, নদী-উপত্যকা ও সমাজ-উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য দ্রুততর করার ব্যবস্থাও সরকার করিয়াছেন। সর্বোপরি, সরকার দেশে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করিতেছেন, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিও লোক যাহাতে আকৃষ্ট হয় সেই উদ্দেশ্যে ঋণ ও আর্থিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তারপর সরকার জাতীয় কর্ম নিয়োগ সংস্থা (National Employment Service) গঠন করিয়াছেন। কর্মপ্রার্থীরা ইহাতে নাম লিখাইলে, এই সংস্থা যোগ্যতা অনুসারে তাহাদের কর্মসংস্থান করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই সংস্থা কর্মপ্রার্থীদের বৃত্তি বিষয়ক পরামর্শদানেরও ব্যবস্থা করেন।

(৬) সরকার ও আয়বৈষম্য—আয়বৈষম্য দূর করিতে না পারিলে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নহে। তাই ভারত সরকার একদিকে

যেমন দরিদ্রশ্রেণীর আয় বৃদ্ধির উপায়গুলির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে জমিদারী প্রথার বিলোপ, উচ্চহারে আয়কর স্থাপন, দানকর ও উত্তরাধিকার কর প্রবর্তন, ভোগ্যদ্রব্যের উপর কর স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা বড়োলোক শ্রেণীর হাতে অপর্যাপ্ত অর্থ কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথেও বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিয়া দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্যও সরকার চেষ্টা করিতেছেন।

(৭) সরকার ও পরিকল্পনা—জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মাথাপিছু আয় বাড়াইয়া জনসাধারণের জীবনধারণের মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতের এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Discuss the Fundamental Rights granted to citizens in the Indian Constitution indicating also their limitations.

2. Discuss the Directive Principles of State Policy as enunciated in our constitution. Distinguish them from 'Fundamental Rights' of Indian citizens.

3. State what you know of the division of powers and sources of revenues between the centre and the states indicating which of the two has the major control.

4. Discuss whether the Indian Constitution is a flexible or an inflexible one. Discuss at the same time how the Indian Constitution can be modified.

5. Explain what is meant by 'a single nationality for an ndian'. Discuss also how Indian nationality can be acquired.

6. Discuss the composition and the procedure for appointment of the Central or the State Cabinet. Explain what is meant by joint responsibility of the Cabinet.

7. Write an essay on the power of the President indicating how he is only a constitutional head.

8. Write an essay on the power of the Governor indicating how he is only a constitutional head.

9. Write an essay on the composition and functions of the central legislatures.

10. Write an essay on the composition and functions of the state legislatures.

11. Explain how a Law is passed in the Central or in the State legislatures.

12. Write an essay on the Judiciary System in India.

13. Write an essay on Local Self-Government in India.

14. State how India is trying to play the role of a Welfare State.

15. Write what you know of the introduction of the Village Panchayet System in India.

16. Write an essay on the composition and working of the Calcutta Corporation.

17. Discuss the role of political parties in a democratic country.

B. Answer the following questions in not more than 80 words :—

1. State the contents of the Preamble to the Indian Constitution.

2. State how difference of opinion between the Central Government and the State Governments may be resolved.

3. Explain what you mean by the statement that the Indian Constitution has given adult franchise to its people.

4. State under what conditions and by whom an ordinance may be passed.

5. Describe the composition of the Upper House in the Central Legislature.

6. Explain what you understand by the phrase 'joint responsibility of the Cabinet' in the Indian Constitution.

7. Write what you know of the composition and the function of Union Boards.

8. State the special features of the Indian Constitution.

C. 1. Below are given certain statements. Underline those which go to prove the democratic nature of our constitution. Cross out the others :—

The Statements

(1) The President is all-powerful. (2) Elections are held in India on the basis of adult franchise. (3) The President acts on the advice of the Prime Minister. (4) Ministers are jointly responsible to the legislature. (5) The Indian Constitution gives greater power to the Centre. (6) There are two houses in the Central legislature.

2. Below are given certain phrases about the distribution of powers and revenues between the Centre and the States. Write 1, 2 and 3 respectively under them to indicate whether they belong to the centre or to the state or to the centre and the state together :—

The Phrases

(1) Import and Export Duties (2) Wealth Tax (3) Sales Tax (4) Land revenues (5) Defence of the country (6) Local Self-Government (7) Public Health (8) Labour Welfare (9) Criminal Laws (10) Income Tax (11) Price Control (12) Regulation of Industries (13) Foreign Trade (14) Agricultural Tax (15) Receipt from the Sale of Stamp.

D. The following suggestions are for your scrap-book:—

1. Collect the pictures of the State and the Central Ministers and write down under each their portfolios.

2. Make, side by side, a list of Federal State and Concurrent powers.

3. Collect newspaper cuttings if they relate to the President, issuing an ordinance or exercising any of his special powers.

E. The following projects may be undertaken :—

1. Organise a mock election of the President of the Indian Union by dividing the class into Central and State Legislatures.

2. Organise the mock passing of a Bill either in a State or in the Central Legislature.

3. Organise an exhibition, under the caption 'Know Thy Constitution'. The important aspects of the Constitution, such as the power of the President and the Governor, Passing of Bills, Judiciary in India, Relation between the Central and the State Government may be illustrated through picture diagrams.

আজিকার ভারত

আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠন প্রয়াস,

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য, আমাদের বৈদেশিক নীতি

আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠন প্রয়াস

১৯৪৭ সালের পূর্বে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান সমস্যা ছিল পরাধীনতা। পরাধীনতা হেতুই সেই যুগে আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতি যেমন ব্যাহত হইত, তেমনি ব্যক্তিমানসের পূর্ণ বিকাশও সম্ভব হইত না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সমস্যা দূর হইয়াছে। কিন্তু তাহার জায়গায় অন্য যেসব সমস্যা গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা (over-population), দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, অজ্ঞতা, ব্যাধি, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি প্রধান। এই সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের উপরই আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা

১৯২১ সাল হইতেই ভারতের জনসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হাজারে হাজারে শরণার্থী আগমনের ফলেও সাম্প্রতিককালে এই সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। নিচে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গত ত্রিশ বছরের আদমসুমারীর হিসাব দেওয়া গেল—

বৎসর	জনসংখ্যা (কোটি হিসাবে)	বৃদ্ধি (কোটি হিসাবে)	শতকরা বৃদ্ধি হার
১৯৩১	২৭.৫৫	২.৭৪	১১%
১৯৪১	৩১.৪৭	৩.৯২	১৪%
১৯৫১	৩৫.৬৮	৪.২১	২২%
১৯৬১	৪৩.৮০	৮.১২	২২%

উপরের হিসাব হইতে দেখিতে পাইবে ১৯৩১ সালে যেখানে আমাদের জনসংখ্যা ছিল ২৭.৫৫ কোটি, সেই ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালে আমাদের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৩.৮০ কোটি। ১৯৩১-১৯৪১ এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা শতকরা ১৪ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর, ১৯৫১-১৯৬১ এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২২ জন হারে; অর্থাৎ শতকরা বৃদ্ধির হার হইয়াছে দেড়গুণেরও বেশী। অথচ, এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের উৎপাদন একই হারে বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে, দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব প্রায়শই দেখা যায়। একই কারণে এদেশের জনস্বাস্থ্যও যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে পৌছাইতে সক্ষম হয়

নাই ; মৃত্যুহারও এদেশে যথেষ্ট বেশী। নিচে আমাদের দেশের প্রতি হাজারে মৃত্যুহারের খতিয়ান দেওয়া গেল—

বৎসর	মৃত্যুহার
১৯৪১	২১'৯
১৯৫১	১৪'৪
১৯৬১	১২'০

সত্য বটে, আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আমরা এদেশের মৃত্যুহার কমাইতে সমর্থ হইয়াছি, কিন্তু এখনও এই হার যথেষ্ট বেশী। আমাদের গড় আয়ুষ্কালও, যদিও আগেকার তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবুও যথেষ্ট কম।

১৯৩১ সালের সরকারী হিসাবে জানা যায় সেই সময় গড়ে একজন পুরুষ ২৬'৯১ বছর এবং একজন নারী ২৬'৫৬ বছর বাঁচিতেন। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে একজন পুরুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইয়াও মাত্র ৩২'৪৫ বছর, এবং একজন নারীর মাত্র ৩১'৬৬ বছর।

প্রশ্ন দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের লোকসংখ্যা পর্যাপ্তাতিরিক্ত (over-populated) হইয়া দাঁড়াইয়াছে? বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের মতে, খাদ্য সরবরাহের প্রাচুর্য থাকিলে কোনো দেশে লোকসংখ্যা ভয়াবহরূপে অতিরিক্ত হয় না, কিন্তু খাদ্যের ঘাটতি থাকিলেই বুঝিতে হইবে সেই দেশে লোকসংখ্যা পর্যাপ্তাতিরিক্ত রহিয়াছে।

পর্যাপ্তাতিরিক্ত লোকসংখ্যা

ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা যেখানে গুণোত্তর প্রগতিতে (Geometrical Progression) বাড়ে, খাদ্যোৎপাদন সেখানে সমান্তর প্রগতিতে (Arithmetical Progression) বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যেখানে ১, ২, ৪, ৮, ১৬...ইত্যাদি, সেখানে খাদ্যশস্য বৃদ্ধি হার হইতেছে ১, ২, ৪, ৬, ৮, ১০...ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহার মতে, একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় পৌঁছিবার পরে, খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতে বাধ্য। ফলে, দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, কিছু সংখ্যক লোক মারা যায় এবং পুনরায় জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসে। জনসংখ্যা কমাইবার এই যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ম্যালথাস ইহার নাম দিয়াছেন নিশ্চিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Positive

Checks)। ম্যালথুসিয়ান মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য মনে হয়, ভারতে লোকসংখ্যা পর্যাপ্তাতিরিক্ত রহিয়াছে। এদেশের লোকের গড়পড়তা জীবনীকাল অস্বাভাবিকভাবে কম। নিদারুণ দারিদ্র্য, প্রকট খাদ্যাভাব, স্থায়ী দুর্ভিক্ষ, মানুষের পক্ষে অনুপযোগী জীবনযাত্রার মান—এই সবই ম্যালথাসের মতের অনুসরণকারীদের মতে এদেশের পর্যাপ্তাতিরিক্ত জনসংখ্যার নির্দেশক। কিন্তু আধুনিককালের অর্থনীতিবিদ্‌গণ জনাধিক্য সম্পর্কে ম্যালথাসের এই মত সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জনসংখ্যাকে কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা সমীচীন নহে। জাতীয় আয় অর্থাৎ দেশের মোট সম্পদের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বিচার বাঞ্ছনীয়। জাতীয় আয় যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলেও আশংকার কোনো কারণ নাই। তাঁহারা মনে করেন, কোনো দেশে মাথাপিছু আয় যখন সর্বাধিক হয়, তখনকার জনসংখ্যাই কাম্য জনসংখ্যা (optimum population); সেই সময়েরই জনসংখ্যার দ্বারা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহা হইলে অবশ্য এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইবে যখন জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইতে কম হইবে। সেই অবস্থাকেই বলা চলে পর্যাপ্তাতিরিক্ত জনসংখ্যা (over-population)। এই মতবাদের ভিত্তিতে অবশ্য আমাদের দেশের জনসংখ্যা পর্যাপ্তাতিরিক্ত নহে। সুতরাং কেহ কেহ মনে করেন, ভারতে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইলে, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস ও ব্যাপক শিল্পায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্ভবপর। এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার না করিলেও, একথাও সত্য যে যদি বর্তমানের হারে জনসংখ্যা বাড়িতেই থাকে তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে জনসংখ্যা পর্যাপ্তাতিরিক্ত হইবেই।

খাদ্যসমস্যা

আমাদের দেশের জনসংখ্যার এই আধিক্য হেতুই আমাদের যে একটি অন্যতম সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা হইতেছে খাদ্যসমস্যা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই খাদ্যসমস্যা ভীষণ আকারে দেখা দেয়; আজিও ইহার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নাই। সত্য বটে, আমাদের দেশে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য

আমরা প্রভূত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছি। তবুও কৃষিপদ্ধতি সন্তোষজনক না হওয়ার ফলে এখনও আমাদের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য দেশ হইতে অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেখানে কানাডার প্রতি একর জমিতে ১২ মণ বা ব্রাজিলে ১৫ মণ গম উৎপন্ন হয়, সেখানে আমাদের দেশে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ মাত্র ৮ মণ। জাপানের তুলনায় ভারতে এক একর জমিতে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ চাউল উৎপন্ন হয়। যেখানে জাভাতে এক একর জমিতে উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ ৫০ টন, সেখানে আমাদের দেশে সমপরিমাণ জমিতে মাত্র ১৫ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ফলে, আমাদের খাদ্য সংকট দূর করা সরকারের পক্ষে এখনও সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। শুধু তাহাই নহে; মুনাফালোভীদের খাদ্যশস্য মজুত করিয়া রাখিবার চেষ্টার ফলেও খাদ্যশস্যের মূল্য না কমিয়া চরম বৃদ্ধিই পাইয়াছে। আমাদের দেশের এক বিরাট অঞ্চলে শুধুই চাউলজাত খাদ্য খাওয়ার ব্যবস্থাও আমাদের খাদ্যসংকটকে তীব্রতর করিয়াছে। আমাদের এখনও প্রতি বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে।

শুধু খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণই নহে, খাদ্যের গুণাগুণের দিক দিয়া বিচার করিলেও এদেশের খাদ্যসমস্যার স্বরূপ বোঝা যাইবে। খাদ্যের পুষ্টিকরতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে, এদেশে শতকরা মাত্র ত্রিশ ভাগ লোক উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া থাকে, ৪১ ভাগ লোক ঐজাতীয় খাদ্য খুব কমই পায় এবং বাকী ২৯ ভাগ যাহা খাইয়া থাকে তাহা মোটেই পুষ্টিকর নহে। এই শতকরা ২৯ জনের খাদ্যে প্রয়োজনীয় তাপসঞ্চারক (Caloric) উপাদান প্রায় থাকেই না; উহাতে জীবনীশক্তিসংরক্ষক উপাদানও থাকে খুবই কম।

খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন, দৈনিক প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ১৩.৬৭ আউন্স খাদ্যের প্রয়োজনের ভিত্তিতে হিসাব করিলেও প্রথম পরিকল্পনা শেষে আরও ৭০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন। এবং যদি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ১৪, ১৫ এবং ১৬ আউন্সে পরিণত করিতে হয় তবে দেশে যথাক্রমে ৮২, ১২০ এবং ১৫৮ লক্ষ টন খাদ্যের অধিকতর উৎপাদন প্রয়োজন। এই হিসাব হইতেই স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের দেশে খাদ্যসমস্যার স্বরূপ বোঝা সম্ভবপর হইবে।

আমাদের দেশের দারিদ্র্য প্রায় প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। এদেশের জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী হইলেও এদেশের জাতীয় আয় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। প্রসংগত বলা প্রয়োজন, একটি দেশের লোক বৎসরব্যাপী পরিশ্রম করিয়া কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি জীবিকাধর্মী লোকেরা যে পরিমাণ সেবামূলক কার্য সৃষ্টি করে—সেই দুইয়ের সমষ্টিকে অর্থনীতিতে বলা হয় সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাণ (Gross National Product)। এই জাতীয় উৎপাদন পরিমাণের অর্থমূল্যকেই বলা হইয়া থাকে জাতীয় আয়। আমাদের দেশের আয়ের উপরিউক্ত উৎসগুলির মধ্যে কৃষিই প্রধান। এদেশের শতকরা ৭০ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিজাত আয়ের উপর নির্ভর করে। অথচ, আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের কৃষিব্যবস্থা সন্তোষজনক তো দূরের কথা, অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষাই অনগ্রসর। ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও কম। শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিদেশী প্রভুদের স্বার্থেই এদেশকে অনগ্রসর করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্বাধীনতা-লাভের পর যদিও বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় সরকার কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন, তবুও আমাদের জাতীয় আয় খুবই কম। ফলে, এদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয়ও নগণ্য এবং অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্যপীড়িত। নিচে আমাদের মাথাপিছু আয়ের একটি মোটা-মুটি বিবরণ দেওয়া গেল—

দারিদ্র্য-সমস্যা

আয়-পরিমাপের বৎসর	জনপ্রতি বাৎসরিক আয়
১৯৩১—৩২	৬৫ টাকা
১৯৪৭—৪৮	২৭২ টাকা
১৯৫২	২৬৫ টাকা
১৯৫৫—৫৬	২৮০ টাকা

উপরের হিসাব হইতেই সহজেই বুঝিতে পারিবে আমাদের দেশের জন-সাধারণের মাথাপিছু আয় কত কম, তাহারা কত দরিদ্র। ইংল্যাণ্ডের লোকের

মাথাপিছু মাসিক আয়ই হইতেছে ৩৬৩ টাকা, আমেরিকানদের মাসিক ৭৮৪ টাকা, এমন কি জাপানীদেরও মাসিক প্রায় ৮২ টাকা। সেক্ষেত্রে ভারতবাসীর মাসিক আয় হইল ২৮০ ÷ ১২, অর্থাৎ প্রায় ২৩ টাকা ৩৩ নয়া পয়সা মাত্র। এই নগণ্য অর্থও আবার সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয় না। একটি হিসাব হইতে জানা যায়, আমাদের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে শতকরা পাঁচজন লোক, অপর তৃতীয়াংশ পঁয়ত্রিশজন লোক, এবং অপর তৃতীয়াংশ বন্টিত হয় শতকরা ষাটজন লোকের মধ্যে। শুধু তাহাই নহে। উপরের হিসাব অনুযায়ী যদিও দেখা যায়, ১৯৩১-৩২ সালের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ৬৫ টাকার জায়গায় বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৮০ টাকায় পরিণত হইয়াছে (প্রায় চারগুণের বেশী), প্রকৃত আয় কিন্তু সেই পরিমাণে বাড়ে নাই। কারণ, আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য অনেক বেশী বাড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৩১-৩২ সালে চাউলের দাম যেখানে ছিল মণপ্রতি ৪ টাকা, সেইক্ষেত্রে ১৯৫৫-৫৬ সালে তাহা সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে মণ প্রতি ২৮ টাকা। ফলে, লোকের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

আমাদের জাতীয় আয়ের এত নিম্নমানের একটি প্রধান কারণ এদেশে বেকার-সংখ্যার আধিক্য। আমাদের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে সেই হারে নূতন কাজ সৃষ্টি করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ আগেই বলা হইয়াছে। আমাদের জাতীয় সরকারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এদেশের শিল্পপ্রসার এতখানি হয় নাই যে এইসব বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। অন্যদিকে শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে। আমাদের কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে বেকার-সমস্যা রহিয়াছে; কারণ, যতলোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক কম লোকেই এই কাজ চলিতে পারে। তাছাড়া, উচ্চ শিক্ষার মোহও আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে। উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা সাধারণত শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ পারতপক্ষে করিতে অনিচ্ছুক। ফলে, বর্তমান ভারতে বেকার-সমস্যা উৎকটরূপে দেখা

বেকার-সমস্যা

দিয়াছে। নিচে আমাদের দেশের বিভিন্ন কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের বাৎসরিক নাম রেজেষ্ট্রীভুক্তির সংখ্যা ও বাৎসরিক কর্মনিয়োগের সংখ্যা দেওয়া গেল—

ৎসর	কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের সংখ্যা	নাম রেজেষ্ট্রীভুক্তির সংখ্যা	কতজনের কর্মসংস্থান হইয়াছে
১৯৫৫	১৩৬	১৫,৮৪,০২৪	১,৬৯,৭৩৫
১৯৫৬	১৪৩	১৫,৮৪,০২৪	১,৮৯,৮৫৫
১৯৫৭	১৮১	১৭,৭৪,৬৬৮	১,৯২,৮৩১
১৯৫৮	২১২	২২,০৩,৮৮৩	২,৩৩,৩২০
১৯৫৯	২৪৪	২৪,৭১,৫৯৬	২,৭১,১৩১

উপরিউক্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, যদিও আমাদের সরকারী কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, নাম রেজেষ্ট্রীভুক্তির সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, কর্মপ্রাপ্তির সংখ্যা সেই অনুপাতে মোটেই আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, ঐ দুই বৎসর যতজন বেকার নিজেদের নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রতি বছর মাত্র শতকরা দশজনের কর্মসংস্থান করা সম্ভবপর হইয়াছিল। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাবমতে ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—

(লক্ষ হিসাবে)

	শহর অঞ্চলে	পল্লী অঞ্চলে	মোট
শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা	৩৮	৬২	১০০
বেকার লোকদের পূর্ব-হিসাবের পরিমাণ	২৫	২৮	৫৩
মোট	৬৩	৯০	১৫৩

এই হিসাব হইতে দেখা যায়, পল্লী ও শহর অঞ্চলে এই পরিকল্পনাধীন সময়ে প্রায় দেড় কোটি লোকের পুরা সময়ের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহার মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ জন হইতেছে শিক্ষিত বেকার—বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। আগামী পাঁচ বৎসরে এই সংখ্যার সহিত আরও সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ যোগ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আমাদের স্বাধীনতা-উত্তরকালে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার মধ্যে আরেকটি অন্যতম প্রধান হইতেছে শিক্ষা-সমস্যা। ইংরেজ আমলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই ছিল এদেশে ইংরেজের অনুগত একটি শিক্ষিত শ্রেণী তৈরী করা, যাহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও আচারে-আচরণে-রুচিতে হইবে ইংরেজী মনোভাবসম্পন্ন। তাহারা এদেশের মানুষের সহিত ইংরেজপ্রভুর যোগাযোগ রক্ষা করিবে, দেশ শাসনে ইংরেজপ্রভুদের সাহায্য করিবে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার মাধ্যম ছিল বিদেশী ইংরেজী ভাষা। ইহার অনিবার্য পরিণতি হইতেছে এদেশের এক বিরাট সংখ্যক লোকই শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইত। শুধু তাহাই নহে, ইংরেজী-জানা স্বল্প ভাগ্যবান ব্যক্তির সহিত ইংরেজী-না-জানা এদেশের বিরাট জনসংখ্যার এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হইয়াছিল। মূলত, শাসনকার্য চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, দেশের শিল্পোন্নয়ন বা কৃষি-উন্নয়নের জন্য বিশেষ শিক্ষিত লোকের একান্তই অভাব ছিল। আবার, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর সংখ্যার চাইতে বেশীসংখ্যক ভারতীয় যখন ঐ শিক্ষাগ্রহণ শুরু করিল তখনও শিক্ষাসমাপনান্তে তাহারা কি করিবে সেই সম্বন্ধে তৎকালীন সরকার কোনো দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ফলে, দেশে যে ব্যাপক পরিমাণে শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি শুরু হয়, আজও আমাদের পক্ষে তাহাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। এমন কি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাও পর্যাপ্ত ছিল না। আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল নিতান্তই স্বল্প। প্রায় ৩৫ কোটি ভারতবাসীর জন্য ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশে ছিল মাত্র ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩০ স্নাতক মহাবিদ্যালয়, ৮৮টি মধ্যবর্তী মহাবিদ্যালয় (Inter College), ৩৬৩৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩৭৮৯ মধ্য বিদ্যালয় এবং ১,৩৪,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই সর্বস্তরের শিক্ষাসংস্থাগুলির জন্য খরচের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। এর পাশা-পাশি আমাদের ইংরেজ প্রভুদের নিজ দেশে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাখাতে বার্ষিক

শিক্ষা-সমস্যা

খরচ ছিল প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা (মনে রাখা প্রয়োজন, ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৮ কোটিরও কম অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশেরও কম)। মাথাপিছু হিসাবে ঐদেশে প্রতি ছাত্রের জন্য খরচ হইত যেখানে ৮০ টাকা, আমাদের ছাত্রদের জন্য সেখানে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ ছিল মাত্র ২'২৫ টাকা (সেইক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫০ টাকা)। ইহার ফলে নিতান্ত স্বাভাবিক-ভাবেই এই দেশের এক বিপুল জনসংখ্যা নিরক্ষরই রহিয়া গিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকালীন হিসাবে দেখা যায়, সেই সময় এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৪ জন মাত্র ছিল শিক্ষিত, অন্যরা নিরক্ষর। ঐ শতকরা ১৪ জনের মধ্যে আবার মেয়েদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৩ জন। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায় এই শতকরা সংখ্যা যদিও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবু তাহাও নগণ্য। এই হিসাবমতে, আমাদের দেশের মাত্র শতকরা ২৩'৭ জন শিক্ষিত, অর্থাৎ সহজ চিঠিপত্র পড়িতে বা লিখিতে পারে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ১২'৮ জন, আর শিক্ষিত পুরুষদের সংখ্যা শতকরা ৩৩'৯ জন।

জনস্বাস্থ্য-সমস্যা

আমাদের জনস্বাস্থ্যের সমস্যাও স্বাধীন ভারতের এক বিরাট সমস্যা। আমাদের গড় আয়ুষ্কালের স্বল্পতা বা আমাদের মৃত্যুহারের কথা তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকালে আমাদের শিশুমৃত্যুর হারও ছিল অত্যধিক। অবশ্য সাম্প্রতিক-কালে আমাদের জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় এই শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিচে বিগত তের বৎসরের শিশুমৃত্যু-হারের খতিয়ান দেওয়া গেল—

বৎসর	হাজার প্রতি শিশুমৃত্যু সংখ্যা	বৎসর	হাজার প্রতি শিশুমৃত্যু সংখ্যা
১৯৪৭	১৪৬	১৯৫৪	১০৯
১৯৪৮	১৩০	১৯৫৫	১০২
১৯৪৯	১২৩	১৯৫৬	৯৮
১৯৫০	১২৭	১৯৫৭	১০১'৬
১৯৫১	১২৩	১৯৫৮	১০৩'২
১৯৫২	১১৬	১৯৫৯	৮৯'১
১৯৫৩	১১৮		

আমাদের এই স্বল্প আয়ুষ্কাল বা মৃত্যুহারের আধিক্যের কারণ আমাদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা, দারিদ্র্যহেতু স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার উপকরণাদির অভাব, পুষ্টিকর সমতাপূর্ণ খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি। ইংরেজ আমলে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে আমাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নামিয়া যায়। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই পুষ্টিকর সমতাপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কয়েকটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় খোলা হইলেও (১৯৫১ সালে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০) তাহা হইতে যে-সংখ্যক চিকিৎসক প্রতি বৎসর ডিগ্রীপ্রাপ্ত হইতেন আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তাহার সংখ্যা ছিল নগণ্য। আবার এই নগণ্য সংখ্যক চিকিৎসকদের মধ্যেও বেশীর ভাগই শহরাঞ্চল ছাড়িয়া গ্রামে যাইতে চাহিতেন না। ফলে, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল অস্বাভাবিকরূপে খারাপ। অন্যদিকে সরকারী আনুকূল্যের অভাবে এবং বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের অবজ্ঞার ফলে এদেশের প্রাচীন আয়ুর্বেদিক প্রভৃতি যেসব চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাও প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। গ্রামাঞ্চল তো দূরের কথা, শহর অঞ্চলেও উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি ছিল না। যাহাও ছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টীকা প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল। শহরাঞ্চলে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা যদিও বা ছিল, গ্রামাঞ্চলে উহার একান্ত অভাব প্রায়শই মহামারী ডাকিয়া আনিত। স্বাধীনতালাভের পর তাই আমাদের এই উৎকট সমস্যারও সম্মুখীন হইতে হয়। গত পনের বছরের আপ্রাণ প্রয়াসে জাতীয় সরকার যদিও এই সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু শিক্ষার বিস্তার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, খাদ্যসমস্যার সমাধান প্রভৃতি অন্যান্য সমস্যার পূর্ণ সমাধান ভিন্ন এই সমস্যার সমাধানও সম্ভবপর নহে।

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টা

তোমরা জান, আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর সর্ববিধ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। পুলিশী রাষ্ট্রের আদর্শ বর্জন করিয়া জনকল্যাণকারী হিসাবে ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প সার্থক করার জন্য

তাহারা আমাদের দেশের সকল নাগরিকের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান করিয়া সুখী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িবার কাজে ব্রতী হইয়াছেন। নিচে উপরিউক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে বিবিধ সরকারী প্রচেষ্টার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

আমাদের আতংকজনক জনবৃদ্ধির হার নিরোধকল্পে সরকারী পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (Family Planning Programme) গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত ও অবহিত করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রচারের সংগে সংগে জন্মশাসনসংক্রান্ত জ্ঞান ও কৌশল জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ও সেই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য বর্তমানে এদেশে শহরাঞ্চলে প্রায় ৫৪৯টি এবং গ্রামাঞ্চলে ১,১০০টি পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শহরাঞ্চলে ৩৩০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং গ্রামাঞ্চলে ১,৮৬৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও পরিবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। আর্থিক হিসাবে, আমাদের প্রথম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ৬৫ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীনকালে ৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বর্তমানে অবশ্য একান্তই স্বেচ্ছামূলকভাবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলিতেছে; অর্থাৎ যাহারা স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে চান শুধু তাঁহাদেরই সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই সমস্যার সমাধানের জন্য আরও কয়েকটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। যথা—(১) প্রতি শিশুর জন্মের উপর কর ধার্য করা, (২) অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ করিয়া বিবাহের যোগ্যতামূলক বয়স স্থির করিয়া দেওয়া, (৩) সন্তানের জন্মের পর অবশ্যকরণীয় বন্ধ্যাত্ব (Compulsory Sterilisation) প্রভৃতি।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

এই প্রসংগে নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক পরিকল্পনানুযায়ী প্রজনন সম্পর্কিত সম্মেলনে বিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলির

প্রদত্ত অভিমত বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তাঁহার মতে ভারতে জনসংখ্যার যেরূপ বৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহার প্রতিকার করিতে না পারিলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ অবস্থা অব্যাহত চলিলে ভারতের জনসংখ্যা ৪৫ বৎসরে দ্বিগুণ হইবে। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনা নিতান্ত প্রয়োজন। জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারে বাড়িতে থাকে তাহা হইলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির সকল প্রচেষ্টাই শুধুমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনগণের খাদ্যসংস্থানের জন্যই নিয়োজিত হইবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান কোনোমতেই উন্নত হইবে না। এমন কি বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে জনসাধারণের জীবনযাত্রার বর্তমান অব-মানবীয় (Sub-human) মান বজায় রাখাও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তাই স্যার জুলিয়ান হাক্সলী বলিয়াছেন, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলেও পরিবার পরিকল্পনার জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহাকে সর্বাধিক লাভজনক বিনিয়োগের অন্যতম বলিয়া মনে করা উচিত হইবে। সৌভাগ্যের কথা, ভারত সরকার ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের এই মতের সহিত সম্পূর্ণ একমত। এই উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় সরকার যে অর্থব্যয়ের কার্যকরী ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার কথা উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় বোর্ড (High Power Central Board) এবং বিভিন্ন রাজ্য বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

খাদ্য-সমস্যার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৭ সালে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটির মতে আমাদের দেশের খাদ্যাভাবের প্রধান কারণগুলি হইতেছে—

খাদ্য-সমস্যা সমাধান প্রসংগে

(১) সরকার কর্তৃক খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা সমাজোন্নয়ন কাজের উপর অধিক জোর দেওয়া।

(২) খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি।

(৩) ভারতে এমন কতকগুলি অঞ্চল আছে যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন দুঃসাধ্য। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য একটি নিম্নলিখিত আশুকরণীয় প্রতিকার-ব্যবস্থার সুপারিশ করেন—

(১) দেশে যাহাতে অধিক খাদ্য উৎপাদন হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

(২) বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা।

(৩) খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং প্রয়োজন হইলে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ (Rationing) ব্যবস্থার আংশিক পুনঃ প্রবর্তন করা।

(৪) খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণের সংগে সংগে খাদ্যমূল্য স্থির রাখার জন্য একটি মূল্য স্থিতিকরণ বোর্ড (Price Stabilisation Board) গঠন করা।

(৫) যাহাদের ভাতই প্রধান খাদ্য, তাহারা যাহাতে আটা, ময়দা প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্যশস্যও গ্রহণ করা শুরু করে, সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ চেষ্টা করা।

(৬) লোকের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করা। এবং

(৭) জনসংখ্যা যাহাতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি অপেক্ষা বেশীহারে বৃদ্ধি না পায়, সেইজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

বলাবাহুল্য, আমাদের জাতীয় সরকার এইসব সুপারিশ সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিলেও আংশিকভাবে সেই অনুযায়ী কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের বা ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধির প্রস্তাবসমূহকে জাতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং ৭৬ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তবুও এই পরিকল্পনায়ও এক কোটি টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর জীবনীশক্তি সংরক্ষক খাদ্য সরবরাহের এবং কৃষিকার্যে অধিকতর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য ফল এবং উদ্ভিজ্জের উৎপাদনের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থাও করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পুনরায় কৃষি-উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে বার্ষিক ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া ফল, তরিতরকারী, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতিরও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমাদের বিভিন্ন শিক্ষা-সমস্যার সমাধানেও জাতীয় সরকার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। এদেশে দশ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়াও শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২০ জন। তাই সরকার প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার

উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন। প্রতি রাজ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ; রেডিও, সিনেমা প্রভৃতির সাহায্যেও ইহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সব শিক্ষাপরিকল্পনার লক্ষ্য শুধুই ইহাদের শিক্ষিত করা নহে। ইহাদের উদ্দেশ্য এই সব প্রাপ্তবয়স্কদের অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ; সুনাগরিকত্ব, সুস্বাস্থ্য, অবসর সময়ের সুব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও ইহাদের সুশিক্ষিত করিয়া তোলা।

শিক্ষা-সমস্যা সমাধান প্রসংগে

আমাদের সংবিধানে ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ের জন্য আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা ঘোষিত হইয়াছিল। কোনো কোনো রাজ্যে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলেও নানাবিধ কারণে উহা সামগ্রিকভাবে সম্ভবপর হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনাধীন কালের মধ্যে ৬—১১ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়েদের আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করা হইয়াছে। পূর্বতন জীবনের সহিত সম্পর্কবিচ্যুত প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তে গান্ধীজীর বুনিয়াদী পরিকল্পনার আদর্শে এই সব বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরের চেষ্টা চলিয়াছে। এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিবার এবং ছেলেমেয়েদের বয়ন, বাগান-তৈরী, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ প্রভৃতি হাতের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র শতকরা ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার কারণ, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য খরচ বেশী প্রয়োজন এবং উহার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। সরকার এই সব বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার (National Extension Programme) সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া যেমন আর্থিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন, তেমনি নূতন নূতন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং পূর্বতন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে পরিবর্তিত করিয়া প্রয়োজনীয় শিক্ষক-সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইতেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা-সমস্যা পর্যালোচনার জন্য ১৯৫২ সালে ভারত সরকার যে কমিশন নিয়োগ করেন (ইহা ইহার সভাপতির নাম অনুযায়ী মুদালিয়র কমিশন নামে খ্যাত) সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে। এক উত্তর প্রদেশ ছাড়া অন্য সকল রাজ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে পাঁচ বৎসরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরে ছয় বৎসরের জন্য ব্যাপ্ত করা হইয়াছে। কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক—সর্ব-স্তরেই শিক্ষার মাধ্যম করা হইয়াছে মাতৃভাষা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপন করিয়া ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে বিভিন্ন জীবিকা গ্রহণে সমর্থ হইতে পারে, এবং এই স্তরেই যাহাতে তাহারা স্বীয় ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বহুমুখী করার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই বহুমুখী ধারাগুলি হইতেছে (১) মানবিক জ্ঞান (Humanities), (২) বিজ্ঞান (Science), ৩) ব্যবসা-বাণিজ্য (Commerce), (৪) কারিগরী বিদ্যা (Technical Education), (৫) চারু-কলা (Fine Arts), (৬) কৃষিবিদ্যা (Agriculture) এবং (৭) (মেয়েদের জন্য) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science)। এই স্তরেও শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য বহু শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার (Extension Prorgamme) মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষকদেরও প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার অদলবদলের ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদানকালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পরে তিনবৎসর করা হইয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যবর্তী মহাবিদ্যালয়-গুলি যাহাতে ঠিকমতো উচ্চশিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করিতে পারে তাহার প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের জন্য ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন (University Grants Commission) গঠিত হইয়াছে।

সাধারণ শিক্ষা (General Education) ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে কারিগরী শিক্ষা (Technical Education) লাভ করিতে পারে সেইজন্য দেশে বহু কারিগরী বিদ্যার উচ্চতম ডিগ্রী প্রদানের জন্য স্থাপিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি ছাড়াও সরকার কারিগরী বিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্স

প্রদানের জন্য বহু পলিটেকনিক (Polytechnic) ও বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Trade schools) স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে কারিগরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে ৯০ কোটির অধিক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে।

এই সার্বিক শিক্ষাসংস্কারের ফলে এই দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, পূর্বের তুলনায় বহু বেশীসংখ্যক ছাত্রছাত্রী আজ শিক্ষার আস্বাদন গ্রহণে সমর্থ হইতেছে। নিচে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের—১৯৪৯ হইতে ১৯৫৮—এই দশ বৎসরের মধ্যে পাঁচ বৎসরের সংখ্যা-বৃদ্ধির হিসাব দেওয়া গেল—

	১৯৪৯-৫০	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
১। বিশ্ববিদ্যালয়	২৬	২৯	৩২	৩৩	৩৭
২। মহাবিদ্যালয়	৪৮৪	৫৯২	৭৪৬	৮১৪	৮৬০
৩। অন্যান্য মহাবিদ্যালয়—					
(ক) কৃষি	১৯	২০	২৭	২৮	২৮
(খ) ব্যবসা-বাণিজ্য	২১	২২	২৬	২৮	৩২
(গ) আইন	২০	২২	২৫	২৯	৩০
(ঘ) চিকিৎসা	৪৫	৫২	১০৩	১১৩	১২০
(ঙ) শিক্ষক-শিক্ষণ	৪৮	৫৫	১০৭	১৩৩	২০০
(চ) ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী	২৮	৩৫	৪৭	৫৪	৫৬
(ছ) অন্যান্য বৃত্তিমূলক	৭১	৭৬	১২৩	২৪২	১৬১
৪। বিদ্যালয়—					
(ক) নার্সারি	২৭৫	৩৩০	৬৩০	৭৬৯	৯২৯
(খ) প্রাথমিক	২০৪,৮২৬	২১৫,০৩৬	২৭৮,১৩৮	২৮৭,২৯৮	২৯৮,০১৮
(গ) মাধ্যমিক	১৯,৬০২	২২,৬৩৯	৩২,৫৬৮	৩৬,২৯১	৩৯,৬০৬

জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্যও সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত চিকিৎসক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য মহাবিদ্যালয়গুলির সংখ্যা যে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা উপরের তালিকা হইতেই দেখা যাইবে। ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে

এইজাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র ৪৫টি, ১৯৫৭-৫৮ সালে তাহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২০টি। শুধু চিকিৎসকই নহে; চিকিৎসাব্যবস্থার বিশেষ অংগ হিসাবেই ধাত্রীবিদ্যা (nursing) শিক্ষাদানের জন্যও দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রাম প্রভৃতি জায়গায় উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে সুচিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতে পারে সেইজন্য হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের সংখ্যাও যে বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে, নিচের তালিকা হইতেই তাহা বোঝা যাইবে—

জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে

বৎসর	হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা
১৯৪৬	৩,৮২৫	৪,৩০,১৯,৭৭২
১৯৫১	৯,৫৫২	১০,০৯,৯৪,৭৯৮
১৯৫৬	১০,৫০১	১৩,৩৮,২৫,৫১৩
১৯৫৭	১০,৬৯৭	১৩,১৭,৬০,১৫৭
১৯৫৮	১০,৩৯০	১৪,০৪,৪৩,৬১৫

সংক্রামক রোগগুলির প্রতিকারার্থে যে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) জাতীয় ম্যালেরিয়া দূরীকরণ পরিকল্পনা—এই উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আমেরিকান কারিগরী সহযোগিতা মিশনের সহায়তায় ভারতের ম্যালেরিয়া ইনষ্টিটিউট্ কাজ করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের লক্ষ্য ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহক মশককুল ধ্বংস করিয়া এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা। ১৯৬১ সালের ১লা মার্চের হিসাবে জানা যায় ঐ সময় এদেশে ৩৯০টি ম্যালেরিয়া ইউনিট কার্যরত ছিল।

(২) জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা—ইহারও লক্ষ্য মশককুল ধ্বংস এবং যেসব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ফাইলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী সেখানে ব্যাপকভাবে ঔষধ প্রয়োগ। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে ৪৫টি ইউনিট কার্যরত রহিয়াছে।

(৩) যক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা—এক হিসাবে দেখা গিয়াছে এদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সক্রিয় যক্ষারোগে ভোগে। এই রোগ নিয়ন্ত্রণার্থে ব্যাপক

B. C. G. টীকা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক যক্ষা নিরোধ অভিযান ও পরবর্তীকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক শিশুদের আশুপ্রয়োজনীয় অর্থ তহবিলের (UNICEF) সাহায্যে ১৭ কোটি সম্ভাবনাময় যক্ষারোগীকে B. C. G. টীকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে ১১৯ জন চিকিৎসক ও ৮১৬ জন টেকনিশিয়ান সম্বলিত ১৭০টি দল এদেশে কাজ করিয়া চলিয়াছে। রোগমুক্ত যক্ষারোগীদের জন্য এপর্যন্ত ১৫টি কলোনী (Aftercare Colony) স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) কুষ্ঠ নিবারণী পরিকল্পনা—বর্তমানে এই দেশে কুষ্ঠরোগগ্রস্তের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। ইহাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য বেসরকারী মিশন ফর লেপারস, হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারণ সংঘ, মহারোগী সেবামণ্ডল, গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশন প্রভৃতি ছাড়াও সরকারী প্রচেষ্টায় ৪টি কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ২৯টি সহযোগী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

(৫) জাতীয় বসন্ত রোগ দূরীকরণ পরিকল্পনা—এই উদ্দেশ্যে ১১টি রাজ্যে ১৩টি বসন্ত রোগের টীকা প্রস্তুতকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মিলিত প্রচেষ্টায় যে পরিমাণ টীকা উৎপাদন হয় তাহাতে বছরে প্রায় সাড়ে সাত কোটি লোককে টীকা দেওয়া সম্ভব। কি শহরাঞ্চলে, কি গ্রামাঞ্চলে—ব্যাপক বসন্তের টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য ১৯৫৪ সাল হইতে যে পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে তাহার ফলে বর্তমানে শহরাঞ্চলে ৩৬৪টি জলসরবরাহ ব্যবস্থার আয়োজন সম্ভবপর হইয়াছে। তাছাড়া, এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই শহরাঞ্চলে ৮২টি স্যানিটেশন পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হইয়াছে। এইজন্য প্রায় ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলেও ১৮·৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১৬ হাজার গ্রামবাসীর জন্য নলকূপ ইত্যাদির দ্বারা বিশুদ্ধ জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

খাদ্যের ভেজালাদি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ঐ আইনকে কার্যকরী রূপ দিবার জন্য Central Committee of Food Standards নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসাবিদ্যারও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে কে. এন. উদুপের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার শিক্ষা, গবেষণা এবং ঔষধাদি প্রস্তুতের ব্যাপার পরিচালনার্থে আয়ুর্বেদিক গবেষণা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যার পাঁচ বৎসরের শিক্ষাক্রমকেও অনুমোদন করিয়াছেন।

আমাদের জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

কিন্তু উপরিউক্ত সমস্যাগুলির কোনোটিই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; সুতরাং সাময়িক সমাধান আংশিকভাবে হইলেও কোনোটারই পূর্ণ স্থায়ী সমাধানও সম্ভবপর নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; যতদিন না পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, খাদ্যদ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায় এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায়, ততদিন পর্যন্ত আমাদের অসম খাদ্যগ্রহণ বন্ধ করা যাইবে না; বা সেইহেতু জনস্বাস্থ্যের অবনতিও রোধ করা যাইবে না। আবার, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে ঐ বিষয়ে কুশলী ব্যক্তিদের প্রয়োজন; সেই জন্য কৃষিবিদ্যা শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন। তেমনি ব্যক্তিগত আয়ের বৃদ্ধি করিতে গেলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের প্রয়োজন, প্রয়োজন জাতীয় সম্পদের পূর্ণ ও সার্থক ব্যবহার। তাই, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অল্প পরেই আমাদের সর্ববিধ সমস্যার সাময়িক ও স্থায়ী সমাধানকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া জাতীয় সরকার জাতীয় জীবনকে সমস্যামুক্ত করিবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভার ন্যস্ত হয়—

(১) দেশের সম্পদ, মূলধন ও জনবল নির্ধারণ করা।

(২) উহাদের যথাযথ ও সর্বাধিক পরিমাণ সুব্যবহার সম্পর্কে প্রস্তাব করা।

(৩) এ সম্পর্কে গুরুত্ব অনুযায়ী কোন কাজটি পূর্বে শুরু হওয়া প্রয়োজন তাহা স্থির করা। এবং,

(৪) সামগ্রিক পরিকল্পনাটির সাফল্যলাভের জন্য কি ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করা।

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশনের খসড়া প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, এবং ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল দুইটি—

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

(১) জাতির জীবনের মান উন্নয়ন করা এবং তাহার নিকট উন্নততর ও বিচিত্রতর জীবনের সুযোগের পথ অবারিত করিয়া দেওয়া। এবং

(২) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথম লক্ষ্যসাধনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এইজন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন প্রয়োজন যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের হাতে উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলি এবং আর্থিক সংগতি না কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। তাহার জন্য প্রয়োজন সরকার পরিচালিত আর্থিক ক্ষেত্রের ক্রমিক পরিবর্ধন এবং ব্যক্তি পরিচালিত আর্থিক ক্ষেত্রের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিস্তার। এই উদ্দেশ্যে শিল্পক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Mixed Economy) প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রে সরকারী উৎপাদন-ক্ষেত্র (Public Sector) এবং বেসরকারী উৎপাদন ক্ষেত্র (Private Sector) স্থিরীকৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন কুটির শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান সহায়ক হিসাবে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়।

সারা ভারতের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য মোট বরাদ্দ করা হয় ২,০৬৯ কোটি টাকা। পরে পরিকল্পনা বহির্ভূত কতকগুলি উপকল্পনা সংযুক্ত করিয়া আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৩৫৬ কোটি টাকা। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন বিভাগে বরাদ্দের হিসাব দেওয়া গেল—

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

বিভাগ	মূল বরাদ্দ (কোটি টাকা)	সমগ্রের শতকরা অনুপাত	পরিবর্তিত বরাদ্দ (কোটি টাকা)	সমগ্রের শতকরা অনুপাত
১। কৃষি ও পল্লীউন্নয়ন	৩৬০·৪৩	১৭·৫	৩৫৭·০০	১৫·১
২। সেচ ও শক্তি উৎপাদন	৫৬১·৪১	২৭·১	৬৬১·০০	২৮·১
৩। শিল্প ও খনি	১৭৩·০৪	৮·৪	১৭৯·০০	৭·৬
৪। পরিবহণ ও যোগাযোগ	৪৯৭·১০	২৪·০	৫৫৭·০০	২২·৬
৫। সমাজসেবা ও পুনর্বাসন	৪২৪·৮১	২০·৫	৫৩৩·০০	২২·৬
৬। বিবিধ	৫১·৯৯	২·৫	৬৯·০০	৩·০
মোট	২,০৬৮·৭৮	১০০·০	২,৩৫৬·০০	১০০·০

উপরিউক্ত ব্যয়বরাদ্দ পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নই অগ্রাধিকার পায়, কারণ এই সময় খাদ্য-সমস্যাই ভারতের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাছাড়া, পাট ও কার্পাস উৎপাদন অঞ্চল দেশবিভাগের ফলে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পাটকল ও কাপড়ের কলগুলির কাঁচা মালেরও ঘাটতি দেখা দেয়। সেই কারণেই এই খাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সেচ ও শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা শস্য উৎপাদনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; তাই তারপরেই তাহা অগ্রাধিকার পায় (নদী-পরিকল্পনাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত)। পরিকল্পনার এই দুই বিভাগেই মোট ৯২২ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট বরাদ্দের প্রায় শতকরা ৪৪·৬ ভাগ, বরাদ্দ করা হইয়াছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়-পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। পরিকল্পনানুযায়ী শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব মালিকদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার তাহাদের অনুরোধ জানান। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে মোট বরাদ্দের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ধার্য করা হয়। তবে ইহার বেশীর ভাগই ধার্য করা হয় রেলপথের উন্নতির জন্য (২৬৮ কোটি টাকা)। ইহা ব্যতীত রাস্তাঘাটের সংস্কার ও প্রসারের জন্য ধার্য হয় ১৩০ কোটি টাকা। সমাজসেবা খাতে যে পরবর্তীকালে ৫৩৩ কোটি টাকা ধার্য হয় তাহার মধ্যে শিক্ষার জন্য ১৬৪ কোটি, স্বাস্থ্যের জন্য ১৪০ কোটি, গৃহনির্মাণ বাবদ ৪৯ কোটি, অনগ্রসর জাতিগুলির উন্নতির জন্য ৩২ কোটি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ১৩৬ কোটি, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি নানাজাতীয় সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য ৫ কোটি এবং শ্রমিক কল্যাণের জন্য ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ না করিলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর হইয়াছে। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্যও অতিক্রান্ত হইয়াছে। কৃষির ক্ষেত্রে আশা করা গিয়াছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন পরিমাণ ৫২৭ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৬ লক্ষ টন দাঁড়াইবে; পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচা মালের ক্ষেত্রে দেশ অনেকটা পরিমাণে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রায় ৬০০ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। প্রথম পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা গিয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষা বেশী। সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনও শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ পরিকল্পনার লক্ষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সিমেণ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রেও বেসরকারী উৎপাদন পরিমাণ পরিকল্পনানুযায়ীই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু চিনি বা লৌহ্‌ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। এই সময়ই সরকারী ক্ষেত্রে সিন্ধ্রি সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, দুর্গাপুর হিন্দুস্থান কেবলস্‌ কারখানা, বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণ কারখানা, মাদ্রাজে রেলগাড়ীর কামরা নির্মাণ কারখানা, বাংগালোরে টেলিফোন কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাধীনকালে মোট ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মিত হয়, এবং কতকগুলি জাতীয় ও রাজ্য সড়ক গড়িয়া ওঠে। বিভিন্নক্ষেত্রে এই উন্নতির ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধির আশা করা গিয়াছিল, সেখানে শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ১০ বৎসর পরে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার (rationing) অবসান ঘটানো সম্ভবপর হয়। কিন্তু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ক্ষেত্রে বা বেকার-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আশানুরূপ কাজ হয় নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য

১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য চারিটি—

(১) রাষ্ট্রীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য রকমের বৃদ্ধি; যাহাতে জনসাধারণের

জীবনধারণের মান উন্নততর হইতে পারে। (২) দ্রুত শিল্পায়ন ব্যবস্থা—মৌলিক ও গুরু শিল্পগুলির উপর গুরুত্ব অর্পণ। (৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক প্রসার। (৪) আয় এবং অর্থসম্পদের মধ্যে অসাম্য হ্রাস ও অর্থসম্পদ সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য
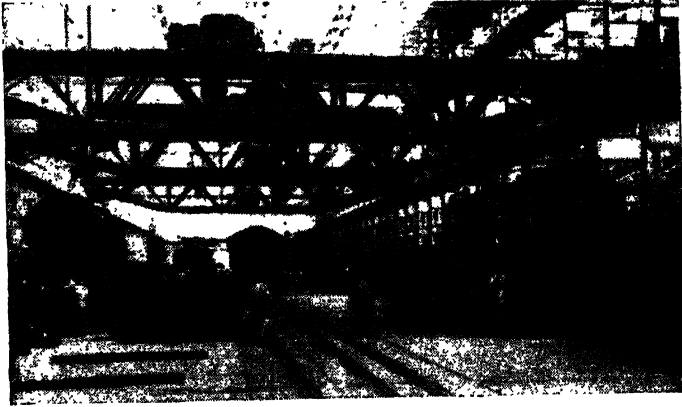
চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিনের কারখানা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য মোট অর্থ বরাদ্দ করা হয় ৪,৮০০ কোটি টাকা। নিচে বিভিন্ন বিভাগে বরাদ্দের হিসাব দেওয়া গেল—

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

	বিভাগ	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	সমগ্রের শতকরা অনুপাত	প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় শতকরা কত ভাগ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে
১।	কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৫৬৮	১১·৮	৫৯·৯
২।	সেচ ও শক্তি	৯১৩	১৯·০	৩৮·৯
৩।	শিল্প ও খনি	৮৯০	১৮·৫	৩৯৭·২
৪।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	১৩৮৫	২৮·৯	১৪৪·৭
৫।	সমাজসেবা ও পুনর্বাসন	৯৪৫	১৯·৭	৭৭·৩
৬।	বিবিধ	৯৯	২·১	৫৩·৫
	মোট	৪৮০০	১০০·০০	৭৭৫·৫

উপরিউক্ত ব্যয়বরাদ্দের হিসাব পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। বস্তুত, পরিকল্পনাটির বিস্তৃত বিবরণী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের নূতন শিল্পনীতি অনুযায়ী এই পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের পরিধি আরও প্রসারিত করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার আওতার মধ্যে মৌলিক এবং
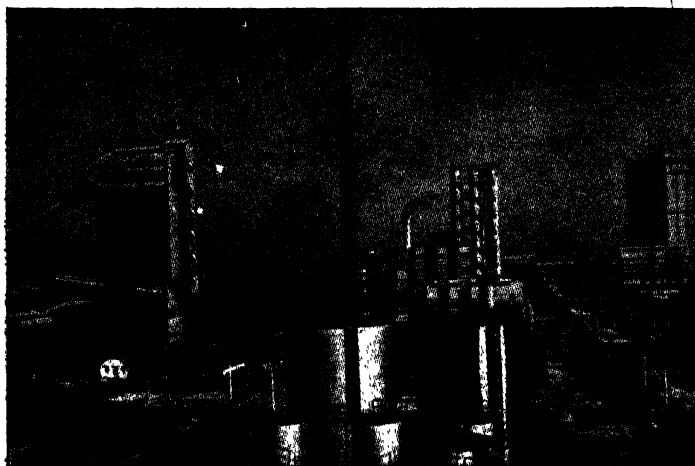
দুর্গাপুরে কোক-ওভেন কারখানা

বিশেষ রকমের সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন সকল রকমের শিল্পোদ্যোগ আসিতে পারে। শিল্পবস্তুর পুনর্শ্রেণীবিন্যাস করিয়া স্থির করা হইয়াছে সামরিক অস্ত্রশস্ত্রাদি, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, খনিজ তৈল, যানবাহন ও যোগাযোগের জিনিসপত্র প্রভৃতি ১৭টি শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়ন সরকারের নিজস্ব দায়িত্বভারের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সার, পরিবহণ ব্যবস্থা, অতি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র প্রভৃতি যে ১২টি শিল্পের সামাজিক মূল্য অপরিসীম বলিয়া স্থির করা হইয়াছে তাহাদের ক্রমান্বয়ে সরকারী মালিকানা ভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে গুরু শিল্পের উপরই সবচাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, পরিকল্পনাধীনকালে তিনটি ইস্পাত কারখানা ও ঢালাই কারখানা স্থাপন করা হইবে। সিন্ধ্রি

কারখানার পণ্যোৎপাদন বহুল পরিমাণে বাড়ানো ছাড়াও আরও তিনটি সার কারখানা স্থাপিত হইবে। রেলওয়ে লোকোমোটিভ আরও বেশী করিয়া তৈরী করা হইবে। এতদ্ব্যতীত, সিমেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া পরিকল্পনার আরম্ভকালীন ৪৩ লক্ষ টন হইতে ১৩০ লক্ষ টন এবং কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৩৮০ লক্ষ টন হইতে ৬০০ লক্ষ টন পর্যন্ত করা হইবে। অবশ্য গুরু শিল্পসমূহের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহের জন্যও মোট বরাদ্দের প্রায় শতকরা ৪.১ ভাগ, অর্থাৎ ২০০ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে। আশা করা গিয়াছে, এইভাবে শিল্পোন্নয়নের ফলে এবং নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নের কাজের ফলে এই পরিকল্পনাধীনকালে প্রায় ৮০ লক্ষ বেকারকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া যাইবে। এছাড়া কৃষির উন্নতির ফলেও ১৬ লক্ষ বেকারের কাজের সংস্থান হইবে। প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় এই পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও অধিক পরিমাণে ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন কালে কৃষি, সেচ, পরিবহণাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভকালে আমাদের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে সামগ্রিক-ভাবে ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনক্ষমতা ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে ইহার সহিত আরও ১১ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ শক্তি যুক্ত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে বৈদ্যুতীকরণ ব্যবস্থার ক্ষমতা ৩৪ লক্ষ হইতে বাড়াইয়া ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াট পর্যন্ত করা হইয়াছে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের পরিমাণ যেখানে ১৯৫১ সালে ছিল ১৪ ইউনিট সেখানে উহা প্রায় ৫০ ইউনিটে পৌঁছিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে সিমেণ্ট, চিনি, সাইকেল, মোটর ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক পাম্প প্রভৃতির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ৩০-৩৫ ভাগেরও বেশী)। কুটির শিল্পের অগ্রগতিও এই পরিকল্পনাধীনকালে লক্ষণীয়। তাছাড়া, জাতীয় আয়ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমাদের জীবন-ধারণের মান এই পরিকল্পনাকালেও বিশেষ উন্নত হয় নাই। সরকার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহার্থে করভার

বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মূল্যস্তরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, বেকার-সমস্যারও আশানুরূপ সমাধান সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ এই কারণে মনে করেন, এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে জাতীয় আয়বৃদ্ধি প্রয়োজন, আর তাহার প্রধান উপায়ই শিল্পায়ন। এইজন্য সাময়িকভাবে দেশের জনসাধারণের ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনা এই দিক দিয়া কতদূর সার্থক তাহার আশু বিচার সম্ভব নহে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাধীনকালে তাহার বিচার হইবে জাতির সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাপকাঠিতে।

প্রসংগত এই পরিকল্পনার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন। ইহাতে গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির উপর খুবই উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব আরোপ করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, ঐ পঞ্চায়েতগুলিই পরিকল্পনার সংগঠন, উন্নয়ন, কল্যাণসাধন, ভূমিসংস্কার, ভূমির ব্যবস্থাকরণ ও পল্লীর পর্যায়ে ঐসব কার্যসাধনের জন্য মৌলিক সংগঠনী হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্যে জেলাসমূহের পুনঃসংগঠন এমনভাবে করার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহাতে জেলার অন্তর্গত পঞ্চায়েতী কেন্দ্রসমূহে এমন এক একটি শাসন পরিষদ গড়িয়া ওঠে যাহা গ্রামের জনসাধারণের নিকট হইতে ক্ষমতা লাভ করিবেএবংযাহার দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্ভবপর হইবে। পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্ম, বিধিব্যবস্থা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যক্রমের সহিত নিবিড়ভাবে সুসংবদ্ধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে ভূমিরাজস্বের একটি বৃহৎ অংশ দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস হইতে আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে। ইহার মূল লক্ষ্য হইতেছে—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

(১) জাতীয় আয় প্রতি বৎসরে শতকরা ৫ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি করা।

(২) খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

(৩) মূল শিল্পগুলির উন্নতি করা এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের স্থাপন, যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বীয় সম্পদেই শিল্পক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে পারে।

(৪) কর্মসংস্থান ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার করা এবং দেশে জনশক্তির পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

(৫) অর্থনৈতিক অসাম্য আরও বেশী রকমে দূর করা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য নিম্নরূপ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে—

	বিভাগ	মোটবরাদ্দ (কোটি টাকা)	সমগ্রের শতকরা অনুপাত
১।	কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	১০২৫	১৪.১
২।	সেচ ও শক্তি	১৫৭৫	২১.৮
৩।	শিল্প ও খনি	১৭৫০	২৪.১
৪।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	১৪৫০	২০.০
৫।	সমাজ সেবা	১২৫০	১৭.২
৬।	বিবিধ	২০০	২.৮
	মোট	৭২৫০	১০০.০

উপরিউক্ত ব্যয়বরাদ্দ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্যের উপর গুরুত্ব শিল্পক্ষেত্রের গুরুত্বের ন্যায়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজসেবাক্ষেত্রের গুরুত্বও অব্যাহত রহিয়াছে। পরিকল্পনার বিস্তৃত ব্যয়বরাদ্দ আলোচনা করিলে জানা যায় এই খাতে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ৫০০ কোটি (যেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল ৩০৭ কোটি) এবং স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হইয়াছে ৩০০ কোটি টাকা (যেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২৭৪ কোটি টাকা)। দেশের জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সার্থক রূপায়ণের জন্য ইহাই স্বাভাবিক।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write an essay on :—

   (a) India's problem of over-population and Government's efforts to solve it.

(b) Our problems of unemployment and Government's efforts to solve them.

(c) Our problems of Education and efforts to solve them.

(d) Our problems of Public Health and efforts to solve them.

(e) The First Five Year Plan.

(f) The Second Five Year Plan.

B. Answer the following questions within 80 words :—

1. Write what you know of our Third Five Year Plan.

2. Show, through a table, the increase of population in India from 1941 to 1961 at the interval of every 10 years.

3. Write what you know of the increase of unemployment in India from 1955 to 1959.

C. The following suggestions are for your scrap-book :—

1. Collect newspaper cuttings in regard to the following : (a) The Third Five Year Plan (b) Increase of National Wealth in India (c) Increase of population in India.

D. The following projects may be undertaken :—

1. Undertake a Social Survey of the locality for the following information :—(a) Number of family members with age divided into males and females. (b) Number of deaths in the family during the last five years with the cause of death and the age of the dead. (c) Number of births in the family within the last five years. (d) Number of earning members in the family with the nature of job and amount of earning of each. (e) The same 5 years before. (f) The number of literate in the family. (g) The same 5 years before.

A wall-newspaper should come out after the survey.

2. Discussion or debates may be organised on the following :

(a) The extent of success of our Five Year Plans.

(b) Methods to be undertaken for expansion and improvement of education.

(c) Methods to be undertaken to meet the problem of unemployment.

(d) Methods to be undertaken to improve our health.

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর বহু দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর আগেও মিশর, রোম, গ্রীস, আরব, ইরান ও চীনের সহিত তাহার বাণিজ্য-জনিত লেনদেন চলিত। মৌর্যযুগে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে কোনো অজ্ঞাতনামা বিদেশী কর্তৃক রচিত Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থ বা পরবর্তী কালের টলেমী, হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়ান প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, সেই সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর হইতে রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, মশলা, হীরা মুক্তা ও সুপারি প্রভৃতি কৃষিজ ও শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই য়ুরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইয়া এদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। মধ্যযুগে (ত্রয়োদশ শতকে) মার্কো পোলো উপরিউক্ত দ্রব্যাদির সংগে সংগে চিনি ও লবণ রপ্তানির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান আমলেও মোটামুটি এরূপ বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের দেশের বহির্বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণই লুব্ধ বিদেশী শক্তির বারবার আক্রমণের একমাত্র কারণ।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিকথা

ইংরেজ আমলে আমাদের বহির্বাণিজ্যের এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার স্বার্থেই এদেশে কার্পাস বা রেশম বস্ত্র উৎপাদন, লবণ তৈরী প্রভৃতি শিল্প লুপ্ত হইয়া যায়। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটায় সেখানে মূলত কারখানা-শিল্প গড়িয়া ওঠে, এবং কাঁচা মালের প্রয়োজনে ভারত হইতে কাঁচামাল লইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে পাঠায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং ভারতের সহিত ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই বাড়িয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বৃটেন হইতে ভারতে মাল আমদানি খুবই কমিয়া যায়। ফলে বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প আমাদের দেশে গড়িয়া

ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালেও ভারতের শিল্পোন্নতি ঘটে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে ভারত প্রকৃত-পক্ষে শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার ফলে তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়তন, আমদানি এবং রপ্তানি উভয় দিকই বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিচে ভারতের গত কয়েক বৎসরের আমদানি ও রপ্তানির মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি

ভারতের আমদানি ও রপ্তানি

(কোটি টাকার হিসাবে)

বৎসর	আমদানি	রপ্তানি
১৯৫০-৫১	৬৫০·৪৩	৬০০·৬৮
১৯৫৫-৫৬	৭৭৪·৩৫	৬০৮·৯১
১৯৫৭-৫৮	১,০৩৬·৪০	৬৩৫·১৪
১৯৫৯-৬০	৮৬৭·০০	৬৪৩·০০
১৯৬০-৬১	১,০৪৪·৭৪	৬৪৬·২৯
১৯৬২-৬৩ (আংশিক, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)	৫২২·৮২	৬৬১·৯৯

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে গত কয়েক বৎসরে আমাদের আমদানি এবং রপ্তানি অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির বৃদ্ধি অনেক বেশী; অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিতেছি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিস ক্রয় করিতেছি। ইহা আশংকার কথা। তাই রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আমাদের সরকার বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তবে আমদানির পরিমাণ বেশী হইলেও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা যে খুব শোচনীয় একথা মনে করার বিশেষ কারণ নাই। বর্তমানে আমরা যে সব জিনিস আমদানি করিতেছি তাহার এক বড়ো অংশ আমরা সরাসরি ভোগে না লাগাইয়া, শিল্প সম্প্রসারণের কাজে লাগাইতেছি। ফলে, কিছুদিন পরে, হয়তো আমাদের দেশের আমদানির পরিমাণ খুবই কমিয়া যাইবে এবং রপ্তানি অনেক পরিমাণে বাড়িবে। বর্তমানে আমাদের ঋণগ্রস্ত মনে হইলেও

ভারতের প্রধান প্রধান আমদানিদ্রব্য (১৯৫৭ সাল)

	দ্রব্য	মূল্য (কোটি টাকায়)
১।	যন্ত্রপাতি— বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য	২৩২·৯৭
২।	লৌহ ও ইস্পাতদ্রব্য	১৪৬·৯৮
৩।	পেট্রোলিয়াম দ্রব্য	৭৭·৭৬
৪।	পরিবহণ দ্রব্য (স্থল, আকাশ ও জলপথের জন্য)	৭৫·৮১
৫।	খাদ্যশস্য	৬৫·৩৯
৬।	তুলা	৪৮·৬২
৭।	ধাতুদ্রব্য	৪১·০৭
৮।	পেট্রোলিয়াম	২৯·৭৪
৯।	রাসায়নিক দ্রব্য	২৯·১৫
১০।	বয়নের ও সেলাইয়ের সুতা	১৯·১৪
১১।	তাম্র	১৭·৬৪
১২।	রং করার দ্রব্যাদি	১৬·৩৯
১৩।	ফল ও বাদাম	১৫·৮৩
১৪।	পশম ও অন্য পশুলোম	১২·৯৮
১৫।	কাগজ প্রভৃতি	১২·৫৯
১৬।	তৈলবীজ, তৈল বাদাম প্রভৃতি	১২·১৪
১৭।	পাট	৭·২০
১৮।	কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও সারদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য মূল খনিজ-দ্রব্য	৬·৬৮
১৯।	মূল রবার	৪·২০

আমদানি মোট—১০২৫·৮২

ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানিদ্রব্য (১৯৫৭ সাল)

	দ্রব্য	মূল্য (কোটি টাকায়)
১।	চা	১২৩·৪০
২।	পাটদ্রব্য	১১৭·২০
৩।	কার্পাস বস্ত্রাদি	৬৫·৫
৪।	অন্যান্য বস্ত্রাদি	৫৯·৯৮
৫।	ম্যাংগানিজ	৩১·৯২
৬।	চর্মদ্রব্য	২১·৫০
৭।	তুলা	১৮·৬০
৮।	তাজা ফল ও তরকারী	১৮·৬০
৯।	মূল উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি	১৪·৪০
১০।	পশম	১২·৯২
১১।	চিনি ও চিনি-দ্রব্য	১২·৮৮
১২।	আকরিক লৌহ	১১·৭৬
১৩।	তামাক	১১·৫৯
১৪।	উদ্ভিজ্জ	১১·৪১
১৫।	সুতা	৯·৭৮
১৬।	মশলা	৮·৪২
১৭।	কফি	৭·৭৩

রপ্তানি মোট—৬৩৭·৭৪

ভবিষ্যতে এ অবস্থা থাকিবে না বলিয়াই আশা করা যায়। ৫৬৫ পৃষ্ঠার হিসাব হইতে ভারত কোন জিনিস কি পরিমাণে আমদানি বা রপ্তানি করে তাহা জানা যাইবে।

এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে ১৯৫৭ সালে আমাদের মোট আমদানির ২২'৭ শতাংশ হইতেছে নানাবিধ যন্ত্রপাতি। অন্যান্য প্রধান আমদানি দ্রব্য হইতেছে লৌহ ও ইস্পাত, ধাতুদ্রব্য, পেট্রোলিয়াম দ্রব্য, তুলা প্রভৃতি; এইগুলি শিল্পের উপাদান বা শিল্পের মূল দ্রব্য (raw materials)। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বা খাদ্যশস্য হইতে প্রস্তুত দ্রব্য আমদানি করিতে হইতেছে সে দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। দেশ বিভাগ ইহার জন্য কতকাংশে দায়ী। ভালো খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমি অনেক পরিমাণে পাকিস্তানের ভাগে পড়িয়া যাওয়ায় আমাদের খুবই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। পাট ও তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির বেশীর ভাগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতকে পাট ও তুলাও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে।

ভোগ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি যে আমাদের দেশে দিন দিনই কমিতেছে তাহা নিচের আমদানির হিসাব হইতে দেখা যাইবে—

	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর
মূলধনীদ্রব্য	১৫%	১৪%	১৪%	১৬%	১৪%
শিল্পদ্রব্য	৫৬%	৬২%	৬২%	৬৫%	৬৬%
ভোগ্যদ্রব্য	১৮%	১৬%	১৬%	১০%	১১%
অন্যান্য দ্রব্য	১১%	৯%	৮%	৯%	৯%

আমাদের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য

রপ্তানি বাণিজ্যের গতি পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। রপ্তানি বৃদ্ধির বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতেছে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রথমেই পাট ও পাটজাত দ্রব্যের নাম করিতে হয়। বর্তমানে ইহা মোট রপ্তানির শতকরা ৩৫ ভাগ অধিকার করে। রপ্তানি বাণিজ্যে চা-এর একটি বিশেষ স্থান আছে। অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তৈলবীজ, সুতীর কাপড়, তামাক,

ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, গালা, মশলা ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আমরা মধ্য প্রাচ্য দেশগুলিতে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ও শিল্প-ব্যবহারের দ্রব্যাদিও পাঠাইতেছি।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানত বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথ-যুক্ত দেশগুলির সহিতই বেশী ছিল। স্বাধীনতালাভের পর অন্যান্য আরও অনেক দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিচে বাণিজ্য সম্পর্কের গুরুত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটা খসড়া দেওয়া গেল—

(১) **ভারত-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য**—এখনও ভারতের বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যকে প্রধান অংশীদারের স্থান দেওয়া চলে। ১৯৬১-৬২ সালের হিসাব হইতে দেখা যায় শতকরা ২৮·৫% বাণিজ্য যুক্তরাজ্যের সহিত হইয়াছে। যুক্তরাজ্য ভারত হইতে চা, পাটজাত দ্রব্য, পাকা ও কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ, কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য, পশম, তামাক, কফি, রবার, লাক্ষা, দড়ি, ছোবড়া, মশলা প্রভৃতি ক্রয় করে। আর ভারত যুক্তরাজ্য হইতে যন্ত্রপাতি, মোটর, সাইকেল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি, পশম ও কার্পাসজাত দ্রব্য, রবারজাত দ্রব্য, রঞ্জকদ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাতদ্রব্য, পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় করে।

(২) **ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য**—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে ভারত আমেরিকা হইতে প্রায় ৯৬·২৩ ও ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় ১১৮·৭২ কোটি টাকার পণ্য আমদানি এবং প্রায় ৮৫·৯১ এবং ৯৫·১২ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতের ১৮ ভাগ বাণিজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সহিত হয়। ঐ দেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, কলকব্জা, কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য, মোটরগাড়ী, খনিজ তৈল, রবার ও লৌহজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, কাগজ ও পেষ্টবোর্ড প্রভৃতি প্রধান। ঐ দেশে রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে চা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, পাকা ও কাঁচা চামড়া, ম্যাঙ্গানীজ, ইলমেনাইট, গালা, অভ্র, তৈলবীজ, মরিচ ও মশলাই উল্লেখযোগ্য।

(৩) **ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্য**—ভারত অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম,

পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, জ্যাম, কৌটা-বন্দী ফল, কাগজ ইত্যাদি আমদানি ও পাটজাত দ্রব্য, চা, তিসি, নারিকেল ছোবড়া, আকরিক ধাতু ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি রপ্তানি করে। ১৯৫৯ সালে ভারত অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১১·৮০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি ও অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯·১৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। ১৯৬১-৬২ সালে রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৪) **ভারত-পশ্চিম জার্মানী বাণিজ্য**—ভারত পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানি করে প্রধানত কার্পাসজাত দ্রব্য, চা, তামাক, আকরিক লৌহ, মশলা, পাকা ও কাঁচা চামড়া, হরিতকী, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, পাটজাত দ্রব্য, লাক্ষা, উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈলবীজ। ভারত ঐ দেশ হইতে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রঞ্জক দ্রব্যাদি, কাঁচের দ্রব্যাদি ও ঔষধ ইত্যাদি ক্রয় করে। ১৯৫৯ সালে ভারত জার্মানী হইতে ১১৮·৭২ কোটি টাকার পণ্য আমদানি ও ১৯·৪৪ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে। বর্তমানে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৫) **ভারত-জাপান বাণিজ্য**—জাপান হইতে বস্ত্র ও কৃত্রিম রেশম, রেশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি, কাঠ ও কাঁচের দ্রব্যাদি, নানাবিধ খেলনা আমদানি করে। অপর পক্ষে ভারত কার্পাস, আকরিক লৌহ, পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, চিনাবাদাম ইত্যাদি রপ্তানি করে। ১৯৫৯ সালে ভারত জাপান হইতে ৪০·৯৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি ও জাপানে ৩৪·৩৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। বর্তমানে জাপান ভারতের সহিত তাহার আকরিক লৌহ-চুক্তি বাতিল করিয়াছে ও ভারত হইতে জাপানে রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে।

(৬) **ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য**—ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক। ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে প্রধানত ধান, চাউল, কেরোসিন, তৈল, তামাক, রেশম দ্রব্য, কাষ্ঠ, খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, চা, চিনি, কয়লা, পুস্তক ও কাগজজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে। ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে মোট রপ্তানির ৪০ ভাগেরও বেশী কার্পাস ও পাটজাত সামগ্রী। ১৯৫৯ সালে ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে ১৩·১৭ কোটি টাকার পণ্য আমদানি ও ব্রহ্মদেশে ১২·৬২ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্য কতকগুলি নূতন পণ্যদ্রব্যের চাহিদার জন্য কিছুটা বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে।

(৭) **ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য**—পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত পাকিস্তান হইতে প্রচুর পরিমাণে পাট ও তুলা আমদানি করে এবং পাকিস্তানে কার্পাস বস্ত্র, পাটজাত দ্রব্যাদি, গুড়, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, চা, সরিষার তৈল, সিমেণ্ট প্রভৃতি রপ্তানি করে। বর্তমানে পাকিস্তানে একটি নূতন চিনির কল স্থাপিত হওয়ায়, চিনি রপ্তানি ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে। ১৯৫৯ সালে ভারত পাকিস্তান হইতে ৫'৪৬ কোটি টাকার পণ্য আমদানি ও ৬'২৯ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে। ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে বাণিজ্যের পরিমাণ স্বল্প মেয়াদী চুক্তি দ্বারা পূর্ব হইতে নির্ধারিত হয়। সম্প্রতি পাকিস্তানের সহিত এইরূপ একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

(৮) **ভারত-ফ্রান্স বাণিজ্য**—ফরাসী দেশ হইতে এদেশে আমদানি-কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে কাপড়, ঔষধ, মদ্য ও টয়লেট দ্রব্যাদি, রং, পশম ও রেশমের কাপড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদেশ হইতে ফরাসী দেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তুলা, চামড়া, কফি, গালা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। বর্তমানে ফরাসী সরকার ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানি করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। কাজেই, আশা করা যায় যে, ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য ভবিষ্যতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে।

(৯) **ভারত-সোভিয়েত রাশিয়া বাণিজ্য**—সোভিয়েত রাশিয়া হইতে ভারত যন্ত্রপাতি, গম, অপরিশুদ্ধ খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি করে ও পাট, চা রপ্তানি করিয়া থাকে। নূতন ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির ফলে ১৯৬৮ সালের মধ্যে উভয় দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বর্তমানের দ্বিগুণ হইবে ও তাহার আর্থিক মূল্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা হইবে আশা করা যায়।

(১০) **ভারত-সিংহল বাণিজ্য**—ভারত সিংহল হইতে নারিকেল শাঁস, নারিকেল তৈল, খনিজ দ্রব্য, রবার, চা প্রভৃতি আমদানি ও ধান, চাউল, কার্পাস দ্রব্য, ইস্পাত দ্রব্য, কয়লা, ফল, তামাক, মশলা, সার প্রভৃতি দ্রব্যাদি সিংহলে রপ্তানি করে। ১৯৫৯ সালে ভারত সিংহল হইতে ৬'৫৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি ও ২২'১৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করিয়াছে। বর্তমানে রপ্তানি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(১১) **ভারত—মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও সীমান্ত বাণিজ্য**—প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে ভারত কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করায় ভারতে আড়তদারী বাণিজ্যে (Entrepot Trade) বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলি হইতে পণ্য আমদানী করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য আবার কেনিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা, প্রণালী উপনিবেশ, প্রভৃতি স্থানে ভারত প্রেরণ করে। ভারত কাশ্মীরের মধ্য দিয়া আফগানিস্থান, মধ্যপ্রাচ্য ও সৌদী আরব দেশগুলির সহিত কিছু 'সীমান্ত বাণিজ্য' (frontier trade) করে। এই বাণিজ্যের পরিমাণ মোট বাণিজ্যের তুলনায় এত কম যে সাধারণভাবে ইহার কোনো তুলনামূলক মূল্যায়ন হয় না। তবুও আঞ্চলিক গতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা যে একটি শুভ সূচনা তাহাতে সন্দেহ নেই।

১৯৬০-৬১ সালের খসড়া হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ঐ বৎসর প্রায় ১০৪৪'৭৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি ও প্রায় ৬৪৬'২৯ কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি করা হয়। ফলে, অনিবার্য কারণেই ভারতের ঐ বৎসর প্রায় ৩৯৮'৪৫ কোটি টাকা লোকসান হয়। ইহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Adverse balance of trade) বলা হয়। রপ্তানিমূল্য যদি আমদানিমূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, সে ক্ষেত্রে উহাকে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Favourable balance of trade) বলা হয়। নিম্নে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের কয়েক বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল। অনুকূল উদ্বৃত্ত যুক্ত (+) চিহ্নদ্বারা ও প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বিযুক্ত (–) চিহ্নদ্বারা দেখানো হইল।

ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade)

বাণিজ্য বৎসর	আমদানি (কোটি টাকা)	রপ্তানি (কোটি টাকা)	বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (কোটি টাকা)
১৯৫৬-৫৭	৮৪৮	৬১৯	—২২৯
১৯৫৭-৫৮	১০৩৬	৬৩৫	—৪০১
১৯৫৮-৫৯	৭৯৯	৫৬৯	—২৩০
১৯৫৯-৬০	৮৬৭	৬৪৩	—২২৪
১৯৬০-৬১	১০৪৫	৬৪৬	—৩৯৯

উপরের হিসাব হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে প্রতিবৎসর আমাদের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আমরা খাদ্যে স্বনির্ভরতা লাভ করিতে পারি নাই। শিল্পোন্নয়নের জন্য আমরা অত্যধিক বর্ধিতহারে প্রচুর যন্ত্রপাতি ও শিল্পের মূল দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিতেছি। যেসমস্ত কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়া আমাদের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাও বর্তমানে দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া দেশ বিভাগের ফলে পাট ও তুলা উৎপাদনের স্থান পাকিস্তানের ভাগে চলিয়া যাওয়ায় ভারতকে ঐ সমস্ত কাঁচামাল পুনরায় আমদানি করিতে হইতেছে। মূলধনী দ্রব্যের আমদানি ভারতের দ্রুত অর্থ-নৈতিক বিকাশের সূচনা করে। অপরদিকে আমাদের এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বিভিন্ন ভাবে রপ্তানি-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে পরিকল্পনাকালীন মোট আমদানির পরিমাণ হইবে ৬২৯৩ কোটি টাকা এবং মোট রপ্তানির পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩৪৫০ কোটি টাকা। কাজেই, পরিকল্পনা শেষে, ২৮৪৩ কোটি টাকা বাণিজ্যে ঘাটতি ধরা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিরক্ষার জন্যে আমদানির পরিমাণ এই সময়ে বাড়িয়া যাওয়াতে ঘাটতিও বাড়িয়া যাইবে।

মোট কথা, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তার কারণ রহিয়াছে। অধুনা (১৩ জুন, ১৯৬৩), কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শা, রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাণিজ্য-চুক্তির কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সমস্যার যে সমাধান হইবে এমন মনে হয় না।

আমাদের বাণিজ্যনীতি

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে ভারতকে খুব সাবধানতার সহিত তাহার বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। অর্থনীতির বর্তমান উন্নতির বিভিন্নক্ষেত্রে ভারসাম্য অর্জনই বাণিজ্যনীতির মূল উদ্দেশ্য, কাজেই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সহিত সময়ে সময়ে এই নীতির পরিবর্তন অপরিহার্য। ইংরেজরা যখন ভারতের শাসক ছিল তখন ভারত সরকারের

কোনো নির্দিষ্ট বাণিজ্যনীতিই ছিল না, কারণ তখন ভারতীয় বাণিজ্যের প্রকৃতি ছিল ঔপনিবেশিক, কাঁচা মাল রপ্তানি ও সেই কাঁচা মাল হইতে প্রস্তুত শিল্পজাত-দ্রব্যের আমদানিই ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের একমাত্র কাজ।

যুদ্ধের পরে ১৯২০-১৯২২সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রথম ঘাটতি দেখা দেয়। ইহার প্রধান কারণ হইল জাপানের শিল্পোন্নয়ন ও তীব্র প্রতিযোগিতা।

এই সময় ভারতীয় জনমত শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণ নীতি (Protection Policy) অনুসরণ করার জন্য সরকারের উপর যথেষ্ট চাপ দেয়। সংরক্ষণ নীতির অর্থ হইতেছে যে, দেশের নূতন শিল্প প্রচেষ্টায় সরকারকে সাহায্য করিতে হইবে যাহাতে উহা দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শিল্পের সহিত মূল্যের মানে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। এই নীতির মাধ্যমে সাধারণত বৈদেশিক শিল্পজাত-দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিয়া দেশের শিল্প প্রচেষ্টাকে সংরক্ষিত করা হইয়া থাকে অথবা সরকার নূতন শিল্প প্রচেষ্টায় সরাসরি সাহায্য দান করিয়া (Bounties) বৈদেশিক শিল্পের সহিত মূল্যমানের সমতা অর্জন করেন। দেশে শিল্পোন্নয়নের পক্ষে এই নীতি খুবই কার্যকরী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নীতির ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানী তাহাদের দেশকে শিল্পে উন্নত করিয়া ইংল্যাণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

১৯২১ সালে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা উচিত কিনা এই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার একটি ব্যবসায় কমিশন (Fiscal Commission) নিয়োগ করেন। এই কমিশন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি ও সরাসরি সাহায্য দান দ্বারা সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের সুপারিশ করেন। ভারত সরকার কোন কোন শিল্পের বেলায় এই সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য একটি শুল্ক সমিতি (Tariff Board) গঠন করেন। ব্যবসায় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ও শুল্ক সমিতির অনুমোদনক্রমে ১৯২৪ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে প্রথম এই নীতি আরোপিত হয়। পরে ১৯২৭ সালে কাগজ ও বস্ত্রশিল্পে, ১৯২৮ সালে দেয়াশলাই শিল্পে, ১৯৩১ সালে ভারী রাসায়নিক শিল্পে ও ১৯৩২ সালে শর্করা শিল্পে এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মোট ১১টি শিল্পে এই নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৯-৫০ সালে ভারত সরকার কৃষ্ণমাচারী কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন ৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। অতীতের সংরক্ষণ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের দীর্ঘকালীন বাণিজ্যনীতি কিভাবে পরিচালিত হইবে, সেই সম্বন্ধে সুপারিশ করার জন্যই এই কমিশন নিযুক্ত করা হয়। কমিশন ভারতের মূল শিল্পগুলি ও তাহাদের সহায়ক শিল্পগুলির সামগ্রিক অবাধ সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এদেশের শিল্পগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করেন—(১) প্রতিরক্ষামূলক শিল্প (২) বুনিয়াদী ও মূল শিল্প (৩) অন্যান্য শিল্প। প্রতিরক্ষামূলক শিল্প অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ তৈরী শিল্পে সংরক্ষণ নীতি কেবল দেশের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইবে। বুনিয়াদী ও মূল শিল্পে এই নীতির প্রয়োগ শুল্ক কমিশন কর্তৃক আরোপিত সর্তাবলীর ভিত্তিতে প্রযোজিত হইবে এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে শুল্ক কমিশন সময়ে সময়ে সরকারকে নির্দেশ দিবেন ইহাই স্থির হয়। সাধারণত এই নীতি অনুসারে বিদেশজাত দ্রব্যাদির উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্যের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই নীতি প্রয়োগের পূর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে শুল্ক কমিশন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে সংরক্ষণ প্রার্থী শিল্পটির প্রসারের সম্ভাবনা কতদূর, উহার উৎপাদন ব্যয় কিরূপ, উহা জাতীয় স্বার্থের সহায়ক কিনা বা উহার সংরক্ষণ ব্যয় জনসাধারণের উপর অত্যধিক বেশী হইবে কিনা। ব্যবসায় কমিশন এ বিষয়ে শুল্ক কমিশনকে যথাযথ নির্দেশ দিবেন।

শুধু শিল্পোন্নয়ন বা খাদ্যোৎপাদনই নহে, প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত রোধকল্পে ভারত সরকার আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থামূলক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া কম প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স দেওয়া ভারত সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর ভারত সরকার তাহার নীতি পরিবর্তন করিয়া দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে সরকার সময় সময় বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়া এই নীতির প্রয়োগ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। রামস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে ১৯৬১ সালে একটি কমিটি দেশের আমদানি

ও রপ্তানি বাণিজ্যের গতি, প্রসার ও ব্যবস্থাদির সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারকল্পে কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশগুলি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া যেসব দ্রব্য রপ্তানি করা সম্ভব সেইগুলির রপ্তানি বৃদ্ধির উৎসাহ দান করিতেছেন। ভারতে যে রপ্তানি বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছেন।

যেসব দেশ পৃথিবীর বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগে লিপ্ত আছে, সে-সব দেশে সর্বাধিক সুবিধা লাভের জন্য শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি, রপ্তানি পরিষদ গঠন (Export Promotion Council), রপ্তানি ঝুঁকি বীমা প্রতিষ্ঠান (Export Risk Insurance Corporation) ও *রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (State Trading Corporation)* স্থাপনা করিয়াছেন। এই সব প্রশংসনীয় কার্য যে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

১৯৫৬ সালের মে মাসে সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানায় ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (State Trading Corporation) স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের সমস্ত আমদানি এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হইয়া থাকে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে পরামর্শ দান ও অন্যান্য বিষয়ে এই প্রতিষ্ঠান সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করে। উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে, এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত বহু দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিয়াছে এবং প্রতি বৎসর রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের যে বিরাট পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, উহা কার্যকরী করিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. State the principal imports and exports of India at the present time, disscussing at the same time the special characteristics of her foreign trade.

2. Explain what is meant by the term 'Balance of Trade'. Discuss the problem of Balance of Trade for India.

3. Discuss the foreign trade policy of the Government of India.

4. What is meant by the term 'Entrepot Trade' and 'Frontier Trade'. How India carries these trades ?

5. Explain the term 'Protection'. How far India is adopting this in her trade policy ?

B. Answer the following questions in not more than 60 words:—

1. *Narrate the trade which India carries on with the* following countries (60 words for each) :

(a) U. S. A. (b) Great Britain (c) Japan (d) West Germany (e) Pakistan (f) U. S. S. R. (g) Burma.

2. Explain why we have a shortage of foreign exchange at present in India.

C. The following suggestions are for your scrap-book :—

1. Collect newspaper cuttings in regard to the periodic statement of Import Policy by the Government of India.

D. The following projects may be undertaken :—

1. If possible, arrange a visit to the Customs Office to prepare a list of exports and imports through it.

Or, Write a letter to the authorities to give you some idea about the exports and imports they handle.

2. Visit the local shops and make a list of commodities imported. Get some idea about the duties which have to be paid.

আমাদের বৈদেশিক নীতি

সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষত প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত, এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া আসিতেছে। একদিকে যেমন এইসব দেশের কত বিভিন্ন জন কত বিচিত্র সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া এদেশে আসিয়া একে একে ধীরে ধীরে এই দেশের সমাজ জীবনে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এই দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে ভারতবর্ষ হইতেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ঐসব দেশে প্রবাহিত হইয়া ঐসব দেশের সংস্কৃতির উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তোমরা জান, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই সম্রাট অশোকের দূতেরা পশ্চিমে সুদূর এপিরাস, কাইরিনি, সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন প্রভৃতি দেশে, দক্ষিণে সিংহলে, পূর্বে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ব্রহ্ম, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে ইংরেজদের আগমন পর্যন্ত ঐসব দেশের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। কিন্তু ইংরেজ আগমনের ফলে এই যোগসূত্র শিথিল হইয়া পড়ে; ক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শুধু ভারতবর্ষই নহে; এই সময় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকতার প্রসারের ফলে ঔপনিবেশিকতার স্বার্থেই প্রাচ্যের প্রায় সব দেশই প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কি অর্থনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক—উভয়ক্ষেত্রেই তাহাদের একমাত্র যোগসূত্র বজায় থাকে তাহাদের নিজ নিজ পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক প্রভুদের দেশের সহিত। এই সময় ভারতবর্ষেরও প্রধান যোগসূত্র স্থাপিত হয় শুধুই বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সংগে।

আমাদের বৈদেশিক সংযোগের ইতিকথা

কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভে অন্যান্য দেশ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আবার ভারতবর্ষও প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্যের দেশগুলির সহিত তাহার পুরাতন সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাজ্যে এবং পশ্চিমে পারস্য, আরব, মিশর, সিরিয়া,

জর্ডন, ইরাক প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্যগুলিতে পরিভ্রমণ করায় ঐসব দেশে ভারতের বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার বাণী প্রচারিত হইয়াছে।

বস্তুত, আমাদের বৈদেশিক নীতির মূল কথাই হইতেছে বিভিন্ন রাজ্যের সহিত বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা বজায় রাখা। আমাদের সংবিধানের আলোচনা প্রসংগে তোমরা দেখিয়াছ, আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনায় যেসব নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অন্যতম হইতেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির সম্মান প্রদর্শন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া বিরোধসমূহের মীমাংসা করার চেষ্টা করা—ইহাই হইবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ভারতের বৈদেশিক নীতি এই মূল নীতির দ্বারাই পরিচালিত। একই কারণে ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী জনগণকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা, কোনো বিশেষ বৈদেশিক শক্তির সহিত নিজেকে জড়াইয়া না ফেলা, সমস্ত রকম সামরিক চুক্তি, অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি, বা আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার সর্বরকম বিরোধিতা করা, এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন। কারণ, ভারতবর্ষ মনে করে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষাকল্পে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য।

আমাদের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী ১৯৫৪ সালে চীনের সহিত তিব্বত সম্বন্ধে চুক্তি প্রসংগে ভারতের উপরিউক্ত বৈদেশিক নীতিকে পাঁচটি সূত্রে উপস্থাপিত করেন। ইহারাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশীল নামে খ্যাত। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে উপস্থিত ২৯টি আফ্রো-এশীয় দেশ এই পঞ্চশীলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। পরবর্তীকালে যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, মিশর প্রভৃতি দেশের সহিত আমাদের সম্পর্কও এই পঞ্চশীলের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই পঞ্চশীল শব্দটি অবশ্য এদেশে নূতন কিছু নহে। তোমরা জান, বুদ্ধদেব যখন তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন তখন তিনি মানুষের অবশ্যকরণীয় পাঁচটি আচারের উল্লেখ করেন—সত্য, অহিংসা,

পঞ্চশীল

অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। আমাদের বৈদেশিক নীতির পঞ্চশীলের সহিত অবশ্যই এই পঞ্চশীলের কোনো সম্পর্ক নাই। শুধুমাত্র, বুদ্ধদেব মানুষকে যেমন কয়েকটি নীতি মানিয়া চলার নির্দেশ দিয়াছিলেন, তেমনি ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলিরও কতকগুলি নীতি মানিয়া চলা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পঞ্চশীল হইতেছে—

(১) পরস্পরের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক সংহতিতে শ্রদ্ধা রাখা।

(২) অনাক্রমণ অর্থাৎ অন্যের অধিকৃত অঞ্চল দখল করার চেষ্টা না করা।

(৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

(৪) পরস্পরের সমতা বজায় রাখা ও পারস্পরিক উন্নতির সহায়তা করা।

(৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি উভয় রাজ্যের অবস্থানের মধ্য দিয়া উভয়েরই উন্নতির চেষ্টা করা।

এই পঞ্চশীলই আমাদের বৈদেশিক নীতির প্রধান ভিত্তি।

ভারতবর্ষের কোনো বৃহৎ শক্তির সহিত নিজেকে সনাক্ত না করার নীতি

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান লক্ষ্য কোনো বিশেষ শক্তিগোষ্ঠীর সহিত জড়াইয়া না পড়া। প্রসংগত বলা প্রয়োজন, পৃথিবী আজ দুইটি প্রধান শক্তিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। এক গোষ্ঠীতে রহিয়াছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, নরওয়ে, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশগুলি। ইহারা পরস্পরের মধ্যে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি প্রভৃতি চুক্তি দ্বারা (N. A. T. O. North Atlantic Treaty Organisation), S. E. A. T. O. (South-East Asia Treaty Organisation) প্রভৃতি সংগঠন গড়িয়া তুলিয়া নিজেদের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও নিরাপত্তার আয়োজন করিয়াছেন। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাংগেরী প্রভৃতি কমিউনিষ্ট মতাবলম্বী রাজ্যগুলি ওয়ারশ' চুক্তি প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়াছেন। পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির বেশীর ভাগই এই দুই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর কোনো একটার

সহিত নিজেদের সত্তা বিলাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। বস্তুত, ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য নেতিবাচক নিরপেক্ষতা নহে। ভারতবর্ষ এই দুই গোষ্ঠীর কোনোটির সহিতই নিজের সত্তা বিলাইয়া দেয় নাই। তাই বলিয়া আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সে যে স্বীয় অভিমত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিবে না বা যখন আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃংখলা ব্যাহত হইবে তখন সে নিরপেক্ষভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহা নহে। এই প্রসংগে আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

'India does not propose to join any camp or alliance, but wish to co-operate with all in the quest for peace and security and human brotherhood······We have not joined any of the great power-groups that dominate the world today. It is in no spirit of pride or arrogance that we pursue our independent policy......We welcome association and friendship with all and the flow of the thought and ideas of all kinds, but we reserve the right to choose our own path. That is the essence of Panchsheel.'

অন্যত্র তিনি জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছেন—

'Where freedom is menaced or justice threatened or where aggression takes place, we cannot be and shall not be neutral.'

বস্তুত, কোনো বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর সহিত নিজেকে বিলাইয়া না দিয়া স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ মতামত ও কার্যকলাপের নীতি ভারতবর্ষকে কোরিয়া, সুয়েজ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধ যখন আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে তখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতই প্রথম দাবী করে যে জাতিসংঘের সেনাবাহিনীর ৩৮ অক্ষাংশ অতিক্রম করা উচিত হইবে না। প্রথমে এই দাবী গ্রাহ্য না হইলেও, চীনা

স্বেচ্ছাসেবকদের উত্তর কোরিয়ার সমর্থনে অগ্রসর হওয়ার পর ভারতবর্ষের এই দাবীর যৌক্তিকতা সকলের হৃদয়ংগম হয়। পরিশেষে ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই ভারতবর্ষের প্রস্তাব গৃহীত হইলে তবেই ঐ যুদ্ধ বন্ধ হয়। সেই সময় ভারতবর্ষকে নিরপেক্ষ জাতিদের লইয়া গঠিত বন্দী বিনিময় কমিশনের (Neutral Nation Repatriation Commission) সভাপতি হিসাবে এক গুরু দায়িত্ব বহন করিতে হয়। কিন্তু কমিশনের ভারতীয় সভাপতি জেনারেল থিমায়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কোরিয়ায় শান্তি স্থাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষায় ভারতবর্ষের অবদান

কোরিয়া

প্রধানত ভারতবর্ষের চেষ্টার ফলেই ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছে। ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদের একগুঁয়েমীর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষই পৃথিবীর জনমতকে সংহত করে, এবং এই উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি সম্মেলনও আহূত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের চেষ্টার ফলেই ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়া

কোরিয়ার ন্যায় ইন্দোচীনের অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া সেখানে শান্তি-স্থাপনের ব্যাপারেও ভারতবর্ষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কলম্বো সম্মেলন এবং পরবর্তীকালে জেনেভা সম্মেলনে ভারতের প্রস্তাব বিশেষভাবে আলোচিত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেননের প্রচেষ্টায় ১৯৫৪ সালের ২রা জুলাই ইন্দোচীনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়। শান্তি চুক্তি যথার্থ প্রয়োগের জন্য যে তিন জাতির পরিদর্শন কমিটি (Three Nation Supervisory Commission) গঠিত হয় তাহার অন্যতম সদস্য হিসাবে ভারত স্বীয় সৈন্যবাহিনী সেই দেশে পাঠাইয়া সেখানকার শান্তিরক্ষায় প্রভূত প্রয়াস পায়।

ইন্দোচীন

মিশরে সুয়েজখালের ব্যাপার লইয়া যখন ইংরেজ, ফরাসী ও ইস্রায়েলী সৈন্যরা মিশর আক্রমণ করে তখন ঐ সব সৈন্যদের মিশর হইতে আশু নিষ্ক্রমণের যে আফ্রো-এশীয় প্রস্তাব করা হয়, ভারতবর্ষ ছিল তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা। এই উদ্দেশ্যে মিশরে যখন জাতিসংঘের সৈন্য প্রেরণ করা হয় তখন সেই সৈন্যদলে ভারতবর্ষও তাহার সৈন্যদের প্রেরণ করে। কিন্তু সেই সংগে সংগে একটি কথা ভারত

মিশর

স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেয় যে ভারতীয় সৈন্যদল শুধুমাত্র বিদ্রোহী সৈন্যদের নিষ্ক্রমণ ও যুদ্ধবিরতি তদারক করিবে মাত্র।

একই কারণে হাংগেরীতে রুশ সৈন্যসমাবেশের প্রতিবাদ জানাইয়াও ভারতবর্ষই প্রস্তাব আনয়ন করে। ভারতীয় প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হাংগেরীতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের গমনের ব্যবস্থা হয়।

হাংগেরী

জাপান সম্বন্ধে সান-ফ্রান্সিস্‌কোতে যে চুক্তি সম্পাদনের আয়োজন করা হয়, ভারতবর্ষ তাহার তীব্র বিরোধিতা করে এবং একটি শক্তিমান এশীয় জাতির ব্যাপারে এইরূপ অসম্মানকর চুক্তি সম্পাদনের গুরুত্ব সম্বন্ধে পৃথিবীকে অবহিত করে।

জাপান

আফ্রিকার দেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সমর্থনও ভারত সর্বদা জানাইয়াছে। চাপে পড়িয়া বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদ কংগো ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও, ষড়যন্ত্র করিয়া কংগোতে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ এই গৃহযুদ্ধ নিবারণেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় সেখানে কাটাংগার সভাপতি শোম্বে যখন এক আত্মঘাতী যুদ্ধের সূত্রপাত করেন, জাতিসংঘ তখন প্রথম দিকে যে কারণেই হউক প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতবর্ষই তখন এই সম্বন্ধে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জোর দিয়া ঘোষণা করে ও অবিলম্বে সেখানে জাতিসংঘের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবী করে। এই উদ্দেশ্যে ভারত সেখানে জাতিসংঘ বাহিনীর অংশ হিসাবে ভারতীয় সৈন্যও প্রেরণ করে। ভারতীয় প্রচেষ্টাতেই ১৯৬২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে কংগো হইতে বেলজিয়ান সৈন্যের অপসারণের নির্দেশ দিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে কাটাংগায় অস্ত্রশস্ত্রের গোপন সরবরাহের বিরুদ্ধে যেমন ভারত জোর গলায় প্রতিবাদ জানায়, তেমনি কংগোর প্রধান মন্ত্রী আদোলার অস্ত্র-সরবরাহের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করে।

কংগো

অছি পরিষদের সদস্য হিসাবে ভারত উপনিবেশগুলির স্বাধীনতালাভের ব্যাপারেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তাহার প্রচেষ্টাতেই ডাঃ মালানের ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দখলের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। টিউনিশিয়া, মরোক্কো, কেনিয়া,

উপনিবেশসমূহ

আলজেরিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশের স্বাধিকারের ব্যাপারেও ভারতবর্ষ প্রধান মুখপাত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে।

এমনিভাবে, যদিও বৃহৎ শক্তিগুলির তুলনায় ভারত অনগ্রসর দেশ, তবু সে শান্তির প্রতি তাহার ঐকান্তিক বিশ্বাস ও অনুরাগ লইয়া বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার 'বলিষ্ঠ নিরপেক্ষ' নীতির দ্বারা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ রোধে প্রয়াস পাইয়াছে।

শুধু বিদেশের সমস্যার সমাধানই নহে। ভারত স্বীয় সমস্যাও একই নীতি অনুসরণ করিয়া সমাধানের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে যখন ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে ভাগ করিয়া দিয়া যায়, তখন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সীমান্ত নির্দেশনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয় নাই। ইহার সুযোগ লইয়া পাকিস্তান পরবর্তীকালে বহু দাবীদাওয়ার অবতারণা করে। ইহা ব্যতীত পাকিস্তান কাশ্মীর দখলের ষড়যন্ত্র করে; উহার সাহায্যপুষ্ট মুসলমান উপজাতীয়দের দ্বারা কাশ্মীর আক্রমণ করায়। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবার আবেদন করিলে ভারত তাহা গ্রহণ করে এবং সৈন্য প্রেরণ করিয়া মুসলমান উপজাতি এবং তাহাদের সংগে আগত পাকিস্তানী সৈন্যদের বিতাড়িত করিতে থাকে। কিন্তু কাশ্মীরের যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও ভারত তাহার শান্তিকামী নীতির অনুসরণে জাতিসংঘের নিকট পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করে। নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে হইলেও, জাতিসংঘের নির্দেশে কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতিতে সে স্বীকৃত হয়। ফলে কাশ্মীরের এক অংশ আজও পাকিস্তানের অধিকৃত রহিয়া গিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর কূটনৈতিক চালের জন্য আজও জাতিসংঘ কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা করিতে পারে নাই।

পাকিস্তান

১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করিলে পাকিস্তান কাশ্মীর লাভের জন্য চাপ দিতে থাকে। ভারত শক্তিশালী হইলে পাকিস্তানকে আক্রমণ করিবে—এই মিথ্যা অজুহাতে চীনের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমেরিকা এবং বৃটেনের ভারতকে অস্ত্রশস্ত্রপ্রদানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান প্রবল আন্দোলন চালাইতে থাকে। ভারত সর্বদাই আপসে বিরোধ মিটাইবার পক্ষপাতী। পূর্বে বহুবার ভারত কাশ্মীর-বিরোধ মীমাংসার জন্য পাকিস্তানের

সহিত সরাসরি আলোচনা চালাইয়াছে। সাফল্যলাভের কোনো আশা নাই জানিয়াও বৃটেন এবং আমেরিকার বিশেষ অনুরোধে আবার সে পাকিস্তানের সহিত কাশ্মীর এবং অন্যান্য বিরোধ আলোচনার দ্বারা মীমাংসার চেষ্টায় স্বীকৃত হয়। আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে চারবার বৈঠক হয়। বৈঠক বসার পূর্বেই ভারত ঘোষণা করিয়াছিল যে পাকিস্তানের অমূলক ভয় দূর করার জন্য ভারত পাকিস্তানের সহিত অনাক্রমণাত্মক সন্ধি করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আলোচনা চলার কালেই পাকিস্তান বেআইনীভাবে চীনের সহিত তাহার অধিকৃত কাশ্মীরের সীমান্ত সম্বন্ধে সন্ধি করে। এতসব সত্ত্বেও ভারত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া যায়। কিন্তু সব আলোচনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

বর্তমানে পাকিস্তান জংগী মনোভাব লইয়া ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। ভারতকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য পাকিস্তানী হামলাদারেরা কাশ্মীরের বেতার বাঁধ নষ্ট করিয়া দেয়। ভারত একদিকে যেমন নিজ সীমান্ত এবং কাশ্মীর রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেমনি অপরদিকে পাকিস্তানের সহিত যাহাতে তাহার কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাত না হয় তাহার জন্য যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।

চীন

দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের মতো চীনও ভারতের সংগে কিছুতেই সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না। চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভারত সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করিয়া নয়া চীন সরকারকে স্বীকৃতি এবং নৈতিক সমর্থন জানায়। জাতিসংঘে চীনের সদস্যপদ লাভের জন্যও ভারত প্রথম হইতেই চেষ্টা করে। ভারত চীনের সংগে পঞ্চশীল নীতিতে স্বাক্ষর করে। চীনের প্রধান মন্ত্রী ভারত সফরে আসিলে 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' রবে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। চীন যখন তিব্বত অধিকার করিল ভারত তখনও চীনের সংগে মৈত্রীর খাতিরে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিল না। ভারতের এইসব মিত্রতাসুলভ কার্যক্রম সত্ত্বেও চীন সরকার ভারতীয় লাদাক অঞ্চলে (আকসাই চীন সংলগ্ন অঞ্চল দাবী করিয়া) বেআইনী অধিকার স্থাপন করিল। কিন্তু এত প্ররোচনা সত্ত্বেও, ভারত যুদ্ধে অগ্রসর

হইল না। সে আলাপ-আলোচনার মারফতেই চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার আশা করিতে লাগিল।

ভারতের এই মিত্রভাবাপন্ন মনোবৃত্তির সুযোগ লইয়া ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং আধুনিকতম সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ভারত আক্রমণ করিল। উভয়পক্ষে বহুলোক হতাহত হইল। চীন তিন সহস্রের উপর ভারতীয় সৈন্য বন্দী করিল। দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বমডিলার পতন হইল। সমগ্র আসাম চীনা আক্রমণের সম্মুখীন হইল। উত্তর-পূব সীমান্তে চীনারা ত্রিশূল বিমানঘাঁটি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া উহার উপর প্রবল আক্রমণ চালাইল।

এই সংকট মুহূর্তে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী ভারতকে সমরসম্ভার এবং অন্যান্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। ভারত এইসব সাহায্য গ্রহণ করিল বটে কিন্তু তাহার নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিল না। সাধারণভাবে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সংগে ভারত কোনো চুক্তি করিতে রাজী হইল না। আরও দেখা গেল, রাশিয়া চীনকে তাহার ভারত আক্রমণের জন্য সমর্থন করিতেছে না। ভারতের নিরপেক্ষ নীতি জয়যুক্ত হইল।

শেষপর্যন্ত চীন স্ব-ইচ্ছায় হটিয়া গেল, কিন্তু ভারতের প্রতি তাহার বিরুদ্ধাচরণ বন্ধ হইল না। এদিকে আফ্রিকা ও এশিয়ার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি ভারত-চীন সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য অগ্রণী হইলেন। কলম্বোতে এইরূপ চারটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বৈঠক হইল। এই বৈঠকে আপস-মীমাংসার জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। ভারত এই প্রস্তাব মানিয়া লইল, কিন্তু চীন আজও ইহা মানিয়া লয় নাই। ফলে ভারতের সর্বপ্রকার সাধু উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ এক অচল অবস্থার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। যে কোনো সময় চীন আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। তাই আমাদের সামরিক শক্তিতে হীন থাকিলে চলিবে না। আমরা আর কখনো অপ্রস্তুত থাকিতে পারি না। এই উদ্দেশ্যে আমরা বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার নিকট হইতে অনেক অস্ত্রসম্ভার সাহায্য হিসাবে পাইয়াছি। কানাডা ব্যতীত উল্লেখিত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সম্প্রতি আধুনিকতম বিমান এবং রাডার ইত্যাদি অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে কি করিয়া বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হয় সেই শিক্ষা আমাদের বৈমানিকদিগকে

দিয়াছেন। অপরদিকে রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সাহায্য হইতেও আমরা বঞ্চিত হই নাই। আমরা নিজেরাও সমরাস্ত্র প্রস্তুত করিতে সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হইয়াছি এবং এদিক দিয়া আমরা স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছি। ভারতে সামরিক অস্ত্রের নির্মাণ গত এক বৎসরে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আমরা আমাদের সৈন্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করিতেছি। আমাদের যুবকমাত্রেই যাহাতে সামরিক শিক্ষা পায় সেই উদ্দেশ্যে ভারতের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এন. সি. সি. ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই প্রস্তুতির ব্যাপারে ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ যথাকর্তব্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে।

আবার, ভারতবর্ষের এই বৈশিষ্ট বৈদেশিক নীতির ফলেই ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই। কেহ কেহ অবশ্য সমালোচনা করিয়া থাকেন যে কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের সার্বভৌমিকতা বিনষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় ভারতকে যে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হইবার ফলে কার্যত সেই সার্বভৌমিকতা ভারতের নাই। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। আন্তর্জাতিক মৈত্রীতে আস্থাবান বলিয়াই ভারতবর্ষ তাহার পূর্বতন শাসক বৃটেনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে নাই; সেইজন্যই সে কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিতে ভারত বাধ্য নহে। কি আভ্যন্তরীণ, কি আন্তর্জাতিক—উভয়ক্ষেত্রেই ভারত যে কোনো বিষয়ে যে কোনো স্বাধীন নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে পারে; বৃটেনের রাষ্ট্রপ্রধান কমনওয়েলথের প্রধান হইলেও শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে ভারতের উপর তাহার কোনো কর্তৃত্বই নাই। তাই সেই দিক হইতে ভারতের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারত কমনওয়েলথে থাকিয়াও যে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহার প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা (যদিও বৃটেন ইহার বিরোধী)।

ভারতবর্ষ ও কমনওয়েলথ

শাদা চামড়া ভিন্ন, অপরাপর বর্ণের নির্যাতন বন্ধ না করা পর্যন্ত ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত সর্বপ্রকার বাণিজ্য বন্ধ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে যাহাতে কোনো দেশ তৈল সরবরাহ না করে সেই চেষ্টায়ও ভারত অগ্রণী হইয়াছে। মোটকথা, যেখানে অন্যায়, যেখানে নির্যাতন, ভারত সেখানেই নির্যাতিতের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছে।

মালয়েশিয়া

মালয়, সিংগাপুর, সারাওয়াক, ব্রুণি ও উত্তর বোর্ণিও লইয়া মালয়েশিয়া গঠিত হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন ইহার বিরুদ্ধাচারণ করিতে থাকিলেও ভারত কিন্তু প্রথম হইতেই মালয়েশিয়াকে সমর্থন জানাইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও জাতিসংঘ

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য জাতিসংঘের সনদের ও কার্যকলাপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন। যদিও সাম্প্রতিক-কালে জাতিসংঘের কোনো কোনো কার্যকলাপ অনেকের মনেই ইহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগাইয়াছে, তবু ভারতবর্ষ ইহার লক্ষ্যের প্রতি এখনও পরম আস্থাশীল। আগেই বলা হইয়াছে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে দুইটি বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ অন্যান্য নিরপেক্ষ ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সহিত একযোগে এই বিবদমান শক্তিদ্বয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস পাইয়া চলিয়াছে। শান্তি ও মানবজাতির কল্যাণের প্রতি তাহার পরম বিশ্বাস লইয়া ভারতবর্ষ ইহাদের বিরোধ ও বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ যথাসম্ভব দূর করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার কাজে সহায়তা করিয়া চলিয়াছে।

ভারতীয় প্রতিনিধিরা বরাবরই জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে ও কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতবর্ষ দুই বৎসরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল। ১৯৫৪ সালে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত জাতিসংঘের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। আমাদের বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ইউনেস্কোর বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করেন, রাজকুমারী অমৃত কাউর পৃথিবীর স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বিভিন্ন সভায় সভানেত্রীত্ব করেন, রামস্বামী মুদালিয়র করেন সামাজিক ও

অর্থনৈতিক কাউন্সিলের সভায়, ডাঃ ভাবা করেন এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সভায়, শিব রাও করেন অছি পরিষদের সভায়।

সাম্প্রতিককালে আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া যে বিধ্বংসকারী আণবিক বোমার পরীক্ষায় রত হইয়াছে, ভারতবর্ষ ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধেও জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে। ১৯৬১ সালের ৩রা নভেম্বর আণবিক বোমার পরীক্ষায় রত আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য প্রভৃতির বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপুল ভোটাধিক্যে আণবিক বোমার পরীক্ষা হইতে বিরত হওয়ার যে আবেদনমূলক প্রস্তাবটি জাতিসংঘে গৃহীত হয়, তাহার অন্যতম প্রস্তাবক ছিল ভারতবর্ষ। সুখের বিষয়, অধুনা, ভূনিম্নবর্তী আণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধ করিয়া, রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে। পৃথিবীর শতাধিক দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। স্বভাবতই এই চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারেও ভারত অগ্রণী হইয়াছে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ ছাড়াও ইহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাদিতেও ভারত বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। জাতিসংঘের শুরু হইতেই ইহার অন্তর্গত FAO, ECAFE, WHO, UNESCO, ILO প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারত কাজ করিয়া আসিতেছে। ভারতের আমন্ত্রণে ১৯৫৬ সালে বাংগালোরে ECAFE-এর দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। FAO-এর ডিরেক্টর জেনারেল হইতেছেন শ্রী বি. আর. সেন। ভারতের আমন্ত্রণে UNESCO-র নবম সাধারণ সম্মেলনও ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে UNESCO-র বিভিন্ন প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য ভারত নানাভাবে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। ভারত ILOরও সদস্য এবং ইহার পঁচিশটির বেশী নিয়ম শ্রমিকদের স্বার্থে ভারতবর্ষের চেষ্টায়ই পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারত WHO, আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রভৃতিরও অন্যতম সদস্য।

শুধু তাহাই নহে। জাতিসংঘ ও ইহার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যাপারেও ভারতের দেয় অর্থের পরিমাণ পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। সাম্প্রতিককালে এই অর্থের পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

EXERCISES

A. Answer the following questions :—

1. Write an essay on the special features of our foreign policy discussing in this connection the principles involved in 'Panchsheel' (পঞ্চশীল).

2. Write what you know of the non-alignment.

3. Write an essay on the policy of India in the U. N. O.

B. Answer the following questions in not more than 80 words :—

1. Discuss the relations of India with Pakistan.

2. Discuss India's recent relations with China.

3. Justify or criticise India's stay within the British Commonwealth of Nations.

4. State the principles of 'Panchsheel'.

C. The following suggestions are for your scrap-book :—

1. Collect pictures of Indians engaged in international work in foreign countries.

2. Collect maps of the Indo-China border (Ladak regions, etc.)

3. Collect maps of the Kashmir frontiers.

4. Collect maps of Nepal's frontiers with India and China.

D. 1. The following projects may be undertaken :—

Debates on (a) India's relation with Pakistan (b) The Kashmir issue (c) Indo-China relations (d) India's role in the Congo (e) India's policy of non-alignment.

2. The following project may be taken up—Preparation of a relief map of India showing frontiers with China and the place China occupied.

SYLLABUS IN SOCIAL STUDIES

(For the School Final Examination 1965 onwards)

A. Introduction

Unit 1. The country we live in—its physical background—geographical position in relation to the rest of the world—the political set-up—the Indian Union and the constituent States—Living as citizens of Free India.

B. Our Basic Needs

Unit 2. Food—food taken in different parts of India—influence of environment (natural and social) on food habits—composition of our food and its nutritive value.

A comparative study of food in India and a few typical countries *e. g.* Arab countries, Mediterranean countries, Japan, Lapland etc.

Unit 3. Clothing—clothing worn in different parts of India—influence of environment (natural and social) on clothing—aesthetic factors in clothing.

A comparative study of clothing in India and a few typical countries *e. g.* Desert Lands, undeveloped African countries, European countries, Polar regions.

Unit 4. Shelter—Types of our houses in different parts of India—influence of environment (natural and social) on housing—modern developments and problems of housing in India.

A comparative study of housing in India and a few typical countries *e. g.* Desert Lands, Polar Regions, European countries and U.S.A., African jungles.

Unit 5. Other Needs—Consumers' goods and services.

C. How We Meet Our Needs

Unit 6. Our principal occupations for meeting the basic needs—agriculture and supplementary occupations, forestry, mining, fishing and pastoral occupations, industries, transport, social services *e. g.* education, health, entertainments, administration, law and order.

Unit 7. Detailed studies of the important occupations and services.

(*i*) Agriculture—Principal Crops—types of agriculture—geographical factors and methods of cultivation. Need for irrigation—the role of River Valley Projects in India's economic progress. The problem of self-sufficiency in Food.

A comparative study between India and a few other countries e. g. Japan, Egypt, U.S.A., U.S.S.R. regarding crops, methods of cultivation and yield.

(ii) Occupations supplementary to agriculture—fishing, animal husbandry, poultry, dairy, preservation of food.

(iii) Forestry—Important forest areas and products—utilisation, conservation and afforestation.

(iv) Mining—mineral wealth of India—important mining centres—utilisation and conservation.

(v) Industries—different types—heavy industries e. g. iron and steel, textiles (jute, cotton, wool, silk, synthetic), chemical, shipbuilding, locomotive, automobile and aircraft industries.

Our cottage industries—chief centres of production in West Bengal.

(vi) Transport and Communication in India—forms of communication and transport in rural and urban areas.

A comparative study of different forms of transport in typical areas e.g. desert lands, polar regions, mountains etc.

A brief account of the development of transport through the ages—invention of wheel and mechanical power—use of steam, gas, electricity and atomic power—recent developments e.g. space-ship.

D. Our Culture and Heritage

Unit 8. (a) The past background—a short survey of the evolution of Indian culture and heritage through the Ages (only land-marks to be touched).

(b) Our Religion—principal religions in India—Hinduism, Buddhism, Jainism, Christianity and Islam—teaching of some important religious reformers of medieval and modern times.

(c) Our Language—the chief language groups and linguistic areas—Federal language and Regional languages—medium of instruction at different stages of education.

(d) Our Art—some notable forms of Art—Ajanta, Ellora, Gandhara, Mahavalipuram, Mughal and Rajput Art—Modern Art.

(e) Our Architecture—some notable forms of architecture—temples, mosques, and other famous historical buildings.

(f) Our Music—Classical and other forms of music—Baul, Bhatiali, Folk-songs, 'Rabindra Sangeet'.

(g) Our Dance—classical, modern and folk dances of India—their characteristics.

In the teaching of the above item, it is not necessary to go into technical details. Attempt should be made to present things like Music, Dance, Art and Architecture in real or realistic settings with ample suitable illustrations.

E. Our National Government

Unit 9. *(a)* Living as citizens of Free India—achievement of Independence in 1947—building up a New India—a free, sovereign, democratic republic with a rich heritage and culture—unity in diversity.

(b) How we attained Independence in 1947. First war of Independence against the British in 1857—growth of Nationalism and the Indian National Congress—Partition of Bengal—Swadeshi Movement—Mahatma Gandhi and Non-violent Non-co-operation movement—armed struggle in Bengal—August movement 1942—Netaji and the I.N.A. Achievement of Independence in 1947.

(c) Our National Government—The New Constitution, 1950—Important features of the Constitution—Fundamental Rights and Duties—Federal character—Centre and Constituent Units—Parliamentary Government—universal suffrage and democratic government—How our laws are made and administered—our Local Administration.

India, a Welfare State—increasing role of Government in the economic life of the people—India's striving for a socialistic goal.

F. India To-day

Unit 10. Post-Independence efforts towards Reconstruction.

(a) Our immediate problems—growing population—economic problems—problems of health and education—our efforts to solve them. The Five Year Plans—their main features—Development of Power, Heavy Industries, Community Development etc. Family Planning.

(b) India's Foreign Trade—commodities we generally export and commodities we import—countries with which most of the trading take place—change in the nature of Trade especially with reference to Trade-Balance.

(c) India's Foreign Policy—Policy of Non-Alignment—participation in World Organisations—India's efforts in the preservation of world peace—India's place in the comity of Nations.

G. Man as Citizen of the World

Unit 11. Shrinkage of distance through development of transport and communication facilities—growing inter-dependence of Nations and countries—Necessity of World Peace —World Organizations and their efforts towards solution of international problems—need of developing world-mindedness.

PRACTICAL WORK

The practical work should consist of the following :—

(*a*) Visits of educational value *e.g.* to factories, farms, ports, museums, industrial and agricultural fairs, National Library etc. and preparation of individual and group reports on visits.

(*b*) Educational projects and activities and preparation of handiwork, models, charts, graphs and short reports.

(*c*) Maintenance of individual scrap-book.

(*d*) Organisation of cultural and educational functions including educational exhibition.

(*e*) Celebration of Independence Day and Republic Day.

Two consecutive periods should be available when project work is undertaken.